গল্পে আত্মবিদ্যা

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব
শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর



সচ্চিদানন্দ সোসাইটি
কলকাতা

প্রকাশক
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি

প্রথম সংস্করণ
রাসপূর্ণিমা, ১৪১০

প্রচ্ছদ
শ্রী বিষ্ণু কর্মকার

প্রাপ্তিস্থান
সচ্চিদানন্দ সোসাইটি
এ-১৯০ মেট্রোপলিটন সমবায় আবাসন
কলকাতা ৭০০১০৫

মুদ্রক
মানসী প্রেস
৭৩ শিশির ভাদুড়ী সরণী
কলকাতা ৭০০০০৬

উৎসর্গ

স্ববোধের বক্ষে স্বভাবের লীলাভিনয়
অদ্বৈতের বক্ষে দ্বৈতের অভিনয়।
সত্তার বক্ষে শক্তির পরিচয়
মনের পর্দায় নাম-রূপ-ভাবের বিষয়।
মনের খেলায় বোধের সত্য মন ভুলে যায়
বোধের কথা বোধের গল্প মনকে জাগায়।
গল্পের সাজে বোধই আছে আত্মার বিষয়
বোধের গল্পে হৃদয়ে আত্মবোধের হয় উদয়।।

সূচীপত্র

প্রকাশকের নিবেদন

গল্পে আত্মবিদ্যা-র দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হল। প্রথম খণ্ড প্রকাশের পর যে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছে তাতে আরেকবার প্রমাণিত হল সব বিদ্যা প্রকাশের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম গল্প। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তাঁর অনন্য ভঙ্গিমায় আত্মবিদ্যার নিগূঢ়তত্ত্ব মনোরঞ্জিনী গল্পের মাধ্যমে সহজ থেকে সহজতর করে সাধারণের জন্য পরিবেশন করেছেন। বর্তমান গ্রন্থটি সেই গল্পগুচ্ছের দ্বিতীয় সঙ্কলন। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের প্রত্যক্ষ নির্দেশেই হয়েছে এর সম্পাদনা, সঙ্কলন ও মুদ্রণ।

বলা বাহুল্য *গল্পে আত্মবিদ্যা* শুধু গল্প নয়, বা আত্মবিদ্যার গল্প নয়—গল্পকে অবলম্বন করেই অধ্যাত্মবিদ্যার এক সুসমঞ্জস প্রকাশ। এই গ্রন্থ পাঠক-পাঠিকাকে প্রভাবিত করবে, আনন্দ দান করবে, লাভবান করবে। লাভ হবে সুন্দর নিটোল কিছু গল্প পড়ার অভিজ্ঞতা, সেসব গল্পের বেশির ভাগই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের ভেতর থেকে উঠে আসা আশ্চর্য সব কাহিনি, তাছাড়া আছে স্মৃতি, শ্রুতি, পুরাণ, উপনিষদ, পঞ্চতন্ত্র, ঈশপের উপাখ্যান, লোকগাথা, বর্তমান সমাজ—এ সব থেকে চয়ন করা কিছু গল্প যা তাঁর নিজস্ব মনোহারী মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় পরিবেশিত; আর লাভ হচ্ছে, কিছুটা অজান্তেই হয়ত, অধ্যাত্মবিদ্যার তত্ত্ববোধন।

মানুষের দুঃখকষ্টের মূল কারণ অজ্ঞান—অজ্ঞান পরমব্যাধি ও পরম শত্রু। অজ্ঞান আত্মজ্ঞানের অভাবেই জন্মায়; আত্মজ্ঞানই পরমজ্ঞান—নিজের সত্যস্বরূপের জ্ঞান বা পরিচয়। তবে গুরুকৃপা ছাড়া আত্মজ্ঞান লাভ হয় না, তার সাধনা তখন বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রথম খণ্ডের মত দ্বিতীয় খণ্ডেও তাঁর উক্ত উপাখ্যানগুলি চমকপ্রদ গল্প হয়েও তত্ত্বাধার বাণীমঞ্জরী। এই তত্ত্ব অনুধাবন করা সাধারণের পক্ষে হয়ত সর্বদা সম্ভব নয়। তাই প্রজ্ঞানপুরুষ প্রতিটি গল্পের উপস্থাপনার অন্তে এর অন্তর্নিহিত তত্ত্বের সংক্ষিপ্ত স্বরূপটি প্রকাশ করে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসাবে তার কয়েকটি এখানে সংক্ষেপে আলোচিত হল।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেছেন সর্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সদ্‌গুরুকে প্রতিষ্ঠা করে সাধনা করলে তবেই সিদ্ধি—এই সিদ্ধিলাভ হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তখনই দৈব আর পুরুষকারের অভেদ মিলন প্রত্যক্ষ হয়। এই প্রসঙ্গে এক ব্রাহ্মণীর কথা বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক তপস্বী ব্রাহ্মণীর পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু হয়। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী এক ব্যাধ সাপটিকে ব্রাহ্মণীর কাছে নিয়ে এল যাতে ব্রাহ্মণী পুত্রের মৃত্যুর শোধ নিতে গিয়ে সাপটিকে হত্যা করে। ব্রাহ্মণী এতে রাজি হয় না, তাতে তো তার পুত্র ফিরে আসবে না। ব্যাধ অনেক গ্রহণযোগ্য সুযুক্তি দেখাল—ব্রাহ্মণী অবিচল, সাপটিও সাফাই গাইল যে সে তো নিমিত্তমাত্র—যমরাজের নির্দেশেই তার এই কাজ। যমরাজও যথার্থভাবে

কোনও কারণ দর্শাতে না-পেরে সমাধান দিলেন—"নিয়তি কেন বাধ্যতে"—দৈব ও পুরুষকারের সংযোগে পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরেই নিয়তির কর্মসম্পাদন। প্রিয়পুত্রের বিয়োগেও আগাগোড়াই ব্রাহ্মণী স্থির ও অটল রইলেন কেননা ব্রাহ্মণী ছিলেন পূর্ণজ্ঞানী, সর্বত্যাগী।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেছেন যে, শুধু ইচ্ছা এবং আর্থিক সামর্থ্য দিয়েই কোনও কাজ সিদ্ধ হয় না। একজন দর্জির গল্প বলে দেখিয়েছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত না সে একজন দক্ষ কারিগর গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করে অভিজ্ঞতা অর্জন করছে ততক্ষণ সে শুধু কাপড় কেটে নষ্টই করেছে, সঠিক সেলাই করতে পারেনি। অধ্যাত্মপথেও একমাত্র পূর্ণ স্বানুভবসিদ্ধ গুরুই ভক্ত-শিষ্যকে প্রত্যক্ষ অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

একটি বহুল প্রচারিত গল্প উল্লেখ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর দেখালেন যে, পথ চলতে গিয়ে যে মারাত্মক ভুল হয় সেই ক্ষতি এই জীবনে আর পূরণ হয় না; সাধনপথে এরকম ভুল সাধকের দু'তিন জন্মের সাধনাও নষ্ট করে দেয়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রচলিত গল্পও নতুনভাবে পরিবেশন করে তার গূঢ়ার্থ উদ্ঘাটন করেছেন। ঈশপের মেষ ও সিংহশাবকের গল্পটি এখানে উল্লেখনীয়। তিনি শেষে বললেন যে জীবমাত্রই আত্মবিস্মৃত দলভ্রষ্ট সিংহশাবক আর সদ্‌গুরু সিংহ স্বয়ং—যাঁর কৃপাতেই জীবেব আত্মস্বরূপে প্রত্যাবর্তন সম্ভব।

প্রেমের শক্তি বোঝাতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এক অপূর্ব কাহিনি শুনিয়েছেন—যেখানে জল, স্থল, কাল ও নীতির ব্যবধান দুস্তর; আবার এই গল্পে ঋষিদের অধ্যাত্ম ও প্রাকৃতবিজ্ঞানের উন্নতির কথাও বুঝিয়েছেন। মূলত অবশ্য প্রেমের মাধ্যমে মানুষ কত অসাধ্যসাধন করতে পারে, কত অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে তাই বুঝিয়েছেন।

গল্পচ্ছলে এমনি আত্মতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্বের বহু টুকরো কথা শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এই *গল্পে আত্মবিদ্যা*-র দুই খণ্ডেই প্রকাশ করেছেন। যে সত্য এক, অখণ্ড, তার বিজ্ঞানেও অনেক ভাগ বর্তমান। এ রহস্য গূঢ় ও গভীর। স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের শ্রীমুখে এই তত্ত্বের স্বরূপ ও ব্যাখ্যান শুনলেই তাঁর কিঞ্চিৎ উপলব্ধি ঘটে। এই শ্রবণ পরে মননে নিদিধ্যাসনে সিদ্ধ হলে সাধকের উৎসর্জন হয়। পাঠক-পাঠিকা এই স্তরের মধ্য দিয়ে গেলে এই গ্রন্থ প্রকাশের সার্থকতা ঘটবে।

এই গ্রন্থে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বিভিন্ন ধরণের বেশ কয়েকটি কাহিনি পরিবেশন করে তাদের অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্বটি সহজবোধ্য করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। গ্রন্থটি শুধুমাত্র একটি গল্পগুচ্ছ ও তত্ত্ববোধিনীই নয়, তার চাইতে বেশি, এটি একটি জীবনবেদ, পাঠক-পাঠিকার নিত্যপাঠ্য। ধ্রুবাস্মৃতিতে প্রতিষ্ঠা দেবার উপপাদ্য সঙ্কলনসার।

সর্বসাধারণের সুবিধার্থে এই গ্রন্থের মূল্যও কমই রাখা হল। সময়মত গ্রন্থটি সবার হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা কৃতার্থ।

সচ্চিদানন্দ সোসাইটি

মুখবন্ধ

গল্পে আত্মবিদ্যা গ্রন্থটির প্রথম খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠে পাঠকবৃন্দ প্রীত, অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ হয়েছে। তারা *গল্পে আত্মবিদ্যা*-র তাৎপর্য, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবং সময়োপযোগী তার প্রকাশন সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে প্রশংসা করেছে। এই রকম তত্ত্বমূলক সহজবোধ্য সাধারণ পাঠকের উপযোগী একটি মৌলিক গ্রন্থের একান্ত অভাব ছিল। *গল্পে আত্মবিদ্যা*-র প্রথম খণ্ড তা বহুলাংশে পূরণ করেছে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড দ্রুত প্রকাশের জন্য বহুজন প্রকাশককে অনুরোধ জানিয়েছেন। তাদের আগ্রহ ও অনুরোধে দ্বিতীয় খণ্ডটি বিলম্ব না-করে সত্বর প্রকাশনের চেষ্টা করা হয়েছে এবং তা যথাসময়ে পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বহুবিধ অসুবিধা ও প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও গ্রন্থটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

গ্রন্থটিব প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এবং তার অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে স্বকীয় স্বানুভূতি ও তার ভাব-ভাষা অবলম্বনে যে-সকল কথা ব্যক্ত করা হয়েছে তাতে আত্মবিদ্যার জটিল সূক্ষ্মতম রহস্যকে আপন হৃদয়ে আপনবোধে কত সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যায় সে প্রসঙ্গেও অতি সুন্দর ভাবে স্বানুভবসিদ্ধ বক্তব্যকে সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হয়েছে। আত্মবিদ্যা হল সর্ববিদ্যার পরাকাষ্ঠা, সর্ববিদ্যার অধিষ্ঠান। অদ্বয় একবোধের স্বরূপই হল আত্মা। তা সর্ব অনুভূতির সার, বোধের বোধ, জ্ঞানের জ্ঞান। এই বোধস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সবার হৃদয়েই নিহিত আছে। সৃষ্টির সমগ্র প্রকাশের অন্তরে—সর্বভূতের সর্বপ্রাণী বা জীবের কেন্দ্রসত্তা অন্তঃসত্তারূপে এই বোধস্বরূপ আত্মা নিহিত আছে। এই আত্মসত্তাই হল অখণ্ড ভূমা নিত্য শাশ্বত অচ্যুত পূর্ণ মৌলিক সত্তা, সমগ্র সৃষ্টি, সমগ্র প্রকাশের সত্য উপাদান। পরমতত্ত্ব তাঁর নাম। এই তত্ত্বস্বরূপ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ সম শান্ত অদ্বয় এক অস্তিসত্তা। চিদানন্দ তার স্বরূপ। আপনবক্ষে আপন দ্বারা আপনই প্রকাশমান। সর্বসম স্বয়ংপ্রকাশতা হল তার মৌলিক ধর্ম।

স্বয়ংপ্রকাশ আত্মসত্তার বক্ষে তাঁর প্রকাশধারার কোনও অভাব হয় না, তাঁর কোনও বিচ্ছেদ নেই, কোনও অভাব নেই, সুতরাং অভাবপূরণের কোনও তাগিদও নেই। আপন আনন্দে আপনই মাতোয়ারা পাগলপারা, তাই তাঁর স্ববোধের বক্ষে স্বভাবের নিরন্তর অভিনব প্রকাশধারায় নিজের স্বভাবকে নিয়ে নিজেই মত্ত আছে। তাঁর স্বভাব ও স্ববোধের মধ্যে কোনও ভেদ বা অন্তরায় নেই সত্য, কিন্তু প্রকাশধারার মধ্যে, তাঁর অভিনব অভিব্যক্তির মধ্যে পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে যে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, নিরন্তর তার ধারায় ক্রম বৈচিত্র্যের ভাব স্ববোধের উপরে তার ছায়া ফেলে। তার ফলে স্ববোধের বক্ষে স্বভাবের লীলায়িত রূপের মধ্যে স্বভাব প্রকাশের পূর্বাপর ক্রম ধরে ভাবের আধিক্যবশত ভাবের বিকাররূপে কিছু প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয়। ভাবেরই

অংশবিশেষ গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বলে স্বভাবের ঘরে গুণভাবের মাত্রার প্রাধান্য পরস্পর প্রকাশের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য রূপে প্রতীয়মান হয়। স্বভাবের শক্তি গুণভাবের মাধ্যমে স্বভাবমহিমাকে প্রকাশ করতে গিয়ে তার প্রকাশধারার মধ্যে অনন্ত অনন্ত বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে। স্বভাবের ঘরে যত প্রকার বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় তারমধ্যে স্ব হল কেন্দ্র এবং ভাব হল তার পরিধি। উভয়ে অভিন্ন হলেও ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হয় বৈচিত্র্যের আধিক্যে। অপরপক্ষে স্ববোধের বক্ষে স্ব এবং বোধ উভয়ই নিত্য সমসূত্রে বদ্ধ। তাদের মধ্যে কোনও ভেদ বা পার্থক্য সম্ভব হয় না, তা নিত্য অদ্বৈত। কিন্তু স্বভাবের ক্ষেত্রে স্ব-এর সঙ্গে ভাব-এর একটা ভেদাভেদ সম্বন্ধ ভাবের দৃষ্টিতে অনুমিত হয় বা প্রতীত হয়। কিন্তু বোধের দৃষ্টিতে তা থাকে না।

স্ববোধের মধ্যে যেমন স্ব এবং বোধ অভিন্ন এক, অর্থাৎ স্ব হল আপন এবং বোধও হল আপন, তা-ই হল আবার আত্মা। স্বভাবের ক্ষেত্রে স্ব হল বোধরূপ আপন, ভাব কিন্তু তার প্রতিফলন বা ছায়া। তাতে স্ব বা বোধের অর্থাৎ আপনতার মানের তারতম্য গুণ ও ভাব ভেদে অনুভূত হয়। জীবনের মধ্যে স্ববোধ ও স্বভাবের পরিচয় কেন্দ্রসত্তা ও অন্তঃসত্তা রূপে অভিব্যক্ত হয়। কেন্দ্রসত্তায় গুণভাবের কোনও অস্তিত্ব ও প্রভাব থাকে না, কিন্তু অন্তঃসত্তাতে স্ব অর্থাৎ আপনবোধের বক্ষে ভাবের আতিশয্যবশত ভাবের প্রকাশের মধ্যে পরস্পর মানের তারতম্য অধিকমাত্রায় প্রকাশ পায় বলে ভাবের ঘরে গুণশক্তির প্রতিক্রিয়া স্বভাববিরুদ্ধ অবস্থা, দেশ-কাল, কার্য-কারণের অবতারণা বা প্রকাশ করে তার মধ্যে ভাববোধের মহিমাকে প্রকাশ করে। সেইজন্য অন্তরের প্রতিফলন বাইরে নাম-রূপের বৈচিত্র্যরূপে প্রকাশ পায়। তার কারণ ও নিয়ন্তা হল অন্তঃসত্তা, অর্থাৎ অন্তরের ভাববোধ যা দ্বৈতরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই দ্বৈত স্বভাবের কার্যই হল বৈচিত্র্যময় নাম-রূপের বহিঃপ্রকৃতি। এই অন্তরের দ্বৈত স্বভাবের কারণ ও নিয়ন্তা হল কেন্দ্রের অদ্বৈত স্ববোধসত্তা। স্ববোধসত্তার পরাকাষ্ঠাই হল তুরীয় বোধস্বরূপ পরমাত্মা। অহংদেব পাকাআমি হল তাঁর পরিচয়। তা তুরীয়তে প্রজ্ঞানঘন, কেন্দ্রে বিজ্ঞানঘন, অন্তরে জ্ঞানাভাস বা জীবচৈতন্য (অহংকার) এবং বাইরে অজ্ঞানঘন বা পরিদৃশ্যমান জড়জগৎ।

জীবজগতের সত্য পরিচয় উপরোক্ত বিশ্লেষণ বিজ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্ত করা হলেও কেবলমাত্র মানুষের মধ্যে উত্তম অধিকারী অনুভবসিদ্ধ হতে পাবে, অপরের পক্ষে তা অনুমানের বিষয় এবং অধিকাংশ মানুষের কাছে তা অনুমানসাপেক্ষও নয়। সৃষ্টির এই অভিনব রহস্য জীবনের অন্তরে-বাইরে জীবনকে জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে পরিচালিত করে। তাই দেখা যায়, পরস্পর জীবের মধ্যে জ্ঞান, অনুভূতি, শক্তি, সামর্থ্য, যোগ্যতা ও গুণের তারতম্যমূলক ভেদ বা পার্থক্য। জীবনের বাইরের দিকটা ইন্দ্রিয়ভাববোধের বিষয়; অন্তরে তা স্বভাবজাত মন-বুদ্ধির বিষয়, অহংকারই তার কর্তা; কেন্দ্রে তা স্ববোধগত এবং তুরীয়তে তা নিত্যাদ্বৈত। অর্থাৎ বাইরে বৈচিত্র্য, নানাত্ব বহুত্ব প্রধান; অন্তরে দ্বৈত ভাবপ্রধান; কেন্দ্রে অদ্বৈত এবং তুরীয়তে নিত্যাদ্বৈত। জীবজগতে মানুষ হল শ্রেষ্ঠ, কারণ মানুষের মধ্যেই কেবল ধর্মভাববোধ, সত্য ও

তত্ত্বের জিজ্ঞাসা অনুসারে যুক্তিপূর্বক বিবেকবিচার বিশ্লেষণ ক্রমধারায় প্রকাশ পায়। স্ববোধের প্রাধান্যেই তা প্রকাশ পায়। সেইজন্য মানুষের মধ্যে অনুভূতি, শক্তি, গুণ ও যোগ্যতার মানের তারতম্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। পরস্পর মানুষের মধ্যে ভেদের কারণ হল অন্তরের স্বভাবজাত ভাব ও অনুভূতি। স্বভাবে গড়া সব মানুষ স্বভাবের দ্বারাই পরিচালিত হয়। কিন্তু সে আপন স্ববোধের পরিচয় সম্বন্ধে সম্যক্ ভাবে অভিহিত নয়। অর্থাৎ স্ববোধের পাকাআমি অহংদেবকে স্বভাবের কাঁচাআমি অহংকার জানতে পারে না। তার জন্য বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান তথা বিদ্যার অনুশীলনের একান্ত প্রয়োজন হয়। পরস্পরের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্যের কারণ স্বভাবজাত অবিদ্যা-অজ্ঞান অর্থাৎ স্ববোধজ্ঞানের অভাব, আবার এই পার্থক্য বা ভেদজ্ঞানের অবসান হয় স্ববোধজাত বিদ্যার প্রাধান্যে। অবিদ্যা-অজ্ঞানের লক্ষণাদি হল নাম-রূপ বৈচিত্র্যের ভেদ বা পার্থক্য, আবার বিদ্যার লক্ষণাদি হল স্ববোধজাত সমতা একতা পূর্ণতা অনন্যতা আপনতা প্রভৃতি। অবিদ্যার দ্বারা হয় গুণভাবের বন্ধন এবং বিদ্যার দ্বারা হয় সেই বন্ধনমোচন বা মুক্তি। অবিদ্যার প্রভাবে হয় জীবনে ভোগ, দুঃখকষ্ট, জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি এবং বিদ্যার প্রভাবে এ সবের অবসানে স্ববোধের বা আপনবোধের অনুভূতি তথা স্বানুভূতি হয়। এই স্বানুভূতি হল আপনবোধ একবোধ বা সমবোধ। কেন্দ্র ও তুরীয়ের মধ্যে সমতা ও একতাই হল পূর্ণ। উভয়ের মধ্যে যে ভেদ প্রতীয়মান হয় তা অতি গৌণ।

উপরোক্ত আলোচ্য বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতেই *গল্পে আত্মবিদ্যা*-র তাৎপর্য পরিবেশিত হয়েছে। পরস্পর জীবনের মধ্যে যে দ্বৈতভাববোধের প্রাধান্য বেশির ভাগ পরিলক্ষিত হয় তার কারণ পূর্বোক্ত আলোচনার বিষয়ের মধ্যে বিশদ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত গল্পগুলি সাধারণ মানুষের জীবনে পরিলক্ষিত ঘটনাবলী অবলম্বনেই রচিত। তার মধ্যে আনুমানিক বা কাল্পনিক কিছু নেই, সবই বাস্তবকে অবলম্বন করে প্রকাশিত। জীবনে বাস্তবতাকে লক্ষ্য করে, তার দিব্য পরিণাম ও স্বভাব হতে স্ববোধে উত্তরণের স্বানুভবসিদ্ধ বিজ্ঞানকে পূর্ণাঙ্গ সমাধানরূপে নির্দেশ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের গল্পগুলির অভিনবত্ব ও বিশেষত্ব অনুসারে তার অন্তর্নিহিত শুদ্ধভাববোধের তত্ত্বকে কোথাও গল্পের মধ্য ভাগে বা কোথাও গল্পের শেষ ভাগে তার সত্য ও তত্ত্বের পরিচয়টি সংক্ষেপে যথার্থ ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে সহৃদয় পাঠকদের কাছে তা সহজবোধ্য হয়।

দ্বিতীয় খণ্ডের গল্পগুলির বিষয়বস্তু প্রথম খণ্ডের গল্পগুলি অপেক্ষা অধিক তাৎপর্যপূর্ণ ও গুরুত্বপূর্ণ। পাঠকগণ পাঠকালে তা অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। এই গল্পগুলি পাঠ করে গল্পের যেমন একটা মজা অনুভব করা যায, তেমনই গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও সত্যের বিশ্লেষণ পড়ে জীবনসমস্যার সমাধান স্ববোধের/আপনবোধের ব্যবহার দ্বারা যে কত সহজেই সিদ্ধ হয় তার পরিচয়ও অবগত হওয়া যায়। হৃদয়ের গভীরে যেমন স্ববোধ-আত্মা নিহিত থাকে, সেইরূপ গল্পগুলির অভ্যন্তরে কেন্দ্রে তার অন্তর্নিহিত সত্য ও তত্ত্বের পরিচয় আবৃত থাকে। বিজ্ঞানসম্মত তত্ত্বভিত্তিক আলোচনার

মাধ্যমে তা আপন হৃদয়ে আপনবোধে আবিষ্কৃত হয়। দ্বিতীয় খণ্ডের গল্পগুলির মধ্যে এমন অনেক গল্প আছে যার বিজ্ঞানভিত্তিক তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবার জীবনে, সমাজ জীবনে এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে অতীব দুর্বোধ্য জটিল সমস্যার সমাধানও সহজ সরল ভাষায় সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করা হয়েছে।

গল্পে আত্মবিদ্যা প্রথম খণ্ড পাঠে পাঠকগণ যেমন আনন্দ পেয়েছে, উপকৃত হয়েছে এবং অনুপ্রাণিত ও উদ্বোধিত হয়েছে, দ্বিতীয় খণ্ডের গল্পগুলি পাঠে তারা নিশ্চয়ই অধিকমাত্রায় আনন্দিত, অনুপ্রাণিত ও স্ববোধ-আত্মায় উদ্বোধিত হবে সে কথা বলাই বাহুল্য। স্ববোধের আলোয় অন্তর-হৃদয় উদ্ভাসিত হবে, আপনবোধের ব্যবহার স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত হবে, স্ববোধ-আত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভে প্রতিষ্ঠা হবে এবং অদ্বয়বোধে স্থিতি দৃঢ় হবে।

সাধারণত গল্প পাঠে পাঠকের আগ্রহ ব্যাকুলতা থাকে, কারণ গল্প পাঠে অন্তর্মন আনন্দ পায়। তার সঙ্গে তত্ত্ববোধের যোগ হলে সেই আনন্দ চিরস্থায়ী হয়। আত্মার বোধই হল আত্মবিদ্যা। এই আত্মবিদ্যা সাধননিরপেক্ষ, কেবল গল্প পাঠ ও অনুশীলনে তা যে কত সহজেই সুসিদ্ধ হয় তা পাঠকের কাছে অভিনব ভাবে আবিষ্কৃত হবে। শাস্ত্র পাঠে শাস্ত্র অনুশীলন করে মানুষ যেমন উপকৃত হয়, দর্শন বিজ্ঞান গ্রন্থ পাঠে এবং তার সম্যক্ অনুশীলনের দ্বারা মানুষ যেমন নূতন জ্ঞানের আলোতে অনুপ্রাণিত, উদ্বুদ্ধ ও প্রবোধিত হয়, সেইরূপ ***গল্পে আত্মবিদ্যা*** পাঠেও পাঠক আপনবোধের ঐশ্বর্যে ও মাধুর্যে অনুভবসিদ্ধ হয়ে আপন স্ববোধ-আত্মার সঙ্গে তাদাত্ম্যলাভে পূর্ণ ও ধন্য হবে।

অধিক বলার অপেক্ষা আর রাখে না, ***গল্পে আত্মবিদ্যা***-ই তার সাক্ষ্য ও প্রমাণ। আত্মবোধে সিদ্ধ যিনি তিনিও ধন্য, পূর্ণ, সার্থক তাঁর জীবন, তিনিই হলেন সর্বতোভাবে মানুষের লক্ষ্য ও আদর্শের প্রতিভূ।

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর

প্রথম অধ্যায়

২০৩

জনৈক ভক্তের সঙ্গে কথোপকথনকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—পান্নালাল ভট্টাচার্য যিনি রেডিওতে গান গাইতেন, তাঁরই পরিচিত কয়েকটি ছেলে কাঁকুলিয়া রোডের বাসায় আসত। পান্নালাল সেই ছেলেদের মুখে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কথা শুনে 'এর' সঙ্গে দেখা করার খুব আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আসব আসব করেও শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি, মারাই গেলেন। দেখা হলে হয়ত তাঁর জীবনটা অন্যরকম হত, নূতন করে বাঁচার অর্থ খুঁজে পেতেন। এত সুন্দর মায়ের গান গাইতেন অথচ তাঁর জীবনের এ রকম পরিণতির কারণ হল, তাঁর সব কিছু থাকা সত্ত্বেও একটি জিনিসের অভাব ছিল—তা হল গুরুশক্তি।

গুরুশক্তি যে কী ভাবে রক্ষা করে, একজনের জীবনের ঘটনা শুনলে বুঝতে পারবে—এক ভদ্রলোক রোগ, শোক এবং সাংসারিক অশান্তিতে খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন। নিজের জীবন শেষ করে দেবার জন্য তিনি ছয়বার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কোনও বারই কৃতকার্য হননি। কারণ যতবার আত্মহত্যা করতে যান ততবারই ধরা পড়ে যান। শেষবারে তিনি মাঝ নদীতে নৌকা নিয়ে গেলেন এবং রিভলভার দিয়ে নিজেকে গুলি করে জলে ঝাঁপিয়ে পড়বেন—এই ঠিক করলেন। কিন্তু এমনই কপাল গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। আর যে বাঁশটি সঙ্গে নিয়েছিলেন জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সেটাও হাত ফসকে পড়ে গেল। সেই মুহূর্তে গুরু এসে উপস্থিত হলেন। গুরু তাকে বললেন—কী রে পারলি? যে দেহ তুই আমাকে সঁপে দিয়েছিস সেটা এখন তোর নয়। নিজের ইচ্ছা মতো তা নষ্ট করার অধিকার যে তোর নেই তার প্রমাণ তুই আজ পেয়ে গেলি! ভক্তটি তখন সব বুঝতে পারলেন এবং নিজেকে গুরুচরণে পূর্ণ সমর্পণ করে পরিণত বয়সে এক বিরাট সাধু হয়েছিলেন।

১২। ৩। ৭৩

২০৪

সৎপ্রসঙ্গ করতে করতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার কুমিল্লা এবং ঢাকায় দু'টি নাটক হয়েছিল—একটির নাম প্লাবন এবং আরেকটির নাম শাঙ্কোপাঙ্গ। দু'টিই খুব ভাল বই। এখন কোন নাটক সবচেয়ে ভাল এই নিয়ে দুই জায়গার লোকেদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হল। বিবাদ শেষ পর্যন্ত চরমে পৌঁছায়। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন একজন বৃদ্ধ মোক্তার—অতি বুদ্ধিমান ও

বিচক্ষণ। শেষ পর্যন্ত সেই মোক্তারকেই মীমাংসা করার ভার দেওয়া হল। তিনি বই দু'খানা সবার সামনে দেশলাই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিলেন। এই দেখে সবাই তাকে জিজ্ঞাসা করল—এটা আপনি কী করলেন?

তিনি বললেন—এই বই দু'টিই তো তোমাদের ঝগড়া ও অশান্তির কারণ। তাই এ দু'টিকে আগে শেষ করে দেওয়া হল।

এই ঘটনাটির তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সংসারে অশান্তির বীজ ও কারণ হল অজ্ঞান। অজ্ঞানই নানা ভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। বিভ্রান্ত মানুষের মন সবসময়ই অস্থির ও চঞ্চল থাকে। সেইজন্য সে কোনও জিনিসকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারে না, তার ব্যবহারের মধ্যেও দোষ থেকে যায়। এইজন্য তাকে দোষের ফল ভোগ করতে হয়। জ্ঞানের অভাবে অজ্ঞানের ফল ভোগ করে মানুষ। আবার জ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা অজ্ঞানের শোধন হলে সে দোষমুক্ত হতে পারে। জ্ঞানই তাকে সমস্ত বিপদ-আপদে রক্ষা করে। জ্ঞানের মতো পবিত্রও কিছু নেই, জ্ঞানের মতো বন্ধুও কেউ নেই। অজ্ঞানে বন্ধন, জ্ঞানে মুক্তি। অজ্ঞান হল মৃত্যু, জ্ঞান হল অমৃত। অজ্ঞান হল দৈত্য, দানব, শয়তান এবং জ্ঞান হল দেবতা।

১৫। ৩। ৭৩

২০৫

কোনও বিষয়ের ব্যবহার সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে মানুষকে কত রকম ভাবে মারাত্মক বিপদে পড়তে হয়, সেই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে।

গীতিনাট্য পরিবেষণকারী এক সাংস্কৃতিক দলের (cultural delegation) বিশেষ অংশগ্রহণকারী এক দম্পতি প্রথমবার রাশিয়াতে গিয়েছিল গীতিনাট্য পরিবেষণ করার জন্য। পুরুষটি ছিল নৃত্য বিষয়ের উপদেষ্টা ও শিক্ষক এবং তার স্ত্রী ছিল গায়িকা—নৃত্যের সঙ্গে গীত পরিবেষণকারিণী। তারা দলবল নিয়ে উঠেছিল একটি বড় হোটেলে। সেখানকার রাস্তা ও ভাষার জ্ঞান তাদের ছিল না। যেদিন তাদের কোনও programme ছিল না, সেই দিন তারা বিশেষ কোনও স্থান দর্শনের জন্য বাইরে বেরিয়েছিল। সেখান থেকে তারা ভিন্ন পথে দর্শনীয় আরও দু-চারটি স্থান ঘুরে হোটেলে ফেরবার সময় খুব বিপদে পড়েছিল, কারণ তখন তারা রাস্তায় এক বিরাট procession-এর সামনে পড়ে যায়। অন্য কোনও রাস্তা এবং রাশিয়ান ভাষা জানা না-থাকায়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তারা অপেক্ষা করছিল। তারা ইংরেজিতে তাদের অসুবিধার কথা পথচারীদের জানাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। এদিকে সময়মতো না-পৌঁছোলে হোটেলে ঢুকতে পারবে না।

দম্পতিকে ভারতীয় জেনে বিশেষ একজন পথচারী ট্র্যাফিক পুলিশের হাতে তাদের তুলে দেয়। পুলিশের সাহায্যে সেই দিন তারা হোটেল বন্ধ হবার এক মিনিট আগে হোটেলে এসে পৌঁছায়। এক মিনিট পরে এলে সেদিন তাদের হোটেলে আর স্থান হত না, মহাবিপদে পড়তে হত। হোটেলে অন্য সবাই তাদের জন্য খুব চিন্তিত হয়ে অপেক্ষা করছিল এবং পুলিশ স্টেশনেও খবর পাঠিয়েছিল। তাদের কাছে সেদিন

সেই দম্পতি খুব কড়া বকুনি খেয়েছিল। তারপর থেকে তারা কোনও guide ছাড়া কোথাও যাবে না, এই স্থির করল।

আরেকদিনের বিপদের ঘটনা হল, প্রথম দিন মেয়েটি বাথরুমে ঢুকেছে স্নান করতে। বাথরুমে স্নানের জন্য নানা রকম ভিন্ন ভিন্ন ডিগ্রির warm water-এর ব্যবস্থা ছিল। তার জন্য বিরাট সুইচবোর্ডে অনেকগুলি সুইচ ছিল। তার স্বামী তাকে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ সুইচ দেখিয়ে তার ব্যবহারকৌশলটা বলে দিয়েছিল। মেয়েটি বাথরুমে ঢুকে কয়েকটি সুইচ খুলে দিয়ে tub-ভর্তি জলে স্নান করতে থাকে। ভুলবশত অথবা অজ্ঞাতসারেই হোক সে এমন কয়েকটি সুইচ টিপেছিল যার ফলে দু-তিনটি কল দিয়ে full speed-এ জল পড়ছিল। সেখানকার স্নানের ঘরের ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল, সাধারণ বাথরুমের মতো নয়। অল্প সময়ের মধ্যে বাথরুম জলে ভর্তি হয়ে যায়। মেয়েটি ভয় পেয়ে এলোমেলো সুইচ টিপতে আরম্ভ করে। তার ফলে জল বন্ধ না-হয়ে বাথরুমে জল বাড়তেই থাকে। মেয়েটি সাঁতার জানত না। যখন বুক-গলা পর্যন্ত জল হয়ে যায় তখন সে ভয়ে চিৎকার শুরু করে এবং নানারকম আওয়াজ কবতে থাকে।

তার বাথরুম থেকে বেরোতে বিলম্ব হতে দেখে এবং নানারকম আওয়াজ শুনতে পেয়ে তার স্বামী তাড়াতাড়ি টেলিফোনে expert-দের খবর দেয়। হোটেলের মধ্যেই expert-দের অফিস ছিল। তারা এসে দু-তিন মিনিটের মধ্যে ব্যবস্থা করে মেয়েটিকে বাথরুম থেকে বের করে নিয়ে আসে। আর কয়েকমিনিট বিলম্ব হলেই মেয়েটির প্রাণরক্ষা করা সম্ভবপর হত না। তারপর ডাক্তার ডেকে এনে চিকিৎসা করে তাকে সুস্থ করে তোলা হয়। তার পরেও তারা তিন সপ্তাহ ছিল এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় programme করেছিল। কিন্তু তিন সপ্তাহের মধ্যে মেয়েটি আর স্নান করেনি। একদিন কেবল তার স্বামী বিশেষ একটি সুইচ খুলে দেয় এবং বাথরুমে দরজার ছিটকিনি খোলা রেখে মেয়েটি স্নান করেছিল। অন্যান্য দিন কেবল বেসিনের জলে হাত-মুখ ধুয়ে পোশাক পরিবর্তন করে নিত।

গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—যথার্থ অভিজ্ঞতার অভাবে সব কিছুর ব্যবহারে যে দোষ বা ত্রুটি হয় তা-ই হল মানুষের দুঃখকষ্টের মূল কারণ। অজ্ঞানই হল পরম ব্যাধি ও পরম শত্রু। এই অজ্ঞান অর্থে এখানে আত্মজ্ঞানের অভাবকে বুঝতে হবে। আত্মজ্ঞান হল সর্বজ্ঞানের জ্ঞান অর্থাৎ নিজের সত্যস্বরূপের যথার্থ পরিচয়। আত্মা অতিরিক্ত যা-কিছু বস্তু, ব্যক্তি, কর্ম, কর্মফল তা অজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত।

১৫। ৩। ৭৩

২০৬

অন্তরে তাঁর দর্শন চাইলে তিনি দেখা না-দিয়ে পারেন না। মানুষ তাঁর দর্শন পাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে, কিন্তু তার মধ্যে ভগবানের জন্য শতকরা কত ভাগ, আর নিজের অভাবপূরণের জন্য কত ভাগ চাওয়া থাকে সেটা ভাল করে দেখতে হয়। সাধনার প্রথম পর্যায়ে সাধকরা তাঁর দর্শন লাভের জন্য জীবনপাত করে। অবশ্য খণ্ড

চাওয়া থেকেই ক্রমশ অখণ্ড চাওয়া আসে। সাধুদের সঙ্গে থেকে তাঁদের দেখে-শুনে তারপর ঐ রকম চাওয়ার ইচ্ছা জাগে। নিরন্তর যেন এক চাওয়া থাকে। চাওয়ার মধ্যে একাগ্রতা থাকা চাই। তা না-হলে চাওয়া কখনওই পূর্ণ হয় না। তার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে হয়। প্রার্থনার ফলে যে কী হতে পারে সেই প্রসঙ্গে একটি গল্প শোন।

ভিল দেশের এক রাজা ঘোড়ায় চড়ে তিরধনুক হাতে শিকার করে বেড়াত। একবার ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে সে এক শিবমন্দিরের সামনে উপস্থিত হল। কিন্তু সে জাতিতে ভিল বলে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি পেল না। লোকেদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে, মন্দিরের ভিতরে যিনি আছেন তিনি জগদীশ্বর বা জগতের রাজা। সে ভাবল, আমিও তো একজন রাজা, তাহলে জগতের রাজার সঙ্গে আমার ভাব করতে হবে! এই ভেবে সে ঠিক করল রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে মন্দিরে যাবে।

রাতে মন্দিরে যাবার আগে ভাবল, সে যে রাজার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাচ্ছে তাঁর জন্য তো কিছু নিয়ে যাওয়া উচিত। সে একটি সুন্দর খরগোশ শিকার করল। রাতে মন্দিরে গিয়ে দেখে মন্দিরের দরজা বন্ধ। অনেক ধাক্কাধাক্কি করেও যখন কেউ মন্দিরের দরজা খুলল না, তখন ভিল রাজা মন্দিরের দরজা ভেঙে সেখানে প্রবেশ করল। মন্দিরে প্রবেশ করে সে দেখতে পেল এক বিরাট শিবলিঙ্গ। রাজা অনেকক্ষণ ধরে শিবলিঙ্গের সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করল। কিন্তু অপরপক্ষ থেকে কোনও সাড়াশব্দ না-পেয়ে ভিল রাজা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেল। সেদিন সে ভাবল, নিশ্চয় আমার কোনও ভুলত্রুটি হয়েছে, সেইজন্যই বন্ধু আমার সঙ্গে কথা বলল না।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—তার কী বিশ্বাস দেখ! সে নিজে রাজা কাজেই তার বিশ্বাস জগতের রাজা তার সমগোত্রীয়। তবে কেন ভাব করবে না?

এই পর্যন্ত বলে তিনি আবার গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন—পরের দিন রাতে আরেকটি জন্তু শিকার করে নিয়ে এসে মন্দিরের দরজা ভেঙে সেখানে প্রবেশ করল. এ ভাবে পর পর ছয়দিন সে অনুনয় বিনয় করে পাথরের মূর্তির সঙ্গে ভাব করার চেষ্টা করল। এদিকে মন্দিরের পুরোহিতরা লক্ষ্য করল রোজই তালা বন্ধ করে যাওয়া সত্ত্বেও কে যেন তালা ভেঙে মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করে এবং মন্দিরের মেঝেতে পশুর রক্ত লেগে থাকে।

সপ্তম দিনে রাজা মরিয়া হয়ে শিবলিঙ্গকে উদ্দেশ করে বলল—কী করলে তুমি তুষ্ট হবে বল? আমার এই চোখ তোমাকে নিবেদন করলে কি তুমি আমার সঙ্গে কথা বলবে? মূর্তি নীরব হয়ে রইল।

ভিল রাজা তখন তিরধনুক দিয়ে নিজের একটি চোখ উপড়ে বিগ্রহের পায়ে নিবেদন করল। এতেও জগতের রাজার মুখে কোনও কথা নেই দেখে ভিল রাজা বলল—তাহলে কি তুমি আমার দু'টি চোখই নিতে চাও? বেশ, দু'টি চোখই আমি দিয়ে দেব। এই বলে আরেকটি চোখ উপড়ে ফেলার উপক্রম করতেই কে যেন তার হাত চেপে ধরল। সেই স্পর্শ পেয়ে ভিল রাজা আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। সে বলল—বন্ধু তুমি এসেছ? এত দেরি করলে কেন? প্রভু উত্তর দিলেন—আমি একটু

দূরে ছিলাম, তাই তোমার ডাক শুনতে পাইনি। কিন্তু তুমি কী চাও? কেন আমাকে ডেকেছ বল?

উত্তরে ভিল রাজা বলল—আমি কিছুই চাই না। শুধু তোমাকে বন্ধুরূপে যেন সবসময় পাই। আমি যখনই ডাকব তখনই তুমি আমার পাশে এসে দাঁড়িও। এটুকুই শুধু আমি চাই, আর কিছু চাই না। জগদীশ্বর 'তাই হবে' বলে অন্তর্হিত হলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কতখানি ব্যাকুলতা নিয়ে ভিল রাজা জগদীশ্বরকে ডেকেছিল যে, পাথরের মূর্তি থেকে তাঁকে প্রকাশিত হতে হল। চাইতে হলে চাওয়ার রূপটা বা বিষয়বস্তুটা পাল্টে নিতে হয়। সীমাকে ছেড়ে অসীমের প্রতি চাওয়ার গতি ফিরিয়ে দিতে হয়। ভূমাকে চাইতে হয়। সাধনা করতে করতে বহু দেবদেবীর দর্শন পাওয়া যায়। তাঁদের কাছে কিছু চেয়ে নিলে সাময়িক প্রয়োজন কিছুটা মেটে বটে, কিন্তু পূর্ণতা লাভ করা যায় না। কাজেই তোমরা (ভক্তদের উদ্দেশ করে) যদি কেউ দেবদেবীর দর্শন পাও তাহলে তাঁদের কাছে প্রার্থনা জানিও যে, সমগ্রতার রূপ প্রকাশের জন্য তুমি আমাকে সাহায্য কর। ধ্যানে এক-এর দর্শন হয়। তা-ই হল আসল দর্শন। তখন সর্বক্ষণ ঈশ্বরীয় দর্শন হয়।

১৯। ৩। ৭৩

২০৭

মহাশূন্য সবকে মানে তাই সে আছে নিত্য সমানে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক হাবাগোবা পিতৃমাতৃহীন জেলের ছেলে ছিল। সে অপয়া বলে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হত। ছেলেটি মনের দুঃখে একবার সাগরপারে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ঘুরতে ঘুরতে ছেলেটি দেখতে পেল একটি কচ্ছপ ডাঙায় উল্টো হয়ে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছে। কচ্ছপের এই অবস্থা দেখে ছেলেটির দয়া হল। সে কচ্ছপটিকে উপুড় করে দিল। কচ্ছপটিকে উপুড় করে দেওয়ামাত্র সে এক পরমা সুন্দরী কন্যায় রূপান্তরিত হল। ছেলেটিকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে মেয়েটি তাকে তার পিতার কাছে নিয়ে যেতে চাইল। মেয়েটির পিতা সমুদ্রের মধ্যে বাসকারী এক রাজা ছিলেন। সেখানে সবাই জলজ জীব।

ছেলেটি ভাল-মন্দ বিচার না-করেই মেয়েটির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল। মেয়েটি আবার কচ্ছপের রূপ ধারণ করে ছেলেটিকে তার পিঠে চড়ে বসতে বলল। ছেলেটি তার নির্দেশ মতো মহা আনন্দে কচ্ছপের পিঠে চড়ে বসল। কচ্ছপরূপী মেয়েটি ছেলেটিকে নিয়ে জলে ডুব দিল। মেয়েটিকে দেখে জলপথের অন্যান্য জলজন্তু ও মাছেরা পথ ছেড়ে দিল। ছেলেটি তখন বুঝতে পারল কচ্ছপরূপী মেয়েটির অনেক ক্ষমতা। ক্রমে তারা দু'জনে রাজপ্রাসাদের সামনে এসে উপস্থিত হল। মেয়েটিকে ও তার পিঠে একটি জীবন্ত মানুষকে দেখে রাজপ্রাসাদের সামনে প্রহরারত প্রহরীরা সসম্মানে রাস্তা ছেড়ে দিল। মেয়েটি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করে নিজের মহলে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে ভাল ভাল খাবার খাইয়ে ও সুন্দর পোশাক পরিয়ে তার পিতার কাছে নিয়ে গেল। মেয়েটির পিতা খুব সুপুরুষ ছিলেন। তিনি মন্ত্রীবর্গ ও

পার্ষদ নিয়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। সেখানে রানিমাও উপস্থিত ছিলেন। রাজা আপন প্রিয় কন্যাকে দেখে খুব আনন্দিত হলেন ও নাম ধরে তাকে ডাকলেন। তখন কন্যার নামে রাজসভায় উপস্থিত সকলে জয়ধ্বনি দিল। মেয়েটির নাম ছিল মিলারি।

মেয়েটি ছেলেটির সম্বন্ধে তার পিতামাতাকে বলল—পিতা, আজ আমার প্রাণ নাশ হয়ে যেত। আমি সমুদ্রের পারে রোদ্দুর পোহাচ্ছিলাম, কতগুলি জেলের ছেলে মিলে আমাকে চিত করে রেখে চলে যায়। তারা আমাকে কেটে খাবে বলে দড়ি ও কাটারি আনতে যায়। সবাই চলে যাওয়ার পর আমি মনের দুঃখে কাঁদছিলাম। সেই সময় এই ছেলেটি এসে আমার প্রাণ বাঁচায়। এর কৃপা ও করুণায় আমি জীবন ফিরে পেয়েছি। তাই একে দেখাবার জন্য তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি। মানুষগুলি বড় নিষ্ঠুর ও হিংস্র। তাদের মধ্যে দয়া, মায়া ও প্রেম নেই। এই যুবক কিন্তু মানুষ হয়েও দয়া, মায়া, প্রেমে গড়া এক মহামানব। তুমি আর মা নিশ্চয়ই ওর প্রতি তুষ্ট হয়ে ওকে কৃপা করবে। আমি মনে মনে স্থির করেছি যে, ওকেই আমি বিবাহ করব। আশা করি তোমরা এতে নিশ্চয়ই রাজি হবে। ও আর নিজের বাড়িতে ফিরে যাবে না। ও আমায় কথা দিয়েছে যে ও আমাদের মধ্যেই থাকবে।

ছেলেটি দেখতে সুশ্রী ছিল, কিন্তু অন্যান্য জেলের ছেলেদের মতো তার জেলে বুদ্ধি ছিল না। শৈশবে তার মাতাপিতা মারা যায়। আত্মীয়স্বজনরা সবাই মৎস্যজীবী ছিল। তারা কয়েকদিন ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে মৎস্য শিকার করতে গিয়ে নানাবিধ অসুবিধায় পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তাকে অপয়া মনে করে বর্জন করে। ভাগ্যদোষে ছেলেটির জীবন রক্ষার আর অন্য কোনও উপায় ছিল না, কিন্তু হঠাৎ অলৌকিক ভাবে তার জীবন পাল্টে গেল।

সহৃদয় রাজা ও রানি ছেলেটির সম্বন্ধে সব শোনার পরে তাকে আদর করে তার জন্য সর্altবিধ রাজকীয় ব্যবস্থা করলেন এবং তার থাকার জন্য নূতন মহল ঠিক করে দিলেন। কয়েকবছর সেখানে সুখে থাকার পর আত্মীয়স্বজনের জন্য ছেলেটির মন খারাপ হওয়াতে আপন ঘরে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করল। মেয়েটি প্রথমে তাকে বুঝিয়ে বলল—তুমি গেলে আর ফিরে আসবে না। তুমি যেও না। এখানে তো তোমার কোনও কষ্ট হচ্ছে না। তুমি চলে গেলে আমি কী করে একা একা থাকব? তুমি সেখানে চলে গেলে নিশ্চয়ই আর ফিরে আসবে না। তখন আমার কথা আর ভাববে না, আমাকে ভুলেই যাবে।

ছেলেটি মেয়েটিকে বুঝিয়ে রাজি করাল ও প্রতিজ্ঞা করল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে সে চলে আসবে। মেয়েটি তাকে কতগুলি নির্দেশ দিয়ে বলল যে, সমুদ্রের তীরে এসে কী রকম ইঙ্গিত করলে মেয়েটি তার সম্বন্ধে জানতে পারবে ও তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। মেয়েটি তার হাতে একটি বাক্স দিয়ে বলল—এই বাক্সের সাহায্যে তুমি আবার এখানে ফিরে আসতে পারবে।

ছেলেটি নিজের গ্রামে ফিরে এসে দেখল সেখানকার সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। সমুদ্রের নিচে মৎস্যরাজ্যে সে পঁচিশ-ত্রিশ বছর ছিল। সেখানকাব সময় ও

পৃথিবীর সময়ের মধ্যে অনেক ব্যবধান থাকাতে ইতিমধ্যে পৃথিবীর তিনশত বছর পেরিয়ে গিয়েছে। সে গ্রামে ফিরে এসে নিজের বাড়ি ও প্রতিবেশীদের বাড়িঘর চিনতে না-পেরে নূতন লোকজনদের জিজ্ঞাসা করল যে, এখানে অমুক নামে এক পরিবার বাস করত, তারা এখন কোথায়? ছেলেটির কথা শুনে সেখানকার লোকজনেরা অবাক হয়ে গেল। তখন এক অতি বৃদ্ধা মহিলা এগিয়ে এল। ছেলেটির মুখে সব কথা শুনে বৃদ্ধা মহিলাটি মাথা নেড়ে চিন্তা করে বলল—আমি আমার বৃদ্ধা দিদিমার কাছে শৈশবে শুনেছিলাম যে, এখানে এক জেলেপাড়া ছিল। বহু জেলে এখানে বাস করত। তারা সমুদ্রের মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করত। সেই জেলেরা অনেকেই মারা গিয়েছে। এখন তাদের বংশধররা কে কোথায় আছে তা কেউ সঠিক ভাবে জানে না। এখানে এখন নূতন মানুষ এসেছে, নূতন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই জেলেদের ইতিহাস আর কেউ জানে না।

সেখানকার ছেলেমেয়েরা কৌতূহলবশত সেই ছেলেটিকে বহু প্রশ্ন করত। তারা মৎস্যরাজ্যের কথা শুনে প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেনি, কিন্তু এটা যে বিশ্বাসযোগ্য তা তারা পরে বুঝতে পারল। যাই হোক, গ্রামের একজন লোক তার নিজের বাড়িতে ছেলেটির থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল।

এই ছেলেটিকে কেন্দ্র করে সেই গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দু'বেলা নানারকম গল্প শুনত তার কাছে। কয়েকদিন থাকার পর ছেলেটির মন খুব খারাপ হয়ে যায়। তার বাক্সের কথা শুনে কিছু দুষ্টু ছেলের সেটার প্রতি আগ্রহ হয়। তারা দুষ্টুমি করে সেই বাক্সটি চুরি করে নিয়ে যায়। তারা বাক্সটি ভাঙতে না-পেরে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেয়। একটি সামুদ্রিক প্রাণী সেটা রাজপরিবারের জিনিস অনুমান করে রাজপ্রাসাদে জমা দিয়ে আসে। রাজকুমারী সেই বাক্স দেখে খুব কাঁদতে শুরু করল। সে প্রায়ই সমুদ্রের তীরে এসে তার স্বামীর সন্ধান করে, কিন্তু পারে ওঠে না। এই ভাবেই কিছুদিন কেটে যায়।

এদিকে ছেলেটি বাক্স হারিয়ে মনের দুঃখে বাক্সের সন্ধান করে তা না-পেয়ে সমুদ্রের পারে কান্নাকাটি করত। ছেলেটিকে রাজকন্যা যে-সমস্ত কথা বলে দিয়েছিল সে-সব স্মরণ করার চেষ্টাও করত, কিন্তু বাক্সটি কাছে না-থাকায় তার সংবাদ বিকৃত ভাবে রাজকন্যার কাছে পৌঁছাত।

কিছুদিন পর ছেলেটি মনের দুঃখে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে, কিন্তু সে সমুদ্রের নিচে মৎস্যরাজের রাজপ্রাসাদের রাস্তা খুঁজে পায় না। সমুদ্রের জলে তার পক্ষে থাকা কষ্টকর হয়ে ওঠে। জলের মধ্যে বহু চেষ্টা করেও সে রাস্তা না-পেয়ে ক্লান্ত হয়ে অনাহারে অজ্ঞান হয়ে যায়। তখন ছেলেটিকে একটি জলজন্তু খাওয়ার জন্য ধরে নিয়ে যায়। পরিবারের সবাইকে নিয়ে যখন খেতে আরম্ভ করবে সেই সময় জন্তুর কন্যা কী করে যেন ছেলেটিকে তাদের রাজকন্যার স্বামী বলে চিনতে পারে। তখন মেয়েটি তার পিতাকে অনুরোধ করে বলে যে, এই ছেলেটিকে যেন রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেওয়া হয়, তাহলে রাজা তাদের পুরস্কার দেবেন। তারা প্রথমে রাজি হয়নি, পরে মেয়েটির মা ও পরিবারের অন্যান্য সকলে রাজি হওয়াতে ছেলেটিকে

রাজপ্রাসাদে পৌঁছে দেওয়া হয়। রাজপ্রহরীরা সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে রাজকন্যার কাছে পৌঁছে দেয়। তখন বহু চেষ্টা করে সেবাযত্নের দ্বারা রাজকন্যা তার স্বামীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনে ও তাকে সুস্থ করে তোলে। ছেলেটিকে ফিরে পেয়ে রাজা ও রানি খুবই আনন্দিত হন। নূতন করে তারা আবার আনন্দে মেতে ওঠে। এরপরে ছেলেটি আর মানবসমাজে ফিরে আসেনি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পের একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হল, জল এবং স্থলের কাল ও নীতির ব্যবধান অনেক। গ্রহ গ্রহান্তরের মধ্যেও কাল, নীতি ও প্রকৃতির তারতম্য অনেক। তা প্রাকৃত বিজ্ঞানের বিষয়। দেশ-কাল, কার্য-কারণের যে নীতি তা সব জায়গায় সবসময় একরকম নয়। এটা মানুষের কাছে বহু সাধনার পরে ধরা পড়েছে। এখনও যে কত অজ্ঞাত বিষয় রয়েছে তার শেষ নেই। গ্রহ, নক্ষত্রের মধ্যে পরস্পরের দূরত্ব ও প্রকৃতিগত সম্বন্ধ জানবার চেষ্টা কত ভাবেই না মানুষ করেছে। সূর্যের কাছাকাছি যে-সব গ্রহ আছে তাদের ঘুরতে কত কম সময় লাগে, আর দূরে যে-সব গ্রহ আছে তাদের কত বেশি সময় লাগে। অতীতকালে এই দেশের ঋষিগণ অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃত বিজ্ঞানের সাধনায় যে কত উন্নত হয়েছিলেন তার কিছু ইঙ্গিত এই গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়। গল্পে ছেলেটির ভিন্ন রাজ্যে যাওয়ার ব্যাপারে দেখানো হয়েছে যে, প্রেমের শক্তি কত বেশি। তার মাধ্যমে মানুষ কত অসাধ্য সাধন করতে পারে এবং অসম্ভবও সম্ভব করতে পারে।

২৪। ৩। ৭৩

২০৮

সাধনার ক্ষেত্রে অন্তঃপ্রকৃতিকে বহিঃপ্রকৃতি কতখানি সাহায্য করে এবং সাধনার প্রভাব বহিঃপ্রকৃতির উপর কতখানি পড়ে সেই প্রসঙ্গে ছোট একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

এক কিশোর বালক চলেছে তার গুরুর সন্ধানে। যেতে যেতে সে এক স্থানে উপনীত হয়ে অনুভব করল প্রকৃতির মধ্যে কেমন যেন একটা শান্ত সমাহিত ভাব। অদূরে সে দেখতে পেল এক বিরাট বিষধর সাপ তার ক্রূর ও বৈরী স্বভাব ভুলে গিয়ে কতগুলি ভেকশাবককে ফণা বিস্তার করে রক্ষা করছে। সাধারণত সাপ ও ভেকের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু সেখানে এর বিপরীত আচরণ দেখে সে বুঝতে পারল এখানে নিশ্চয় কোনও উচ্চকোটির শক্তিশালী মহাত্মা আছেন যার জন্য সেখানে হিংসার মধ্যে অহিংসা ও নির্বৈরিতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। বালকটি ঘুরতে ঘুরতে মহাত্মার গুম্ফার কাছে উপস্থিত হল। মহাত্মা তাকে অস্ফুট স্বরে ইঙ্গিতে তার গুরুর সন্ধান বলে দিলেন। সেই অস্ফুট স্বরের আওয়াজেই সারা পাহাড় গমগম করে উঠল।

বালকটি আরও দেখতে পেল যে, সেখানে উপস্থিত আরও অনেক সাধু, মুনি গুরুদর্শনের অপেক্ষায় বসে আছেন। সামনে একটি বড় গুম্ফা, তার মধ্যে সেই গুরু-

মহারাজ তপস্যায় রত। মাঝে মাঝে তিনি যখন গুম্ফার বাইরে বেরিয়ে আসেন, তখন সবাই তাঁর দর্শন পেয়ে তাঁর আশীর্বাদ লাভে ধন্য হয়। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার গুম্ফার ভিতরে চলে যান এবং একটি বড় পাথরের খণ্ড দিয়ে গুম্ফার মুখটা ঢাকা থাকে। বাইরে থেকে কেউ সাহস করে পাথরের খণ্ড সরিয়ে গুম্ফায় প্রবেশ করে না। বালকটি কোনও ভ্রূক্ষেপ না-করে সোজাসুজি গুম্ফার কাছে গিয়ে বিরাট পাথরখণ্ডটি গুম্ফার মুখ থেকে সরিয়ে তার মধ্যে প্রবেশ করল। গুম্ফার মধ্যে গুরুমহারাজও তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। বালকের এই নির্ভীক ও অসাধারণ আচরণ দেখে গুম্ফার বাইরে অপেক্ষমান সাধক, তপস্বীরা অতীব বিস্ময়ে পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল—কে এই অসাধারণ বালক? একে তো ইতিপূর্বে কখনও এখানে দেখা যায়নি! কোনও জিজ্ঞাসাবাদ না-করে, কারওকে পরোয়া না-করে বালকটি সোজা গুম্ফার কাছে গিয়ে পাথরখণ্ডকে সরিয়ে অনায়াসে তার মধ্যে প্রবেশ করল। বালকের এই কাণ্ড দেখে সবাই হতবাক। সে নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে গুম্ফার মধ্যে প্রবেশ করে সেই প্রবীণ তপস্বীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে করজোড়ে দাঁড়িয়ে রইল। তপস্বী বালককে আশীর্বাদ করে বসতে বললেন এবং তাকে যথাবিধি দীক্ষা দিয়ে দিলেন। এই অসাধারণ বালক ও এই তপস্বীর পরিচয় আধ্যাত্মিক জগতে অমর হয়ে আছে। এই বালকই পরবর্তীকালে আচার্য শঙ্কর রূপে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সেই প্রবীণ তপস্বী হলেন পরম অদ্বৈতবাদী গোবিন্দপাদাচার্য। তাঁর গুরু ছিলেন নিত্যাদ্বৈতবাদী গৌরপাদাচার্য। তাঁর স্বানুভবসিদ্ধ দর্শনই হল 'অজাতবাদ'। আচার্য শঙ্কর অষ্টম বর্ষে গৃহত্যাগ করে গুরুর আশ্রয়ে যান ও ষোলো বছরের মধ্যে সমগ্র যোগশাস্ত্র, বেদান্তশাস্ত্র ও অদ্বৈতবাদের অন্যান্য গ্রন্থ শেষ করে তার ভাষ্য ও টিপ্পনী লিখে অদ্বৈতবাদের সম্প্রসারণ করে গিয়েছেন। ষোলো বছরে তাঁর আয়ু শেষ হয়ে গেলে মহামুনি ব্যাসদেব তাঁর অর্জিত তপঃশক্তি থেকে আরও ষোলো বছর আয়ু বাড়িয়ে দিলেন এবং এই ষোলো বছরে তিনি আরও অদ্বৈতবাদের গ্রন্থ রচনা করে অদ্বৈতবাদ প্রচারের জন্য সারা ভারতে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর অমর কীর্তি হল ভারতে চারটি মঠ প্রতিষ্ঠা—উত্তরে যোশীমঠ, দক্ষিণে সিঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমে সারদা মঠ ও পূর্বে হল গোবর্ধন মঠ। তিনি অসাধারণ প্রতিভা, মেধা ও তপঃশক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি অদ্বৈতবাদের ভিত্তিকে সুদৃঢ় করে রেখে গিয়েছিলেন।

১২। ৬। ৭৩

২০৯

জীবনের জন্য সত্য নয়, সত্যের জন্য জীবন। জীবনের জন্য তাঁকে চাইলে পূর্ণের সাধনা হয় না। অপরপক্ষে তাঁর জন্য জীবন হলে হয় পূর্ণের সাধনা। ভগবানের জন্য সাধনা হলে তা দেহ-ইন্দ্রিয় কেড়ে নিতে পারে না। এই সাধনা সর্বসময়ের জন্য হতে পারে।

আমার জন্য জীবনকে সসীম বন্ধন বলে, আর তোমার জন্য জীবনকে অসীম, অনন্ত ও মুক্তি বলে। যেখানে দাঁড়িয়ে একদিন একজন বলবে জগৎ মিথ্যা, সেখানে

দাঁড়িয়ে সেই আবার বলবে— না, জগতে অসত্য বলে কিছু নেই। এ রকম উক্তি লক্ষ লক্ষ মহাপুরুষদের মুখ থেকে বেরিয়েছে। যাঁরা একদিন জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, তাঁরাই পরে জগৎকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।

একদিন দুই মহাত্মার কথা কাটাকাটির সময় 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) উপস্থিত ছিল। একজনের বক্তব্য ছিল সংসার ত্যাগ করে বৈরাগ্যের পথ অনুসরণ করা উচিত এবং আরেকজনের মত ছিল ঈশ্বরের সাধনা সংসারের মধ্যে থেকেই করতে হবে। উভয় সাধকই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ নিয়ে নানা বিশ্লেষণ করে বহু মতপথ প্রকাশ করলেন। সারাদিনে তাদের দ্বন্দ্বের কোনও মীমাংসা হল না। তাদের কাণ্ডকারখানা দেখে খুব হাসি পেল। তাদের বলা হল—বাবারা, আপনারা একটু জলটল খেয়ে শরীর তাজা করে নিন। সমাধান তো হল না, আবার বসতে হবে। তাদের কিছু খাইয়ে দেওয়া হল। তারপর প্রসঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে গেল। তখন জিজ্ঞাসা করা হল—বাবারা এতক্ষণ আপনারা কার কথা বলছিলেন? প্রভু, ইষ্টের কথা, না নিজেদের কথা? এই কথা শুনে তারা খুব লজ্জিত হলেন। সত্যিই তো প্রভুর বা ইষ্টের কথা একবারও বলা হয়নি! তাদের অপ্রস্তুতভাব দেখে বলা হল—ভালই বলেছেন, মনে থাকবে। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য কি মতপথ না গন্তব্যস্থল? গন্তব্যস্থলের খবর গন্তব্য ক্রিয়ার বা শাস্ত্রের মধ্যে নেই। আপন আপন ইষ্ট আপন আপন অন্তরেই রয়েছেন।

তারা বললেন—আপনি ধরিয়ে দিয়ে ভালই করেছেন। সত্যি এক এক সময়ে যে কী হয়! তাদের বলা হল—তার কারণ জীব নিজের মনকে বেশি ভালবাসে। ঈশ্বরকে ভালবাসলে মনের প্রাধান্য আসতে পারে না। আপনারা বিচার করে দেখুন যে, কাকে ভালবাসেন। মানুষ জানে না সে কী ভালবাসে! দেহ-ইন্দ্রিয়-মনের চাহিদাপূরণের তাগিদও আছে আবার ঈশ্বরকে পাওয়ার ইচ্ছাও আছে। উভয়ের সমাধান পৃথক পৃথক ভাবে একরকম হয় আবার অখণ্ড একভাবে আরেকরকম হয়। দেহ-ইন্দ্রিয়ের ভগবান ও ইন্দ্রিয়াতীত ভগবান দু'জন নন। ভগবান তো একজন। সুতরাং এক-এ মন থাকলে ভগবানে মন থাকে, আর দুই-এ মন থাকলে দুনিয়াতে মন থাকে। দুনিয়াতে মন থাকলে মতবাদের গোঁড়ামি, পক্ষপাতিত্ব, কলহ, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি থাকে। এক-এ মন থাকলে এই সব ঝামেলা আর থাকে না। এক ঈশ্বর সব কিছুর মধ্যে নিত্যবিদ্যমান। তাঁকে মানলে দ্বন্দ্ব, কলহ থাকে না। পূর্ণ ভাবে তাঁকে মানার পূর্বে পূর্ণ ভাবে তাঁকে জানা যায় না। আবার পূর্ণ ভাবে জানা না-হলে তাঁকে পূর্ণ ভাবে মানাও যায় না। এক-এর সাধনাই হল ঈশ্বরের সাধনা। ঈশ্বরের উপর গুরুত্ব দিলে এক-এর প্রভাব বাড়ে। বহুর মধ্যে বা দুইয়ের মধ্যে অবস্থিত এক-কে এবং এক-এর মধ্যে অবস্থিত বহুকে একমাত্র একবোধ দিয়েই উপলব্ধি করা যায়। তখন সে সর্বভূতে এক হরির নিত্যলীলা আস্বাদন করে স্বানুভূতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মতপথের মধ্যে তাঁকে বসিয়ে নিলে মতপথের দ্বন্দ্ব মিটে যায়। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি তাঁকে উপলক্ষ্য করে। তিনি যেখানে আছেন সব মতপথ সেখানে আছে। মনের বিকার মতপথকে অবলম্বন করে এবং নিজেকে ঈশ্বরের থেকে পৃথক ভেবে হয়। সত্তার পরিচয় প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। ভজন

ও প্রার্থনা ছাড়া তাঁকে পাওয়া যায় না। ধ্যান করেই হোক আর কর্ম করেই হোক, সেই এক ঈশ্বরকেই সকলে পায়। কর্ম তাঁর সঙ্গে মিলন ঘটিয়ে দেয়। তাঁকে ধরে কর্ম করলে হয় ভক্তি। তাঁকে বাদ দিয়ে কর্ম করলে হয় ভোগ।

এই যুগে মতপথ ও পুঁথিপুস্তকের দ্বারা মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। একটিমাত্র কথা নিলেই ফুরিয়ে যায়। এক ব্রহ্ম-আত্মাই তো সব। একটি বড় চিঠির সারাংশ হল ছোট একটি খবর। তা জানা হয়ে গেলেই চিঠির প্রয়োজন ফুরিয়ে যায়। সমগ্র শাস্ত্র ও মতবাদের সার হল এক ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর, "দ্বিতীয় নাস্তি"। এটা মনে রেখে চলাই হল জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সাধনা।

শাস্ত্র বা সাধুসন্তের দোহাই দিয়ে নিজেদের দোষত্রুটি শোধন করা যায় না। প্রত্যেক জীবন বোধস্বরূপের আপন। সর্বকর্মই বোধের পূজা। বোধ হতে বোধের জন্য, বোধের দ্বারা তা সাধিত হয়। একেই বলে তত্ত্বজ্ঞান। বোধের জন্য বোধের জীবন হলে বন্ধন-মুক্তি অভিনয় বা খেলা মাত্র মনে হয়। আর ইন্দ্রিয়-মনের জন্য জীবন হলে বন্ধন-মুক্তির সমস্যার সমাধান হয় না। তখন মনে হয় সত্য অনুমানের বিষয়, অজ্ঞেয়। ইন্দ্রিয়বোধের অধীন জীবনকে পুনঃপুনঃ দেহধারণ করতে হয় এবং জন্ম-মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। কিন্তু বোধের জীবনে জন্ম-মৃত্যু শুধু অভিনয়, দুঃখজনক নয়।

২৬। ০৬। ৭৩

২১০

দেহের উর্ধ্বে দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীত বোধের স্তর থেকে সত্যধর্মের বিজ্ঞান আরম্ভ হয়। যারা দেহগত বোধ নিয়ে ধর্মের কথা বলে, পুস্তক প্রকাশ করে এবং ধর্মজগতে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে, তারা বিশেষ স্বার্থবোধ থেকেই তা করে থাকে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার একজন বৈজ্ঞানিক এক মহাত্মাকে অবজ্ঞাভরে প্রশ্ন করেছিলেন—আপনাদের বিজ্ঞান আমি কেন বুঝতে পারব না? মহাত্মা ঝট করে একটি অলৌকিক নিদর্শন দেখিয়ে দিলেন। তখন বৈজ্ঞানিক অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এর মধ্যে এমন কী বিশেষত্ব আছে যা দিয়ে আপনি এটা দেখালেন? মহাত্মা বললেন—এর মধ্যে বিশেষ কিছু বিশেষত্ব নেই কারণ এ সব ধর্মজগতের অ-আ-ক-খ। বৈজ্ঞানিক আরও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—এই যদি ধর্মজগতের অ-আ-ক-খ হয় তবে M.A. পাশ করলে কী হবে? আধ্যাত্মিকতা সম্বন্ধে তার ধারণা যে ভুল—এ সব দেখেও তার নিজের ভুলটা বুঝতে সময় লাগল!

প্রায় সাত বছর বাদে বৈজ্ঞানিক মহাত্মার কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে বললেন—এবার আমি আমার ভুলটা বুঝতে পেরেছি। আপনার কথা আমি মানতে রাজি আছি। আপনার বিদ্যা আমাকে দয়া করে শেখান। মহাত্মা বললেন—এই বিদ্যা শেখা অত সহজ নয়। তোমার পূর্বের শিক্ষা ভুলে গিয়ে নূতন করে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে।

তোমাদের বড় বড় ডিগ্রি আত্মোপলব্ধির পথে কোনও কাজে লাগে না। অভিমানশূন্য হবার জন্য এবং সব কিছুকে ঈশ্বরবোধে গ্রহণ করার যোগ্যতা লাভের জন্য সর্বনিম্ন স্তরের মানুষ ও জীবদের সঙ্গেও মিশতে হয়। জানা, পারা, বোঝা—এ সব হল বিদ্যার অভিমান। তা ঈশ্বরোপলব্ধির অন্তরায়। বৈজ্ঞানিক তখন জিজ্ঞাসা করলেন—তাহলে কী করতে হবে আমাকে? মহাত্মা তাকে কুলিকামিনদের সঙ্গে কাজ করতে বললেন।

পনেরো বছর তাদের সঙ্গে কাজ করার পর বৈজ্ঞানিক তাদের সেই স্বভাব ও সহজ, সরল জীবনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। মহাত্মা বললেন—এবার তুমি আমার কাছে বসে ধর্মকথা শোনবার সুযোগ পাবে। আস্তে আস্তে তাঁর কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনে সেই বৈজ্ঞানিক অধ্যাত্মবোধের অনেক উচ্চস্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ধর্মগ্রন্থ ইত্যাদি প্রকাশ করে ধর্মজগতে তাঁর অবদান রেখে গিয়েছিলেন।

দিব্যজীবন লাভের জন্য বিশেষ সাধনা একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞান হল সাধনসাপেক্ষ। বিনা সাধনায় সৎ-এর পরিচয় পাওয়া যায় না। সাধনার পরেও আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের কৃপা, করুণার একান্ত প্রয়োজন হয়। ঈশ্বরের কৃপা ও করুণা জোর করে পাওয়া যায় না। শরণাগত, সংযত ধ্যানী চিত্ত ঐকান্তিক ভক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের সর্বোত্তম কৃপালাভে সমর্থ হয়।

৩। ৭। ৭৩

২১১

জীবরূপী মা স্বয়ং স্বেচ্ছায় নানাবিধ দুঃখকষ্টের ভোগাভিনয় করেন, কিন্তু তাঁর এইরূপ লীলাভিনয়ের তাৎপর্য সহজে ব্যক্ত করেন না। সেইজন্য এই তত্ত্ব মন সহজে ধরতে পারে না। সবচেয়ে বড় সত্য হল সর্বপ্রকাশের মধ্যেই তিনি আছেন। তাতে তিনি ছাড়া দ্বিতীয় কেউ নেই। জীবের মধ্যে এক পৃথক কাল্পনিক অহংকার আমি-বেশে ভেদ সৃষ্টি করে দুঃখকষ্টের অভিনয় করে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক মহাত্মার কাছে এক গৃহী ভক্ত এসে তার দুঃখকষ্টের কথা জানিয়ে বলল—বাবা, আমার যে কত কষ্ট তা তো তুমি জান। তুমি কত শক্তি রাখ, ইচ্ছে করলেই তুমি আমার কষ্ট দূর করে দিতে পার।

মহাত্মা তার কথা শুনে বললেন—কষ্টের কথা বলছ, কই আমি তো তোমার কষ্ট কিছু দেখছি না। আমি তো দেখছি এগুলি সব হরির খেলা। মহাত্মা নিজেই একটি সাংঘাতিক ব্যাধি নিয়ে চলেছেন যা বাইরে থেকে কেউ টের পায় না। ভক্ত যতই দুঃখের কথা বলতে যায়, মহাত্মা ততই তার দৃষ্টিকে ঈশ্বরমুখী করার চেষ্টা করেন।

ভক্ত বলল—তুমি যতই চোখে আঙুল দিয়ে ভগবানকে দেখাও না কেন আমি তো শুধু কষ্টই দেখছি।

শেষ পর্যন্ত মহাত্মার কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে সে ধৈর্য হারিয়ে ফেলল। সামনে ধুনি জ্বলছিল, তা থেকে জ্বলন্ত কাঠ তুলে সে মহাত্মাকে লক্ষ্য করে ছুড়ে মারল। আঘাতের

ফলে মহাত্মার দেহ থেকে রক্তপাত হতে লাগল, কিন্তু রক্তপাতের প্রতি কোনও ভ্রূক্ষেপ না-করে তিনি শুধু হাসতে লাগলেন। হঠাৎ মহাত্মার ভাবান্তর হল এবং তিনি *দেখতে পেলেন ভক্তের অঙ্গ থেকে রক্তপাত হচ্ছে। ভক্তও দেখল তার নিজের শরীর থেকে রক্তপাত হচ্ছে। আপন অঙ্গে আঘাতজনিত যন্ত্রণা ও রক্তপাত দেখে সে অবাক হয়ে তার কারণ ভাবতে থাকে। মহাত্মাকে আঘাতের পরিবর্তে অলক্ষ্যে নিজেকেই নিজে আঘাত করেছে, এই ভেবে সে বিষণ্ণ চিত্তে সেখান থেকে প্রস্থান করে।*

এই রহস্যের কারণ নির্ণয় করতে না-পেরে ভক্ত বাড়ি ফিরে যায়। আঘাতজনিত রক্তপাতের ফলে দু-তিন দিন সে খুব কষ্ট পায়। তিন রাতের পর সে একটি স্বপ্ন দেখল যে, তার নিজেরই দু'টি মূর্তি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। একজন যেন বলছে—ভীষণ-কষ্ট পাচ্ছি এবং আরেকজন বলছে—কষ্ট কোথায়? আমি তো কষ্ট দেখতে পাচ্ছি না। সেদিন মহাত্মার সঙ্গে তার যে কথোপকথন হয়েছিল সেগুলিরই পুনরুক্তি যেন তার নিজের দু'টি রূপের মধ্যে সাধিত হচ্ছে। এই স্বপ্ন দর্শনের ফলে অতিশয় বিস্ময়ান্বিত হয়ে সে পরদিন সকালে মহাত্মার কাছে গেল। সেখানে গিয়ে দেখতে পেল ধুনি জ্বলছে, কিন্তু মহাত্মা নেই। তার ঐ জিজ্ঞাসা নিয়ে মহাত্মার সন্ধানে সে বেরিয়ে পড়ে। মহাত্মার সন্ধান সে আর পায়নি সত্য, কিন্তু তার সদ্‌গুরুলাভ হয়েছিল। তার ফলে সে পূর্ণসিদ্ধ এবং আপ্তকাম হয়। তখন সে সর্বভূতে এক হরির নিত্যলীলা আস্বাদন করে স্বানুভূতির উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

গল্পটির মর্মার্থ হল, মানুষের অন্তরে জিজ্ঞাসারূপে ভগবানই ভগবানকে খুঁজে বেড়ান। ভগবান নিজেই সাধুসন্ন্যাসী, গৃহী সেজে নিজেকে বহুরূপে আস্বাদন করার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বিশ্বে তিনি ছাড়া আর কেউ নেই। তবে একজনের সঙ্গে আরেকজনের বাহ্যিক প্রকারভেদ সত্য মনে হলেও তা ভ্রান্তিমাত্র। কারণ অখণ্ড সত্যের ব্যবহারে সত্যই প্রকাশ পায়, মিথ্যা বা ভ্রান্তি তাতে সম্ভব নয়। নানাত্ব-বৈচিত্র্য নিত্য চিৎতত্ত্বের লীলাভিনয়মাত্র।

২৩। ১০। ৭৩

২১২

গুরুকৃপা বিনা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের সাধনা বিড়ম্বনামাত্র। বই পড়ে নিজে নিজে অধ্যাত্মসাধনা করা যায় না।

'আত্মগুরু, ইষ্ট, মা হলেন শুদ্ধবোধস্বরূপ। নাম হল তাঁর বিজ্ঞানস্বরূপ। 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র বিজ্ঞান হল আত্মগুরুর, ইষ্টের বা মায়ের বিজ্ঞান।

মুক্তপুরুষ হতে চাইলে সর্ব ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সদ্‌গুরুকে বসিয়ে পূজা করতে হয়। সর্ব ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠানচৈতন্যকে জাগ্রত করে সাধক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি, গল্পের মর্মার্থ অনুভব করতে চেষ্টা করো।

এক ব্রাহ্মণীর পুত্র নিয়ে সংসার। ব্রাহ্মণী খুব সাধনভজন করেন। পুত্রটি বড় হওয়ার পরে সে কাজকর্ম করতে শুরু করে। ব্রাহ্মণী সাধনভজন করে খুব তপঃশক্তি লাভ করেছেন। তার পুত্র একদিন জঙ্গলে কাজ করতে করতে হঠাৎ সর্পাঘাতে মারা

যায়। এক ব্যাধ এই দৃশ্য দেখতে পায়। ব্যাধেরও সাধনশক্তি ছিল। ব্রাহ্মণী ও তার পুত্রের সঙ্গে সেই ব্যাধের পরিচয় ছিল। কাজেই তাকে বধ করবে না বলে সাপটিকে ধরে নিয়ে গেল ব্রাহ্মণীর কাছে। সাপকে সে বলল—তোকে ব্রাহ্মণীকে দিয়ে বধ করাবার ব্যবস্থা করব।

ব্যাধ ব্রাহ্মণীকে বলল—এ তোমার পুত্রহন্তা, ওকে তুমি বধ কর।

উত্তরে ব্রাহ্মণী বলল—একে মারলে তো আমার পুত্র আর ফিরে আসবে না।

ব্যাধ—অতশত বুঝি না। শত্রুকে নাশ করা তোমার কর্তব্য। সুতরাং ওকে তোমার বধ করতেই হবে।

ব্রাহ্মণী রাজি না-হওয়ায় সাপকে নাশ করার পক্ষে ব্যাধ নানা রকম যুক্তি দিয়ে ব্রাহ্মণীর যুক্তিকে খণ্ডন করতে লাগল। ব্যাধ যে-সকল যুক্তির অবতারণা করল তা অতি বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ লোকের পক্ষেই সম্ভব। বিশেষ জ্ঞানপাণ্ডিত্য না-থাকলে যুক্তি সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব।

ব্যাধ বলল—সাপকে আমি ছাড়ব না। কেন তার শাস্তি হবে না আমি জানতে চাই।

সাপ বলল—তুমি মিছিমিছি আমাকে দোষী সাব্যস্ত করছ। ছেলেটির মৃত্যুর জন্য আমি দায়ী নই। আমি কালের দ্বারা প্রেরিত। আমি আমার কাজ করেছি মাত্র। আমি কখনওই দোষী নই।

তাদের এই বাদানুবাদের সময় সেখানে এক মুনি এসে উপস্থিত হলেন। আদ্যোপান্ত সব ঘটনা শুনে তিনি বললেন—এ বিষয়ে মীমাংসা করা খুব কঠিন। আমার দ্বারা হবে না। আমি কালকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তখন সেখানে কাল এসে উপস্থিত হলেন।

ব্যাধ কালকে উদ্দেশ করে বললেন—তুমি যখন সাপকে নিয়োগ করেছ তখন পুত্রহত্যার অপরাধে আমি তোমাকেই বধ করব।

কাল বললেন—আমি নির্দোষ। আমি আমার কাজ করেছি। কালের স্রোতে কর্মফল বাঁধা আছে। ছেলেটি তার নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করছে।

ব্যাধ আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বলল—তাহলে তুমিও তোমার কর্মফল ভোগ কর। আমি তোমাকে হত্যা করব।

কাল—এই কাজে আমার কোনও হাত নেই। যম আমাকে নিয়োগ করেছেন। অতএব দোষ করলে যম করেছেন।

ব্যাধ—অতশত বুঝি না। ফাঁকি দিয়ে পালাবার জন্য কর্মতত্ত্ব বলছ। ধর্ম রক্ষা হবে কী করে?

যম কোনও মতেই বিষয়টির মীমাংসা করতে না-পেরে ভোগের বা নিয়তির প্রাধান্য অনতিক্রম্য বলে ঘোষণা করলেন। তিনি নিয়তির দাস। নিয়তি কারও দাস নয়। নিয়তি অতীব দুর্বোধ্য। দৈব ও পুরুষকারের সংযোগে পূর্বাপর সম্বন্ধ ধরে নিয়তি সব কিছু সম্পাদন করে। তপস্যার দ্বারা নিয়তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সুতরাং ব্যাধকে নিয়তির জন্য তপস্যা করতে বলে যম সমস্যাটির মীমাংসা করে

দিলেন। তারপর সকলে আপন আপন গন্তব্যস্থলে চলে গেলেন। যাবার সময় প্রত্যেকে ব্যাধের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করে আশীর্বাদ করে গেলেন।

ব্যাধ ভাবল, আমার দোষ তো কেউ ধরিয়ে দিতে পারল না! সে এর উত্তর পেল ব্রাহ্মণীর কাছে।

ব্রাহ্মণী বলল—বাবা, দৈব বিশ্বাস করে যে পুরুষকারকে বিশ্বাস করে অথবা দৈব ও পুরুষকারকে যে একবোধে ব্যবহার করে তার কর্মফল থাকে না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পের ইঙ্গিত হল, আসল বস্তু পেলে বিকার থাকে না। আগাগোড়া ব্যাধের যুক্তিগুলি অতি বিচক্ষণ ও জ্ঞান-পাণ্ডিত্যপূর্ণ হলেও তার ভিতরে অনেক গলদ ছিল। সেইজন্য ব্রাহ্মণীর কাছে এসে তাকে হার মানতে হল। তাই দেখা গেল যে, যিনি ত্যাগ করতে পারেন তিনিই জ্ঞান দিতে পারেন। পূর্ণ জ্ঞানীই হলেন সর্বত্যাগী। সেইজন্য প্রিয় পুত্রের বিয়োগেও ব্রাহ্মণী স্থির ও অটল ছিলেন। এই হল যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের লক্ষণ।

ব্রহ্মজ্ঞানী যথার্থ সদ্‌গুরু পদবাচ্য। সদ্‌গুরু ব্রাহ্মণীর কথায় ব্যাধের আত্মজ্ঞান লাভ হয়। এর ফলে তার যথার্থ পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের অভেদ মিলন ঘটে, অর্থাৎ সামগ্রিক কার্য-কারণের অবসান হয়। দৈব ও পুরুষকারের অভেদ মিলনই হল আত্মজ্ঞানের লক্ষণ। সদ্‌গুরুই একমাত্র আত্মজ্ঞানের অধিকারী।

৪। ১২। ৭৩

২১৩

প্রস্তুতি ছাড়া এগিয়ে গেলে আবার পিছনে নেমে আসতে হয়। মনের সপ্ত ভূমির নিম্ন ভূমি থেকে একেবারে সহস্রারে উঠে গেলে নেমে আসতে কারও ভাল লাগে না, কিন্তু নিম্ন ভূমিতে চাবি পড়ে থাকলে নেমে আসতেই হবে।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

আমেরিকায় একশো তলার একটি বাড়িতে একজনের অফিস ছিল আশি তলায়। আর সে বাস করত এক তলায়। একদিন lift খারাপ ছিল, কিন্তু অফিসে জরুরি কাজে তাকে উপরে যেতে হয়। বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে আশি তলা সিঁড়ি বেয়ে উঠে অফিস ঘরের কাছে এসে দেখে যে, অফিসের চাবি আনতে সে ভুলে গিয়েছে। চাবি নিয়ে আসার জন্য অতগুলি সিঁড়ি ভেঙে নেমে আবার ওঠার শক্তি সে পেল না কারণ সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।

আশি তলা সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠে আবার নিচে আসবার ফলে সেই লোকটি বহুদিন অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তাতে দৈহিক, মানসিক, আর্থিক—বহু ক্ষতি হয়, যা আর ঐ জীবনে পূরণ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। সাধনপথে এইরূপ একটি মারাত্মক ভুলের জন্য দু-তিন জনম সাধকের নষ্ট হয়। ভুলের মাশুল জন্ম জন্মান্তর ধরে বহন করতে হয়—তারই ইঙ্গিত এই ছোট গল্পটির মাধ্যমে দেওয়া হল।

২৩। ১২। ৭৩

২১৪

একসময় সংস্কৃত মন্ত্র খুব জাগ্রত ছিল। উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি ও বোধ জেগে উঠত। তার কারণ পৃথিবীতে প্রত্যেক স্পন্দনের সঙ্গে সবার অতীত অতীত জন্মের সম্বন্ধ আছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ঘটনা বললেন।

কোনও এক পশ্চিম দেশীয় সাহেব এই দেশে ভ্রমণ করতে এসেছিল। ঘুরতে ঘুরতে এক পাহাড়ে একজন মহাত্মার সঙ্গে তার দেখা হয়। সাহেব দেখল সাধুর মন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তার সর্বশরীর কেঁপে উঠছে। সাহেব তার কারণ বুঝতে না-পেরে এই বিষয়ে অন্যান্যদের কাছে জিজ্ঞাসা করাতে একজন বলল—সাহেব, তুমি যাঁর কাছে এসেছ তিনি একজন খুব উচ্চ স্তরের সাধক। তাঁর মাহাত্ম্য আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।

সাধুর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সর্বশরীর কেঁপে ওঠার কারণ আর কিছুই নয়, তিনি প্রণব মন্ত্র জপ করতেন এবং সেই প্রণব ধ্বনির প্রতিধ্বনি হত সাহেবের অন্তরে। সাহেব সেই মহাত্মাকে মন্ত্রের অর্থ এবং তার সর্বশরীর কেঁপে ওঠার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি কয়েকদিন তাকে তাঁর কাছে থাকতে বললেন। সাহেব মহাত্মার কাছে থেকে গেল এবং ঐ পরিবেশে আস্তে আস্তে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে লাগল। সাধুর নির্দেশে জীবনযাপন করতে করতে একদিন সাহেবের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হতে লাগল। সাহেব তখন বলল—এবার আমি আমার আসল জায়গায় এসে উপস্থিত হয়েছি। জানি না কী কারণে আমি পশ্চিম দেশে জন্মগ্রহণ করেছি! তবে এখানে আমি আমার পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়েছি—এটাই আমার আসল জায়গা।

৩। ২। ৭৪

২১৫

কেবলমাত্র সদ্‌গুরুর কৃপায় চৈতন্যের সপ্ত স্তরের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। গুরু হলেন সর্বদেবদেবীর ঘনীভূত মূর্তি। সমস্ত দেবদেবী এবং স্বয়ং ঈশ্বরও গুরুভজন করেন। এই কারণেই অবতারপুরুষদের জীবনে সর্বপ্রকার বিধি-নিয়মের সুসংবদ্ধ আচরণ দেখা যায়। মহাপুরুষরা অনেকক্ষেত্রে বিধি-নিয়মের আচরণ লঙ্ঘন করলেও অবতারপুরুষরা সমাজকল্যাণ রক্ষার্থে ধারা ঠিক রাখার জন্য বিধি-নিয়মের আচরণ কখনও লঙ্ঘন করেন না।

একবার এক মহাপুরুষের কাছে এক ভণ্ড গেরুয়াধারী সাধু এসে উপস্থিত হয়। তার বাইরের সাজপোশাক সাধুর মতোই ছিল। মহাপুরুষ তাকে দর্শনমাত্রই শ্রদ্ধাপূর্বক যথাবিধি প্রণাম করলেন। মহাপুরুষ এবং তার অনুরাগীবৃন্দ সকলেই এই ভণ্ড সাধুর বিষয়ে জানতেন। সাধু বিদায় নিয়ে চলে যাবার পরে তারা মহাপুরুষকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই সাধু তো একজন ভণ্ড লোক এবং এর কুকীর্তির কথাও সবাই জানে। সব জেনে-শুনে আপনি তাকে প্রণাম করে এত সম্মান জানালেন কেন?

মহাপুরুষ তাদের অনুযোগ শুনে হেসে বললেন—যার জন্য প্রণাম করা হয়েছে সেখানে সব ঠিকই আছে। গেরুয়াবেশ হল ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতীক। ত্যাগ-বৈরাগ্যের প্রতীককে আমি প্রণাম করেছি, কাজেই প্রণাম করা বৃথা যায়নি।

মহাপুরুষদের আচরণ সাধারণের কাছে দুর্বোধ্য। একজন শিষ্য বলল—সাধুর মহিমাও বুঝি না, ভণ্ডের মহিমাও বুঝি না।

মহাপুরুষ সস্নেহে তাকে বললেন—বুঝতে হলে একটু অপেক্ষা করতে হবে।

মহাপুরুষের শিষ্যদের মধ্যে একজন বোকা ভক্ত ছিল। সে লেখাপড়া বিশেষ শেখেনি, কিন্তু মহাপুরুষের সব আচরণ হুবহু অনুকরণ করার চেষ্টা করত। তিনি কখন কী করেন, কী ভাবে চলেন, কী বলেন, তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে লক্ষ্য করত এবং আড়ালে গিয়ে তা অনুকরণ করত। অন্যেরা কেউ এই খবর জানত না। কেবল মহাপুরুষই তার এই খবর জানতেন।

একদিন মহাপুরুষ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কি আমার গদিতে বসবি? মহাপুরুষের প্রতি কথায় শক্তি ঝরে! তিনি বুঝেছিলেন শয়নে-স্বপনে গুরুর কথা ভাবতে ভাবতে বোকা শিষ্যের জীবন দিব্য ভাবে রূপায়িত হয়েছে। গুরুর কথা ভাবতে ভাবতে সে গুরুতাদাত্ম্য লাভ করেছে। যে ভাব ভিতরে প্রকাশিত হলে গুরুবোধে প্রতিষ্ঠা হয় সেই ভাবে শিষ্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে যে গুরুবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা স্বয়ং গুরু ব্যতীত আর কেউ বুঝতে পারেনি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এইজন্য বলা হয়, ভিতরের ভাব জানেন শুধু অন্তর্দেবতা ও গুরু। অতএব আচার ও নিয়ম পালনের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিধি-নিয়ম মেনে আচরণ হলে জীবনে একটা শৃঙ্খলা ও সামঞ্জস্য আসে।

৭। ৪। ৭৪

২১৬

ব্যষ্টি আমি-র লয় মানে নিজের সমস্ত বৃত্তি যখন বন্ধ হয়ে যায় বা সব বৃত্তি গুটিয়ে একটিমাত্র বৃত্তিতে আসে, তাকেই বৃত্তিনাশ বলে। অর্থাৎ 'আমাববোধের' প্রাধান্য কমে গিয়ে 'বিশুদ্ধ আমিবোধের' প্রাধান্য বেড়ে যায়। বৃত্তিগুলি সব কেন্দ্রসত্তায় লয় হয়ে যায়। কাল ও গুণের খেলায় প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের সমান সম্বন্ধ আছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর দক্ষযজ্ঞের একটি ঘটনা বললেন।

দক্ষযজ্ঞে যেবার সতীর দেহনাশ হয়, তার পূর্ব পূর্ব কল্পগুলিতেও দক্ষযজ্ঞ হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারই সতীর দেহনাশ হয়নি। দক্ষ এক কল্পে একাদশ রুদ্রের দশম রুদ্রকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, কিন্তু একাদশ রুদ্রের কথা তাঁর স্মরণ ছিল না বলে তাঁকে তিনি নিমন্ত্রণ করেননি। সেই যজ্ঞে সতীর দেহ থেকে বিশেষ এক শক্তি এবং শিবের দেহ থেকে বিশেষ এক মূর্তি আবির্ভূত হয়েছিল। তাদের নাম যথাক্রমে ভদ্রকালী ও মহাকালভৈরব। দুই শক্তি সংযুক্ত হয়ে দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করতে আরম্ভ করল। তাঁদের ভয়াবহ ধ্বংসকার্যে অসুর এবং দেবতারা অসহায় ও বিব্রত হয়ে পালিয়ে

গেল। তখন দধীচি মুনি এই ধ্বংসকাণ্ডের কারণ ধ্যানে জানতে পারলেন। তিনি জানালেন যে, মহেশ্বর যিনি যজ্ঞের হোতা, তাঁকেই নিমন্ত্রণ করা হয়নি। বিষ্ণুর মধ্যে যিনি ভোক্তা তিনিই মহেশ্বর। একবার বিষ্ণুকে ও একবার শিবকে বলা হয়েছে ভোক্তা। এর কারণ উভয়ের মধ্যেই এক তত্ত্ব নিহিত আছে।

দক্ষও বিরাট ভক্ত ছিলেন এবং অনেক সাধনা বা তপস্যা করেছিলেন। মহেশ্বর পরাশক্তিকে নিয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হলেন। তখন দক্ষ ধ্বংস বা প্রলয় আসন্ন জেনে শিবের স্তব করতে আরম্ভ করলেন। কোন যুগে কোন কল্পে শিব কী রূপ ধারণ করেছিলেন এবং করবেন তার বর্ণনা ও মহিমা তিনি গাইতে লাগলেন। তিনি বললেন—দ্বাপরে এসে তুমি গোপালরূপে লীলা করবে, সেই গোপালরূপে তোমাকে বন্দনা করি। এর থেকে ভবিষ্যৎ কল্পের ভগবানের লীলা সম্বন্ধে পরিচয় পাওয়া যায়।

এই ভাবে নানা যুগের মহিমা বন্দনা করতে করতে দক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়লে শিব তার স্তবে তুষ্ট হয়ে বললেন—তুমি কী বর চাও? দক্ষ বললেন—জগৎকল্যাণের জন্য আমি কঠোর তপস্যা করে এত আয়োজন করেছি এবং এই যজ্ঞে সৃষ্টির সর্বস্তরের আয়োজন যুক্ত আছে, এগুলি যেন পণ্ড না-হয়। দক্ষ কোনও এক কল্পে প্রজাপতি ব্রহ্মা ছিলেন। তাই তিন সৃষ্টির সমস্ত স্তরের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন।

শিব দক্ষকে বললেন—তোমার এই যজ্ঞের ফল তুমি ঠিক সময়ে পাবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে তোমার যজ্ঞের কিছুটা নষ্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এরও একটি কারণ আছে। তুমি পূর্ব পূর্ব কল্পে যে যজ্ঞ করেছিলে তখন আমিই যজ্ঞ ধ্বংস করেছিলাম। প্রত্যেক কল্পের তপস্যা ও যজ্ঞের ফল পরবর্তী কল্পে ফিরে আসে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সৃষ্টির প্রতি কল্পের ঘটনা যা নির্দিষ্ট করা থাকে, সেই সেই কল্পের অবসানে আবার নূতন কল্প হয়। নিজের কার্যের কারণেই পরবর্তী কার্যের কারণ সৃষ্টি হয়। এর থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করা মানে নিজেকে নাশ করা নয়। অখণ্ড মানার ফলে দেবত্বের স্তর, তারপর ঈশ্বরত্বের স্তর অতিক্রম করা যায়। ঈশ্বরীয় স্তর অতিক্রম করে সমগ্র কল্পের সঙ্গে ঘুরতে আরম্ভ করলে পরবর্তী সৃষ্টির কারণ নাশ হয়।

৯। ৪। ৭৪

২১৭

ব্যাধি সম্বন্ধে সাধারণত বিকৃত ধারণাই করা হয়। কিন্তু ব্যাধির প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ব্যাধি হল পরিবর্তন বা রূপান্তরের অন্যতম একটি মাধ্যম। অবশ্য আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশের মতেই জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি—চারটিকেই খুব হেয় মনে করা হয়েছে। কিন্তু সত্যবোধের অনুভূতির জন্য এই চারটির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

জরা-ব্যাধিকে ব্রহ্মা যখন প্রকাশ করলেন তারা ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করল—আমাদের কী কাজ? কী করতে হবে আমাদের? তার উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—যেখানে যত সৃষ্টি আছে তার মধ্যে তোমাদের প্রবেশ করতে হবে। শুনে তারা কেঁদে বলল—আমাদের এই রূপকে কেউ ভালবাসবে না। আমাদের কী উপায় হবে? কে আমাদের রক্ষা করবে? ব্রহ্মা বললেন—তার ব্যবস্থা করা আছে। এই সকল বিধান অনুসরণ করে যদি তোমরা প্রবেশ কর তবে তোমাদের রক্ষার ভার আমার উপরেই থাকবে। এই বলে তিনি তাদের সমুদয় বিধান বলে দিলেন।

জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি প্রত্যেকের বিজ্ঞান, ব্যবহারপদ্ধতি ও গতির পথ নির্দিষ্ট করে বেঁধে দেওয়া আছে। এদের সৃষ্টির ইতিহাস আছে। আনন্দে ব্রহ্মা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করে চলেছেন, সৃষ্টির সংখ্যা যে কত বেড়ে চলেছে সেদিকে তাঁর কোনও খেয়াল নেই। যখন খেয়াল হল তখন তিনি দেখলেন যে, এত সৃষ্টি সামলানো তাঁর পক্ষে মুস্কিল হয়ে পড়ছে। তখন তিনি মহেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন, কিন্তু মহেশ্বরের কাছে গিয়ে দেখলেন মহেশ্বর ধ্যানে রত। তখন ব্রহ্মাও ধ্যানে বসলেন।

ধ্যানের মাধ্যমে তিনি সংহারের কারণ মৃত্যুকে আহ্বান করলেন। তখন এক অপূর্ব সুন্দরী নারী মূর্তি তাঁর সামনে আবির্ভূতা হয়ে জিজ্ঞাসা করল—পিতা, আপনি আমাকে সৃষ্টি করলেন, এবার আজ্ঞা করুন আমার কী কর্তব্য? ব্রহ্মা বললেন—সংকল্পের প্রকাশরূপ তুমি, সেই সংকল্প অনুসারে তোমার নাম মৃত্যু। সে তখন জিজ্ঞাসা করল—আমাকে কেন প্রকাশ করেছেন? আমার কী কাজ?

উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—সমস্ত সৃষ্টিকে যথানিয়মে তোমায় ধ্বংস করতে হবে। এই কথা শুনে মৃত্যু দুঃখিত হল। ব্রহ্মার কাছে কেঁদে সে বলল—এত নির্মম, নিষ্ঠুর কাজের জন্য কেন আমাকে সৃষ্টি করলেন? এ ছাড়া আপনি আমাকে অন্য যে কোনও কাজে নিযুক্ত করুন। অপরকে বিনাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তখন ব্রহ্মা আবার ধ্যানে বসলেন। সেই অবসরে মৃত্যুও তপস্যায় রত হল। প্রায় অযুত বছর পার হয়ে গেলে ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি দেখলেন সৃষ্টির সংখ্যা কমেনি। মৃত্যু তার কাজ করেনি। তাই দেখে ব্রহ্মা মৃত্যুর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হতেই মহেশ্বর এসে উপস্থিত হলেন। কারণ ক্রোধই ধ্বংসের কারণ। ক্রোধের বৃত্তিরূপ হলেন মহেশ্বর স্বয়ং। মৃত্যুর প্রতি ব্রহ্মার ক্রোধ দেখে মহেশ্বর বললেন—একে তুমি কেন কষ্ট দিচ্ছ? তুমি তো স্রষ্টা। কষ্ট দেওয়া তো তোমার কাজ নয়। জগতের কল্যাণের জন্যই আমি তোমাকে অনুরোধ করছি। তুমি তোমার ক্রোধ সংবরণ কর।

মৃত্যু দেখল তার রেহাই নেই। ব্রহ্মার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। তখন দুঃখে বেদনায় তার চোখের জল পড়তে লাগল। ব্রহ্মার কাজ এতেই সিদ্ধ হল। মৃত্যুর চোখের জল তিনি তার কমণ্ডলুতে ধরে রাখলেন এবং তাকে আদেশ করলেন—তুমি তোমার কাজে যাও, আমি তোমাকে সাহায্য করব। মৃত্যু আবার তাঁর কাছে আবেদন জানাল—পিতা, আমাকে ক্ষমা করুন। এই কাজ ছাড়া আমাকে অন্য কোনও কাজে

নিযুক্ত করুন। ব্রহ্মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—বাইরে মৃত্যুরূপে তুমি জীবদেহ বিনাশ করলেও আমার আশীর্বাদে অন্তরে তুমি অমৃতস্বরূপ হয়ে থাকবে।

জরাজীর্ণ দেহ মৃত্যুর দ্বারা লাভ করে একটি সুন্দর দেহ। তোমার মৃত্যু নেই। তোমার আশীর্বাদে তোমার ভক্ত অমৃতস্বরূপ প্রাপ্ত হবে। তুমি জীবের দেহ-আবরণকেই বিনাশ করবে। জীব বিনষ্ট হবে না। জীবরূপে তুমি থাকবে নিত্য অমৃতস্বরূপ। জীবের আকার ও বিকারেরই হবে শুধু জন্ম-মৃত্যু।

মৃত্যু আবার তপস্যা করে শক্তিলাভ করল। সেই শক্তিলাভ করার পর মৃত্যু ব্রহ্মাকে বলল—লোকহননের কাজ আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। ব্রহ্মা তখন তাঁর নিজের তপোবল দ্বারা মৃত্যুর তপোবল আবৃত করে দিলেন। মৃত্যু তখন নিরুপায় হয়ে বলল—এবার আপনি যা বলবেন তা-ই আমি করতে বাধ্য। তবে একটি বর আমাকে দিতে হবে। মৃত্যুরূপে যখন আমি যার কাছে যাব তখন তার প্রতি আমার হৃদয় যেন প্রেমে পূর্ণ থাকে। তার প্রতি নির্মম, নিষ্ঠুর যেন না-হই। মৃত্যুর এই প্রার্থনায় ব্রহ্মা মুস্কিলে পড়ে গেলেন। ঐ রূপে মৃত্যু কারও কাছে গেলে ধ্বংসের কাজ হতে পারে না। তবুও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ব্রহ্মা সন্তুষ্ট চিত্তে মৃত্যুকে আশীর্বাদ করে বললেন—মৃত্যু যাকে কৃপা করবে সে অমৃতত্ব লাভ করবে। মৃত্যুর কাজে বাধা দেবার ক্ষমতা দেবতাদেরও নেই।

মৃত্যু তখন জিজ্ঞাসা করল—কী অবস্থায় আমি যাব? ব্রহ্মা তাকে নির্দিষ্ট বিধান দিয়ে বললেন—এই সকল বিধান অনুসরণ করে প্রাণহরণ করলে তোমার কোনও দোষ হবে না। যারা ভগবানের নাম স্মরণ করে, তাদের কাছে যাবার সময় তাদের ইষ্টের অনুমতি নিয়ে যেতে হবে।

একবার ইষ্টের বিনা অনুমতিতে এক শিবভক্তকে নিয়ে গিয়ে যম ভীষণ বিপদে পড়েছিলেন। যমপুরীতে গিয়ে ভক্ত শিবকে ডাকতে থাকে। ভক্তের ডাকে যমপুরীতে শিব এসে উপস্থিত হলেন। যখন তিনি শুনলেন ভক্তের এই দশার জন্য যম দায়ী, তখন যমকে তিরস্কার করে বললেন—সব কিছুরই একটা বিধান আছে। কোথায় কী করতে হবে তার হিসাব না-থাকলে তোমার কাজে ত্রুটি থেকে যাবে। শেষ পর্যন্ত সেই ভক্তকে কিছু করতে না-পেরে যম নিজের আয়ু থেকে তাকে আয়ু দিয়ে মর্তে ফেরত পাঠান। নিজের ভূলের মাশুল যমকেও দিতে হয়েছে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মৃত্যুকে সাধারণত সকলে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু মহাসাধকের কাছে মৃত্যু হল সর্বোত্তম মিত্র ও সাথি। মৃত্যুর সঙ্গে যারা সৌহার্দ্য করে মৃত্যু তাদের কৃপা করে, অর্থাৎ অমৃতলোকের দ্বার খুলে দেয়। মৃত্যু তুষ্ট না-হলে অমৃত পাওয়া যায় না। মৃত্যু কার মধ্যে আছে? অমৃত রয়েছে সদ্‌গুরুর মধ্যে। মৃত্যু রয়েছে অমৃতের মধ্যে বা সদ্‌গুরুর মধ্যে। বোধস্বরূপ গুরু প্রীত হলেই অমৃতের আস্বাদন হয়। সমতা হল অমৃত এবং অসমান হল মৃত্যু।

১৪। ৪। ৭৪

২১৮

মহারাষ্ট্রীয় যোগী একনাথের নাম সকলেরই জানা আছে। তাঁর মহিমা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন এক জমাদার একনাথের খুব অনুরক্ত হয়। তার একবার বিশেষ ইচ্ছা হল একনাথকে গৃহে আমন্ত্রণ করে এনে ভোগ দেয়। মনের তীব্র ইচ্ছা দমন করতে না-পেরে জমাদার একদিন একনাথকে গিয়ে বলল—আপনি তো ভগবান। আপনার কাছে আমার একটি আবেদন আছে। একনাথ তার প্রার্থনাকে অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি নিজেকে ভগবান বলে স্বীকার না-করলেও জমাদারের বিশ্বাসে আঘাত হানতে পারলেন না। কারণ যে যাঁকে ভগবানরূপে অবলম্বন করেছে সেই অবলম্বন থেকে তাকে বিচ্যুত করার অধিকার কারও নেই। কাজেই জমাদার তাঁকে ভগবানরূপে বরণ করায় তিনি প্রতিবাদ করতে পারলেন না।

জমাদার তাঁকে আরও বলল—ভগবান তো ভক্তের ইচ্ছা পূরণ করেন, তাই আমার একটি প্রার্থনা আছে। একনাথ জিজ্ঞাসা করলেন—কী প্রার্থনা? জমাদার বলল—আজকে এই শরীরটা (নিজেকে দেখিয়ে) যা ভোগ দেবে তা-ই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। একনাথ তার প্রার্থনায় সম্মতি জানালেন। কারণ তিনি জানেন যে, তিনি তো কিছু গ্রহণ করবেন না, তাঁর গুরুকেই সব দিয়ে দেবেন। তাঁর নিজস্ব কিছুই নেই।

জমাদারের ঘরে ভোগ গ্রহণের সংবাদ পেয়ে সমাজের নেতৃস্থানীয়রা তাঁকে সমাজচ্যুত করল। একনাথকে তারা সমাজচ্যুত করলেও একনাথ কোনও কিছু থেকে বঞ্চিত হলেন না। তাদের যুক্তি ছিল—হতে পারেন একনাথ যোগী ভক্ত, কিন্তু ব্রাহ্মণের সংস্কার রক্ষা করা তাঁর প্রধান কর্তব্য। এর উত্তরে একনাথ বলেছিলেন—আমি কিছু গ্রহণ করিনি। যিনি সর্বভূতে ভোক্তা বা অধিযজ্ঞ রূপে অধিষ্ঠিত তিনিই গ্রহণ করেছেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানে প্রাণই প্রাণকে গ্রহণ করল। তদূর্ধ্বের অনুভূতি হল বোধ। বোধই বোধকে জানে এবং গ্রহণ করে। বোধের রাজ্যে দ্বিতীয় কেউ নেই। বহির্দৃষ্টিতেই বিচার, অর্থাৎ উচিত-অনুচিতের প্রশ্ন আসে।

১৯। ৫। ৭৪

২১৯

বুদ্ধদেবের প্রিয় শিষ্য ছিল মৌদগল্য। তিনি অসাধারণ যোগী ছিলেন। এমন কোনও জাগতিক ইচ্ছা ছিল না যা তিনি ইচ্ছামাত্র পূরণ করতে পারতেন না। শত্রুরা তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে তাঁর হাড় গুঁড়ো করে মিশিয়ে দিয়েছিল। তাঁর এই পরিণাম হয়েছিল। তাঁর এই পরিণতি সম্বন্ধে বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন—ওর আধ্যাত্মিক পথে অনেক উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু এখনও কর্মফলের প্রভাবমুক্ত সে হতে পারেনি, অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়াশূন্য অবস্থার সঙ্গে সে যুক্ত হয়নি। সে পিতৃহত্যা করেছিল, তারই প্রতিক্রিয়া এ ভাবে হল। সেইজন্য তাঁর এই দুর্গতি। এত শুভ সংস্কার থাকা সত্ত্বেও সে কর্মফলের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মন-বুদ্ধির রাজ্যে থাকা পর্যন্ত ঈশ্বরদর্শনের পরেও প্রতিক্রিয়া থাকে। অদ্বয়তত্ত্বের মহিমা সর্বোত্তম। তাতে কোনও প্রতিক্রিয়া থাকে না।

ক্রিয়াশক্তির সাধনায় ঈশ্বরের কৃপা পাওয়া যায়, কিন্তু সর্বকর্মের ফল ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। নিজেকেই তা ভোগ করতে হয়। তাতে ঈশ্বরের সাহায্য পাওয়া যেতে পারে। সেইজন্য দেহভোগ শেষ করতে হয়। মহাযোগে ভোগের কোনও প্রশ্ন নেই।

কুণ্ডলিনীর বিজ্ঞান অনুযায়ী এক একটা দেহের মধ্যে বহুবার মানুষ মুক্ত হবার সুযোগ পেতে পারে। ব্যষ্টি মুক্ত দেহের মধ্যে বাকি অন্যান্য দেহের কর্মফল প্রতিক্রিয়াশূন্য হয়ে যায় না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত মুক্ত দেহ প্রতিক্রিয়াশূন্য হয় না, ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে হতে পারে। সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া হয়ে চলে।

২১। ৫। ৭৪

২২০

পুঁথিপুস্তকের মাধ্যমে জানা যায় যিশু তাঁর জীবনে নাকি অনেক বিভূতি দেখিয়েছিলেন। বস্তুত যিশু কোনও বিভূতি দেখাননি। একদিন প্রচারকার্যে যাওয়ার পথে একটি ঘটনা ঘটে। তিনি ভক্তদের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি মেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে কেঁদে পড়ে মিনতি জানিয়ে তাঁকে বলে—আমার ভাই মরণাপন্ন, তুমি আমার ভাইকে বাঁচিয়ে দাও। যিশু বললেন—আমি তো বাঁচিয়ে দেবার বিজ্ঞান জানি না বা মারবার বিজ্ঞানও জানি না। আমি তো বাঁচাতে পারব না। মেয়েটি বলল—অতশত বুঝি না। আমি জানি এবং মানি যে, তুমি পারবে। যিশু আহ্লাদিত হয়ে বললেন—তুমি মান? তাহলে তো তোমার কোনও অভাব থাকতে পারে না! পরমপিতা তোমাকে নিশ্চয় দেখবেন। তাঁর কথা বিশ্বাস করে মেয়েটি বাড়ি ফিরে এল। মেয়েটি বাড়িতে এসে দেখে তার ভাই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—যিশুর বিভূতির নিদর্শন হিসাবে এই ঘটনা হয়ত লিপিবদ্ধ করা হবে, কিন্তু তিনি বারবার বলেছেন এতে তাঁর কোনও কৃতিত্ব নেই, শুধু বিশ্বাসেই অসাধ্য সাধন করা যায়। পরমপিতাকে যে মানে সে-ই তাঁর কৃপা পায়। এ রকম আরেকটি ঘটনা তাঁর জীবনে ঘটে যেখানে মুমূর্ষুকে বাঁচিয়ে দেবার প্রার্থনা তাঁর কাছে জানান হয়। তিনি অস্বীকার করেন যে, বাঁচাবার শক্তি তাঁর নেই। কিন্তু যিশু যে পারেন, এই বিশ্বাসে আবেদনকারী পূর্ণ বিশ্বাসী। তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস দেখে যিশু বললেন—তোমার যখন এত বিশ্বাস তখন তোমার প্রার্থনা পরমপিতা নিশ্চয় পূরণ করবেন। এ সব অত্যাশ্চর্য ঘটনা যিশুর বিভূতির খেলা নয়—শুধু তাঁর বিশ্বাস যে, one who rely on God, God takes full responsibility, ঘটনাগুলির তিনি মাধ্যমমাত্র। অনেক মহাত্মা মহাপুরুষের জীবনই এই রকম ঘটনার মাধ্যম হয়। এঁরা অখণ্ডের মধ্যে মিশে আছেন বলে অখণ্ড বিশ্বাসের মাধ্যমরূপে কাজ করতে পারেন। বিশ্বাসের কথা শুনলে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও বললেন—তাঁর কৃপা ও অবদানের অভাব নেই। তবে ব্যক্তিগত ভাবে কতখানি কৃতজ্ঞতাবোধ জেগেছে তার উপরেই সব কিছু নির্ভর করে। অকৃতজ্ঞতাবোধই দুঃখকষ্টের কারণ। দেহ থেকে আরম্ভ করে মন-বুদ্ধি পর্যন্ত সব তাঁর সম্পত্তি—এ-ই হল একমাত্র জ্ঞান। সাধনা যদি কিছু করতে হয় তবে এই সত্যকে মানার চেষ্টা কর। 'সন্দেহ' বা 'কিন্তু' দিয়ে নয়। সংশয়শূন্য বিশ্বাস এলে সত্যোপলব্ধির জন্য বেশি সময় লাগে না।

কেউ যদি কল্পনা করে যে তার পক্ষে জানা সম্ভবপর নয়, তিনিই তাকে মানিয়ে নেবেন বা জোর করে বা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তার পৃথক সত্তা কেড়ে নেবেন, তাহলেই ভাল হয়। এর উত্তরে বলা যায় যে জোর করতে গেলে কষ্ট হয় এবং বোঝাতে গেলে ধৈর্যের অভাব হয়। এই কারণে জীবনে যা-কিছু আছে সব 'তুমিবোধে' মানা হলে আর কিছু বাকি থাকে না। এই মানাকেই দীক্ষা বলে। সুখ-দুঃখ সব তুমি, আমার এই আমিবেশে তুমি খেল এসে—এই হল অখণ্ড এক-এর পরিচয়। সব কিছু যদি তিনি হন ও তাঁব হয় তবে আমিও অখণ্ডের মধ্যেই আছি। এই বোধে হবে নিত্যমুক্ত।

২৩। ৬। ৭৪

২২১

'হর, হর' জপের পরিণতি প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক পাগল 'হর, হর' করে জীবন কাটিয়ে দিয়েছিল। 'হর, হর' মানে তুমি হরণ করে নাও। সে 'হরি, হরি' বলল না। তার সাধনার প্রক্রিয়াটি বড় সুন্দর ছিল। এদিকে তার সংসারে খুবই অভাব। সেইজন্য তার পরিবার তার উপরে সন্তুষ্ট ছিল না। তার পরিবার ছিল ঠিক সক্রেটিসের পরিবারের মতো। রোজগার করে না-খাওয়াতে পারলে কোন পরিবারই বা সন্তুষ্ট হয়!

জনৈক ভক্ত বলল—আপনাদের ভাষায় এগুলি লীলা।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—যা বল তোমরা তা-ই স্বীকার করে নেওয়া হল। 'এর' (নিজেকে দেখিয়ে) কোনও ভাষা নেই। যাই হোক, একদিন রোজগার করে পাগল যা পেল বাড়ি আনতে আনতে রাস্তায় তা বিতরণ করতে করতে নিঃস্ব হয়ে গেল। একটিমাত্র আখ শুধু অবশিষ্ট ছিল। সেই আখ পেয়ে পরিবার তো তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে স্বামীর পিঠে এক ঘা লাগিয়ে দিল। আখটা তার পিঠে পড়ে দু'খানা হয়ে গেল। এতে পাগলের কোনও প্রতিক্রিয়া হল না। তার মুখে শুধু 'হর, হর' ধ্বনি। আখটা তার পিঠে ভাঙতেই আনন্দে আরও গদগদ হয়ে বলতে লাগল—হর তুমি আমায় এত ভালবাস যে একা খেতে পারলে না বলে দু'খানা করলে। এই বলে সে গান আরম্ভ করে দিল। পত্নী তার কাণ্ড দেখে হতবাক। পত্নী দেখল যে, সে গান করছে আর তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নামছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখে যেখানে স্বামী দাঁড়িয়েছিল সেখানে সে নেই, সব শূন্য। এই কাণ্ড দেখে সে ভাবল, একে নিশ্চয় ভূতে ধরেছে। ভূত ছাড়াবার ব্যবস্থা করতে হবে বলে সে ওঝা ডাকল। ওঝা এসে যথারীতি তার প্রক্রিয়া অর্থাৎ ঝাঁটার বাড়ি ইত্যাদি দিতে লাগল। কিন্তু ভূতের

ওঝা ভূতনাথকে ঘাড় থেকে নামাবে কী করে? পাগলের ঘাড় থেকে ভূত তো নামলই না বরং পাগলই 'হর, হর' করে ওঝার ঘাড়ে চেপে বসল।

'হর, হর' করেই তার সমস্ত সাধনভজন হয়ে গেল। ঐ তার একমাত্র নাম, একমাত্র বীজ।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—'হরি' বললে বলা হয় আমি হরণ করি। অর্থাৎ 'আমিভাব' এসে যায়। আর 'হর' বললে বলা হয় তুমি হরণ করে নাও। এ ছাড়া 'হর'-এর আরেকটি সুন্দর অর্থ আছে। 'হ্'—মহাপ্রাণ অখণ্ড চৈতন্যসত্তা। সে তার শক্তির সঙ্গে সব সময় যুক্ত। 'র' হল শক্তি।

'হর, হর' বার বার উচ্চারণ করলে হয় 'হ্'-এর মধ্যে 'র' এবং 'র'-এর মধ্যে 'হ্'। তাহলে 'আমি' থাকে না। যেখানে আমি থাকে না, সেখানে তুমিও থাকে না। 'হর, হর' উচ্চারণে একবার 'হ্' আগে আসে, একবার 'র' আগে আসে। অর্থাৎ সত্তা-শক্তি, শক্তি-সত্তা বা "হংসঃ-সোঽহং" এই ভাবে চলে। এই বীজ মন্ত্রই ছিল তার জীবনের অবলম্বন।

৩০। ৬। ৭৪

২২২

মায়ার ফাঁদে পড়ে মহাসাধকের কী রকম দুরবস্থা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও এক মহাযোগী হিমালয়ে সাধনা করতেন। তাঁর কাছে অষ্টসিদ্ধি গোলামের মতো ছিল এবং ভূতজগতের যত স্তর আছে সবগুলি স্তরের উপর তাঁর প্রাধান্য ছিল। একদিন তিনি নিজের আসনে বসেছিলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন অনতিদূরে এক অপূর্ব সুন্দর পুরুষ চলে যাচ্ছেন। হাতে তার একটি মোটা দড়ির গাছা। যোগী তাকে দেখে অবাক হয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, কে এই অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ! এত উচ্চ ভূমিতে দেবতা ছাড়া কোনও মানুষের পক্ষে তো আসা সম্ভব নয়! দেবতার দর্শন লাভের জন্য তিনি দেববন্দনা আরম্ভ করলেন। সেই পুরুষ তার স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে কাছে এলেন। যোগী তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি কে? আপনার পরিচয় জানতে পারলাম না তো! তিনি বললেন—আমার নাম মায়া। যোগী বিস্মিত হয়ে বললেন— মায়া! মায়া তো জানি নারী মূর্তি, কিন্তু আপনি তো পুরুষ! তিনি বললেন—আমি যে কোনও বেশ ধারণ করতে পারি। যোগী বললেন—শাস্ত্রে আছে মায়া নারী মূর্তি, তার মোহিনী রূপ দিয়ে মানুষকে ভোলায়। তিনি বললেন—শাস্ত্রের ঐ বাক্যও আমার মায়া। যোগী তার হাতের দড়িটা দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার হাতের এই দড়ি দিয়ে কী করেন? মায়া বললেন—এই দড়ি দিয়ে আমি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে বাঁধি। যোগী অবাক হয়ে বললেন—এঁদেরও বাঁধতে হয়? এঁরা তো দেবতা। তাহলে বদ্ধ জীবকে আর কত মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধতে হয়? তিনি বললেন—জীবকে বাঁধতে দড়ির দরকার হয় না। জীবকে বাঁধবার জন্য একটি ইঙ্গিতমাত্র প্রয়োজন হয়। যোগী তখন জিজ্ঞাসা করলেন—আর আমার

জন্য তোমার কী প্রয়োজন হয়? আমি তো মুক্তপুরুষ, মায়ার অধীন নই। মায়া হাসতে হাসতে বললেন—তোমার জন্য একটি ইঙ্গিতও প্রয়োজন হয় না। এই বলে তিনি মিলিয়ে গেলেন।

এই ঘটনার তিন দিন পর যোগী ধ্যানে বসেছেন, সেই সময় দূর থেকে অপূর্ব সুন্দর গন্ধ এবং সুরের মূর্ছনা ভেসে আসতে লাগল। সুন্দর গন্ধের মাদকতায় এবং অপূর্ব সুরলহরীর আকর্ষণে যোগীর মন বার বার চঞ্চল হয়ে উঠল। তার পক্ষে আর ধ্যানে বসা সম্ভবপর হল না। কোথা থেকে এই সুর ও গন্ধ ভেসে আসছে তা সন্ধান করার জন্য তিনি বেরিয়ে পড়লেন। যোগী নিরাকারের ধ্যান করেন, তাই জগতের সব কিছুই এতদিন মায়া ও মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আজ আর তিনি বসে থাকতে পারলেন না। অনুসন্ধান করতে করতে তাঁর পরিচিত গণ্ডির সীমা ছাড়িয়ে বহু দূর চলে এসেছেন। পাহাড়ের আরেকটি সুন্দর উপত্যকায় এসে তাঁর মনে হল খুব কাছ থেকেই যেন সুর ভেসে আসছে। এইবার বোধহয় তা দেখতে পাবেন।

এমন সুন্দর মনোরম স্থানে এসে তিনি উপস্থিত হয়েছেন যার সৌন্দর্যের বর্ণনা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। স্বর্গের নন্দনকাননের সঙ্গেই শুধু তার তুলনা করা চলে। যোগী ভাবলেন, এই সুন্দর পবিত্র স্বর্গোদ্যানে বসামাত্রই সমাধিলাভ হবে! ঝরনাগুলিতে রঙিন আলোর বাহার ঝরে পড়ছে। পত্রে-পুষ্পে-ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে সেই উদ্যান অপূর্ব মনোহর রূপলাবণ্যে ভরে উঠেছে। সেই অকল্পনীয় সৌন্দর্যের মোহে মুগ্ধ ও আবেশিত হয়ে যোগী উদ্যানের মধ্যেই সুর এবং গন্ধের উৎস খুঁজতে লাগলেন। তিনি ভাবলেন, নন্দনকাননের মতো এই উদ্যানের মালিক নিশ্চয় কোনও দেবতা হবেন! এখানে যখন এসে পড়েছি তখন তাঁকে দর্শন করেই যেতে হবে! হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন ঝরনার ধারে বসে এক অপূর্ব সুন্দরী কন্যা মধুর কণ্ঠে সুললিত স্বরে গান করছে। তার রূপ এবং সুরমূর্ছনা যোগীকে আকর্ষণ করতে লাগল। যোগী ভাবলেন, এই মেয়েটি নিশ্চয়ই কোনও দেবতার কন্যা! এর মাধ্যমেই সেই দেবতার সাক্ষাৎ পাব। তিনি কন্যার যত কাছে আসেন, দেখেন কন্যার স্থান পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কন্যাকে ধরতে চেষ্টা করেও ধরতে পারছেন না। ক্রমে তাঁর জেদ বেড়ে যেতে লাগল। নিজেকে আর সংযত করে রাখতে পারলেন না। মায়া, মিথ্যার বোধ তাঁর উড়ে গিয়েছে। অনেকক্ষণ চেষ্টার পর একবার তিনি ঝট করে কন্যার বেণি ধরে ফেললেন। বেণি ধরতেই কন্যা হি হি করে হেসে মিলিয়ে গেল। তার সেই হাসি পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। তখন যোগীর সম্বিৎ ফিরে এল। মায়ারূপী কন্যা যোগীকে বলল—তোমাকে ভোলাতে কোনও পাশ দরকার হয় না, শুধু ইঙ্গিতমাত্র প্রয়োজন। এবার কোথায় গেল তোমার যোগবিভূতি? যোগী দেখলেন, সত্যিই তো তিনি সব কিছু বিস্মৃত হয়েছেন। যোগী বুঝতে পারলেন যে, এ সবই মায়ার কীর্তি! তিনি কাতর ভাবে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন তার যোগবিভূতি ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। মায়া বলল—এগুলি আমারই দেওয়া জিনিস, আমি নিয়ে চললাম। আত্মা কিছু দেয় না। আত্মার মধ্যে দুই নেই। কে কাকে দেবে?

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—দ্বৈতভূমির মধ্যে থেকে অদ্বৈতের সাধনা হয় না। দ্বৈতজ্ঞান থাকলে আত্মার জ্ঞান থাকে না।

৭। ৭। ৭৪

২২৩

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একদিন ভক্তদের বললেন—যা-কিছু কর একজনকে সমর্পণ কর, একজনকে দাও। এটা-ওটা করে দশটার মধ্যে দিলে হবে না। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি ঘটনা বলছি শোন।

এক ব্যক্তি রোজ একটি নির্দিষ্ট গাছের গোড়ায় একই সময় জল দিত। প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে সে তার ঐ কাজটুকু নিষ্ঠা সহকারে করে যেত। এই ভাবে বেশ কয়েকবছর কেটে যাওয়ার পর একদিন এক বিরাট পুরুষ তার সামনে এসে উপস্থিত হল। সে এসে ঐ ব্যক্তিকে বলল—আমি তোমার সেবায় সন্তুষ্ট হয়েছি। বারো বছর যাবৎ তুমি আমাকে যে নিয়মিত জল দিয়েছ তা আমি পেয়েছি। বল, আমি তোমার কী উপকার করতে পারি? সেই ব্যক্তি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে তুমি? তোমাকে তো আমি চিনি না। সে তার পরিচয় দিয়ে বলল, সে ঐ গাছেই বাস করে, অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য। সেই ব্যক্তি বলল—তুমি কী বলছ বুঝতে পারছি না। আমি তোমাকে কোনও দিন জল দিইনি। আমি গাছের গোড়ায় জল দিয়েছি। ব্রহ্মদৈত্য বলল—সে জল আমি নিয়মিত ভাবে পেয়েছি এবং তোমার এই অবিচ্ছিন্ন কর্মে খুব সন্তোষ লাভ করে তোমাকে কিছু দিতে চাই। তুমি কী চাও বল? সেই ব্যক্তি বলল—আমার এখন কোনও কিছুর প্রয়োজন নেই এবং আমি কিছুই চাই না। ব্রহ্মদৈত্য বলল—বেশ এখন তোমার প্রয়োজন নেই, ভবিষ্যতে যদি কোনও কাজে আমার সাহায্য বা কোনও কিছুর প্রয়োজন হয়, আমাকে স্মরণ করো তখন আমি আসব। তোমার পাওনা আমার কাছে জমা রইল। এই বলে ব্রহ্মদৈত্য চলে গেল।

এর কিছুদিন পর এই লোকটি সেই স্থান ত্যাগ করে বনের মধ্যে এক কুটির বেঁধে বাস করতে লাগল। পূর্ব অভ্যাস ত্যাগ করে সে আরেকটি নূতন কর্ম তার প্রাত্যহিক কর্মে যোগ করল। তার কুটিরের সামনে রাস্তার কিছুটা অংশ প্রত্যহ ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রাখত। প্রতিদিন নিষ্ঠা ও যত্নের সঙ্গে এই কর্ম করে তার জীবনে একটি নূতন অভ্যাস তৈরি হল। একদিন সে দেখতে পেল এক দিব্য জ্যোতির্ময় পুরুষ সেই রাস্তা আলোকিত করে দাঁড়িয়ে আছেন। লোকটি জিজ্ঞাসা করল—কে তুমি? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না! সেই দিব্যপুরুষ বললেন—আমি পূর্ব দিকের অধীশ্বর। তবু সে চিনতে পারল না দেখে দিব্যপুরুষ উত্তর দিলেন—আমার নাম আদিত্য। আমি রোজ সকালে এই পথ দিয়ে যাই। তুমি পথ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বড় সুন্দর করে রাখ, আমি বড় তৃপ্তি পাই। তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়ে আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। তুমি তোমার প্রয়োজন অনুসারে চেয়ে নাও। সেই ব্যক্তি বলল—আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। তোমার জন্য আমি তো কিছু করিনি। রাস্তা ঝাঁট দিয়ে শুধু পরিষ্কার করে রেখেছি, এর বেশি কিছু করিনি। তা ছাড়া আমার

তো কিছু প্রয়োজন নেই, আমাকে তুমি কী দেবে? আদিত্যদেব বললেন—বেশ তোমার কিছু পাওনা জমা রইল আমার কাছে। প্রয়োজন হলে তুমি আমাকে স্মরণ করো, আমি তখনই এসে উপস্থিত হব। এই বলে তিনি অদৃশ্য হলেন।

এর পরে সেই ব্যক্তির আরেকটি নূতন অভ্যাস দেখা দিল। রোজ সে তার খাবারের এক অংশ আলাদা করে সরিয়ে রেখে দিত। এই ভাবে দশ-বারো বছর অতিক্রান্ত হলে পর এক সৌম্যদর্শন দিব্যকান্তি পুরুষ তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে বললেন—তোমার ভোগ নিবেদনে আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। বল, আমি তোমার কী উপকার করতে পারি? সে এবারেও খুব অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না। তোমার উদ্দেশে তো আমি ভোগ নিবেদন করিনি। উত্তরে তিনি বললেন—আমার উদ্দেশে দাওনি ঠিকই, তবে আমি তা পেয়েছি। তোমার আচার, নিয়মনিষ্ঠা ও শুচিশুদ্ধতায় আমি অত্যন্ত প্রীত ও আনন্দিত হয়েছি। আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই। নিবেদনকারী পূর্বের মতোই জানাল, সে কিছুই গ্রহণ করতে পারবে না, কারণ তার কোনও চাহিদা বা প্রয়োজন নেই। সেই দেবতাও বলে গেলেন—ঠিক আছে যদি কোনও দিন কোনও প্রয়োজনে আমাকে দরকার হয় তখন মনে মনে স্মরণ করো, আমি যথাসময়ে এসে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করব।

এরপব তার আরেকটি নূতন অভ্যাস তৈরি হল। সে তার কুটিরের আশেপাশে ছোট ছোট প্রাণী যেমন হাঁস, মুরগি, ছাগলছানা প্রভৃতিদের নিয়মিত খাবার দিত। তার এই কাজেও কোনও অবহেলা বা গাফিলতি ছিল না। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ভাবে নিষ্ঠাসহকারে সে এই কাজ পালন করে যেত। একদিন এক দিব্যপুরুষ তার সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন—তোমার সেবাযত্নে আমি খুবই প্রীত ও সন্তুষ্ট হয়েছি। বল, আমি তোমার কী উপকারে লাগতে পারি? সেই ব্যক্তি বলল—আমার নিজস্ব কোনও প্রয়োজন নেই। আর আমার কোনও উপকারেরও দরকার নেই। কিন্তু তার আগে তোমার পরিচয় দাও। তুমি কে? তোমাকে তো চিনতে পারলাম না! উত্তরে তিনি জানালেন—আমার নাম মহাপ্রাণ, আমি প্রাণরূপে সবার অন্তরে থাকি। তুমি প্রাণের সেবা করে আমারই সেবা করছ। সেই সেবায় আমি অত্যন্ত তুষ্ট হয়ে তোমাকে কিছু দিতে চাই। এবারেও সে পূর্বের মতো কোনও কিছু গ্রহণ কবতে চাইল না। প্রাণের দেবতাও তাকে জানিয়ে গেলেন—তোমার কিছু প্রয়োজন হলে আমায় স্মরণ করো, আমি তখনই আসব। এই বলে তিনি প্রস্থান করলেন।

তার মধ্যে আরেকটি অভ্যাস তৈরি হল। সে প্রতিদিন একটি ফাঁকা জায়গায় গিয়ে উপর দিকে তাকিয়ে চার দিকে চোখ বুলিয়ে কী যেন করত। এইরূপ প্রায় দশ-বারো বছর করার পর তার কাছে এক দিব্যপুরুষ আবির্ভূত হলেন। সেই পুরুষ এসে বললেন—তোমার প্রাত্যহিক স্মরণে আমি মুগ্ধ ও প্রীত হয়েছি। তোমাকে আমি কিছু দিতে চাই। সেই ব্যক্তি এবারেও অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কে তুমি? তোমার জন্য আমি কিছু করেছি বলে তো মনে পড়ছে না। আগন্তুক বললেন—আমি হলাম দিক্‌পাল। সবদিকেই আমার গতি। তোমার একনিষ্ঠতা ও সদাচরণে সন্তুষ্ট হয়ে

তোমাকে বর দিতে চাই। তুমি তোমার ইচ্ছা ও প্রয়োজন মতো জিনিস আমার কাছে চেয়ে নাও। সে পূর্বের মতো তা গ্রহণ করতে চাইল না। তখন দিকপাল বললেন—বেশ এখন তোমার প্রয়োজন না-থাকলেও পরে যদি কোনও প্রয়োজন হয় তখনই আমায় স্মরণ করো। তোমার কিছু পাওনা আমার কাছে জমা রইল।

এরকম পর পর আরও অনেক ক্রিয়াকর্ম করে অধিযজ্ঞদের কাছ থেকে সে কৃপা ও আশীর্বাদ পেল। এরপর তার কাছে একজন এসে বললেন—তোমার সমস্ত সাধনার সিদ্ধি নিয়ে এসেছি, তুমি গ্রহণ কর। আমি হলাম পূর্ণ সিদ্ধিদাতা। তখন সেই ব্যক্তি আরও বিস্মিত হয়ে বলল—পূর্ণসিদ্ধি পাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই। কারণ আমি কোনও সাধনাই করিনি। তার কথা শুনে পূর্ণ সিদ্ধিদাতা একটু হকচকিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, তাহলে কী আমি ভুল লোকের কাছে এলাম! না, আমার তো ভুল হয়নি। জমার খাতা লোকটিকে খুলে দেখিয়ে বললেন—দেখ, তোমার নামে এত সব জমা আছে। এই বলে সে প্রথম থেকে অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য তাকে যা দিতে চেয়েছিল সেই থেকে আরম্ভ করে প্রত্যেক দেবতাদের কাছে তার যা পাওনা ছিল সব হিসাব দেখাতে লাগলেন। এ সব দেখে সে বলে উঠল—এ সব নিয়ে আমি কী করব? আমি তো কিছু চাইনি।

এরপর সে আরও অবাক কাণ্ড দেখতে পেল। তার চার দিকে দেবতারা উপর থেকে নিচে অবধি সারি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। চার দিক দিব্য জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। সবাই তাকে ফল দেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রত্যেককেই এই গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্বন্ধে একটু চিন্তা করতে বলা হল। সেই ব্যক্তি কে? ফলগুলি নিলেই বা কী হবে আর না-নিলেই বা কী হবে?

এর মধ্যে পঞ্চতত্ত্ব, সপ্তদশতত্ত্ব, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব প্রভৃতি সব তত্ত্বের ইঙ্গিত দেওয়া আছে। সেই ব্যক্তির মধ্যে কর্ম নিরন্তর হয়ে চলেছে, যেমন ঈশ্বরের মধ্যে কর্ম নিরন্তর হয়ে চলে। কারণ ঈশ্বর নিষ্ক্রিয় হলে জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। অতএব সে ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত হয়েছে।

আরেকটি ভাববার বিষয় হল কর্মফল কার প্রয়োজন হয়? কার কাছে তা ফিরে আসে? কর্ম অনুসারে প্রত্যেকে ফল পায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ কর্মফল বা সাধনার সিদ্ধি ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে চায় না। বহু কষ্ট করে লোভনীয় বিভূতি, যেমন শূন্যের মধ্যে বিচরণ করা বা জলের উপর দিয়ে হাঁটা ইত্যাদি লাভ হলে মন সহজে তা সমর্পণ করতে চায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি তার কর্ম নিষ্কাম ভাবে করে এবং সাধনার ফল ঈশ্বরকে সমর্পণ করে দেয় সে ত্যাগ-বৈরাগ্যে পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তৃতীয় বিষয় হল কে এমন ব্যক্তি আছে যে সব করেও কিছু করে না, যে সক্রিয় হয়েও নিষ্ক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় হয়েও সক্রিয়। অতি সাধারণ সেই ব্যক্তি। কিন্তু মানুষ সাধারণকে বাদ দিয়ে অসাধারণের পিছনে ছুটতে গিয়ে নাস্তানাবুদ হয়। সাদাকে বাদ দিয়ে রঙিনের পিছনে ছুটতে মন ভালবাসে। তাই ভগবান চার দিকে সব রঙিন করে

সাজিয়ে রেখেছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সবাইকে তিনি বড় করে নিজে ছোট হয়ে আছেন। গল্পের মধ্যে ঈশ্বরীয় তত্ত্বের সব দেওয়া আছে। ঈশ্বর বলতে যা বলা হয় সেই বক্তব্যের মধ্যেও কারও সঙ্গে কারওর মেলে না, তর্কবিতর্ক আরম্ভ হয়। কারণ এমন কোনও কথা নেই যা সবার কাছে প্রীতিকর হতে পারে। যদিও সব ভাব নিয়ে আত্মা বা ঈশ্বর খেলেন, কিন্তু তিনি নিজেকে নিয়ে নিজেই তৃপ্ত হন না। তিনিই যখন সর্বপ্রকাশের মধ্যে বিদ্যমান, তিনি স্বয়ংপূর্ণ হলে তাঁর প্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ হবে না কেন?

রুচিভেদে গুণভেদ হয়, গুণভেদে হয় শক্তিভেদ এবং শক্তিভেদে জ্ঞানভেদ হয়। এই রকম প্রত্যেক স্তরেই তারতম্য হয়ে যায়। এগুলি বাইরেব প্রকাশের বহির্বিভাগের ব্যাপার। এই জন্য গল্পের সেই ব্যক্তির নানা স্থানে ভিন্ন ভিন্ন কর্মের প্রয়োজন হয়েছে এবং বহু দেবদেবীকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আবির্ভূত হতে হয়েছে। প্রত্যেক দেবদেবীকে সমর্পণ করা হলে ভগবান স্বয়ং এসে দেখা দেন।

মানুষের প্রয়োজনে ভগবান ভাগ হয়ে যান। প্রয়োজন না-হলে তিনি মানুষের কাছে ভগবানরূপে থাকেন। দিনের বেলায় মানুষের কত প্রয়োজন হয়, কিন্তু রাতে ঘুমিয়ে পড়লে সব প্রয়োজনের অবসান হয়।

বহুত্ব, দ্বৈত, একত্ব, অদ্বৈত, নিত্যাদ্বৈত প্রভৃতি তত্ত্বের ইঙ্গিত গল্পটিতে আছে। আরেকটি বিষয় হল কর্মশূন্য সত্য অপূর্ণ। জ্ঞানশূন্য বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানশূন্য জ্ঞানও অপূর্ণ। শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাসের পূর্ণরূপ তার মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত। কারণ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি নিরলস ভাবে কর্ম করতে পারে না। ত্যাগ-বৈরাগ্য না-থাকলে ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্য কার্য করা যায় না। সেই ব্যক্তি যে কত বড় শান্তির রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত তার প্রমাণ পাওযা যায় যখন সব দেবতারা উপযাচক হয়ে কর্মফল দিতে এলে সে অনায়াসে তা প্রত্যাখ্যান করল। যেখানে মানুষ দেবতাদের কাছে চেয়ে পায় না সেখানে দেবতাদের অযাচিত কৃপা সে অপ্রয়োজনীয় বোধে গ্রহণ করল না।

প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কী রকম ব্যবহার করা উচিত তাও এই গল্পে দেখানো হয়েছে। দান, দয়া, দমন, ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রকাশ তার ভিতরে আপনিই হয়ে চলেছে। ব্যষ্টি, সমষ্টি ও তার ঊর্ধ্বে যা-কিছু জ্ঞাতব্য তত্ত্ব সব এই গল্পটির মধ্যে রয়েছে। এ ছাড়া প্রথম পুরুষ, মধ্যম পুরুষ, উত্তম পুরুষ, বহিঃপ্রকৃতি, অন্তঃপ্রকৃতি, কেন্দ্রপ্রকৃতি, নির্গুণ-সগুণ ও নির্গুণগুণীর সব মহিমা এই গল্পটির মধ্যে দেওয়া আছে। গল্পের কোন জায়গায় এই তত্ত্বগুলি যুক্ত আছে তা এক একদিন এক এক পর্যায়ে আলোচনা হলে বোঝার পক্ষে সুবিধা হবে।

এই মহাসাধক সাধারণ হয়ে অসাধারণ আবার অসাধারণ হয়েও সাধারণ। যাঁকে কেউ জানে না, এমনকী সে নিজেও জানে না, কারণ তার জানবার প্রয়োজন নেই। দেবতারা কোথা থেকে এলেন, এর সঙ্গে তাঁদের সম্বন্ধ কী? মনের কোন স্তরে থাকলে কর্ম করেও কর্মফল না-নিয়ে থাকা যায়? গল্পটির উদ্দেশ্য কী? বিরাট বস্তুকে ধরে রাখার জন্য একটি পদ্ধতি সর্বদা প্রয়োজন হয়। কোনও কিছু ধারণ করার জন্য ধারণশক্তির ব্যবহারের দ্বারা আধার সৃষ্টি হয়। আধার মানে আনন্দকে ধারণ করার

জন্য যা সৃষ্টি হয়। আধারের দু'টি অংশ আছে। এক দিকে নিজেকে নিজে ব্যবহার করে অর্থাৎ খাদ্যরূপে ব্যবহার করে এবং আরেক দিকে খাদ্য দিয়ে খাদককে ধারণ করে বা প্রাণ বাঁচায়। অর্থাৎ প্রাণ এক দিকে খাদ্য এবং অন্য দিকে খাদক, স্রষ্টা-সৃষ্টি বা জ্ঞাতা-জ্ঞেয়। জ্ঞেয় থাকলে জ্ঞাতা থাকে। পরমাত্মার জ্ঞেয় নেই কারণ তাঁর নিজেকে জানার দরকার নেই। যেখানে প্রয়োজন থাকে সেখানে দ্বৈত বা বিকল্প অবস্থা থাকে। সন্দেহ আসলেই জ্ঞানের ক্রিয়া আরম্ভ হয়।

নির্বিকল্প সমাধি ও নিত্যলীলা সমাধি এক পর্যায়ভুক্ত। নির্বিকল্পের অর্থ জড় নয়। ভগবান স্বয়ং এই সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত থেকে বাইরে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেন ও অন্তরে নির্বিকার থাকেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানযোগের সমাধিতে প্রতিষ্ঠিত হলেই এই অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যান্য সমাধিতে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সঙ্গে যুক্ত হওয়া যায়। যেখানে ঈশ্বর স্বয়ং সমাধি সেখানে কোনও শর্ত থাকতে পারে না। সেখানে ভগবানের সব রূপ-নাম-ভাব-বোধ একার্থবোধক।

অনুভূতি কার? জীব যদি বলে আমার তাহলে পূর্ণানুভূতি হতে পারে না। 'অনুভূতি' শব্দের সামনে অণু কথাটি রাখা হয়েছে। 'অনুভব' মানে আগে অণু হও। অণু হলে সব কিছুর মধ্যে মিশে থাকা যায়। মানা ছাড়া অণু হওয়া যায় না। জানলে অণু হওয়া যায় না। যদিও মনের স্বভাব হল জানতে চাওয়া। জানা মানে এখন যা আছে তা নয়, পরিণামে যা আছে তা-ই। খণ্ডের পরিণাম হল অখণ্ড, অপূর্ণতার পরিণাম পূর্ণতা এবং অজ্ঞানের পরিণাম জ্ঞান।

'মা' মায়া হয় খণ্ড হলে। খণ্ড হলে গতির বা বিকারের আগমন হয়। মা খণ্ড হয় মায়ারূপে। 'য়' = গতি। যার সঙ্গে 'য়' যুক্ত হয় সে ঠিক থাকে। যা আসে-যায় তা-ই গতি।

গল্পের সেই ব্যক্তি সাধনার পূর্বে ও পরে একই অবস্থায় আছে। তার মধ্যে সাধনা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে হয়েছিল। সেইজন্য সে নিত্যসিদ্ধ। মহাযোগে কর্ম আপনা থেকেই হয়।

৯। ৭। ৭৪

২২৪

তাঁকে মানলে রাজার রাজা হওয়া যায়। আমেরিকার President হোক আর কোটিপতি হোক সবারই tension থাকে। মানলে tension দূর হয়ে complete expansion হয়। যেখানে 'আমার' নেই সেখান থেকে আরম্ভ হয় 'তোমার'।

'আমার নেই বললেই হয় পূর্ণ
আমার আছে বললে হয় চূর্ণবিচূর্ণ।'

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক মহাত্মা হরি নাম করে বেড়াতেন। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে তিনবার 'হরি নারায়ণ' নাম উচ্চারণ করতেন। সেই সময় কেউ কিছু দিলে ভাল নইলে সেখান থেকে চলে

যেতেন। একজন ধনী গৃহস্থ খুব কৃপণ ছিলেন। তার বাড়িতে 'হরি নারায়ণ' বলে দাঁড়াতেই সেই বাড়ির দারোয়ান কিছু তো দিলই না উপরন্তু খুব গালাগাল করল। কিন্তু মহাত্মা নীরবে সব শুনে গেলেন, কোনও প্রতিবাদ করলেন না। দূরে দাঁড়িয়ে মালিকের সেক্রেটারি এই দৃশ্য দেখল। সাধুর এই আচরণে সে ভাবল, এই সাধু কোনও সাধারণ সাধু নন, নিশ্চয়ই উচ্চ স্তরের সাধু। এঁর কাছে শক্তিবিভূতি পাওয়া যেতে পারে। এই মনে করে সে তাড়াতাড়ি সাধুকে একটি পয়সা ভিক্ষা দিল। সাধু বললেন—পয়সা দিচ্ছ? আমার পয়সা লাগবে না, তুমিই নাও। এই বলে তিনি পয়সা ফেরত দিয়ে দিলেন।

সেক্রেটারি ভাবল, সাধু এক পয়সায় সন্তুষ্ট নন, বোধহয় আরও চান। এই ভেবে সাধুকে দু'টি পয়সা দিল। সাধু সেই পয়সাও তাকে ফিরিয়ে দিল। সেক্রেটারি তখন তিন পয়সা, চার পয়সা করে বাড়িয়ে বারবার তার কাছে পাঠাতে লাগল। কিন্তু প্রতিবারই সাধু পয়সা ফেরত পাঠালেন। সেক্রেটারি তখন এক আনা, দুই আনা করে ষোলো আনা দেওয়ার পরে সাধুকে বলল—আমার তো আর নেই, তোমাকে কী দেব? এতেই তুমি সন্তুষ্ট হও। সাধু তখন তাকে একটি ফুল দিয়ে বললেন—এর কাছে তুমি যা চাইবে তা-ই পূরণ হবে।

সেক্রেটারি ফুল পেয়ে ভাবল, এর চেয়েও শক্তিশালী জিনিস হয়ত সাধুর কাছে আছে। এত অপমানের পরেও সাধুর অবিচলিত আচরণে সে বুঝেছে তাঁর অনেক ক্ষমতা আছে। সেই জন্য তাঁকে ফুলটি ফিবিয়ে দিয়ে বলল—তোমার কাছেই ফুলটি রাখ, আমি তো ব্যবহার জানি না। তখন সাধু ফুলটি ফেরত নিয়ে নিলেন।

সেক্রেটারি তখন তার মালিকের কাছে গিয়ে বলল—আপনার কত ধনসম্পদ আছে আমি জানি এবং আমি যে কত নিয়েছি তা আপনি টের পাননি। আপনার দ্বারে আজ যে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে এসেছে সেই সাধুকে আপনি ফিরিয়ে দেবেন না। আজ আমি তাকে সব দিয়ে মুক্ত হয়েছি। মালিক সেক্রেটারির কথায় কেমন যেন হয়ে গেলেন। পূর্ণের সান্নিধ্যে এলে পূর্ণের প্রভাব পড়ে। মালিক অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধুকে একটি প্রণাম করলেন। কোনও দিন তিনি মাথা নত করেননি। প্রণাম করতে গিয়ে অনভ্যাসের জন্য মাথা মাটিতে বেকায়দায় পড়ে ফেটে গেল এবং রক্ত পড়তে লাগল। সাধু ছুটে এসে ক্ষতস্থান বেঁধে তার শুশ্রূষা করলেন। মালিক সাধুকে বিনিময়ে কিছু দিতে চাইলে সাধু বলল যে, তাঁর কিছুই লাগবে না। তাঁকে যা দিতে চান তা দিয়ে যেন হরি নারায়ণের সেবা করেন। সাধুর কথা মালিকের মনঃপূত হল না। তিনি বললেন—আমি এত কষ্ট করে রোজগার করেছি, হরি নারায়ণকে দেব কেন?

সাধু বললেন—তুমি কার সাহায্যে রোজগার করেছ? মালিক বলল—আমি করেছি। সাধু আর কোনও কথা না-বলে চলে গেলেন।

পরের দিন কৃপণ মালিকের বাড়িতে ডাকাত এসে তার সর্বস্ব লুট করে নিয়ে চলে গেল। তাকে একেবারে সর্বস্বান্ত করে পথের ভিখারি করে দিয়ে গেল। মালিক বুঝলেন, সাধুকে ঐ ভাবে ফিরিয়ে দেওয়াতেই তার এই দুর্গতি হল। তিনি

সেক্রেটারির কাছে গিয়ে বললেন—আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি, তুমি সেই সাধুর কাছে আমাকে নিয়ে চল। সেক্রেটারি বলল—উনি অনেক দূরে চলে গিয়েছেন, তাঁকে কোথায় খুঁজব? সে কাজ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। মালিক বললেন—আমি যখন নিঃস্ব, তুমিও নিঃস্ব। তোমার চলবে কী করে? সেক্রেটারি বলল—আমার কিছু নেই। তাই চলবে কি চলবে না তা আমার দেখার দরকার নেই।

কতখানি পরিবর্তন হলে 'আমারভাব' চলে যায়! সেক্রেটারির জীবনেও ঠিক এতখানি পরিবর্তন হয়েছিল সাধুর সংস্পর্শে। যেখানে 'আমার' নেই সেখান থেকে আরম্ভ হয় 'তোমার'।

'আমার নেই বললেই হয় পূর্ণ
আমার আছে বললে হয় চূর্ণবিচূর্ণ।'

মালিক তখন নিজেই সাধুর সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। তারপর যখন সাধুর সঙ্গে তার দেখা হল তখন নিজের দুরবস্থার কথা তাঁকে সব জানালেন। সাধু শুনে বললেন—তোমার সম্পত্তি হলে ওরা নিল কী করে? হরি নারায়ণকে সেবা করলে না, কিন্তু ডাকু নারায়ণ এসে সব কেড়ে নিয়ে গেল। মালিক সাধুর কাছে খুব কান্নাকাটি করে বললেন—আমার তো এখন কিছু নেই, তোমাকে কী দেব? সাধু তাকে বার বার জিজ্ঞাসা করলেন—সত্যি কথা বলছ, তোমার কিছু নেই? তিনি সাধুকে বার বার জানালেন যে, তার কিছুই নেই। তখন সাধু জিজ্ঞাসা করলেন—ঠিক আছে, কী চাই বল? তোমার যা টাকা ছিল তা ফেরত চাও না অন্য কিছু চাও? মালিক বুঝে উঠতে পারলেন না কোনটা চাইলে তার লাভ হবে। কোনও কিছু স্থির করতে না-পেরে তিনি সাধুকেই জিজ্ঞাসা করলেন—আমি যদি টাকা চাই তাহলে কী হবে আর যদি 'হরি নারায়ণ' বলি তাহলেই বা কী হবে? সাধু বললেন—টাকা চাইলে আবার ডাকু ধরবে আর হরি নারায়ণকে চাইলে আমার মতো দুরবস্থা হবে।

মালিক কী চাইবে বুঝতে পারছেন না দেখে সাধু মাঝামাঝি একটি বিধান দিলেন। তাকে আরেক সাধুর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর সেই সাধুর কাছে গিয়ে তিনি নিজেকে তৈরি করতে লাগলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মহামন্ত্র সবার ভিতরেই আছে। কেউ ছোট নয়, কেউ ভিখারি নয়। সবাই পূর্ণের অধিকারী। মল তৈরি করতে ভাল লাগে তাই সবাই একসময় মজা লোটে। মল কাটাতে গেলে আছাড় খেতে হয়। ধোপারা যেমন আছাড় মেরে কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করে, সেই রকম জীবনেও দুঃখকষ্টরূপ আছাড় আসে।

৩০। ৯। ৭৪

দ্বিতীয় অধ্যায়

২২৫

বোধ ছাড়া সুখ, দুঃখ, অভাব, অভিযোগ বোঝা সম্ভবপর নয়। বোধকে বাদ দিয়ে জীবনে এক পা-ও চলা যায় না। আর বোধের তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা না-করলে কয়েকজন্ম মহাপুরুষদের সঙ্গে কাটিয়ে দিলেও কোনও লাভ হয় না।

এ রকম একটি ঘটনা আছে যে, কয়েকজন্ম মহাপুরুষের সঙ্গে থেকেও একজনের কোনও পরিবর্তন হল না। তখন তাকে মহাপুরুষের বংশে পাঠিয়ে দেওয়া হল। তাতেও তার বোধের তত্ত্বের প্রতি আগ্রহ জাগল না। মহাপুরুষের বংশে জন্ম, এই গর্বেই সে তার জীবন কাটিয়ে দিল। সে নিজে থেকে কোনও চেষ্টা করতে রাজি নয়। ভগবান ভাবলেন, একে এমনভাবে বোধের রাজ্যে টেনে নিয়ে যেতে হবে, যাতে সে কলুর বলদের মতো ঘোরে!

এদিকে সেই ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে যা-কিছু ভোগের আয়োজন করে সব বিফল হয়ে যায়। এই দুর্ভোগ ও ব্যর্থতার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সে অনেক সাধু-সন্ন্যাসীর শরণাপন্ন হল, কিন্তু তাঁরা কেউই এর কারণ নির্ণয় করতে পারলেন না। তখন সে হতাশ হয়ে একজন মহাত্মার কাছে আত্মসমর্পণ করল। সে মহাত্মাকে বলল—বাবা, তুমি যা করতে বলবে আমি তা-ই করতে রাজি আছি। আমাকে একটু রেহাই দাও। মহাত্মা বললেন—যা করতে বলব তা-ই করবে? আচ্ছা, এক জন্ম তোমাকে ময়লা মাথায় করে নিয়ে ফেলতে হবে। সে এই কথা শুনে আঁতকে উঠে বলল—সেকি ! এ ছাড়া কী আর কোনও উপায় নেই? মহাত্মা বললেন—বেশ, ময়লা মাথায় করে নিতে হবে না, ময়লার গাড়ি টানতে হবে। সে তাতেও রাজি হল না। মহাত্মা চিন্তান্বিত হলেন। তখন তিনি তাকে বললেন—তাহলে কী আর করবে বল? বলদ হয়ে এক জন্ম জমি চাষ কর। সে বলল—ওতে আরও কষ্ট। রোদে, জলে, ঝড়ে, খোলা মাঠে পড়ে থাকা, এ সব আমি পারব না। মহাত্মা বললেন—তাহলে মুটেগিরি কর। তার সে কাজেও আপত্তি। সে বলল—মুটেরা দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না, তাদের বড় কষ্ট। মহাত্মা দেখলেন এর ভিতরে জন্ম জন্মান্তরের ভোগের বীজ রয়েছে। তখন তিনি তাকে রাজবাড়িতে রাজপরিবারে পাঠিয়ে দিলেন। রাজবাড়িতে চার দিকে প্রচুর ভোগ্য দ্রব্য এবং তার মনে ভর্তি সাধ। কিন্তু বিকল ইন্দ্রিয়ের জন্য সে কিছুই ভোগ করতে পারছে না। ভোগবিলাসের মধ্যে থেকে, ভিতরে ভোগেচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভোগ করতে না-পারার যে কী যন্ত্রণা তা একমাত্র ভুক্তভোগীই জানে। রাজা সাধু ও গনৎকার ডাকিয়ে এর কারণ জানতে চাইলেন। এক সাধু রাজাকে বললেন—এ তো তবু এখানে ভাল ভাবে আছে, এর অতীত

জন্মের কর্মফলের তালিকা দেখলে ভয় করে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—এগুলি খণ্ডন করার উপায় কী? সাধু বললেন—একমাত্র উপায় হল কর্ম করে কর্মফলের দুর্ভোগ খণ্ডন করা। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করল—আর কোনও উপায় নেই? সাধু বললেন—কর্ম না-করলে জ্ঞানবিচার করতে হবে। এই বলে জ্ঞানযোগের সাধনপদ্ধতি বলে দিলেন। জ্ঞানবিচারের পদ্ধতি শুনে সে বলল—এ তো দেখছি আরও কঠিন। তখন হতাশায় ও ক্ষোভে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সাধু বললেন—এ তোমার এক জন্মের কর্মফল নয়, জন্ম জন্মান্তরের কুকীর্তির ফলে এই দুর্ভোগ। তোমাকে অতটা পথ ফিরে গিয়ে সব খণ্ডন করতে হবে। তখন বিবর্তনবাদের তত্ত্ব অর্থাৎ কী করে নিম্ন জন্ম থেকে ধাপে ধাপে মনুষ্যজন্ম, তারপর তদূর্ধ্বে ওঠে তা বুঝিয়ে দিলেন। সে তখন দুঃখে, বেদনায় কাঁদতে আরম্ভ করল। 'হা ভগবান, হা ভগবান!' বলে সে কাঁদতে লাগল আর তার একটি একটি করে ইন্দ্রিয় গলতে লাগল। এই ভাবে যখন তার সব ইন্দ্রিয় গলে গেল, শুধু প্রাণটা তখনও চলতে লাগল।

এদিকে পাহাড়ের এক গুম্ফাতে সাধনার বলে সর্ব জীবদেহের সঙ্গে এক সাধকের একাত্মবোধ জেগেছিল। সেই ব্যক্তির ব্যাকুল আর্তনাদে তিনি কাতর হয়ে পড়লেন। তার প্রতি সমবেদনায় তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল 'আহা!' ধ্বনি। যেই না বলা 'আহা!' অমনি তার মাথায় একটি পাথর এসে পড়ল। পাথরের আঘাতে তার মাথা ফেটে গেল। তিনি খুব ব্যথা পেলেন। সেই ব্যক্তির অত জন্মের বেদনার কিঞ্চিন্মাত্র সেই সাধু গ্রহণ করলেন।

এর রহস্য হল মানুষের দুঃখের বোঝা সাধুসন্ন্যাসীর বেশে ভগবানই গ্রহণ করে লাঘব করেন। মানুষের ধর্ম হল দুঃখকে সরিয়ে সুখকে গ্রহণ করা।

তার এই 'হা ভগবান, হা ভগবান!' কান্না শুনে আরেকজন সাধকের মন দ্রবীভূত হল। তিনিও তার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—ভগবান একে কৃপা কর। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায়ও একটি গাছের ডাল ভেঙে পড়ল এবং মাথা ফেটে রক্তপাত হতে লাগল। তিনিও এই ভাবে তার দুঃখের কিছু অংশ গ্রহণ করলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই সকল কর্মরহস্য শুনলে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে যাবে। তারা সাধুসন্ন্যাসীর দুঃখকষ্টের রহস্য না-জেনে ভুল বিচার করে। বহু বছর আগে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মুখ দিয়ে একটি কথা বেরিয়েছিল—

'মানুষ নেবার বেলায় বলে আপন
দেবার বেলায় করে ছল।
দেবতারা দেবার বেলায় বলে আপন
নেবার বেলায় করে ছল।'

কর্মফল থেকে কারও রেহাই নেই, এমনকী সাধুসন্ন্যাসীদেরও মুক্তি নেই। তাঁরা যেই সমবেদনা জানালেন অমনি তাঁদেরও দুর্ভোগের বোঝা বইতে হল। ভগবান নিজে দুঃখকষ্ট ভোগ করার জন্য একদল সাধুসন্ন্যাসী বানিয়ে রাখেন। তাঁদের মাধ্যমে

তিনিই স্বয়ং তা ভোগ করেন। অথচ বর্তমান সমাজে সাধুসন্ন্যাসীরাই সবচেয়ে বেশি অবহেলিত ও উৎপীড়িত। তাঁরা মৌখিক প্রশংসা, নিন্দা, মান, অপমানকে শত হস্ত দূরে রাখেন। মহাপুরুষ, অবতারপুরুষদের বাণী ও আচরণ অনুসরণ করতে না-পেরে পরবর্তী যুগে কিছু লোক সেগুলিকে সাধারণ মানুষের কাছে বিকৃত করে বা আপন খুশি মতো ব্যাখ্যা করে।

মানুষ যে রকম জীবন নিয়ে আসুক তা আগুন নিয়ে খেলা বই আর কিছু নয়। দুই দিক দিয়ে সে পোড়ায়। আত্মজ্ঞান পেলে আত্মজ্ঞান দিয়ে বাকি সব পোড়ায়। আর না-পেলে স্থূল জগতের দুঃখকষ্টের জ্বালায পুড়ে মরে।

২৭। ১০। ৭৪

২২৬

ছোট একটি তত্ত্বকে সুবোধ্য করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প শোনালেন।

এক নগরে এক অন্ধ বহুদিন যাবৎ বাস করে। অন্ধের কষ্ট আর দুর্ভোগের সীমা নেই। তাই নগরের থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে। নগরের চার দিক উচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাইরে যাবার রাস্তা সে একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু অন্ধের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। একজন অন্ধকে বলল—একটি উপায় আছে। এই নগরেব প্রাচীর ধরে ধরে এগিয়ে যাও, একসময় দরজা পাবে। অন্ধ তার কথা মতো প্রাচীর ধরে ধরে এগিয়ে যেতে লাগল। দ্বারের কাছে আসলেই তার গায়ে চুলকানি আরম্ভ হয়। দেওয়াল ছেড়ে সে তখন গা চুলকায়। দ্বার পার হয়ে গেলে চুলকানি বন্ধ হয়। সুতরাং দ্বারের সন্ধান আর সে পায় না। বহু চেষ্টা করেও নগরের বাইরে সে আর আসতে পারে না।

গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হল, অন্ধ এখানে অজ্ঞানী মানুষ। যারা বিষয়বোধ বা 'আমারবোধ' নিয়ে কর্তা সেজে সংসারে বাস করে তারাই অন্ধ। বাহ্যিক জ্ঞান থাকলেও তা কাজে লাগে না। দেওয়াল হল চুরাশি লক্ষ যোনি। গায়ের চুলকানি হল প্রারব্ধ সংস্কার ও কর্মফল, অর্থাৎ কাম, কাঞ্চন, বিষয়াসক্তি ও মোহ, অজ্ঞান। মনুষ্যজীবন হল দ্বার। এই দ্বার দিয়ে নগরের বাইরে যেতে হয় অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হতে হয়। গুরু হলেন মুক্তিপথের নির্দেশক। ভগবৎ নাম হল মুক্তির উপায়। সেই জন্য দেবতারাও মনুষ্যজীবন লাভের জন্য প্রার্থনা করেন। মনুষ্যজীবন পেয়ে সত্যসাধনা না-করলে পশু ভাবে জীবন কাটে।

২৯। ১০। ৭৪

২২৭

মনকে কামনার রাজ্য থেকে সরিয়ে নেবার জন্য গুরুর সাহায্যের একান্ত প্রয়োজন হয়। সদ্‌গুরুর বা নিত্যসারথির বক্ষ থেকে একচুলও কেউ সরাতে পারে না—এই বিশ্বাস যার থাকে সে সহজেই সন্দেহমুক্ত হয়।

বোধ এত সূক্ষ্ম জিনিস যে, তার প্রকাশ ছাড়া তাকে ধরা যায় না। এক যোগী নিজের ভিতরে বোধকে দেখবার জন্য চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু দেখল যে, ভিতরে

নাড়িভুঁড়ি ও মল আছে। মল কমাবার জন্য সে খাওয়া বন্ধ করল। ফলে তার শরীর ক্রমশ দুর্বল হতে থাকে। তখন সে তার গুরুকে সব কথা খুলে বলল।

গুরু বললেন—ভিতরে নাড়িভুঁড়ি ও মলই শুধু দেখতে পেলি, আর কিছু দেখলি না? যা দিয়ে অর্থাৎ যার সাহায্যে দেখলি তাকে দেখ।

যোগী—কী করে দেখব?

গুরু—যা দিয়ে এ সব তুই দেখলি তাকে দুই ভাগে ভাগ করে এক ভাগে নিজে থেকে আরেক ভাগকে দেখ।

যোগী সেই ভাবেও দেখতে চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না। গুরু তাকে আবার চেষ্টা করতে বললেন।

যোগী এবার কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তারপর বলল—সব অন্ধকার দেখছি।

গুরু—যা দিয়ে অন্ধকার দেখছিস সেটা তো আলো। সেই আলোকে ভাগ কর।

এই ভাবে গুরু তার মনকে দ্বৈতবোধে নিয়ে এলেন। তার পরে জিজ্ঞাসা করলেন—কী দেখছিস?

যোগী—নানারকম জ্যোতি এবং আলো দেখছি।

গুরু—আবার চেষ্টা কর। কিছুক্ষণ পর তিনি শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—এবার কী দেখছিস?

যোগী তার অনুভূতির কথা কিছুটা বলে চুপ করে গেল।

গুরু—ঠিক আছে, চলতে থাকুক।

তারপর যোগী আর কোনও কথা বলতে পারল না। যেখানে বলা-কওয়া বন্ধ হয়ে যায় সেখানেই হল পরমাত্মার আবাস।

এবার একটি গল্প শোন।

কোনও এক মহাত্মা এক-এ কী রকম প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তা পরীক্ষা করার জন্য কয়েকজন দুষ্টু লোক ষড়যন্ত্র করে এক যুবতী নারীকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিল: সাধনার অনেক উচ্চ স্তরে উঠলেও নারীর পুরুষের প্রতি এবং পুরুষের নারীর প্রতি দুর্বলতা থাকে।

সাধক সেই নারীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—মা, তোমার কী চাই? তিনি মাতৃবোধেই মেয়েটিকে গ্রহণ করলেন।

মেয়েটি উত্তরে বলল—তোমার ঐ সুন্দর দেহটিই আমার প্রয়োজন, আর কিছুই চাই না।

মহাত্মা বললেন—এতদিন তুমি কোথায় ছিলে? আজ তোমার এই দেহটির প্রয়োজন হল! আর এই দেহটি নিয়েই বা তুমি কী করবে?

নারী—আমার ভোগে লাগবে তোমার এই দেহ।

মহাত্মা—বেশ, তাহলে তুমি একটু অপেক্ষা কর। আমার কয়েকটি কাজ বাকি আছে। সেগুলি আমি আগে সেরে ফেলি। এই বলে তিনি আসনে সমাধিস্থ হয়ে বসে রইলেন। দেহ ছেড়ে তাঁর মন কোথায় চলে গেল, শুধু দেহ পড়ে রইল জড়বৎ।

মেয়েটি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর মহাত্মার দেহ স্পর্শ করে দেখে যে, তাঁর দেহ বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে। তার কামনায় উত্তপ্ত শরীর মহাত্মার হিমশীতল দেহের সংস্পর্শে আসামাত্র ছ্যাঁৎ করে উঠল। সে ভাবল, মহাত্মা তো জীবিত নেই তাহলে এঁকে নিয়ে আমি এখন কী করব! এই সব ভেবে সে যখন সেখান থেকে চলে আসছিল সেই সময় দেখে এক বিরাট সাপ ফণা তুলে ছোবল দেবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে আছে। সে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু সাপ একটুও নড়ল না। যারা মেয়েটিকে এই কাজে নিযুক্ত করেছিল তারা সাপ দেখে ভয়ে পালিয়ে গেল। সে তখন কী করবে বুঝতে না-পেরে এই সংকটকালে মহাত্মার কাছেই ফিরে এল এবং তার চরণে এসে লুটিয়ে পড়ল। সে মহাপুরুষকে বলল—বাবা, আমাকে বাঁচাও।

মহাত্মার যখন সমাধিভঙ্গ হল তিনি দেখলেন মেয়েটি মাটিতে পড়ে আছে আর সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। মহাত্মা সাপকে বললেন—তুমি আবার এলে কেন? সাপ বলল—আমার আসার কারণ ছিল। সাপটি তারপর চলে গেল। মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পেয়ে মহাত্মার কাছে তার জঘন্য কাজের জন্য ক্ষমা চেয়ে বলল—আমার কী উপায় হবে? আপনি আমাকে উদ্ধার করুন! আমার ভিতরটা পাপের ময়লায় ভর্তি। মহাত্মা—হ্যাঁ পারি। সব ময়লা আগে দেশলাই কাঠি দিয়ে জ্বালিয়ে দাও।

মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল—জ্বালিয়ে দিলে তো আমি মরে যাব। আমার দরকার নেই পরিষ্কার হবার, আমি চলি।

মহাত্মা বললেন—যেখানে ফিরে যাচ্ছ সেখানে তারা আরও বড় আগুন জ্বালিয়েছে তোমার সর্বনাশ করার জন্য। এর চাইতে আরও বড় আগুন জ্বালালে ঐ আগুন নিভে যাবে।

মেয়েটি কী করবে বুঝতে পারছে না। আবার এখানকার নির্দেশও তার মনঃপূত হচ্ছে না।

মহাত্মা বললেন—আচ্ছা, তুমি যখন বাবা বলে আমাকে ডেকেছ তখন তুমি আমার কন্যা হলে। এসেছিলে ভোগ করতে, তার পরে বাবা বলে ডেকেছ। সুতরাং তোমার ভার আমি নিলাম। তারপর মহাত্মা মেয়েটিকে আদেশ করলেন—যাও, ঐ কুণ্ড থেকে স্নান করে এসে এখানে বস।

মেয়েটি তাঁর নির্দেশ মতো স্নান করে এসে যথাস্থানে বসল। তার পরে তাকে তুলসীপাতা ও জল খেতে দিয়ে মহাত্মা বললেন—এই আসনে বসে আমি যা বলব তা ভাবতে আরম্ভ কর। যতক্ষণ না তোমার সামনে খাবার রেখে দেওয়া হয় ততক্ষণ এই আসন ছেড়ে তুমি উঠতে পারবে না। তিনি মেয়েটিকে একটি নাম দিলেন। নাম পেয়ে সে ভাবতে আরম্ভ করল। ধীরে ধীরে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সেদিন সন্ধে পার হয়ে রাত হয়ে গেল। পরদিন দুপুরে সে দেখল তার সামনে তিনটি ফল রাখা আছে। কিন্তু মহাত্মা সেখানে নেই, শুধু ধুনি জ্বলছে। সে আসন ছেড়ে উঠতে পারল না। সমস্ত শরীর অবশ হয়ে গিয়েছে তার।

সে একটি ফল খেয়ে ফেলল। আরেকটি ফল খাবার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম ভাঙতেই তার মনে পড়ল মহাত্মা তাকে বিশেষ নির্দেশ অনুযায়ী ভাবনা করতে বলে গিয়েছেন। সে আবার মহাত্মার দেওয়া নাম ভাবনা করতে লাগল। এই ভাবে তিন দিন তিন রাত পার হয়ে গেল। দেহের সব অংশ তার অসাড় হয়ে গিয়েছে, সে আর উঠতে পারছিল না। তখন মেয়েটি তৃতীয় ফলটি খেল। তার পরে সে দেখতে পেল মহাত্মা তাকে যে নামটি দিয়েছিলেন, সেই নামটি যেন চার দিক থেকে ভেসে আসছে এবং চতুর্দিক দিব্য জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছে। এই ভাবে সাত দিন পার হয়ে গেল। সাত দিন পর চোখ মেলে সে দেখতে পায় তার সামনে গুরু বসে আছেন। গুরু তার দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

গুরু তাকে বললেন—কী ভোগ করতে এসে কী ভোগ করছ!

মেয়েটি আর কোনও কথা বলতে পারল না, চুপ করে রইল। তার চোখ বেয়ে শুধু জল পড়তে লাগল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সেই নারী জীবনে চরম অধোগতিতে বা দুর্গতিতে পড়েছিল। তখন তাকে ঐ ভাবে নাম না দিলে মহাত্মা উদ্ধার করতে পারতেন না। এক ফোঁটা জল পেলে চাতক পাখির যে অবস্থা হয়, সেই রকম এক ফোঁটা জলের জন্য হাহাকার করার মতো ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা এলে তবেই নাম পেলে কাজ হয়।

১০। ১১। ৭৪

২২৮

যে জানতে চায় তাকে নিষেধ করা হবে না। জানতে কে না-চায়! কিন্তু জানার পরিণতি লাভ হয় মানার মাধ্যমে। দেহের বিকার থেকে মুক্ত হওয়া খুব কঠিন। দেহের বিকারে মহাজ্ঞানী, মহাযোগীও অসহায় বোধ করেন। তাঁর সামনে তাঁরই সৃষ্ট বস্তু ধ্বংস হয়ে যায়। বশিষ্ঠদেবের জীবনে এর সর্বোত্তম উপমা পাওয়া যায়।

সর্বসাধনার পরিসমাপ্তি যাঁর মধ্যে হয়েছে, অর্থাৎ যিনি অতিমানব, তাঁর সামনে তাঁর একশো পুত্রকে বিশ্বামিত্র যখন বিনাশ করলেন তিনি শুধু তাকিয়ে রইলেন, কোনও প্রতিবাদ করলেন না। তাঁর কামধেনুকে যখন ছিনিয়ে নিতে এল তখনও তিনি নিষ্ক্রিয় ও নীরব রইলেন। তাকে ছাড়াবার কোনও চেষ্টাই করলেন না। তখন কামধেনু তাঁকে বলল—আমি তোমার কন্যা, তুমি আমাকে রক্ষা করবে না? উত্তরে তিনি বললেন—সত্যি যদি তুমি বশিষ্ঠের কন্যা হয়ে থাক তবে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা তোমার আছে। কামধেনু তখন বলল—আমি যদি বশিষ্ঠের কন্যা হয়ে থাকি তবে আমার ইষ্ট আমার বশে আছেন। তখন সে আত্মশক্তির জোরে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হল।

বিশ্বামিত্রের ছিল রজঃশক্তি, সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা ছিল না। ফলে রজঃশক্তি দিয়ে সাধনা করে তিনি রজোপ্রধান সত্ত্বগুণ লাভ করেন।

বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের ঘটনাবলীর এই দৃশ্য যদি কারও দর্শন হয় তাহলে সত্তার স্থির বক্ষে শক্তি যে নিরন্তর খেলে যাচ্ছে তা সে অনুভব করতে পারবে। বশিষ্ঠদেব হলেন সত্তা। তিনি স্থির না-থাকলে রজঃশক্তি কার বক্ষে খেলবে? বিশ্বামিত্র একে একে তাঁর সকল পুত্রকে বিনাশ করলেন, কিন্তু তবুও বশিষ্ঠদেবের চিত্তকে বিব্রত করতে পারলেন না। পত্নী অরুন্ধতী শুধু একবার বললেন—তুমি দেখেছ? বশিষ্ঠদেব কোনও উত্তর না-দিয়ে শুধু একবার তাঁর দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে রইলেন। অরুন্ধতী ভাবলেন, আমি কাকে কী দেখতে বললাম, সর্বত্র যাঁর চোখ তিনি আবার কী দেখবেন! বশিষ্ঠের পাশে তিনিও স্থির হয়ে বসে রইলেন।

জনৈক ভক্ত বলল—Climax হল পুত্রহত্যার পর।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সে তো আছেই! মানুষ নিজেকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিতে পারে না, কিন্তু বশিষ্ঠদেব তা-ই করেছিলেন। ব্রহ্মজ্ঞপুরুষদের ইচ্ছামৃত্যু হয়। তাঁরা স্বেচ্ছায় নিজেদের মৃত্যুর হাতে তুলে না-দিলে মৃত্যু তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। মানুষ মৃত্যুর দ্বারে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করে কখন সে নিয়ে যাবে। আর ভক্ত ও ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের দ্বারে এসে মৃত্যুকে অপেক্ষা করতে হয়, যখন তাঁরা নিজেকে দেবেন তখনই মৃত্যু তাঁদের নিয়ে যেতে পারে, নতুবা নয়। সাধক ও ভক্তদের উপর মৃত্যু আধিপত্য বিস্তার করতে পারে না। শিবভক্ত, গুরুভক্ত, মাতৃভক্তদের নিতে হলে মৃত্যুকে শিবের কাছে, গুরুর কাছে বা মায়ের কাছে অনুমতি চাইতে হয়। যারা যথার্থ ভাবে নাম করে তাদের নামে ভগবান সব জমা রাখেন।

বিশ্বামিত্রের তপঃশক্তি ছিল প্রচুর যার বলে তিনি প্রায় ঈশ্বরের স্তরে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সামান্য একটু বাকি ছিল। চরম অহংকারের পরেই আসে ত্বংকার। বিশ্বামিত্র ঈশ্বরের আসন দখল করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দ্বৈতবোধে ব্রহ্মজ্ঞ হওয়া যায় না। বশিষ্ঠদেব অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন বলে তাঁর কাছে মৃত্যু-অমৃত উভয়ই সমান ছিল।

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের নিধনযজ্ঞ সবাই করতে পারে না। জ্ঞানী রাজি হন না। অজ্ঞানীদের মধ্যে অনেক দুষ্টু বুদ্ধির লোক থাকে, তারাই করতে পারে এই কাজ।

বিশ্বামিত্র যখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের কাছে গিয়ে ব্রাহ্মণত্ব পদ চাইলেন তাঁরা বললেন—আমরা তোমাকে ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব না। যদি কোনও ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ তোমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করেন তবেই তুমি ব্রাহ্মণত্ব পদে প্রতিষ্ঠিত হবে। বশিষ্ঠদেব তাঁকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করলেন না, কারণ তার অদ্বৈতবোধের অভাব ছিল। বিশ্বামিত্র তাঁকে অনেক অনুনয় বিনয় করে বললেন—তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করে নাও, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা থাকবে না। কিন্তু উত্তরে বশিষ্ঠদেব কিছু বললেন না। বিশ্বামিত্র তখন ভাবলেন, বশিষ্ঠদেবকে শেষ করে দিলে আমি ঐ পদ লাভ করব। আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কেউ থাকবে না। এই মনে করে তিনি ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের নিধনযজ্ঞ আরম্ভ করলেন এবং তার আগে বশিষ্ঠদেবকে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিলেন যে, তাঁকে এই যজ্ঞের হোতা হতে হবে।

বিশ্বামিত্রের তপঃশক্তি ও রজঃশক্তি পূর্ণ ছিল। কিন্তু তপঃশক্তি যে পূর্ণতা দিতে পারে না, বিশ্বামিত্রের জীবন হল তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যজ্ঞে বশিষ্ঠদেব একটি একটি করে আহুতি দিচ্ছেন আর বিশ্বামিত্র আনন্দ করছেন। কিন্তু এই আনন্দ সত্যিকারের আনন্দ নয়। যে দেয় সে আনন্দ করে আর যে পায় সে আনন্দ পায় না। যে পায় তার অভাববোধ থাকে। আর যার আছে সে-ই দিতে পারে। যার অভাব আছে সে দিতে পারে না।

পঞ্চম আহুতি দেবার সময় বিশ্বামিত্রের খেয়াল হল, এ তিনি কী করছেন, কাকে মারবার জন্য তিনি আয়োজন করছেন! মৃত্যুকে যিনি পরোয়া করেন না, একটি আহুতি দেবার পর আরেকটি দিলেই যাঁর সব শেষ হয়ে যাবে তিনি কী নির্লিপ্ত ও অবিচলিত ভাবে নিজের মৃত্যুযজ্ঞ নিজেই করে যাচ্ছেন! বিশ্বামিত্র তখন বললেন—আমি সত্যিই তোমার মৃত্যু চাই না, তুমি আমাকে স্বীকার করে নাও। বশিষ্ঠদেব কোনও উত্তর দিলেন না। যজ্ঞের লেলিহান শিখায় একে একে তিনি আহুতি দিতে লাগলেন।

এদিকে দেবদেবীরাও শঙ্কিত হয়ে গেলেন এই ভেবে যে, জগৎ কি তাহলে ব্রহ্মজ্ঞশূন্য হয়ে যাবে! কিন্তু তাঁদেরও বাধা দেবার কোনও ক্ষমতা ছিল না।

ষষ্ঠ আহুতি দেওয়া শেষ হলে বিশ্বামিত্র চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন—তুমি স্বীকার না-করলে আমি ব্রাহ্মণ হতে পারব না। বশিষ্ঠদেবের স্থিরতা দেখে তিনি ভাবলেন, যে পদের অধিকারী আমি নই, সেই পদ জোর করে নিতে চাইছি বলেই আমি বশিষ্ঠদেবকে জানতে পারছি না!

সপ্তম আহুতি দেবার সময় বিশ্বামিত্র বললেন—আমি ব্রাহ্মণ হতে চাই না। আমি অপরাধ করেছি, আমাকে ক্ষমা কর। আমার সর্বস্ব আজ তোমাকে সঁপে দিলাম। তোমার কৃপায় আমি নিজেকে পূর্ণ মনে করব। তখন বশিষ্ঠদেব সপ্তম আহুতি হাত থেকে ফেলে দিয়ে বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে সম্বোধন করে আলিঙ্গন করলেন। তিনি বললেন—আজ এই মুহূর্তে তুমি যথার্থ ব্রাহ্মণ হলে। সব সমর্পণ করে আজ তুমি এই পদ লাভ করলে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বিশ্বামিত্র এবং বশিষ্ঠদেবের মতো সাধক বর্তমান যুগে খুবই বিরল। প্রায় প্রত্যেক সাধকই একটুখানি সাধনা করেই ঈশ্বরের পদে বসতে চায়। কিন্তু ঈশ্বরের পদে তাকে বসাতে পারেন একমাত্র গুরু। তাই ঈশ্বর বলেন—গুরুর মাধ্যমে আমাকে পাবে।

১০। ১২। ৭৪

২২৯

আত্মবিজ্ঞান হল পূর্ণ ভাবে বোধি এবং বুদ্ধির বিজ্ঞান। শুধু নিত্য নয় বা শুধু লীলা নয়, নিত্যলীলার বিজ্ঞান—যেখানে সগুণ-নির্গুণ, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি প্রভৃতি সব তত্ত্বের তথ্য নিহিত আছে। এর ব্যবহারে ভোগ বা ত্যাগ কোনওটিরই প্রাধান্য দেওয়া হয় না। জীবনে যা আসে তাকে মেনে নিয়ে চলতে হয়!

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক যোগী এক স্থানে বসে নিজের চরণখানি উনুনে দিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে রোজ ভাত রান্না করেন। প্রতিদিন তাঁর এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করে কয়েকজন সাধক সেই যোগীকে জিজ্ঞাসা করল—আপনি উনুনে লকড়ি (কাঠ) না-দিয়ে রোজ এই ভাবে ভাত রান্না করেন, এটা আপনি কী করেন?

তাঁর এই আচরণ যে অপরের কৌতুহলের কারণ হতে পারে সে সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞাত ছিলেন। তিনি অবাক হয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করলেন—কেন আমি কী করি? ঠিকই তো করি। তারা বলল—উনুনে লকড়ি না-দিয়ে আপনি আপনার পা দেন কেন?

তিনি বললেন—কোনটা আমার নয় দেখাও।

তারা লকড়ি নিয়ে এসে দেখাতে গেল। কিন্তু একটু পরে তারা দেখল লকড়িটা তার পায়ে পরিণত হয়েছে। তখন তারা বুঝতে পারল যোগীর অসাধারণ মহিমা যা কোনও সাধারণ মানুষের ধারণায় আনা সম্ভব নয়।

তারা তখন হাত জোড় করে বলল—আমরা বুঝতে পারিনি। আমাদের অন্যায় হয়ে গিয়েছে। অপনি দয়া করে একটু বুঝিয়ে দিন।

তিনি উত্তরে বললেন—এ তো বুঝবার জিনিস নয়, এটাই সত্য।

তারা জিজ্ঞাসা করল—আপনি কী খান?

তিনি বললেন—আমি আমার এক অংশকে খাই।

তখন তারা বুঝল যে, এই হল আসল ব্রহ্মজ্ঞান। তারা যোগীকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কোন গুরুর চেলা? তিনি বললেন—আমি তোমাদেরই চেলা। তোমরা কারণ, আমি কার্য।

তারা বলল—আমাদের তো ঐ রকম হয় না।

তিনি বললেন—কারণে থাকলে হয় না। কারণ কার্য হলে কী হয় তার দৃষ্টান্ত তোমাদের সামনেই আছে।

তারা বলল—আমরা কবে কার্য হব?

তিনি বললেন—তোমরা যখন কারণের বক্ষ ছেড়ে যাবে তখনই কার্য হবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষ যাদের অস্পৃশ্য বলে ঘৃণা করে তারা যে কত মহৎ হয় মা 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) তা দেখিয়েছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এদের সম্বন্ধে যা বলেছেন তা হল—

"কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি
শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে
তুমি আছ গৃহবাসে তাই আছে রুচি
নইলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে।"

তাঁর এই অনুভূতির প্রকাশ তাঁর মহত্ত্বকেই ঘোষণা করছে। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুভূতির স্পর্শে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়েছিল, যার ফলে এই কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ চোখের জল সামলাতে পারেননি।

২। ২। ৭৫

২৩০

বেদে সত্য সম্বন্ধে বলেছে, সত্য এক, কিন্তু তার বিজ্ঞান বহু। কোনও দল প্রথম অংশকে মেনে নিয়ে সাধনা করে, আবার কোনও দল দ্বিতীয় অংশকে সমর্থন করে সাধনা করে। এই ভাবে এক সত্য দু'টি দলে ভাগ হয়ে যায়। কী ভাবে ভাগ হয় তার একটি ছোট উপমা শুনলে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে।

দুই ভাই পিতার আদর্শে বড় হয়ে উঠেছে। একই বাড়িতে তারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে থাকে। হঠাৎ তাদের মধ্যে মতভেদ হল। দু'জন দু'জনের কাছ থেকে সরে যেতে চাইল। তখন বাড়িঘর, জিনিসপত্র সব নিজেদের মধ্যে ভাগ করে ফেলল। এমনকী বাবার উপাধি ভট্টাচার্যকে ভাগ করে এক ভাই নিল ভট্ট এবং আরেক ভাই নিল আচার্য। পৃথক হয়ে গেলেও অন্তর থেকে সহজে পৃথক হওয়া যায় না। দুই ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে খেলাধুলা করে এবং একজন আরেকজনের বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করে। ছোট ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিল হয়, কিন্তু এর জন্য তারা বড়দের কাছে মার বা বকুনি খায়। এক বাড়ির একটি ছোট ছেলে একদিন রাগ করে বলেই ফেলল—আমাদের তোমরা বকুনি দাও আর বাবারা ছোটবেলায় এক থালায় বসে ভাত খেয়েছে। আমাদের বেলায় যত দোষ।

দুই ভাইয়ের কানেই কথাটি গেল। তাদের শৈশবের স্মৃতি জেগে উঠল। সত্যিই তো তারা একসময় এক থালায় বসে ভাত খেয়েছে।

ছোট ভাইয়ের ছেলের উপবীত হবে। যার কাছে এ বিষয়ে বিধান বা পরামর্শ চাইতে গেল তিনি তাদের বিবাদ মিটিয়ে ফেলার জন্য অনুরোধ জানালেন। তিনি বললেন—এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ভাইয়ে ভাইয়ে মিলে যাও। এক অংশ বাদ দিয়ে ভট্ট লিখতে হচ্ছে, ভাল লাগছে কি? বড় ভাইয়ের পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে সব মিটিয়ে ফেল। ছোট ভাই বলল—আমার লজ্জা করে। এ সব আমি পারব না। অন্য কোনও বিকল্প ব্যবস্থা করা যায় না? দুই ভাইয়ের মনেই ভাব করার ইচ্ছা জেগে উঠল। তিনি বললেন—হ্যাঁ আরেকটি কাজ করতে পার। বাড়িঘর ত্যাগ করে হিমালয়ে চলে যাও। ছোট ভাই বলল—শত জন্ম তপস্যা করেও এ সব আমার দ্বারা হবে না।

পরদিন ভগবানের কৃপায় ও দুই ভাইয়ের প্রবল ইচ্ছায় দু'জনের মিলন হয়ে গেল। উভয়ে উভয়কে কোলাকুলি করল। ভাইরা মিলে গেলে স্ত্রীরা বেশিক্ষণ ঝগড়া করতে পারে না। তারাও ভাব করে ফেলল।

সেই বাড়িতে 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) নিমন্ত্রণ ছিল। বাড়িতে কলহ-বিবাদ মিটিয়ে দুই ভাই একসঙ্গে উপবীত উপলক্ষ্যে কাজ করছে দেখে ভাল লাগল। তাদের বলা হল—এই হল আসল উপবীত। যে বস্তু সর্বগুণের আকর, তাকে নয় গুণের মধ্যে উপবীতের মাধ্যমে তার একটি লক্ষণ প্রকাশ করা হয়। নয়টি গুণ দিয়ে উপবীতের সুতো তৈরি করা হয়। গুণশূন্য হবে কেন? গুণশূন্য মানুষকে কেউ ভালবাসে না।

সেই সময় কোথাও কিছু গ্রহণ করা হত না। তাদের সে কথা বলা হল। তবে এখানে খাদ্যের পরিবর্তে আরও সুন্দর বস্তু গ্রহণ করা হয়েছে। সত্যকে পালন করলে যে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই আনন্দ পাওয়া গেল তোমাদের মিলনে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মন যেমন বিভেদ সৃষ্টি করে, তেমনই মনই আবার তা দূর করে মিলনের জন্য ব্যাকুল হয়। প্রয়োজন হয় মনের। আকৃতি-বিকৃতি, উপাদানসত্তার কোনও ক্ষতিই করতে পারে না। মাটির প্রতিমা গড়া ও ভাঙার আদি-মধ্য-অন্তে যেমন মাটিই থাকে, সেইরূপ জীবনের চৈতন্যস্বরূপ উপাদান নিত্য একই থাকে। তা অনুভূত হলে মন অ-মন বা চিৎস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

বৈচিত্র্যকে ব্যবহার করতে গিয়ে মনে আবরণ পড়ে। সেই আবরণ সরাবার জন্য শুদ্ধবোধের প্রয়োজন হয়।

৪। ৩। ৭৫

২৩১

গুরুভাবের বা গুরুবোধের সঙ্গে যখন শিষ্যের গুরুবোধের মিলন হয় তখনই তাকে বলে গুরুতাদাত্ম্য।

গুরু-শিষ্য সম্পর্ক হল বাহ্যিক। মূলত উভয়ই এক তত্ত্বের অন্তর্গত বলে অভেদ বিজ্ঞানাত্মার দিক থেকে গুরু-শিষ্যে ভেদ থাকে। গুরু তাকে গুরুরূপে অনুভব করে গুরুর আসনে বসিয়ে দেন।

একবার কাঠিয়াবাবা ও তাঁর গুরু একই স্থানে বসেছিলেন। যত লোক সাধুদর্শন করতে আসত তারা কাঠিয়াবাবাকে প্রণাম করে তাঁর পায়ে অর্ঘ্য দিত। তাঁর গুরু দেখলেন কাঠিয়াবাবা তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ফলে এখন আর একসঙ্গে এক জায়গায় থাকা উচিত নয়। কাঠিয়াবাবাকে তিনি বললেন—তুমি থাক, আমি এই স্থান ত্যাগ করে চলে যাব। কারণ দো শের এক বনমে নহী রহ্ সকতা। কাঠিয়াবাবা গুরুর বিচ্ছেদ সইতে না-পেরে অতবড় যোগীপুরুষ ছোট বালকের মতো গুরুর পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। তিনি গুরুকে বললেন—এতদিন আমি তোমার সঙ্গে রয়েছি, আমি আমার সর্বস্ব তোমাকে সমর্পণ করেছি, এখন আমাকে ছেড়ে কেন চলে যাচ্ছ? কাঠিয়াবাবার এই দুর্বলতাকে অনেকে মোহ বা মায়া বলতে পারে। কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, গুরু শিষ্যকে পূর্ণ করে দেবার পরেও শিষ্য কেন গুরুকে ছেড়ে থাকতে পারছে না? এটা মোহ বা মায়া নয়। এটাই আসল জিনিস। কাঠিয়াবাবা গুরুকে বললেন—গুরু, তোমার জিনিস, তত্ত্ব দিয়েছ। তোমাকে ছেড়ে কী করে থাকব? তুমি আমার ব্রহ্ম। ব্রহ্ম আমাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমি কী করব? কাঠিয়াবাবা বোধ দিয়ে তাঁর গুরুকে ধরেছিলেন। গুরু তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—ম্যায় হরবকত তেরা সাথ রহুঙ্গা।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কাজেই রূপকে পাওয়া যায় সকলের শেষে। তত্ত্ব পাওয়ার পর রূপের গুরুকে যথার্থ ভাবে পাওয়া যায়। তাই যখন মা 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) অনেক কিছু দেখালেন তখন মাকে বলা হল—মা, তোকে পেলাম কিন্তু সর্বসময়ের জন্য পেতে চাই। মা তখন বোধের মধ্যে ধরিয়ে দিয়ে বললেন—রূপের মধ্যে বোধ সত্য। সর্বরূপ বোধেরই অভিব্যক্তি। তাই তোমাদের সবার মধ্যে 'এ' মাকে দেখতে পায়।

১১। ৩। ৭৫

২৩২

মন কত জিনিসের জন্য কাঁদে, কিন্তু আপনস্বরূপের জন্য একবারও কাঁদে না। তাঁর জিনিস তাঁকে ফিরিয়ে দিতে কেউ চায় না। কিন্তু একদিন তো দিতেই হবে। সাধারণ মানুষের মনের ভাব হল—হচ্ছে হচ্ছে, হবে হবে। এই ভাবেই তাদের সময় কেটে যায়। আর সাধকরা মরণপণ করে বসে বলেন—তুমি নেবে তো নাও নইলে এই জীবন শেষ করে দেব। সেখানে ভগবান এসে তাঁর ভানুমতীর খেলার ঝুলি দেখিয়ে দেন। এটা দেখতেও কেউ রাজি নয় কারণ ঝুলি থেকে তার নিজের অতীত জীবনের কত কীর্তি যে ফাঁস হয়ে যাবে এই ভয়ে।

একবার এক পাগলের সঙ্গে এক মহাত্মার দেখা হয়েছিল। তাকে দেখে বোঝা যায় না যে, সে কোন দেশের পাগল, এই দেশের না সেই দেশের। তিনি আশ্রমে সকলের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করেন পাগলের সঙ্গেও সে রকমই ব্যবহার করলেন। পাগল কোনও সময়ে কাছে আসে আবার কোনও সময়ে সরে যায়। তিনি পাগলকে প্রসাদ দেওয়ার জন্য শিষ্যদের নির্দেশ দিতে তারা জানাল যে, তাকে প্রসাদ দেওয়া হয়, কিন্তু সে নিজে প্রসাদ খায় না, অন্যদের প্রসাদ খাইয়ে দেয়। এই কথা শুনে মহাত্মা ভাবতে বসলেন। তিনি ভাবতে ভাবতে তলিয়ে গেলেন, কিন্তু কোনও হদিশ পেলেন না।

প্রতি আত্মা স্বতন্ত্র ভূমিতে বাস করে। সেই জন্য সবার খবর সবাই জানতে পারে না। আশ্রমের একজন বলল—পাগলের মধ্যে বড় অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখি, এ কী কোনও সাধক না অন্য কিছু?

মহাত্মা পাগলের কাছে যেতে চান, কিন্তু সে ধরা দেয় না, সরে সরে যায়। তাকে অনুসরণ করতে করতে দেখেন পাগল গোয়ালঘরে গিয়ে গরুর চরণধূলি মাথায় নিচ্ছে। তার ঐ আচরণ দেখে মহাত্মা ভাবল, এ কী রকম পাগল যে গরুর চরণবন্দনা করে!

মহাত্মা একবার তীর্থভ্রমণে বেরোলেন। তিনি সেখানে গিয়ে শুনলেন একজন বলছে—দেখ এক অদ্ভুত ধরনের মহাত্মার দর্শন পেয়েছি। সে ক্ষণে হাসে, ক্ষণে গায়, ক্ষণে মাটিতে লুটায়—তার স্বরূপ বোঝা দায়! তার খেয়াল হলে সে পশুর পায়েও হাত দিয়ে প্রণাম করে। এই কথা শোনামাত্র তাঁর আশ্রমের পাগলের কথা মনে পড়ে গেল। লোকটি আরও বলল—যত মহাত্মার সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁরা কেউই তার মহিমা জানেন না। মানুষ সাধনভজন করে যে স্তরে পৌঁছায় তার বহু উর্ধ্বে তিনি অবস্থান করেন।

পরিব্রাজক মহাত্মা বললেন—ইনি তো আমার আশ্রমে গিয়েছিলেন, আগে জানলে পায়ে ধরতাম!

তার কথা শুনে আরেকজন জিজ্ঞাসা করল—কিসের জন্য পাগলের পায়ে ধরতেন, কিছু পাওয়ার লোভে? তিনি ইচ্ছে করলে আপনার যা-কিছু আছে সব কেড়ে নিতে পারেন। আপন ইচ্ছায় কিছু হবে না। আপনি তাঁর কাছে চেয়ে পাবেন না।

তাঁর সঙ্গে পাগলের আরেকবার দেখা হয়েছিল, কিন্তু পাগলের বেশে নয়, রাজবেশে। তখন তার অদ্ভুত আচরণ প্রকাশ পেল। মহাত্মারা কেউ তার কাছে ঘেঁষতে

পারেন না, কিন্তু দীনদুঃখীদের সঙ্গে সে প্রাণ খুলে মেশে। পাগল সেই মহাত্মার মনোবাঞ্ছা পূরণ করেছিল। দেহরক্ষার তিন দিন আগে সে বলল—তোমার ইচ্ছা এই দেহে পূরণ করতে পারব না। দু'টি জনম এই ভাবে যাবে। তৃতীয় জনমে এমন একজন মহাত্মার দর্শন পাবে যাঁর দ্বারা তোমার অতৃপ্ত কামনা চরিতার্থ হবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই রকম পাগলের পরিচয় পুঁথি-পুস্তকের মাধ্যমে জানার উপায় নেই। তোমাদের এ রকম হতে ইচ্ছা করে না?

২৮। ৩। ৭৫

২৩৩

এক-এর মধ্যে মন যুক্ত রেখে যা করা যায় তা-ই ভজন। জীবনের অগ্রভাগে এক-কে রেখে চলা হল একাগ্রতা। সাধারণের জন্য একাগ্রতা লাভের সহজ উপায় হল মনের সামনে একভাব বা একনাম রেখে চলা। এই কারণেই প্রয়োজন হয় সুন্দর একটি চিন্তা, শব্দ বা মন্ত্র। নিজের দেহ আবরণের জন্য যেমন জামা-জুতোর প্রয়োজন, মনের একাগ্রতা রক্ষার জন্যও সেইরূপ মহাত্মা মহাপুরুষদের ছবি রাখা প্রয়োজন। যে কোনও একজন মহাপুরুষের প্রতি অখণ্ড শ্রদ্ধা থাকলে প্রত্যেক মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা আপনিই জাগে।

একবার একজন বলেছিল—আমার গুরু তো মুসলমান, কিন্তু আমি ব্রাহ্মণের ছেলে। আমার কি আল্লার দর্শন হবে, ব্রহ্মদর্শন কি হবে না?

তাকে তখন বলা হল—আল্লার দর্শন হলেই তো তুমি ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যাবে।

ভক্ত—আমার গুরু হিন্দু কি মুসলমান কিছুই বুঝি না। তাঁর মধ্যে এত প্রেম ও ভালবাসা দেখেছি যে, তা দেখেই আমি তাঁকে গুরুরূপে বরণ করেছি। এখন আমার উপায় কী?

তাকে বলা হল—তোমার গতি সর্বোত্তম। এত যাঁর প্রেম, ভালবাসা তাঁর আশ্রয়ে থেকে তোমার খারাপ হবে কেন?

ভক্ত—হরি ও আল্লার মধ্যে দ্বন্দ্ব নেই ঠিকই, তবুও মুসলমানের কাছে থেকে কি আমার হরিদর্শন হবে?

তখন তাকে বলা হল—তোমার গুরু মুসলমানই হন আর যা-ই হন তাঁর মধ্যে তুমি হরি, রাম, শিব, মহাপ্রভু প্রভৃতি সকলের দর্শন পাবে। গুরু তোমার কাছ থেকে এই বিশ্বাসটুকু চাইছেন। গুরুই যে সব, এই বিশ্বাস থাকা চাই। যার অন্তরে বিশ্বাস নেই তার কোনও গতি নেই।

তোমরা সকলে সর্বদা স্মরণে রেখ যে, বিশ্বাসই হল সকলের আসল পরিচয়। বোধ বা মন যা-ই বল সবই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভক্ত বলে—আমি তাঁকে দেখিনি, শুধু বিশ্বাস করি। বিশ্বাস এসে গেলেই সাধনা শেষ। বিশ্বাসকে ঋষিযুগে শ্রদ্ধা বলা হয়েছে। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মধ্যে সামান্যই তফাত আছে।

আসলে শব্দতে কিছু এসে যায় না, প্রাণকে যা স্পর্শ করে তা-ই গুরু বা মন্ত্র।

সেই ভক্ত বলেছিল—আমার গুরু 'হরি, হরি', 'রাম, রাম' জপ করেন আবার এদিকে আপনিও আল্লার মহিমা কীর্তন করেন। এর রহস্য বা তাৎপর্য কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার গুরু আপনার কথা শুনে আপনাকে ধরে থাকতে বলেছেন।

তাকে তখন বলা হল—যখন তিনি বলেছেন ধরে থাকতে ধরে থেক। গুরুর বাক্যকে ব্রহ্মবাক্রূপে ধরে নিও। সদ্গুরুমাত্রই সৎ-এ প্রতিষ্ঠিত।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ঘটনাটি বলে তার তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) 'আল্লা, আল্লা' করে কেন, তা মুখে বলে বোঝানো যাবে না। ভাল লাগে তাই করি। 'ল্লা' 'হ্লাদিনী' শক্তিকে নির্দেশ করে। এই জন্যই প্রহ্লাদ নাম শুনতে ভাললাগে, যদিও প্রহ্লাদের জীবন দুঃখে গড়া। কিন্তু তার জীবনে শুধু দুঃখই ছিল বললে ভুল হয়। তার জীবনে আনন্দরসও ছিল।

প্রহ্লাদ হল বিশ্বাসের একটি ঘনীভূত মূর্তি। কারও বিশ্বাস প্রহ্লাদের মতো দৃঢ় হলে সে বালকবৎ হয়ে যায়। বালকের মধ্যে আনন্দ স্বতঃস্ফূর্ত খেলে।

২২। ৬। ৭৫

২৩৪

ওঁ পরম কারণ হংস নারায়ণ
পুরাণপুরুষ দিব্যজীবন
সত্যস্বরূপ সত্য কারণ
প্রকাশবিভূতি তাঁর বিশ্বজীবন।।
বিশ্ব আধার বিশ্ব কারণ
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং।
তাঁর অবতার হরি পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
পুরাণপুরুষ পরমহংস।।
শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং
সর্ব ভাবের মহামিলন
সর্ব কারণের সমীকরণ
হংস নারায়ণ পরম কারণ।
শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং
সত্যস্বরূপ শিব নারায়ণ
মানববেশে দিব্যজীবন।।

ভগবানেব পরিচয় ষোলো আনা মানা না-হলে পাওয়া যায় না। এক আনা কম থাকলে হবে না। জগতে কত অবতারপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। এক এক যুগে ভগবানের এক এক বেশকে অবলম্বন করে মানুষ এগিয়ে চলে। কিন্তু ষোলো আনা মানা হলে সব অবতার এক হয়ে যান। তখনই তাঁর মধ্যে শাস্ত্রের জীবন্ত প্রকাশ দেখা যায়।

এইরূপ মহাত্মার মতপথের কোনও বিচার থাকে না এবং তিনি কারও সমর্থনের ধার ধারেন না। তাঁকেই অতর্কমূর্তি স্বতঃসিদ্ধ স্বয়ংপ্রমাণ স্বয়ংপ্রকাশ বলা হয়। মানুষ এই অবস্থার অংশমাত্র অনুভূতি লাভ করলে সিদ্ধপুরুষে বা মহাপুরুষে পরিণত হয়। সেই জন্য দেখা যায় সিদ্ধপুরুষগণ বা মহাপুরুষগণ আপন আপন রুচি অনুযায়ী অতীতের অবতারদের ভজন করেন। কিন্তু ভগবান এসে সব মতপথের অবতারকে ভজন করেন বিশেষ কোনও মতপথকে প্রাধান্য দেন না। কারণ সব নিয়ে যখন সেই অখণ্ড ভূমার পরিচয়, কোনও একটিকে তিনি বাদ দিতে পারেন না।

ভগবানের ভজন করা সবচেয়ে সোজা আবার সবচেয়ে কঠিন। এত সহজ বলেই কারও ভাল লাগে না। সহজকে সকলে সহজ ভাবে মেনে নিতে পারে না, কঠিন ভেবে নিয়ে মাতামাতি করতে ভালবাসে। বিশেষের মাধ্যমে কিছু পাওয়াকেই আসল পাওয়া মনে করে। নির্বিশেষের মাধ্যমে পাওয়াকে আসল মনে করে না। ভগবানের কাছে সর্ববস্তুর সমান মূল্য। নিজের বোধ দিয়ে নিজের মধ্যে আবরণ সৃষ্টি করে তাঁকে অসমান মনে হয়।

এক ভক্ত রামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি ভগবান হয়ে এত দুঃখকষ্ট ভোগ করছ কেন? এর উত্তর শোনার জন্য তিনি তাকে মুনি, ঋষিদের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা শুনে বললেন—আমরাও তো তাই ভাবি! তিনি স্বয়ং ভগবান নারায়ণ হয়ে কেন এত কষ্ট ভোগ করছেন? এর উত্তর আমাদেরও জানা নেই।

মুনি, ঋষিরাও এর উত্তর দিতে পারলেন না দেখে রামচন্দ্র সেই ভক্তকে হনুমানের কাছে এর উত্তর জিজ্ঞাসা করতে পাঠালেন। হনুমানকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন—দুঃখমূর্তিই হল আমার প্রভুর আসল রূপ। রামচন্দ্র শুনে বললেন—হনুমান ঠিকই বলেছে। ওর মতো ভক্তই শুধু এই কথা বলতে পারে। এটা আমার একটি বিশেষ রূপ।

শ্রীকৃষ্ণকে যখন জিজ্ঞাসা করা হল—কারাবরণ এবং যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়ে এত দুঃখভোগের কী কারণ? শ্রীকৃষ্ণ বললেন—এ সব কথার উত্তর আমারও ভাল করে জানা নেই। এই বিষয়ে নারদকে জিজ্ঞাসা কর।

নারদকে জিজ্ঞাসা করা হলে নারদ বললেন—এ প্রশ্নের উত্তর একমাত্র প্রভুই দিতে পারেন। আমি প্রভুর কাছে যাচ্ছি, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করব।

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। ব্যাসদেব বললেন—আমি বললে তো তাঁর মহিমার কথাই বলব, তুমি বরং প্রভু জনার্দনকেই জিজ্ঞাসা কর।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন—আমিও এই তত্ত্ব বুঝি না, তুমি ব্যাসদেবের কথাই শোন। তিনি সর্বশাস্ত্রের প্রতিনিধিস্বরূপ। তিনি যা বলেন তা-ই মেনে নিও।

ব্যাসদেব বললেন—এ বিষয়ে উত্তর দেবার একমাত্র অধিকারী হলেন পিতামহ ভীষ্মদেব, যিনি বশিষ্ঠদেবের কাছে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছেন, সনক ঋষির কাছে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন এবং জমদগ্নি মুনির কাছে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করেছেন। এক কথায় তাঁর সমকক্ষ, প্রাজ্ঞবিজ্ঞ ব্যক্তি পৃথিবীতে দ্বিতীয় কেউ নেই।

যুধিষ্ঠির ব্যাসদেবের কথা অনুসারে ভীষ্মদেবের শরণাপন্ন হলেন। ভীষ্মদেব সব কথা শুনে বললেন—এই প্রশ্ন তোমার মতো যোগ্য ব্যক্তির মুখেই শোভা পায়। কিন্তু তুমি যাঁকে সাথে নিয়ে এসেছ তাঁকে জিজ্ঞাসা না-করে আমার কাছে এসেছ। তুমি তো এক মস্ত বড় রহস্যের সৃষ্টি করলে। যাই হোক, তুমি যখন এসেছ তখন আমি আমার সাধ্য মতোই উত্তর দেব। কারণ তুমিই একমাত্র এই প্রশ্নের উত্তর শোনবার যোগ্য অধিকারী।

ভীষ্মদেব প্রভু জনার্দনের চরণবন্দনা করে বললেন—তোমার কথা তুমিই এর মুখ থেকে প্রকাশ করবে বলে এই ব্যবস্থা করেছ। ভীষ্মদেব তখন একে একে পুরাণ-পুরুষগণের মহিমা প্রকাশ করতে লাগলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর দুঃখমূর্তি প্রসঙ্গে বললেন—ভীষ্মদেবের সেই যে কথা বলার ভঙ্গিমা তারই স্মৃতি হঠাৎ ভিতরে আজ খেলে গেল। তা-ই গানের মাধ্যমে আজ তা প্রকাশ হয়ে পড়ল।

ভগবানের দুঃখবরণের মহিমা অনুভব করতে হলে বাল্মীকি ও হনুমানের কঠোর তপস্যা ও সর্বসমর্পণের নীতি অনুসরণ করেই বুঝতে হবে। তাঁদের মধ্যে দিয়েই ভগবান আপন মহিমা ব্যক্ত করেছেন। বাল্মীকি সহস্র বছর কঠোর তপস্যা করার পর শ্রীরামচন্দ্রের পরিচয় বুঝতে সমর্থ হলেন এবং তাঁর মহিমা গাইলেন।

ভগবানের পরিচয় পেতে হলে সর্ববেদনার মূলে যেতে হবে। যথার্থ সত্য সত্যের দ্বারাই আবৃত হয়ে যায়। একটি সত্য হল বেদনা ও অপর একটি সত্য হল বেদ। অথবা বলা যায়, একটি হল কষ্ট ও আরেকটি হল কেষ্ট। যিশু হলেন কষ্টের ঘনীভূত মূর্তি —তা-ই হল কৃষ্ণের রূপ। যিশু ও কৃষ্ণ একজনই। কৃষ্ণের দেহধারণের যে তালিকা আছে, সেই তালিকার মধ্যে যিশুর নামও আছে।

সাধারণ মানুষ দুঃখে বিচলিত ও বিমূঢ় হয়ে তার থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু ভগবান সব দুঃখ একাকী নীরবে সহ্য করেন। তিনি কারও ঘাড়ে দুঃখের বোঝা চাপিয়ে নিজের বোঝা লঘু করতে চান না। দুঃখের অখণ্ড মূর্তিকে বরণ করাই যে মুক্তি শান্তি পাওয়ার একমাত্র রাস্তা তার প্রত্যক্ষ নিদর্শন ভগবানের স্বেচ্ছায় দুঃখবরণের মধ্যে পাওয়া যায়। যেমন বুদ্ধদেব রাজার ছেলে হয়েও স্বেচ্ছায় তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধন করে কষ্ট বরণ করলেন। সাধক তপস্যার কষ্ট সহ্য করে লক্ষ্যে পৌঁছোবার আশা নিয়ে। তাই আশাহত হলে তপস্যা বন্ধ হয়ে যায়। তপস্যা সুখকর নয়। তাই খুব কম লোকই এই পথে আসে। কিন্তু বর্তমান যুগে ধর্মপথে কেউ কোনও কষ্ট করতে রাজি নয়। তারা রাধারানি মায়ের মতো কান্নাকাটি করতে বা বুদ্ধদেবের মতো কঠোর তপস্যা করতে পারবে না। যদি অলৌকিক মন্ত্রবলে বা বড়ি খেয়ে কিছু পাওয়া যায়—এই আশা নিয়েই থাকে। মন্ত্রবলে হয় ঠিকই, কিন্তু ঐ marble গড়িয়ে দেবার মতো। যেটুকু গড়িয়ে যায় সেটুকুই যেতে পারে, তার বেশি আর পারবে না।

২৯। ৬। ৭৫

২৩৫

যা-কিছু পাওয়া যায় সব গুরু-ইষ্টের চরণে সমর্পণ করে দিতে হয়। মানুষের মধ্যে যে কী বিরাট শক্তি আছে সে সম্বন্ধে মানুষ নিজেই সচেতন নয়। মানুষ স্বরূপত ভগবান। মানুষের আপনস্বরূপকে আবিষ্কার ও অনুভব করার মতো বিরাট আবিষ্কার ও অনুভূতি আর কিছু নেই। মনুষ্যজীবন অতি দুর্লভ। দেহধারণের কারণ শুধু অবিদ্যার কাজ নয়। কারণ দেহধারণ না-করে ব্রহ্ম-আত্মজ্ঞান (অমৃতস্বরূপের জ্ঞান) লাভ করার উপায় নেই। স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম—এই চারটি ভাববোধের স্তরের সঙ্গে ব্রহ্মজ্ঞানের যোগ আছে। দেবতারা চতুর্বর্গের অন্তর্ভুক্ত নন। যদি কেউ সমস্ত নরকুলকে বন্দনা করে, তবে সমস্ত দেবতাদের বন্দনা করা হয়ে যায়। তাই কবি বলেছেন—'সর্বদেশে, সর্বকালে যেথায় আছেন নারায়ণ, তোমাকে প্রণাম।'

যে কোনও একটি ভাব নিয়ে সব কিছু সাধিত হলে হয় অখণ্ড ভূমা। তা-ই হল মুক্তি শান্তি ও পূর্ণতার স্বরূপ। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে একটি গল্প ছিল, বলছি শোন।

একদিন এক জিপসি খেলা দেখাতে গিয়ে বিপদে পড়ে। তাকে সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করে এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। জিপসি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তার ত্রাণকর্তাকে কিছু দিতে চাইল। লোকটি বলল—আমাকে আর কী দেবে? তবে তুমি একটি কাজ করো, বিশেষ একসময়ে তোমার এই খেলা প্রভুকে দেখিও। সেই সময় অন্য কেউ যেন তোমার খেলা না-দেখে।

এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেল। ত্রাণকারীর কথা জিপসি একদম ভুলেই গেল, তার কথা জিপসির খেয়ালই ছিল না। এক শহরে খেলা দেখিয়ে সে অনেক টাকা রোজগার করল। সে বাড়িঘর বানিয়ে নিশ্চিন্ত মনে সেখানে বাস করতে লাগল। তার অবস্থা একেবারে ফিরে গেল। হঠাৎ একদিন সেই লোকটির কথা তার মনে পড়ল। সে ভাবল, আমাকে তো ভগবানের সামনে লোকটি খেলা দেখাতে বলেছিল, কিন্তু আমি তো দেখাইনি! জিপসির বাড়ির সামনে একটি গির্জা ছিল। সেখানে প্রতিদিন অনেক লোক যাতায়াত করত।

Father-কে একদিন গির্জায় গিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল—আমি কি গির্জায় যেতে পারি? Father তাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু সবার সামনে সে ভগবানকে খেলা দেখাতে লজ্জা বোধ করল। Father-কে পরে সে জানাল যে, রাতে যখন সবাই চলে যাবে তখন সে গির্জায় যাবে। তিনি তার কথাতে সম্মতি জানালেন। তারপর থেকে সে রোজ মাতা মেরির সামনে খেলা দেখাত। মাতা মেরিও মূর্তি থেকে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে খেলা করতেন। Father-এর assistant-এর একদিন কৌতূহল হল। সে ভাবল, দেখি তো রোজ রাতে সে কী করে! রাতে সে গির্জায় উঁকি মেরে ঐ দৃশ্য দেখে অভিভূত হয়ে Father-কে সব জানায়। তিনি তার কথা শুনে হেসেই উড়িয়ে দেন। তিনি ভাবলেন, পাথরের মূর্তি কী করে হাঁটবে, কথা বলবে! তিনি প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলেন না। পরে জিপসিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে সরল বিশ্বাসে বলল—এটা অবিশ্বাস্য কেন হবে? তিনি তো দেবী, তাঁর তো অসীম ক্ষমতা। তিনি কেন মূর্তি থেকে নেমে আসতে পারবেন না?

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—এ রকম মনের প্রস্তুতি থাকলে অধ্যাত্মসাধনায় যে কত দূর এগোতে পারা যায় তা এই গল্পটির মাধ্যমে বোঝা গেল। জানাজানির ফলে যে বিকার সৃষ্টি হয়, মানলে তা আর থাকে না। মানাকে মানুষ অন্ধ বলে বিদ্রুপ করে। বাবা-মাকে না-চিনে মানলে যদি তাকে অন্ধতা বলা হয় তাহলে আর কিছু বলার থাকে না। জিপসিকে লোকটি কোনও বীজ বা মন্ত্র দেয়নি, শুধু বলেছে—প্রভুকে খেলা দেখিও। সরল বিশ্বাসে সে মাতা মেরির দর্শন পেল। সহজ সরল বিশ্বাস যে কত বড় বস্তু তা এই গল্পটির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকে বলে—বিশ্বাস করে ঠকতে হয়। বিশ্বাস করে ঠকা—এটা স্ববিরুদ্ধ কথা হয়ে যায়। তবে দৃঢ় বিশ্বাস গড়তে সময় লাগে। প্রহ্লাদের মতো বিশ্বাস অতীব দুর্লভ। শুধুমাত্র মায়ের কথা বিশ্বাস করে সে নীরবে পিতার অত অত্যাচার সহ্য করে নিল।

বাবা-মায়ের কথা মেনে নিলেই কাজ হয়ে যায়, মন্ত্রের দরকার হয় না। কিন্তু দেখা যায় ছোটবেলায় সন্তান বাবা-মাকে যাও বা মানে, লেখাপড়া আরম্ভ হলে মূল বস্তুর উপর আবরণ পড়ে যায়। এই আবরণকে বহু কষ্ট করে সরাতে হয়। আবরণের ফলে বাবা-মা ও গুরুজনদের প্রতি দোষদৃষ্টি আসে। এই অন্তরায়গুলিকে সরাবার জন্য অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান পৃথক কোনও বিজ্ঞান নয়। জীবনে সব কিছু সমাধানের জন্য, বিরুদ্ধ অবস্থাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ভাবে সম্মুখীন হবার জন্য যা-কিছু প্রয়োজন এবং বৈচিত্র্যের মূলকে দর্শনের জন্য যা প্রয়োজন, তা যে উপায়ে পাওয়া যায় তা-ই হল অধ্যাত্মবিজ্ঞান। এর মধ্যে কোনও নির্দেশ নেই। যার যা সয় বা যার যা ভাব, তা দিয়েই সে এগোতে পারে। মন ও ভাবের মধ্যে কোনও তফাত নেই। ভাবের মধ্যে প্রাণ, বুদ্ধি প্রভৃতি সব ভাব নিয়ে হয় সগুণ। ভাবময় রূপ হল বিশ্বরূপ আর বোধময় রূপ হল পরব্রহ্ম।

ভাব কথাটি খুব সুন্দর, যার থেকে আসে ভাব, অভাব, স্বভাব, মহাভাব প্রভৃতি। অব্যক্ত থেকে প্রথম ব্যক্ত হয়, সেই অভিব্যক্তি হল ভাব। সমগ্র অভিব্যক্তি পূর্ণমাত্রায় হয়ে গেলে হয় স্বভাব। তবে ভাবকে অনুমান করা যায় না, কারণ অনুমান হল ভাবের অনেক নিচে।

ভাব মানে আমি যখন যা তখন তা-ই। ভাবের বিজ্ঞান সকল বিজ্ঞানকে একত্র করে অভিব্যক্ত হয়। ভাবের মধ্যে দিয়ে তাঁকে ব্যাপকরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু মনের মধ্যে ভাগ ভাগ হয়ে যায়। 'মানস' শব্দের মধ্যে ভাব থাকে। 'মানস' শব্দটি পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করলে হয় 'সমান'। কেন্দ্রসত্তাই সমান এবং তা-ই স্বভাব। স্বভাব থেকে সব নেমে আসে। স্বভাবে সমান থাকলে অভিমান আসে না। অপমান ও অভিমান সমান—সবকে মানলে সমান থাকে। মানা কঠিন নয়। প্রথম প্রথম মানা চেষ্টাসাপেক্ষ থাকে, পরে তা স্বতঃস্ফূর্ত হয়।

২৯। ৬। ৭৫

২৩৬

পূর্ণতা আছে শ্রীগুরুর চরণে। 'আমার আমিকে' শুধু গুরুই নিতে পারেন, দেবতারা নিতে পারেন না। গুরু কিন্তু একজন ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। ইন্দ্রিয়ের বাইরে ও ভিতরে অনুভূতির মধ্যে যা-কিছু উপস্থিত হয় সবই আত্মবোধরূপ গুরুরই স্পন্দিত এবং লীলায়িত রূপ। তা সম্যক্‌রূপে মনে রেখে আত্মব্যবহার সাধন করতে পারলে গুরুর কৃপা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও এক মহাত্মা বেশ কিছু ভক্তশিষ্য নিয়ে পাহাড়ের উপরে এক আশ্রম তৈরি করে বাস করতেন। একদিন তাঁর এক শিষ্য মহাত্মাকে জানাল যে, সে তীর্থভ্রমণে যেতে চায় কারণ সাধুদের সমস্ত তীর্থভ্রমণ করতে হয়।পরিব্রাজক না-হলে না কি সাধু হওয়া যায় না? গুরুদেব তাকে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সে বদ্ধপরিকর, যাবেই। তখন গুরুদেব আর কিছু বললেন না। যাবার সময় শুধু শিষ্যকে বলে দিলেন—তুই যে তীর্থেই যাস তোর এই বুড়ো বাবার জন্য সবচেয়ে বুরা (খারাপ) জিনিসটি নিয়ে আসিস।

শিষ্য নানা তীর্থে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সব গুরুভাই ও আশ্রমবাসীদের জন্য কিছু কিছু জিনিস নিল, কিন্তু গুরুদেবের জন্য বুরা জিনিস আর খুঁজে পায় না। সবচেয়ে খারাপ জিনিস কোনটা—এই কথা লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করলে তারা হাসে এবং তাকে বিকৃত মস্তিষ্ক ভাবে।

সব তীর্থ ঘুরে ঘুরে শিষ্যটি আশ্রমের উদ্দেশে ফিরে চলেছে। আশ্রমে পৌঁছোবার জন্য দুই দিন আর বাকি আছে। গুরুদেবের জিনিস নিয়ে যেতে পারল না বলে তার খুব মন খারাপ। সে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগল এই ভেবে যে, আমি এতই অধম যে, গুরুদেব নিজমুখে চাইলেন একটি জিনিস অথচ আমি তা নিয়ে যেতে পারলাম না।

পরদিন সকালবেলা সে প্রাতঃকৃত্য করতে বসেছিল। সেই সময় হঠাৎ তার মনে হল এই মলই সবচেয়ে খারাপ জিনিস। এই মলই গুরুদেবের জন্য সে নিয়ে যাবে। এই ভেবে যেই মুহূর্তে হাত দিয়ে মল তুলতে যাবে ঠিক তখনই সে শুনতে পেল মলের ভিতর থেকে কে যেন বলছে—সাবধান! আমার গায়ে হাত দিও না। তুমি আমাকে খারাপ মনে করছ! কিন্তু কাল আমি তো ছিলাম সন্দেশ, রসগোল্লা, সুমিষ্ট ফল প্রভৃতি। তুমি তো আমাকে খেয়েছিলে। আজ আমার এই রূপ তো তুমিই বানিয়েছ। তোমরা ভাল ভাল জিনিস খাও এবং মলরূপে সেগুলি বিকৃত করে নিকৃষ্ট ভেবে তা পরিত্যাগ কর, আমরা কিন্তু নিকৃষ্ট হই না। আমার উপরেই কতগুলি প্রাণীর জীবন নির্ভর করছে। তারা আমাকে গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করে। আমাকে আবার তারা আরও নিকৃষ্ট মলরূপে পরিত্যাগ করবে। তাও আবার আরেক শ্রেণীর প্রাণী গ্রহণ করবে তাদের প্রাণধারণের জন্য। এই ভাবে আমার রূপান্তর হতে হতে আমি পঞ্চভূতের মধ্যে আবার মিশে যাব। এই পঞ্চভূতই আবার জীবের খাদ্যরূপে পরিণত হবে। আমার নাশ নেই, কেবল প্রকাশের আকার-প্রকারের বিকার ও রূপান্তর হয়।

আমি প্রাণশক্তিরই অন্তর্ভুক্ত। আমার নাম অন্ন। আমাকে ছাড়া জীবজগতের চলে না। আমার উপরেই জীবজগৎ বেঁচে আছে।

মলের মুখে তার আত্মকাহিনি শুনে সেই ব্রহ্মচারী অতি বিস্মিত হয়ে তাকে সংগ্রহ করার থেকে নিবৃত্ত হল। সে হাত-মুখ ধুয়ে কর্মান্তরে চলে গেল। মলের কাছ থেকে তত্ত্বকথা শুনে সে খুবই আশ্চর্য হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত গুরুর জন্য কিছু না-নিয়েই সে আশ্রমে ফিরে গেল। সে ভাবল, আমি এতই অপদার্থ যে, নিকৃষ্ট কোনও জিনিসই খুঁজে বার করতে পারলাম না।

যাই হোক, সে অবশেষে আশ্রমে এসে পৌঁছাল। আশ্রমে এসে সে তার গুরুভাইদের জন্য যা যা এনেছে সবাইকে তা দিল। তারা সকলেই খুব খুশি ও প্রীত হল। দুই দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, কিন্তু সে গুরুর সঙ্গে আর দেখা করেনি। তৃতীয় দিন গুরু নিজেই তার কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন—দেখ, তীর্থভ্রমণ করে এসে প্রথমে গুরুকে প্রণাম জানিয়ে তাঁকে প্রদক্ষিণ করতে হয়। তুমি দুই দিন হল আশ্রমে এসেছ অথচ আমার সঙ্গে একবারও দেখা করলে না। তুমি তীর্থভ্রমণে যাবার সুফল আর কিছু পেলে না। সুফল গুরুর কাছ থেকেই পেতে হয়। আগে তীর্থে যাবার কথা বলাতে আমি তোমাকে বারণ করেছিলাম, কারণ তখন তোমার তীর্থে যাবার সময় হয়নি বলে। তুমি আমার কথা না-শুনে জোর করে তীর্থে গিয়েছ। তীর্থক্ষেত্রে যথার্থ নিয়ম পালন করতে হয় কী ভাবে তাও জেনে যাওনি। নিজের খেয়ালখুশি মতো বেরিয়ে এসেছ। গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী না-চলে, গুরুর সেবা ঠিক মতো না-করে, খেয়ালখুশি মতো ধর্মচর্চা করলে সাধু হওয়া যায় না। মনে রেখ, গুরুসেবাই হল ধর্মসাধনার মুখ্য উপায়, তীর্থভ্রমণাদি সব গৌণ। যাই হোক, তুমি তোমার এই গুরুবাবার জন্য কী এনেছ?

শিষ্য মাথা নত করে গুরুর কথা শুনছিল আর তার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। সমস্ত ব্যাপারটা তখন তার মানসপটে ভেসে উঠছিল আর তা চিন্তা করে নিজেকে খুব অসহায় বোধ করছিল। সে নিজের অযোগ্যতা, অক্ষমতা ও অজ্ঞতার জন্য নিজেকে খুব নিকৃষ্ট ও অধম মনে করছিল। গুরুর কোনও কথার উত্তর না-দিয়ে চুপ করে ছিল বলে গুরু তাকে বললেন—আমার কথার তো কোনও উত্তর দিলে না? গুরু এই একই প্রশ্ন দু-তিনবার করাতে হঠাৎ শিষ্য বিলাপ করে গুরুর চরণ ধরে বলতে লাগল—হে কৃপানিধি গুরু! আমি আপনার অযোগ্য সন্তান। আমি অজ্ঞানী, মূর্খ এবং সর্বব্যাপারে নিকৃষ্ট। আপনার আদেশ বা নির্দেশ পালন করার যোগ্যতাও আমার নেই। অজ্ঞ লোক যে রকম ভুল করে, আমি তার চাইতেও বেশি ভুল করেছি, প্রথম থেকে আপনার কথা না-শুনে। বহু তীর্থে ঘুরেছি কিন্তু আমি কোথাও সুখশান্তি পাইনি। অনেক সাধু দর্শন করেছি, কিন্তু তাঁদের কাছ থেকে যথার্থ কৃপা ও আশীর্বাদ কী ভাবে লাভ করতে হয় তাও জানি না বলে তা সংগ্রহ করতে পারিনি। এই আশ্রমের গুরুভ্রাতাদের জন্য অনেক কিছু আনবার কথা তারা বলেছিল ভিন্ন ভিন্ন তীর্থ থেকে। তাও পুরোপুরি আনতে পারিনি। সামান্যই তাদের জন্য এনেছি। অনেক ভেবেচিন্তে দেখলাম এ সংসারে সকলেই আমার থেকে গুণে, যোগ্যতায়, জ্ঞানে,

সেবায়, শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে, বিশ্বাসে এবং আপনার নির্দেশ পালনে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তাদের তুলনায় আমি সবচেয়ে অধম ও নিকৃষ্ট। আমার মতো অধম ও নিকৃষ্ট জগতে আর কেউ নেই। সর্ব-নিকৃষ্ট ও অধম এই আমাকেই আপনার চরণে সঁপে দিচ্ছি। আপনি এখন যা ভাল মনে করেন তা-ই করুন। আমার এই জীবনের প্রতি ধিক্কার এসে গিয়েছে। আমার আর বাঁচার ইচ্ছাও নেই। এই বলে সে বিলাপ করতে থাকে।

তখন দয়ার্দ্রচিত্ত করুণাঘন হৃদয় যাঁর, সেই গুরু শিষ্যের এই আত্মনিবেদনে প্রীত হয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে বললেন—আজ থেকে তুমি এই আশ্রমে আমার সেবা করার সুযোগ পেলে। তোমার অভিমান-অহংকার তোমাকে বিকৃত করতে পারবে না। এই ভাবে যারা আত্মসমর্পণ করে তারা গুরুর আশ্রয় পায় এবং গুরুশক্তির অধিকারী হতে পারে। তোমার প্রতি আমি খুব খুশি হয়েছি। আমি সর্বান্তঃকরণে তোমাকে আশীর্বাদ করছি যে, তোমার ভিতরে অন্তরচৈতন্য জেগে উঠুক। তোমার শ্রদ্ধা-ভক্তি-বিশ্বাস পূর্ণ হোক। তুমি আত্মবোধের যোগ্য অধিকারী হয়ে আশ্রমের সুনাম ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। এইবার তোমার তীর্থভ্রমণ সার্থক হয়েছে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গল্পটির মধ্যে আত্মসমর্পণের এক বিশেষ উদাহরণের মাধ্যমে গুরুকৃপা লাভের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। গুরু এই জিনিসই চান প্রত্যেকের কাছে। শিষ্য নিজেকে পূর্ণ সমর্পণ করলেই গুরু নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে তার মধ্যে প্রকাশ করতে পারেন। 'আমি আমার বোধ' হল অহংকার। অহংকার থেকে আসে নানাবিধ দোষ, যথা—শ্রেয়মন্যতা ও হীনমন্যতা ভাব। এই দুই ভাবেই মন বিকৃত হয়।

কী সুন্দর এই উপাখ্যানটি! সব তীর্থ ঘুরে শিষ্য দেখল পূর্ণতা কোথাও নেই। পূর্ণতা আছে একমাত্র শ্রীগুরুচরণে। সম্যক্‌রূপে একবোধের, সমবোধের বা আপনবোধের স্মৃতিকে মনে রাখা সম্ভব হয় পূর্ব পূর্ব অভ্যাস দ্বারা। সম্যক্‌রূপে ইন্দ্রিয়-মনের সংযম সাধিত হলে, ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়ে অন্তর্মুখী গতি নিলে, চিত্তের দোষাদি ক্ষীণ ও শূন্য হলে, মন বিনীত, নম্র ও অনুগত হলে অর্থাৎ অন্তরের সমগ্র ভাব শুদ্ধ হলে তখন আত্মসেবায় সতত যুক্ত থাকার সামর্থ্য লাভ হয়। তখনই শিষ্য আত্মবোধের সম্যক্ অধিকারী বা পূর্ণ অধিকারী হতে পারে।

২০। ৭। ৭৫

২৩৭

মানতে মন চায় না, কারণ মনের ভাল লাগে না। এই মানা প্রসঙ্গে জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করলে তাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

শ্রীনাগেশ্বরবাবা প্রথম জীবনে ছিলেন হাইকোর্টের জজ। এক আসামিকে তিনি ফাঁসির রায় লিখে দিয়েছিলেন। তারপর আসামিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—তোমার তরফ থেকে কিছু বলার আছে? উত্তরে আসামি বলেছিল—আমি কিছু জানি না। আমার নারায়ণ আছেন। তিনিই আমার বিচার করবেন। যথারীতি তাকে গলায় ফাঁস পরিয়ে ফাঁসি দেওয়া হল। তখনকারদিনে গলায় দড়ি দিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলে

দেওয়া হত। ফাঁসি দেবার পর দেখা গেল আসামি মরেনি। যারা ফাঁসি দিয়েছিল তারা দেখল তার গলায় ঠিক মতো ফাঁস পড়েনি। তারা এ রকম ঘটনা দেখে অবাক হয়ে গেল। ফাঁসির নিয়ম হল একবার ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়বার আসামিকে ফাঁসি দেওয়ার অধিকার কর্তৃপক্ষের নেই।

তাকে যখন এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হল তখন সে বলেছিল—আমি কিছু জানি না। আমার নারায়ণ আছেন, তিনি সব জানেন। আসামির ঐ কথায় জজের চোখ খুলে গেল। তিনি ভাবলেন, আজ এই লোকটি আমাকে শিক্ষা দিল যে, আমি বিচার করার কেউ নই! দুনিয়ার মালিক স্বয়ং বসে বিচার করেন। আমি কত নিরপরাধ লোককে ফাঁসির রায় দিয়েছি। আমার বিচার কে করবে? এই ভেবে তিনি কাছারির পোশাক ছেড়ে কৌপীন পরে হিমালয়ের উদ্দেশে রওনা হলেন। তিনি আর বাড়িতে ফিরলেন না। এক মহাত্মার কাছে তিনি নাম পেয়েছিলেন। মহাত্মা বলেছিলেন—আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব।

পরবর্তীকালে দেখা যেত যে, তিনি এক জায়গায় বসে আছেন, খাওয়াদাওয়া বা মলমূত্র ত্যাগের জন্য একবারও উঠতেন না। তাঁর গলায় মোটা মোটা সাপ পেঁচিয়ে থাকত। তাই তাঁর নাম হয়েছিল শ্রীনাগেশ্বরবাবা।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—দুঃখ যা দিয়ে অনুভব করা হয় তা-ই চৈতন্য। মানাতেই আনন্দ, জানতে গেলেই দুঃখ পেতে হয়। মাকে মানলে ভিতরে শূন্য হয়ে যায়। তখন আর শাস্ত্র পড়তে হয় না। ভিতর থেকে আপনিই শাস্ত্র প্রকাশ পায়। তখন দেখে, মা-ই বলেন, মা-ই শোনেন।

২০। ৭। ৭৫

২৩৮

আমি ও আমার দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হল আমার সঙ্গে আমার বাড়িতে বাস করার মতো। ঘরে বাস করলেই মানুষ ঘরের অধীন হয়ে যায় না। সাধনার শেষে উপলব্ধি হয় যে, দেহঘর হতে সাধক সম্পূর্ণ স্বাধীন। এই বোধ দৃঢ় করার জন্য মনের একাগ্রতা বা ঐকান্তিকতা প্রয়োজন। তাহলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে আসল বস্তুর সঙ্গে নিজের একাত্মতা অনুভূত হয়। তখন এই বোধই খেলে যে, আমিই সেই চৈতন্যস্বরূপ, যে সব কিছুকে প্রকাশ করে চৈতন্যরূপেই থাকে। তখনই মানুষ হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যে সম্বন্ধ তা দ্বন্দ্ব, বিরোধ ও বিকারের সম্বন্ধ নয়। তা হল আপনবোধের সম্বন্ধ। এগুলি সব বোধের সঙ্গে বোধের খেলা। এই স্তর থেকেই আরম্ভ হয় নিত্যলীলা। মানুষ দেখে, এই লীলায় মুক্তপুরুষদের গলা জড়িয়ে ধরে ভগবান খেলেন। বলতে পারে যে, এঁরা ভগবানের কত প্রিয়। হৃদয়মধ্যে যিনি বাস করেন, সেই হৃদয়পুরুষের সঙ্গে তার কোনও কারণে দুস্তর আবরণের ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে।

মৎস্যেন্দ্রনাথ ছিলেন নাথ সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাযোগী। তিনি গোরখনাথরূপে সকলের কাছে সুপরিচিত। তিনি ছিলেন শিবের উপাসক। তিনি সমগ্র প্রকৃতির শক্তি

বা বিভূতিশক্তির অধিপতি ছিলেন। তাঁর জন্য স্বর্গ থেকে বিশেষ একটি সময়ে সুন্দর স্বর্ণনির্মিত পাত্রে খাবার আসত।

একবার দত্তাত্রেয় এক স্থান থেকে অপর এক স্থানে যাচ্ছিলেন। প্রখর সূর্যতাপে ধরণী বিদগ্ধ। আকাশ স্বচ্ছ ও নির্মল, মেঘের লেশমাত্র নেই। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন সূর্যের সামনে একটি ছায়া পড়ল। তখন তিনি তাঁর ত্রিশূল দিয়ে মাটিতে একবার আঘাত করলেন। ত্রিশূল দিয়ে মাটিতে আঘাত করার সঙ্গে সঙ্গে যার দ্বারা সেই ছায়া সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর সামনে মাটিতে এসে পড়ল। তিনি পাত্র দেখে বুঝলেন এর ভিতরে খাদ্যদ্রব্য আছে এবং স্বর্গ থেকে কোনও মহাযোগীর কাছে তা যাচ্ছে। তিনি তা দেখে বিলম্ব না-করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন।

এদিকে খাবার আসার সময় পার হয়ে যাচ্ছে দেখে মৎস্যেন্দ্রনাথ ভাবলেন, কী ব্যাপার! কে অন্তরায় সৃষ্টি করল? তিনি যখন ধ্যানে দত্তাত্রেয়র কথা জানতে পারলেন তখন তাঁর সামনে তিনি উপস্থিত হয়ে বললেন—তোমার সাহস তো কম নয়, তুমি আমার খাবার আটকে রেখে বিলম্ব ঘটিয়ে দিলে! দত্তাত্রেয় বললেন—তোমার খাবার জানলে আটকাতাম না। আর আমি তো বিলম্ব করিনি, সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছি। মৎস্যেন্দ্রনাথ বললেন—তুমি খুব চতুর আমি জানি। বেশ পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করা হোক আমাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। দত্তাত্রেয় বললেন—আমি জ্ঞানত কোনও অন্যায় করিনি। তবে আমি তোমার কথায় রাজি আছি, পরীক্ষা দিতেও প্রস্তুত। কী পরীক্ষা দিতে হবে বল। মৎস্যেন্দ্রনাথ বললেন—একবার আমি অদৃশ্য হয়ে যাব, তোমাকে খুঁজে বার করতে হবে আমাকে, আবার তুমি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং আমি খুঁজে বার করব তোমাকে। যে খুঁজে বার করতে পারবে না, সে হেরে যাবে।

এ শুধু নিছক কাহিনি নয়, সত্য স্বয়ং। মৎস্যেন্দ্রনাথ নিজেকে আত্মগোপন করে ফেললেন। নাথ সম্প্রদায়ের যোগীদের সেই ক্ষমতা আছে। তাঁরা ইচ্ছামাত্র বহু দূরের পথ এক মুহূর্তে অতিক্রম করতে পারেন। দেশ-কালের বিষয়াদি কোনও অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না। তাহলে ভেবে দেখ বিজ্ঞানের কোন উচ্চ শিখরে উপনীত হলে এই বিদ্যা আয়ত্ত করা যায়! বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকদের কাছে এটা একটি বিরাট জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ের ব্যাপার। শক্তির এক বিশেষ স্তরে যখন যোগাযোগ হয়ে যায় তখন মনে ইচ্ছার উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা কার্যে পরিণত হয়। তখন দেশ-কালের অন্তরায়কে সাধক অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে।

মৎস্যেন্দ্রনাথকে দত্তাত্রেয় খোঁজবার জন্য উদ্যত হয়ে একটি পা বাড়িয়ে দিয়ে দেখলেন তিনি এক সমুদ্রের পারে দাঁড়িয়ে আছেন আর সমুদ্রের তলায় অসংখ্য মাছ খেলা করছে। তিনি ক্রীড়ারত একটি মাছকে ধরে ফেললেন। পরে দেখলেন সেই মাছটিই মৎস্যেন্দ্রনাথ। তিনি মৎস্যরূপে আত্মগোপন করে সেখানে খেলায় মেতে ছিলেন।

মৎস্যেন্দ্রনাথ তখন বললেন—এবার তুমি লুকাও, আমি তোমাকে খুঁজে বার করব। দত্তাত্রেয় নিজেকে আত্মগোপন করে ফেললেন, কিন্তু মৎস্যেন্দ্রনাথ আর তাঁকে

খুঁজে পেলেন না। তিনি ভাবলেন, উনি কোন স্তরে চলে গেলেন! রূপ, নাম, ভাব কোনও স্তরেই তো তাঁকে খুঁজে পেলাম না। তাহলে কি সেই স্তরের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়নি! যখন খুঁজে পেলেন না তখন আত্মসমর্পণ করে বললেন—দত্তাত্রেয় তুমি সামনে এস। আমি তোমার কাছে হার স্বীকার করছি।

দত্তাত্রেয় কিছুক্ষণ পরে তাঁর সামনে এলেন। মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কোথায় লুকিয়েছিলে? দত্তাত্রেয় বললেন—কেন, আমি তো তোমার মধ্যেই লুকিয়েছিলাম, তাই দেখতে পাওনি।

এই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব হল, তাঁদের এই লুকোচুরি খেলা সাধারণ মানুষের মতো দ্বন্দ্ব, দ্বেষে পূর্ণ নয়। তা শিশুদের লুকোচুরি খেলার মতো শুদ্ধ, পবিত্র ও অহিংসার খেলা।

মৎস্যেন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমার মধ্যে তুমি কী ভাবে লুকিয়েছিলে? দত্তাত্রেয় বললেন—তুমি তোমার মধ্যে যে-ভাবে আছ ঠিক সে-ভাবে ছিলাম। তাঁর কথা শুনে মৎস্যেন্দ্রনাথ নিজের মধ্যে নিজেকে আস্বাদনের জন্য ডুবে গেলেন। তিনি নেমে আসতে চাইলেন না। দত্তাত্রেয় বললেন—এবার নেমে এস। তিনি নেমে এলে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করলেন।

গল্পটি শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বোধের স্তরে রূপ, নাম, ভাব সব গলে যায় এবং অখণ্ড একাকার রূপ প্রাপ্ত হয়। বোধস্বরূপ সর্বব্যাপী বলে সর্বস্থানে সে থাকতে পারে। এই গল্পের মধ্যে দিয়ে সত্যের মহিমা প্রকাশ করা হয়েছে। ছোট-বড় বা জয়-পরাজয়ের প্রশ্ন নেই এখানে। দু'জনেই সত্যের ঘনীভূত মূর্তি, সত্যকে প্রকাশ করে দিয়ে তা জানিয়ে দিচ্ছে।

মানুষের যে বস্তু দরকার তা এঁরা দিয়ে দেন। এঁরা প্রত্যেকের সঙ্গে মিশে আছেন, কিন্তু মানুষ সেই বিষয়ে সচেতন নয়। নিত্যবস্তু হারায় না। কাজেই তা কেউ নাশ করতে পারে না। দেশ-কাল তাকে বাঁধতে পারে না।

গুরু মহাত্মাগণ আসল বস্তু ধরিয়ে দেন, কিন্তু তা গ্রহণ করার জন্য কারওকে জোর করেন না। নিজের ভিতর থেকে যে পদ্ধতি বেরিয়ে আসে তা অতি উত্তম। মা তাই 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) দেখিয়েছিলেন যে, প্রত্যেকের ভিতরে আমি খেলে উঠব। প্রত্যেককে একই ছাঁচে ফেলা যায় না। আধ্যাত্মিক পথে নিজস্ব রুচি, ভাব, পরিবেশ, পরিস্থিতি, যোগ্যতা প্রভৃতি অনুসারে প্রত্যেকের মধ্যে সাধনা ও তার সিদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন ঢংয়ে প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা না-থাকলে সুষ্ঠু ভাবে সেই যোগ্যতার বিকাশ হতে পারে না। কারও প্রভাব কারও উপরে যেন না-পড়ে। কিন্তু কেউই কারওকে বাদ দিয়ে নয়। প্রত্যেকের অন্তর আপন পদ্ধতি আপনিই বেছে নেয়। বলপূর্বক যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় সত্যোপলব্ধির পক্ষে তা ভাল ফল দেয় না। প্রত্যেকের আত্মা স্বাধীন, কিন্তু কারও সঙ্গে কারওর বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব নেই। এক সত্য ভূমিতে, এক সত্য কারণে, এক সত্য দিয়ে সব জীবন গড়া।

সত্য হল সেই বস্তু যা সবার মধ্যে নিত্য একই ভাবে থেকে তাঁর মাহিমা প্রকাশ করে। তা প্রত্যেকের ভিতরে অনুভূত হয় এবং প্রত্যেকের ভিতরেই খেলে। এ ভাবে

যা-কিছুর সঙ্গে পরিচয় হয় তা-ই অনুভূতি। অনুভূতি দিয়েই অনুভূতিকে পাওয়া যায়। সত্যানুভূতির সাধনা আর কিছু নয়, লুকোচুরি খেলা। এই খেলার কেন্দ্র প্রত্যেকের ভিতরে আছে। তা আবিষ্কার করাই হল অনুভূতি লাভ করা। জীবনে যত দ্বন্দ্ব, সংশয়, গ্লানি, পরাজয়—সব অনুভূতির অংশবিশেষ। মন অতীত ঘটনার স্মৃতি ভুলে যায়। কিন্তু সব ঘটনার সাক্ষিরূপে আছে চৈতন্যস্বরূপ। তার মধ্যে সব জমা থাকে। তার জাত হল, সে স্বয়ংজাত। সে স্বয়ংপূর্ণ, কারণ সে নিজেকে দিয়েই নিজেকে পূরণ করে। সে স্বতঃসিদ্ধ নিত্য শুদ্ধ পবিত্রতম বস্তু। সে সিদ্ধ হয়েই আছে। তাকে আর নূতন করে সিদ্ধ হতে হয় না। সে স্বয়ংপ্রমাণ। সে সব কিছু প্রকাশ করে বলে তাকে প্রকাশ করার জন্য দ্বিতীয় কোনও বস্তুর প্রয়োজন হয় না। এ-ই হল লুকোচুরি খেলা। সত্যস্বরূপ নিত্য নিরঞ্জন। যত সুন্দর ও কুৎসিত প্রকাশ আছে সব তাঁর মধ্যেই। জ্ঞান-অজ্ঞানের মিলনভূমি তিনি স্বয়ং। তিনি না-থাকলে সুখ-দুঃখ কিছুই জানা যায় না ও অনুভব করা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে অনুমান করে কিছু বলা যায় না।

অনুভূতির অতীত আর কিছু আছে কি না, তা অনুমানসাপেক্ষ। অনুভূতির মধ্যে যা আছে তা-ই সবার কাছে সবচেয়ে নিকটতম। স্বস্থ সব সময় ছিল, আছে ও থাকবে। কী ভাবে? বোধে বোধময়স্বরূপ। যা-কিছু সব সত্যেরই প্রকাশ। প্রকাশ প্রকাশকের বাইরে যেতে পারে না বা প্রকাশকশূন্য হতে পারে না। সত্যের অণুতম প্রকাশও সত্য। অখণ্ড থেকে তা বিচ্যুত হতে পারে না। খণ্ড অখণ্ডের মধ্যে থেকেই খণ্ডরূপে প্রকাশ পায়। অখণ্ড এমনই বস্তু যে, তার মধ্যে যা-কিছু প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয়, তার পরিচয় অখণ্ডকে নিয়ে হয়, বাদ দিয়ে নয়।

২৪। ৮। ৭৫

২৩৯

পূর্ণের মধ্যে পূর্ণ জাত হয়। পূর্ণের থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে। ঋষিদের এই বাক্য অতি বড় সত্য। কাজেই ঋষিদের মাধ্যমে মানুষ যা পেয়েছে, তা প্রত্যেকের সম্পত্তি সে নিজেই পেয়েছে। এটা লাভ করার প্রশ্ন ওঠে না। লাভ করার অর্থ হল, যা ছিল না তা পেতে হবে। এটা ঠিক নয়। প্রত্যেকের হৃদয়কেন্দ্রে সেই বস্তু আছে। তার উপব আবরণ পড়েছে। সেই আবরণটা সরিয়ে দিতে হবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও এক মহাত্মার কাছে একজন সাধক এসে উপস্থিত হলেন। তিনি সকলের সঙ্গে যেমন প্রেম-ভালবাসাপূর্ণ ব্যবহার করেন তাঁর সঙ্গেও সেই রকমই ব্যবহার করলেন।

সাধক মহাত্মাকে জিজ্ঞাসা করলেন—ভগবানের জন্য আর কতকাল কাঁদব বলতে পারেন? যা হোক আপনি একটা ব্যবস্থা করুন।

মহাত্মা তার কথা শুনে বললেন—তুমি তো ভাগ্যবান। সাধক—এ সব কথা আমি শুনতে চাই না। এ রকম মিষ্টি মিষ্টি কথা আমি অনেকের কাছে শুনেছি। এ সব শুনে আমার কী লাভ হল?

মহাত্মা স্নেহ-ব্যাকুল কণ্ঠে তাকে বললেন—তুমি তাঁকে খুঁজে বেরিয়েছ, সত্যিই তুমি ভাগ্যবান। এই বলে তিনি আলিঙ্গন করতে গেলে সাধক ধরা দিলেন না। তিনি বললেন—এ সব জীবনে অনেক পেয়েছি, এবার কী করব তা বলুন, আমি আর পারছি না।

মহাত্মা—তুমি যাঁর জন্য কাঁদছ তিনি যে কত দীর্ঘকাল তোমার জন্য কেঁদেছেন তা কি জান! তাঁরই কান্নার ছিটেফোঁটা তোমার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, আর তুমি বলছ যে তুমি কেঁদেছ? কথা বলতে বলতে মহাত্মা সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর দু'নয়ন বেয়ে প্রেমাশ্রুধারা পড়তে লাগল। সেই দৃশ্য দেখে সাধকের ভাবান্তর হল।

সাধক বলল—আজ আমার সব সাধ মিটে গিয়েছে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আসল কথা কি জান, ভগবানকে পূর্ণরূপে সবাই চায় না। তিনি সকলের জন্য যুগ যুগান্তর ধরে কাঁদছেন আর মানুষ একটু কেঁদেই অহংকার করে। মহাত্মার সংস্পর্শে এসে সেই সাধকের জীবনে আমূল পরিবর্তন এল।

গুরু যখন আত্মা স্বয়ং তখন তদতিরিক্ত কিছু বা কেউ অসিদ্ধ। তাই বলা হয়, গুরু ছাড়া কিছু বা কেউ নেই অর্থাৎ এমন কেউ নেই যে গুরু ছাড়া বা গুরু অতিরিক্ত। যাঁর দ্বারা প্রত্যেক জীবন বিধৃত ও পরিচালিত হয় তিনিই হলেন আত্মা বা গুরু। গুরুর এমনই মহিমা যে, তিনি ব্যক্তি ও নৈর্ব্যক্তিক উভয়রূপেই আছেন। রূপ-নাম-ভাব যা থেকে পাওয়া যায়, যাঁর মধ্যে সব অবস্থান করে, যাঁর কৃপায় পূর্ণতা লাভের চেষ্টা জাগে এবং তার উপকরণ সংগৃহীত হয়, তিনিই হলেন নিত্যগুরু। যাঁর মধ্যে পূর্ণতা আস্বাদন করা যায় তিনিই হলেন আত্মগুরু। গুরু রূপময়, নামময়, ভাবময় ও বোধময় রূপে দর্শন দেন।

সবারই একদিন এই পরিবর্তন হবে এবং হতে বাধ্য। জগতে যা-কিছু হচ্ছে তাঁর কৃপা ও করুণাতেই হচ্ছে। তাঁর কৃপার বাইরে কোনও প্রকাশ, তা সে যতই ক্ষুদ্র বা মহৎ হোক না কেন, হতে পারে না। তবে তা অনুভব করার জন্য কয়েকটি প্রয়োজনীয় বস্তু সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। প্রথমত হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত রাখতে হয়। যারা উন্মুক্ত রাখে তাদের হৃদয়ে তাঁর কৃপা ও করুণাধারা নিরন্তর প্রবেশ করে। আর যারা হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত রাখে না তাদের অন্তরে তা প্রবেশের সুযোগ পায় না। এরপর প্রশ্ন উঠতে পারে, কেউ উন্মুক্ত রাখে, কেউ রাখে না—এর কারণ কী? এর উত্তরে বলা যায়, যারা হৃদয়দ্বার খোলা রেখেছে তারা তার কৃপাশক্তিতেই রেখেছে। তিনি যার মধ্যে কৃপা করে যা প্রকাশ করেন, তা-ই তার মধ্যে প্রকাশিত হয়। প্রস্তুতির ক্রম অনুসারে প্রত্যেকের মধ্যে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে চলেছেন। এই কারণেই অন্তরের বিকাশকে কেউ জোর করে বন্ধ রাখতে পারে না। তাঁর কৃপায় অজ্ঞানীর জ্ঞান হয়, অবিদ্যা বিদ্যা হয়। যুক্তিতর্ক তাঁরই দান।

২৪। ৮। ৭৫

২৪০

দেহের সঙ্গে চৈতন্যের যে দ্বন্দ্ব-বিরোধ তা মানুষের মনকে টেনে রাখে। তাকেই বলে দেহাত্মবুদ্ধি বা বিষয়াসক্তি। নিত্যবস্তুর উপরে পোশাকের হেরফের হয় বলে মন জন্ম জন্মান্তর ধরে ঘুরে মরে, কিন্তু আসল বস্তু ধরতে পারে না।

গুরু দত্তাত্রেয় যিনি কীটপতঙ্গ, পশুপাখি থেকে আরম্ভ করে কত লোককে যে গুরুপদে বরণ করেছিলেন তার ঠিক নেই। মাছরাঙা পাখির একাগ্রতা তাঁকে দিয়েছিল মনঃসংযমের শিক্ষা। মাকড়সার বারবার সুতোর উপরে ওঠার চেষ্টা দিয়েছিল তাঁকে ধৈর্যের শিক্ষা। তাঁর পিতা ছিলেন অত্রি ঋষি এবং মাতা অনসূয়া। পিতা যেমন অসাধারণ ছিলেন, সেইরূপ মাতাও ছিলেন অনন্যসাধারণ। সতীত্ব ও পতিব্রতায় তাঁর সুনাম ছিল। তিনি ছিলেন সতী অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের আদর্শ। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একবার অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষা করার জন্য তার গৃহে অতিথির ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হলেন। অনসূয়া তাঁদের সেবা আপ্যায়নের জন্য উদ্যত হলে তাঁরা বললেন—একটিমাত্র শর্তে আমরা তোমার সেবা গ্রহণ করতে পারি। তা হল আমাদের সামনে তোমাকে বিবস্ত্র হয়ে পরিবেষণ করতে হবে। অনসূয়া শুনে ভাবলেন, এ তো কঠিন শর্ত! এদিকে অতিথি নারায়ণকেও তো ফিরিয়ে দিয়ে অসন্তুষ্ট করতে পারেন না। তখন তিনি বললেন—ঠিক আছে, তাই হবে। তাঁরা অনসূয়ার কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। তাঁরা ভাবল, এ যে দেখছি রাজি হয়ে গেল! অত্রি ঋষি এই সংবাদ জানতে পারলে ব্রহ্মার ব্রহ্মত্ব, বিষ্ণুর বিষ্ণুত্ব আর মহেশ্বরের সব ক্ষমতা কেড়ে নেবেন। কারণ অত্রি ঋষি সেই ক্ষমতা রাখেন।

ঋষিপত্নীরও ছিল কিছু ঐশ্বরিক ক্ষমতা। তিনি পতির কমণ্ডলু থেকে জল নিয়ে তাঁদের গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা তিনজন তিনটি বালকে পরিণত হয়ে গেলেন। বালকের কাছে মাতার কোনও লজ্জা থাকে না। মাতৃপ্রেমে কামের গন্ধ নেই। এই তিনমূর্তি পরে এক মূর্তিতে পরিণত হয়ে গেল। তিনিই হলেন জগদ্‌গুরু দত্তাত্রেয়। অনসূয়ার কৃপা ছাড়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ক্ষমতা নেই স্বস্বরূপে ফিরে আসেন। এখানে মাতৃশক্তির মহিমার একটি দিককে তুলে ধরা হয়েছে। মা হলেন সেই শক্তি যাঁর শক্তিতে সবাই শক্তিমান। তিনিই আত্মদান করে সব প্রকাশ করেন। এই মা কোনও নারী নন। নারীরূপ হল তাঁর প্রকাশভঙ্গিমা। দত্তাত্রেয়র মহিমা উপলব্ধি করা মনুষ্যবুদ্ধির সীমানার বাইরে। দত্তাত্রেয় তাঁর পিতামাতা ও অন্যান্য অনেকের কাছে শিক্ষালাভ করে অতি অল্প বয়সেই গুরুপদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষার মূল তত্ত্ব ছিল, সব কিছুকে সত্য বলে মেনে নেওয়া। পৃথিবীর প্রতিটি প্রকাশ থেকে সার বস্তু চয়ন করে তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।

২৪। ৮। ৭৫

২৪১

বোধের তত্ত্ব এমনই বস্তু যা রূপ, নাম, ভাব সম্বন্ধে সচেতনতা এনে দেয়। বোধের বোধ হল মানুষের আসল সম্পদ—যার কণামাত্র হল অন্যান্য স্বরূপ। এগুলি তার থেকেই জাত। বোধের বোধ তৈরি হলে অষ্টসিদ্ধি আপনা থেকেই ছুটে এসে সেবা করে। আর এর বিপরীত হলে অর্থাৎ সাধক সিদ্ধির পিছনে ছুটলে তা আসমুদ্র হিমাচল পর্যন্ত ছুটিয়ে মারে। শক্তি বিভূতির জন্য সাধনা করলে অনেক দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়।

বাবার বাবাকে পেলে অমৃত সম্পদ আপনিই পাবে। অমৃতের সন্তান অমৃত সম্পদ থেকে কেন বঞ্চিত হবে? তাঁর কাছে গিয়ে বলতে হবে—বাবা, আমাদের কী দোষ বলে দাও। গুরু মহাত্মাদের নির্দেশ মেনে চলতে না-পারলেও অন্তত তাঁদের কাছে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতে হয়।

এক ভবঘুরে বেকার যুবক একবার গিয়েছিল এক মহাত্মার কাছে চাকরির জন্য। তিনি বললেন—আমি ভিক্ষাভাণ্ড নিয়ে ঘুরি, তোমাকে আমি কী চাকরি দেব? যুবকটি বলল—আপনার অনেক বড় বড় শিষ্য আছে, তাদের বলে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিন। মহাত্মার দয়ালু প্রাণ। তিনি ছেলেটিকে ফিরিয়ে দিতে পারলেন না। তিনি তাকে বললেন—ঠিক আছে, কাল এস।

পরের দিন যুবকটি মহাত্মার সঙ্গে দেখা করতে এলে তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার বিদ্যা কতদূর? যুবক বলল—আমি ম্যাট্রিক পাশ করেছি। মহাত্মা তাকে বললেন—তুমি কত টাকা মাইনে আশা কর? সে বলল—তিনশো টাকা। এই কথা শুনে মহাত্মা বললেন—আজকাল B.A. পাশ ছেলেরাই তিনশো টাকার চাকরি পায় না আর তুমি কী করে এত টাকা আশা কর? আচ্ছা, কাল এস। যুবক শুনে একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল—আপনি আজকে আসতে বলেছিলেন তাই এসেছি। ঠিক আছে চাকরি যখন আমার দরকার তখন কাল আবার আসব।

পরদিন সে আরেকজন বন্ধুকে সঙ্গে করে নিয়ে এল। অপর যুবকটি মহাত্মাকে বলল—আপনি ওকে চাকরি দেবেন বলেছেন, আমাকে দেবেন না? মহাত্মা বললেন—আমার কাছে তো একটি কাজ আছে। তোমাকে পরে দেব। প্রথম যুবকটি জিজ্ঞাসা করল—মাইনে কত? মহাত্মা বললেন—একশো টাকা। ছেলেটি মুখ বেঁকিয়ে বলল—মাত্র একশো টাকা। এ তো আমার খাওয়াদাওয়া করতেই সব খরচা হয়ে যাবে। মহাত্মা বললেন—তোমার এক পয়সাও যেখানে রোজগার নেই সেখানে একশো টাকা কি কম হল? ছেলেটি তখন বলল—ঠিক আছে, কাজটা কী একটু শুনি। মহাত্মা বললেন—প্রত্যেকদিন এক ঘণ্টা করে তোমাকে এখানে এসে হরি নাম করতে হবে। এর জন্য তুমি মাসে একশো টাকা পাবে। শিষ্যদের বলে তিনি ছেলেটির জন্য এই ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শিষ্যরাও গুরুবাক্য মেনে সবাই মিলে একশো টাকা তুলে দিতে রাজি হয়েছিল। হরি নাম করতে হবে শুনেই যুবকটি চোখ-মুখ বিকৃত করে বলল—ওঃ হরি নাম করতে হবে! সে বন্ধুকে বলল—চল যাই এখান থেকে। মহাত্মা বুঝলেন যে, আসলে তার প্রয়োজন নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—ছেলেটির background নেই বলে ভগবৎ পথে আসার বা সাধুসঙ্গ লাভের সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সে তা গ্রহণ করতে পারল না। বুদ্ধিমান ছেলে হলে তক্ষুনি নিয়ে নিত এই ভেবে যে, তার দুই দিকই হবে। মানুষ গরিব হতে পারে, কিন্তু বিবেকশূন্য বা মতিচ্ছন্ন হবে কেন?

মহাত্মারা জানেন, সামান্য একটি গুণ অর্জন করতে কত পরিশ্রম করতে হয়। অনাহারে, অনিদ্রায় সারাজীবন পাত করার পর হয়ত সামান্য একটু বোধ তাদের মধ্যে খেলে। এটা ভগবানের দান। জাগতিক কোনও বস্তুর মূল্য দিয়ে তা মূল্যায়ন করা যায় না এবং এই মূল্যবান বস্তুর স্বতন্ত্র মর্যাদা রক্ষা করার জন্য মহাত্মাগণ এ সব বিতরণের বিষয়ে খুব কড়া হন, মরে গেলেও তাঁরা কিছু দিতেন না। কিন্তু বর্তমান যুগে মানুষের স্বভাব হল, যোগ্যতা থাকুক আর না-ই থাকুক সেই জিনিস তাদের চাই। না-দিলে শিক্ষকদের মেরে শেষ করে দেয়। আধ্যাত্মিক জগতেও এর ব্যতিক্রম নেই। যিশু, গান্ধি এঁদের জীবনেও একই পরিণতি লাভ হয়েছিল।

৯। ৯। ৭৫

২৪২

আত্মা নিজেকে দেখতে, পেতে ও জানতে চায়। আত্মা নিজেকে বহুরূপে পেতে চায় বলে বহু বেশ ধারণ করে এবং বহু বেশ ধারণ করেও তাঁর স্বাদ মেটে না।

ধ্যানে কী হয়? নিজেকে নিজেই দেখে। সাধক খুঁজতে খুঁজতে নিজেকেই পায়। আর যখন পায় না, সেটাও তার নিজেরই অপর একটি রূপ। শুধু নির্গুণে তৃপ্তি হয় না। তাই জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেমের আস্বাদন চায়। জেনে হয় না। তাই শিব, শক্তিকে বলেন—তোমাকে ছাড়া আমার চলে না। ওখানে সব সময় বসে থাকতে ভাল লাগে না, তাই নেমে আসি। তুমি ছাড়া আমায় গাঁজা কে দেবে? কাজেই নেমে এসে শিবকে শক্তির সাহায্যই নিতে হয়।

মাও এ রকম এক জায়গায় বলেছেন—সংসার যখন ভাল লাগে না, তখন সেই যে তুমি ব্রহ্মতত্ত্ব বলেছিলে সেটাই ভাবি। ভাবতে ভাবতে মন তলিয়ে যায়। দু'জন দু'জনের পরিপূরক। এই যে দুই, বড় অপূর্ব! এমনভাবে দু'জনে জুড়ে রয়েছেন, কখনওই পৃথক করা যায় না। অতি উচ্চ অবস্থার দু-একজন সাধকের পক্ষেই তা অনুভব করা সম্ভব।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও এক উচ্চকোটির মহাত্মা পঞ্চাশ বছর ধরে সাধনা করেছেন 'আমার' ব্যবহার করবেন না-বলে। অভ্যাস করতে করতে তাঁর এমন হয়েছে যে, কোনও অবস্থাতেই 'আমার' আর মুখ দিয়ে বেরোয় না। মা তা দেখে বললেন—দাঁড়া, এক খেলা দেখাব! মা এমন এক কাণ্ড করলেন যে, সাধকের পঞ্চাশ বছরের সাধনা এক নিমেষেই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। সর্বোত্তম সাধকগণ, যাঁরা মহাত্মাকে মাথায় তুলে রেখেছিলেন, তাঁদের কাছে মহাত্মা একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলে ফেললেন—এটা আমার

ভাল লাগে না। তাঁর এই কথা শোনামাত্র চার দিক থেকে সাধকরা বলে উঠলেন—কী বললেন? পঞ্চাশ বছর ধরে যা ব্যবহার করেননি আজ তা করে ফেললেন! মহাত্মা তখন লজ্জিত হয়ে তাঁদের বললেন—আমার অপরাধ হয়ে গিয়েছে। পরে তিনি স্বীকার করলেন যে, এটা মায়ের জিনিস, মায়ের মহিমা। মায়ের কাছে সব সমর্পণ করে তিনি মাথা হেঁট করে রইলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ব্রহ্মশক্তি যখন লীলা করেন তখন ব্রহ্মকে নানা ভাবে প্রকাশ করেন। ব্রহ্ম তখন চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি উভয়ই সমান। দেবদেবী প্রভৃতি সব সৃষ্ট বস্তুই ব্রহ্মশক্তিকে পূজা করে। ব্রহ্মও শান্তভাব দিয়ে ব্রহ্মশক্তির সেবা করেন। শক্তি একটু সরে গেলে সত্তা নিজেকে রাখতে পারে না। সত্তা-শক্তিকে কোনও ঋষি পৃথক বলতে চাননি, তবু তত্ত্বচর্চা করতে গিয়ে পৃথক হয়ে যায়। কেউ কারওকে বাদ দিয়ে সিদ্ধ বা পূর্ণ নয়। এর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় আচার্য শঙ্করের জীবনে। অতবড় একজন তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানী পণ্ডিত, তাঁর মধ্যে প্রেমভক্তির এমন সমন্বয় হয়েছিল যে, তাঁর স্তোত্রগুলি পাঠ করলে চোখে জল আসে। তাঁর জ্ঞানের তত্ত্ব যেমন মনকে উচ্চ ভূমিতে পৌঁছে দিতে পারে, তেমনই ভক্তিরসের স্তবগুলি মনকে একেবারে গলিয়ে দিতে পারে। এই হল তাঁর মহিমা। তাঁর প্রেমে বিগলিত তনু গঙ্গার স্তোত্র করতে করতে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গলে গিয়েছে। তাঁর ঐ স্তোত্রগুলি পড়লে মনে হয় যেন গঙ্গার বক্ষেই আছি, গঙ্গা দূরে নেই। গোবিন্দের ভজনেও তাই হয়েছে। গোবিন্দের সঙ্গে মিশে যেন একাকার হয়ে গিয়েছেন।

২১। ৯। ৭৫

২৪৩

রোজ রোজ যে ঝাল খায়, সে রুচি পাল্টালে ভাল জিনিস দিয়েই পাল্টায়। শুক্তো খেলেও তা খারাপ হবে কেন? নিজের ভিতর থেকে নিজে প্রকাশ করে নিজেকে নিজেই চাইছে এবং তদনুরূপ আস্বাদন করছে। এই হল অনুভূতি।

এক গরিব পাগল খুব সুন্দর কথা বলেছিল। তারা তিন বন্ধু ছিল। একজন ছিল পয়সাওয়ালা লোক কিন্তু উদার মনোভাবাপন্ন। আরেকজন ছিল সাধু। বহুকাল যাবৎ পাহাড়পর্বতে সাধনভজন করে সে ফিরে এসেছে। বড়লোক বন্ধু তাকে আশ্রম বানিয়ে থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। একদিন তিনজন চুপ করে বসে আছে। বড়লোক বন্ধু বলছে—ভগবানের কী বিধান দেখ তিনজনকে তিন রকম বানিয়েছেন। ওর কোনও দিকেই কিছু হল না। এই কথা শুনে গরিব বন্ধুটি বলে উঠল—আমার কষ্ট আছে তোমাকে কে বলল? আমার যেমন একটা অভাব আছে তেমন একটা ভাবও আছে। সেই ভাব হল সমপদের। আমার টাকার অভাব থাকা সত্ত্বেও সমপদের ভাব আছে। অভাবের মধ্যেও আমি তুরীয় ভাবে আছি। তুমি টাকার ভাবে আছ, আমি ক্ষয়ের ভাবে আছি।

তার কথা শুনে সাধক বন্ধু বলল—সাধনভজন করে অনেক তত্ত্ব লাভ করেছি, কিন্তু ওর মতো অত সুন্দর ভাব তৈরি করতে পারিনি। ওর সব খালি, ভিতরে সব পরিষ্কার। তখন সে গরিব বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করল—তাহলে ভগবানের মহিমা কী? সে বলল—তার মহিমা এক দিকে মাপা যায় না। ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখলে একটি মাপকাঠি পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়ের গভীরে কিছু পাওয়া যায় না। তার পরে প্রশ্ন আসে ভিতরের খবর কী করে পাওয়া যায়? পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যতখানি মিল, ঠিক ততখানি অমিল আছে—এই ধারণার দ্বারা মিলের মধ্যে অমিলকে বসিয়ে এবং অমিলের মধ্যে মিলকে বসিয়ে ভাবনা করলে তা সম্ভব হয়। তৃতীয় উপায় হল সাধনার যে কোনও লক্ষ্যকে ধরে এবং লক্ষ্যের মধ্যে ভাবকে ধরে পুনঃপুনঃ লক্ষ্য (দর্শন) করা।

এ ছাড়া আর কিছু আছে কি না তার উত্তরে বলা যায় হ্যাঁ আছে। যদি কেউ পুনঃপুনঃ প্রশ্ন করে—তদতিরিক্ত কী আছে? তাহলে বলতে হয় তা থাকা কী করে সম্ভব! যতবার অতিরিক্ত বলছ ততবারই আছে। তাহলে অনাস্থা হয়ে যায়। আছে বললেই অনাস্থা আসে। তারই একভাব অনাস্থারূপে প্রকাশ পায়।

২১। ৯। ৭৫

২৪৪

এই যে মহাপূজা শরৎকালে হয় তাতে পৃথিবীর প্রায় সব সৃষ্ট বস্তুই লাগে। তবে তার অভাবে বিকল্প ব্যবস্থাও রাখা আছে। যখন কতগুলি বস্তু পাওয়া যায় না, তার জন্য কতগুলি মন্ত্র আছে, সেই বস্তুর অভাব তখন মনন দ্বারা পূরণ করতে হয়। যেমন শ্রীরামচন্দ্র নীলকমলের অভাবে নয়নকমল দিতে চেয়েছিলেন। মনে শুভ সংকল্পের দ্বারা মানস পূজা হয়। পূজার অনেক স্তর আছে। একটি হল স্থূল স্তর, যার সঙ্গে সকলেই পরিচিত। তারপর আছে সূক্ষ্ম স্তর, সূক্ষ্ম ভাব দিয়ে সেই পূজা হয়।

এ ছাড়া জীবন্ত পূজা হয়। দুর্গাপূজার সময় তিন দিন মাকে পূজার আসনে বসিয়ে পূজা করে—এ রকম দৃষ্টান্তও আছে। সেখানে সন্তানদের সঙ্গে বাবাও মাকে অঞ্জলি দেয়। কী অপূর্ব সংকল্প, কল্পনা করা যায় না! আদর্শ জীবন যাঁরা আবিষ্কার করে গিয়েছেন, তাঁরাই সর্বোত্তম বস্তু লাভ করেছেন। ভগবান জীবনের মধ্যে না-আসলে তাঁকে প্রত্যক্ষ ভাবে পাওয়া যায় না। জীবনদেবতার পরিচয় লাভের জন্য বস্তুর সাহায্য নিতে হয়।

নিজের মা-বাবার মধ্যে যিনি জগৎ পিতা বা মাতার ধ্যান করেন, তিনিই হলেন মহাসাধক। একসময় 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) শুধু এই কথাই বলার ছিল। ভগবান সম্বন্ধে কেউ 'এর' কাছে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বলা হত—দু'জন প্রত্যক্ষ দেবতার খবর পাওয়া গিয়েছে! তাঁরা হলেন নিজের মা ও বাবা। এমনভাবে এগুলি প্রকাশ হত যে, লোকে শুনে বলত, 'এ' একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছে। কৈলাসাধিপতি পিতা হয়ে আসেন এবং পার্বতী মাতা হয়ে সংসার পাতেন। তাঁরাই হলেন ঘরে ঘরে জীবন্ত দেবতা। তাঁদের মধ্যেই আবার লক্ষ্মী, নারায়ণ, শিব, দুর্গাকে দেখা হয়েছে।

জীবনের মধ্যে বাস করে যদি এই অনুভূতি না-হয়, তাহলে কল্পনার মধ্যে থাকতে 'এ' রাজি নয়। প্রত্যেকের কাছে প্রত্যেকের জীবন যখন প্রিয়, তখন পূর্ণকে দিয়েই পূর্ণের সেবা করতে হয়। তাতেই পূর্ণতা লাভ করা যায়। মা-বাবার সঙ্গে সন্তানের যে সম্পর্ক তা imposition নয়, একেবারে জন্মগত সূত্রে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা। কাজেই কতখানি গভীর সম্বন্ধ এর মধ্যে আছে তা সহজেই অনুমেয়। যে ক'টা জীবন নিয়ে এই জিনিস খুলেছে, তার সঙ্গে সবাই পরিচিত।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও একজন মহামাতৃসাধক তাঁর শিষ্যকে একদিন বললেন—আমার কাছে এসেছিস কেন? শিষ্য বলল—তুমি কি মায়ের সঙ্গে কথা বল? মহাত্মা বললেন—তুই বলবি? তিনি তখন শিষ্যকে বললেন—তুই নিজের মায়ের সঙ্গে কথা বলিস? শিষ্য তখন মহাত্মার কাছে স্বীকার করল যে, সে কিছুদিন যাবৎ নিজের মা-বাবাকে বরদাস্ত করতে পারছে না। মহাত্মা সব শুনে শিষ্যকে বললেন—বাবা-মা যদি তুষ্ট না-হন, আমি বহু চেষ্টা করলেও মা তোর সঙ্গে কথা বলবেন না। তুই আগে তাঁদের তুষ্ট করে আয়। মহাত্মার কথা মতো শিষ্য তাঁর নির্দেশ পালন করে পনেরো বছর বাদে উপলব্ধি করল যে, কত বড় সত্য তার হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সে ধরতে পারেনি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—বাবা-মা রূপে তিনি নিজেকে প্রকাশ করে নিজেরই বৃহত্তর অংশকে সন্তানের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন। তারপর তাঁদের মাধ্যমে আরও বৃহত্তর অংশের সঙ্গে যুক্ত হবার ব্যবস্থা করেছেন। শিবভক্ত, মাতৃভক্তদের এঁরাই হলেন বড় সম্পদ। শিবভক্ত পিতাকে শিবরূপে নেয় এবং মাতৃভক্ত মাতাকে জগন্মাতারূপে গ্রহণ করে। সবচেয়ে নিকটে যাঁরা আছেন তাঁরা হলেন মা-বাবা। আত্মা তো পরের কথা। ভগবানই যে মা-বাবা তা নিজের মা-বাবাকে দিয়েই অনুভূত হয়।

২৮। ৯। ৭৫

২৪৫

মায়ের প্রেম ও আত্মদান সত্যের জীবন্ত উপমা। পিতামাতা সন্তানের কল্যাণের জন্য নিজেদের জীবনও বিসর্জন দিতে পারেন। পিতামাতার পর গুরুই একমাত্র শিষ্যের মঙ্গল ও কল্যাণের জন্য আত্মোৎসর্গ করতে পারেন। এই জন্যই ঋষিদের মুখে উচ্চারিত হয়েছে—

"গুরোর্মধ্যে স্থিতামাতা মাতৃমধ্যে স্থিত গুরুঃ
গুরুর্মাতা নমস্তেঽহস্তু মাতৃ গুরুং নমাম্যহম্।।"

উভয়ের লক্ষ্য এক। আপন সন্তানের কল্যাণচিন্তাই হল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। আপনবোধকে তাঁরা ছড়িয়ে দেন বলেই বলতে পারেন—সবাই আমার সন্তান। এই বাণী হল গুরুবাণী, মাতৃবাণী। জগন্মাতাও সেই কথাই বলেন—সবার পুষ্টি, তুষ্টি আমিই দিয়ে রেখেছি। এই হল আত্মবাণী, হৃদয়বাণী।

মানুষের বড় সৌভাগ্য যে, সে মনুষ্যজীবন পেয়েছে। মানুষের মধ্যে প্রকাশ পায় অনন্ত মহিমা। মান ও হুঁশ তার মধ্যেই দেওয়া আছে। তার মধ্যেই প্রেম উছলে পড়ে। সব প্রাণীদের মধ্যেই যেমন মাতৃপ্রেম ও আত্মদানের মহিমা আছে তেমনই আবার বিকল্প উদাহরণও দৃষ্ট হয়। কারণ পূর্ণতার মধ্যে সব রকমই থাকবে।

চিদানন্দময়ী মা এক সাধককে এক রাতে দর্শন দিয়ে কৃপা করেন। সেই সাধক দর্শন লাভের পর গৃহত্যাগের সংকল্প করেন এবং নিজের গর্ভধারিণী জননীর কাছে সেই সংকল্পের কথা বলে আশীর্বাদ ভিক্ষা করেন। তাঁর মা সব শুনে বললেন—তুই আমার একমাত্র হৃদয়ের ধন। তোকে আশীর্বাদ না-করেও পারছি না। আবার আশীর্বাদ করতেও প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। এই অবস্থায় আমি কী করব?

সাধক বললেন—তোমার আশীর্বাদ না-পেলে আমার যাওয়া হবে না। আর যদি আশীর্বাদ কর তবে কোনও বাধা আসবে না।

মা—আশীর্বাদ নিশ্চয়ই করব, কোনও বাধা দেব না, কিন্তু তার আগে তোকে একটি কথার উত্তর দিতে হবে। সেই চরম বস্তু লাভ করার পরে কী তোর এই মায়ের কথা মনে থাকবে? এই উত্তরের জন্যই আমি অপেক্ষা করছি।

পুত্র—তা তো আমি জানি না!

মা তখন তাঁকে আরেকটু তৈরি হয়ে নিতে বললেন। সেই পরমপিতাই প্রত্যেকের মা-বাবারূপে আসেন। আবার এই বাবা-মা কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন্তানকে সংসারে টেনে রাখেন বা আশীর্বাদ করেন। এই উভয় দৃষ্টান্তই দেখা যায়।

জীবভাব দিয়ে দিব্যভাবের আস্বাদন পাওয়া যায় না। আবার পূর্ণ দিব্যভাবে জীবভাবের অস্তিত্ব থাকে না। এই তত্ত্বের পরিপ্রেক্ষিতেই মা তাঁর সাধক সন্তানকে বলেছিলেন—বর্তমান অবস্থা থেকে যখন ঐ উচ্চতর অবস্থায় যাবি তখন এই বর্তমান বাস্তবতার মূল্য তো হারিয়ে ফেলবি! যাতে হারিয়ে না-ফেলিস সেই জন্য আরও প্রস্তুত হয়ে নে।

সাধক সন্তানকে এ রকম বলার তাৎপর্য হল—রাতের তৃতীয় প্রহরে মা সন্তানকে আশীর্বাদ করে বলতেন—তোর নূতন পথের যাত্রা জয়যুক্ত হোক। দিনের বেলায় খাবার দিয়ে বলতেন—তোর দেহ, প্রাণ, মন সুস্থ থাকুক।

মাকে এরকম ভাবে আশীর্বাদ করতে দেখে সাধক একদিন জিজ্ঞাসা করলেন—মা তুমি দিনের বেলায় এক রকম বল এবং রাতে আরেক রকম আশীর্বাদ কর। এই দু'টির মধ্যে কোনটা ঠিক?

এর উত্তরে মা বলেছিলেন—রাত আর দিন সমান না-হলে সিদ্ধিলাভ করবি কী করে?

পরে গুরুর কাছে বেদান্ত অধ্যয়ন করতে গিয়ে ঠিক এই মন্ত্রই সাধক পেলেন যে, দিন ও রাতকে সমান করতে হবে। যে কোনও শাস্ত্র পড়েই তিনি দেখতে পান যে, মা পূর্বে তাঁকে একটি একটি করে সব কিছুই শিখিয়েছেন। তাই শাস্ত্র পাঠের সময় তাঁর মায়ের কথা মনে পড়ে যায় এবং যখন যা অনুভূত হয় তার সঙ্গেও মায়ের কথা মিলে যায়।

অবশেষে সাধক শাস্ত্রের সব তত্ত্ব লাভ করে গুরুর আসনে বসবার যোগ্যতা লাভ করলেন। গুরুকে প্রণাম করার পরে শিষ্যের মুখ দিয়ে মাতৃস্তব বেরিয়ে এল।

গুরু বললেন—আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হয়েছি। গুরুদক্ষিণাও তুমি দিয়েছ এবং সব ঋণও তুমি শোধ করেছ। গুরু তাঁকে সর্বান্তঃকরণে অমূল্য সম্পদের পূর্ণ অধিকারী করে দিলেন। তারপর বললেন—তুমি শেষে যে স্তব পাঠ করলে তার নিশ্চয়ই কোনও তাৎপর্য আছে।

সাধক বলল—হ্যাঁ আছে। মাকে এই চরম অনুভূতির প্রসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর আশীর্বাদেই তা প্রকাশিত হয়েছে যথাকালে।

গুরু তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তুই সত্যের সত্য উপলব্ধি করেছিস, আর আমি সত্যকে উপলব্ধি করেছি। মধুরের পরেও মধুর আছে।

এই সংসার উপলব্ধি হলে সত্য আরও মধুর হয়ে যায়। শিষ্যের এই চরম সত্যের উপলব্ধিতে গুরু যে কতখানি আনন্দ পেয়েছেন তা সহজেই অনুমেয়। সাধকের মা-ই তার সিদ্ধি লাভের মূলে। মাকে তিনি কথা দিয়েছিলেন সেই জন্য আবার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। মাকে প্রণাম করার পরেই তাঁর মুখ থেকে একটি সুন্দর স্তব প্রকাশ পেল—

"ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব।
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব।
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব।।"

এই স্তবটি প্রকাশ করে মহাসাধক অনুভূতির গভীরে ক্ষণকালের জন্য ডুবে গেলেন। তাবপর অনুভূতির জ্যোতিতে ঝলমল অন্তরে, তাঁর উজ্জ্বল মুখাবয়বে ফুটে উঠল অদ্বয় আত্মবোধের আরেক সূত্র—

"স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন।"

সঙ্গে সঙ্গে তিনি গেয়ে উঠলেন—"সর্বাত্মকোঽহম্", "সর্বোঽহম্", "সর্বশূন্যোঽহম্", "সর্বাতীতোঽহম্"।

সেই ভাবে কিছুক্ষণ স্তব্ধ, মৌন ও স্থির থেকে সাধক অখণ্ড ভূমা 'আমিবোধে' প্রবোধিত হয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন—

"অখণ্ড ভূমা সর্বসম পরমতত্ত্ব স্বানুভবসিদ্ধ
সচ্চিদানন্দ পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পরমেষ্ঠি গুরুরহম্।
অহং উর্ধ্বস্তাৎ অহং অধঃস্তাৎ অহং পশ্চাৎ
অহং পুরস্তাৎ অহং বামতঃ অহং দক্ষিণতঃ
অহং অন্তঃস্থ চ বহিঃস্থ সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠামি নিত্যাদ্বৈত কেবলোঽহম্।।"

পরমাত্মবোধের মূর্তি তাঁর মধ্যে তখন স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্ত হচ্ছে, তাই তিনি আবার ব্যক্ত করলেন--"সর্বগত্বাৎ অনন্তশ্চ স্বৈব অহম্ অবস্থিতম্ মত্তঃ সর্ব্বং

অহমেব সর্ব্বং ময়ি সর্ব্বং সনাতনে। অহমক্ষয় নিত্য পরমাত্মাত্মসংস্থিতং ব্রহ্মাত্ম সঙ্গীতম্। অহমাদি চ মধ্য চ পরতঃপুমান্।"

পরম অদ্বয়বোধে প্রতিষ্ঠিত শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বসংবেদ্য স্বানুভবসিদ্ধ মহাসাধক আত্মানন্দে বিভোর হয়ে আবার বললেন—

"নিরুপমম্ অনাদিতত্ত্বম্ ত্বমহমিদমদঃ ইত্যাদি কল্পনা দূরম্।
নিত্যানন্দ একরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাঽহম্।।"

"অখণ্ড একরসং বস্তু সচ্চিদানন্দলক্ষণ
বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বপ্রভঃ দ্বৈত বর্জিতোঽহম্।।"

এই মহাসাধক পরমধন্য ও কৃতকৃত্য হয়ে পরম অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মবোধের মহিমা কীর্তন দ্বারা সদ্‌গুরুর দক্ষিণা প্রদান করলেন। এই হল পরমার্থ তত্ত্বসিদ্ধির ফলশ্রুতি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এগুলি যে কত বড় মন্ত্র ভাবা যায় না, যে মন্ত্র নূতন প্রাণের সঞ্চার করে, শুকনো হৃদয়ে ভাবের সঞ্চার করে। অনেক গভীরের তত্ত্ব তিনি 'একে'(নিজেকে নির্দেশ করে) দেখিয়েছেন। তাঁকে বলা হয়েছে—এগুলি নিয়ে 'এ' কী করবে? তুমি থেক শয়নে, স্বপনে, প্রতিটি স্পন্দনে। সব যখন তুমিই দাও, তখন ভুলিয়েও তুমিই দাও। ওটা করো না। যখন যেখানে দেহ বানাও, তোমার ঐ স্মৃতিটুকু গেঁথে দিও। ভূমিষ্ঠ হবার সঙ্গে সঙ্গে এবং সচল হয়ে থাকার মধ্যেও তুমিই থেক।

এই মাকে খুঁজতে যেতে হয় না, সব কিছুর মধ্যেই তিনি আছেন। এক বৃদ্ধ প্রবীণ ত্যাগ মার্গের সন্ন্যাসীর সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য 'এর' যোগাযোগ হয়েছিল। তাঁর কঠিন হৃদয় ও ভীষণ দাপট আছে বলে একজন জানিয়েছিল। তাঁর এ রকম স্বভাবের জন্য অনেকেই তাঁর কাছে যেতে ভয় পেত। তিনি 'একে' কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। উত্তরে বলা হল—কিছু জানি না। শুধু 'মা, মা' বেরোল। তিন-চারটি প্রশ্নের পর ঐ একই কথা শুনে তিনি বললেন—হুঁ। 'এর' চার দিকে তিন-চারবার ঘুরে কী দেখলেন কে জানে! 'এর' চোখ দিয়ে জল পড়ছিল। মা যে-ভাবে শিশুকে আদর করে তিনি সে-ভাবে 'একে' আদর করলেন। তাঁর চোখ দিয়েও জল পড়ছিল। তিনি বললেন—ঠিক বেদান্তের মতো। সার বস্তু তুমি পেয়েছ! প্রেমের অশ্রুর এই হল মহিমা এবং দুঃখের অশ্রুর অন্য মহিমা। তিনি 'এর' মাথায় চুমু দিলেন। 'এর' মুখ থেকে তখন একটি মাতৃসংগীত বেরোল। তা শুনে তিনি ছোট শিশুর মতো হাসতে লাগলেন। অথচ শোনা যায় তাঁর কঠিন হৃদয়ের কথা। সঙ্গে যারা ছিল তাদের বলা হল—তাঁর মধ্যে দিয়ে মা তাঁর এক স্বরূপ দেখিয়ে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ মাতৃভাবে তাঁর সঙ্গে কাটল।

এ রকম অনেক ঘটনা আছে যা প্রেমকে প্রত্যক্ষরূপে ধরিয়ে দেয়। পিতামাতার ঋণ শোধ করা যায় না, গুরুর ঋণ তবু শোধ করা যায়। গুরু আসনে বসিয়ে দিলে শিষ্য তাঁর সঙ্গে মিশে যায়। এই জন্য জগদ্‌গুরু সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী আচার্য শঙ্কর নিজ

হাতে মায়ের কাজ করলেন। আহা কী অপূর্ব! শঙ্কর তুমি এই জায়গায় (নিজ বক্ষদেশ দেখিয়ে) থাকবে। তুমি ব্রহ্ম উপলব্ধি করে জগৎকে দীক্ষিত করে গিয়েছ, আবার মাকে পাশে রেখে মাতৃ মহিমাও গেয়েছ। তাঁরা তো মাকে মায়া বলে বাদ দিতে পারতেন। বাদ দেননি, কারণ তাঁরা সত্যের সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে জগৎকে আস্বাদন করেছিলেন। তাঁদের জীবনী শ্রবণে অনুভূতি লাভ হয়। তাঁদের নাম স্মরণে অন্তরে জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। তাঁদের ধ্যান করলে বৈরাগ্য আসে। তাঁদের সঙ্গ করলে প্রতিটি জিনিসের মূল্যবোধ জাগে।

২৮। ৯। ৭৫

২৪৬

বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হয় যে, সাধক নিজেই যেন সাধনভজন, ধ্যান প্রভৃতি করে। বস্তুত সব কিছুর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মালিক একজনই আছেন। তাই বলা হয়, আত্মগুরুই সব সময় সবাইকে ধরে রেখেছেন। স্বভাবের মাধ্যমে স্ব-এর সঙ্গে অর্থাৎ স্বভাব-আত্মার সঙ্গে যুক্ত রেখে তিনিই সকলকে পরিচালনা করেন। সেই জন্য সূত্রাত্মা কথাটি বলা হয়েছে।

সৎপ্রসঙ্গ করতে করতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক মহাত্মা নিরন্তর গোবিন্দসেবায় রত থাকতেন। একদিন তিনি গোবিন্দসেবায় ব্যস্ত ছিলেন। সেই সময় এক পাগল এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—কী করছ তুমি? বেলা হয়ে গেল, গোবিন্দকে ভোগ দাও।

মহাত্মা—গোবিন্দের ভোগের ব্যবস্থাই আমি করছি।

পাগল—যে গোবিন্দ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই গোবিন্দকে আগে ভোগ দাও, তারপর তোমার বিগ্রহের গোবিন্দকে দিও।

মহাত্মা তার কথা শুনে খুব মুস্কিলে পড়লেন। অতিথি হল নারায়ণ, তার কথাও ফেলতে পারছেন না, আবার নিত্য অভ্যাসের সংস্কারকে বাদ দিয়ে পাগলকে ভোগও দিতে পারছেন না।

সেই মহাত্মা একসময় 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) নিজমুখে বলেছিলেন যে, জীবনে তিনি অনেক পরীক্ষা দিয়েছেন, কিন্তু এইরূপ জটিল সমস্যার সম্মুখীন কোনও দিন তাঁকে হতে হয়নি।

পাগল বারবার তাঁকে ভোগ দেবার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়াতে মহাত্মা ভাবলেন, সবই তো তিনি জানেন। কিন্তু লোকাচারও তো তাঁকে মেনে চলতে হবে। পাগলের কথা তো শাস্ত্র মানবে না। তখন উভয় দিক বজায় রাখার জন্য তিনি ভোগকে দুই ভাগে ভাগ করলেন। কিন্তু পাগল তা দেখে বলল—এ রকম ভাবে ভোগ নেব না, পুরোটাই দিতে হবে।

বিগ্রহকে ভোগ দেবার নিয়ম নেই বললেও মহাত্মারা বা সাধুরা নিয়মভঙ্গ করতে পারেন না, সাধারণ মানুষ হয়ত বা তা পারে। তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে গুরুকে

স্মরণ করতে লাগলেন এবং বিগ্রহের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বললেন—তুমি বলে দাও, কী করলে তোমার সেবা ঠিক মতো হবে এবং পাগলের কথাও রাখা হবে।

এই ভাবে প্রার্থনা করতে করতে যখন তিনি সমাধান খুঁজে পেলেন, তখন পাগল আর তাঁর সামনে নেই। তখন তিনি ছুটলেন পাগলের খোঁজে। সারাদিন ছুটোছুটির পরে তিনি দেখলেন এক ভাঙা দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে পাগল আপনমনে বসে আছে, কোনও দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নেই।

মহাত্মা তারপর মন্দিরে ফিরে গিয়ে আরতি করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি আরতি ভাল ভাবে করতে পারছিলেন না। তাই পূজারতি শেষ করে আবার সেই পাগলকে খুঁজতে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরে দেখলেন যে, পাগল এক তেঁতুল গাছের উপরে বসে আছে। পাগলকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি তাকে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। তিনি বললেন—তুমি যা খেতে চাইবে তা-ই আমি খাওয়াব।

পাগল বলল—যা চাইব তা তুমি খাওয়াতে পারবে না।

মহাত্মা আবার বললেন যে, সে যা চাইবে তা-ই তিনি খাওয়াবেন। শেষ পর্যন্ত পাগল তাকে দিয়ে একটি অঙ্গীকার করিয়ে নিল। পরদিন পাগল মন্দিরে গিয়ে মহাত্মাকে বলল—আমাকে মাছ খাওয়াও।

মহাত্মা কথা দিয়েছিলেন, সুতরাং মাছের ব্যবস্থা করলেন। তখন পাগল আবার নূতন বায়না ধরল যে, ঐ ভোগ আগে গোবিন্দকে দিতে হবে, তারপর পাগল খাবে।

গোবিন্দের মন্দিরে মাছ ভোগ দেওয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ। বড় বড় পণ্ডিতরাও বেদবিরুদ্ধ কাজ করতে পারেন না। সুতরাং মহাত্মা কী করবেন তা বুঝে উঠতে পারলেন না! তিনি কত অনুনয় করে চরণ ধরে সেধে তাকে খাওয়াবেন বলে নিয়ে এসেছেন। এখন কী উপায়! তিনি আবার শ্রীগুরুর শরণাপন্ন হলেন। গুরু তাঁকে বলে দিলেন—পাগলকে ও আমাকে নিয়ে একসঙ্গে গোবিন্দের কাছে ভোগ দে।

শ্রীগুরুর নির্দেশ অনুযায়ী মহাত্মা দরজা বন্ধ করে পাগলকে ও গুরুকে গোবিন্দের সামনে একসঙ্গে ভোগ নিবেদন করলেন। মহাত্মার সেদিন সেই সময় এক অদ্ভুত দর্শন হল। তিনি দেখলেন গুরুই একবার পাগল হচ্ছেন, আরেকবার গোবিন্দ হচ্ছেন। এ রকম তিনজনের স্থানেই তিনজনকে দেখলেন। সব শেষে তিনি দেখলেন তিনটি মুখ আর নেই। ভোগ তাঁর নিজের মুখেই পড়ছে। তখন তিনি ভাবতে লাগলেন, এটা কি স্বপ্ন না অনুভূতি? স্বপ্ন বলে উড়িয়ে দিতে পারলেন না। কারণ সবই তাঁর স্মৃতিতে আছে।

পরে মহাত্মা দেখলেন পাগল মন্দিরের বারান্দায় বসে আছে। পাগল মহাত্মাকে বলল—বিড়ি খাওয়াও। মহাত্মা তাকে বিড়ি এনে দিলেন। পাগল এবার বলল—আমি শোব, বিছানা দে।

মহাত্মা তাঁর নিজের বিছানাটি তাকে দিলেন। পাগল শুয়ে তার মধ্যে মলমূত্র ত্যাগ করে নোংরা করে রাখল। সেগুলি মহাত্মা নিজেই আবার পরিষ্কার করে রাখলেন। একটু পরেই পাগল তাকে আদেশ করল—আমাকে জলখাবার খাওয়াও।

এদিকে মহাত্মা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। নিজের স্নানাহারের বা বিশ্রামের পর্যন্ত সময় পাননি। মহাত্মা তাকে বললেন—একটু আগে তো খেয়েছ, এক্ষুনি আবার জলখাবার লাগবে?

পাগল কোনও কথাই শুনতে চায় না। বাধ্য হয়ে মহাত্মা জলখাবার তৈরি করে খেতে দিলেন। পাগল নিজে খেয়ে মহাত্মাকে এঁটো খাবার তুলে দিয়ে বলল—নে এটা খা।

মহাত্মা গোবিন্দের ভোগ ছাড়া কোনও দিন কারও এঁটো খাননি। তাই পাগলের এঁটো খেতে তাঁর সংকোচ হচ্ছিল, তবুও খেতে হল।

পাগল তার পরে চলে গেল। কিন্তু সে চলে যাওয়াতে মহাত্মার ভাল লাগল না। দু-এক দিন পরে তিনি তাকে আবার ডেকে আনলেন। তারপর পাগলের কথা মতো তাঁকে স্বপিণ্ড দিতে হল। তার পরে পাগল চলে গেল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মহাত্মা 'একে' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) বলেছিলেন—সেই যে পাগল চলে গেল আর কোনও দিন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। কিন্তু সে আমার জীবনে এক পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়ে গেল। সাধন, পূজা, শাস্ত্রপাঠে মহাত্মার জীবনে যা হয়নি, তা-ই হয়ে গেল পাগলের সংস্পর্শে এসে।

সাধননিষ্ঠা, গুরুনিষ্ঠা ভেঙে চুরমার করে পাগল তাকে অবধূত বানিয়ে দিয়ে গেল। অবধূত হল সেই অবস্থা যখন সবকিছুর সঙ্গে নিজের একাত্ম সম্বন্ধ হয়। যথার্থ পাগল হয় তখনই যখন সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে সর্বতোভাবে অভিন্ন বা একাত্ম অনুভব করা হয়। এ-ই হল সমত্বে স্থিতি, ব্রাহ্মীস্থিতি, অদ্বয়তত্ত্বে বা অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠা—সচ্চিদানন্দস্বরূপে আপনবোধের পূর্ণ সমাধান ও স্থিতি। এই হল স্বানুভূতি।

২২। ১০। ৭৫

তৃতীয় অধ্যায়

২৪৭

কী ভাবে সদ্‌গুরু শিষ্যের যোগ্যতার মানের বিকাশ সাধন করে তাকে পরমসিদ্ধি লাভে সাহায্য করেন এবং গুরুপদে, গুরুস্থানে বসিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তার মধ্যে মিশে যান সেই প্রসঙ্গে অতীতের একটি ঘটনা শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন।

একবার এক গৃহীর সঙ্গে 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) আলাপ হয়েছিল। তার গুরুতর কয়েকটি দোষত্রুটি ছিল যার জন্য বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজনের কাছে সে অপ্রিয় ছিল। একবার এক বন্ধুর পাল্লায় পড়ে সে এক মহাত্মার কাছে গেল। মহাত্মা তাকে তাঁর কাছে প্রায়ই আসবার জন্য বলতেন।

কিছুদিন পরে হঠাৎ সেই মহাত্মা স্থানান্তরে চলে গেলেন। তার পরেই তার যোগাযোগ হল 'এর' সঙ্গে। তাকে দেখে খুব কৌতুক বোধ করলাম এই ভেবে যে, মা নিজেকে কী ভাবে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করছেন, কিন্তু পারছেন না, থেকে থেকেই প্রকাশ হয়ে পড়ছেন। মা যেন আরও উঁকিঝুঁকি দিচ্ছেন। তখন তাকে চা ও খাবার দেওয়া হল। সে তখন বলল—আপনার ঘরে এই পেয়ালা ছাড়া আর কোনও পেয়ালা নেই?

সে সংকোচ বোধ করছে দেখে তাকে বলা হল—তুমি খাও, পরে ধুয়ে নিলেই হবে।

লোকটি বলল—এ রকম ভাবে যত্ন করে কেউ কোনও দিন আমাকে খাওয়ায়নি। আজ আপনি দিলেন। আমার অনেক ব্যাধি আছে। জেনে-শুনে আমি আপনার ক্ষতি করতে পারব না।

তখন তাকে আশ্বাস দিয়ে বলা হল—তোমার সে ভয় নেই। তোমার কোনও দোষ হবে না। 'এর' দায়িত্ব আরেকজনের কাছে রইল। খেয়েদেয়ে সে চলে গেল। তাকে যাবার সময় বলা হল—আবার এস।

লোকটি বলল—আপনি আমার সম্বন্ধে জানেন না, তাই আসতে বলছেন। এহেন কুকাজ নেই যা আমি করিনি। সে সব শুনলে আপনি আর আমায় ঘরে ঢুকতে দেবেন না।

তার মধ্যে সচ্চিদানন্দময়ী মা এমন এক দৃশ্য দেখালেন যে, বোঝা গেল মা 'একে' বিজ্ঞানসিদ্ধ করাবেন বলে লোকটিকে এখানে এনেছেন।

মাকে বলা হল—জীবনরূপে তুমি যে কত অভিনয় কর! আজ 'এই জায়গায়' (নিজের দেহের দিকে দেখিয়ে) ঐ জীবনকে বসাতে পারতে। দু'টি পৃথক ভাবাপন্ন জীবনের মিলনের মাধ্যমে পরম একতত্ত্বের নিগূঢ় অদ্বয় সত্যটি প্রত্যক্ষ ভাবে স্বানুভবসিদ্ধ করাবে বলে তুমি এই ব্যবস্থা করেছ।

বেশ কয়েকদিন পরে আবার সে এসে বলল—একটা বিড়ি দিতে পারেন?

তাকে বললাম—এই জায়গায় তুমি ঠকলে। এ সব তো আমার কাছে নেই। তবে দোকান থেকে আনিয়ে দিতে পারি।

লোকটি বলল—না থাক খাব না। আপনার কাছে ঋণ বাড়ছে।

এরূপ প্রকৃতির লোকের মধ্যে এমন সচেতনতা দেখে অবাক হলাম। তাকে বলা হল—তোমার কোনও ঋণ নেই। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) তোমার কাছে মহাঋণী।

এ কথা শুনে তড়িতাহতের মতো সে স্তব্ধ হয়ে গেল। সে জিজ্ঞাসা করল—আমি কী এমন করেছি যার জন্য আপনি ঋণী হলেন?

তাকে বলা হল—কয়েকদিন এস তাহলেই টের পাবে। তিন দিন পরে সে আবার এসে হাজির হল এবং একই কথা জানতে চাইল। তাকে বললাম—তুমি এখানে খাও, থাক, পরে সব বলব। কিন্তু সে নিজের দোষত্রুটি সম্বন্ধে খুব সচেতন। তাই বলল—আপনার বিছানায় আমি শোব না।

যাই হোক, তাকে অনেক বুঝিয়ে রাখা হল। তাকে বলা হল—তুমি চিদানন্দময়ী মায়ের একটি উদাহরণ। তোমার জীবনের মাধ্যমে যে উদাহরণ চিতিমাতা দেখালেন তা আমাকে মানতে হবে।

সে তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—আমার মধ্যে আপনার চৈতন্যময়ী মা আছেন? আর আপনি ঋণ শোধ করবেন আমার মতো এক অপদার্থ হতভাগাকে মেনে!

তাকে বললাম—তুমি জীবনে অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছ। তোমার এই অভিজ্ঞতারূপী মাকে মানাই হল 'এর' আনন্দ।

সে বলল—তাহলে আপনি আসল মাকে দেখেননি।

তার প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া হল না। তার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে থাকা হল। চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তখন চিদানন্দময়ী মায়ের অহেতুক কৃপা, করুণার কথা ভেবে মনে হচ্ছিল, মাগো তুমি অযাচিত ভাবেই সব দিয়ে যাও, তবে সাধনা করে তোমাকে আর পেতে হবে কেন? এক-এর কাছে এক-কে তুমিই তো প্রকাশ করে দাও। তাই তো বলা হয়, সংসারে যা-কিছু আছে সব ব্রহ্মজ্ঞগুরুরই পরিচয়। এই হল সত্যানুভূতি।

২৯। ১০। ৭৫

২৪৮

ভগবানের ষোলো কলা অভিব্যক্তির শেষ কলা হল নাম। সত্য যে-ভাবে ষোলো কলায় নেমে এসেছে তা হল—(১) মহাপ্রাণ (২) আকাশ (৩) শ্রদ্ধা (৪) বায়ু (৫) অগ্নি (৬) জল (৭) পৃথিবী (৮) ইন্দ্রিয় (৯) মন (১০) অন্ন (১১) বীর্য (১২) মন্ত্র (১৩) তপঃ (১৪) কর্ম (১৫) লোকসিদ্ধি ও (১৬) নাম। নাম হল সমস্ত প্রকাশের ধারক। নাম ছাড়া কোনও প্রকাশের ব্যবহার হয় না। ক্ষুদ্রতম প্রকাশস্পন্দনও নামের সঙ্গে যুক্ত। বোধের থেকে নাম নেমে আসবার আগে ভাবের মাধ্যমে আসে।

নামের মহিমা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ছোট গল্প বললেন।

কবির ছিলেন সুফি সম্প্রদায়ের মুসলমান সাধক। তাঁর গুরু ছিলেন তুকারাম। তখন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে দু'টি ভাগ ছিল—সুরাবর্দি সম্প্রদায় এবং নকশাবন্দি সম্প্রদায়। শেষোক্ত সম্প্রদায় যোগের চক্রবিন্দু ধরে সাধনা করত এবং হিন্দু দেবদেবীদের উপাসনা করত। কবির রাম নাম জপ করতেন। তাই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লোক বাদশার কাছে অভিযোগ জানায়। বাদশা সৈন্যদের তাঁর হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দেওয়ার আদেশ দেন। কিন্তু দেখা গেল রাম নামে তাঁর হাত-পায়ের বাঁধন আপনিই খুলে গেল। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি বড় সুন্দর দোঁহা আছে—

"শূন্য মরে, মরে অজপা
রাম নাহি মরে, রাম নাহি মারে
ধরে রাম যারে।"

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—শূন্য মরে অর্থাৎ অদ্বৈতজ্ঞান আবৃত হয়ে যায় এবং মায়াশক্তি সাধককে টেনে নামিয়ে আনে। অজপা জপও সব সময় রাখা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে রামকে ধরে এবং রাম যাকে ধরেন তার কভু বিনাশ হয় না। সেইজন্য দেখা গেল রাম নামের শক্তিতে কবির কাজির বিচার থেকে অব্যাহতি পেলেন। কবিরের প্রাণঘাতকগণ তাঁকে জীবন্ত দেখে ভয় পেয়ে রাজার কাছে খবর দিল। রাজা বললেন—তাঁকে আর ঘাটিও না। এরপর আমার সিংহাসন নিয়ে টানাটানি পড়বে।

৩০। ১১। ৭৫

২৪৯

জ্ঞানের সাধনপদ্ধতি পৃথক। সেই জ্ঞানসিদ্ধির থেকে আসে অদ্বৈতভক্তি। তা দ্বৈতভাবনার অনেক উর্ধ্বে।

এই অদ্বৈতভক্তির কথা বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

ভগবানের সঙ্গে যত পিরিতই করা যাক না কেন তাঁর সঙ্গে মিশে না-গেলে দ্বৈতবোধের বিকার থেকে যায়। কিন্তু সহজে কেউ মিশতে চায় না। এই কারণেই ভগবান সহজে কারওকে পরাশক্তির বা প্রেমভক্তির চাবি দেন না। ভগবান এই বিষয়ে ভীষণ কড়া।

'এর' (নিজেকে) মধ্যে সব পাগলের খেলা চলে। তার মধ্যে এক পাগল প্রশ্ন করে এবং আরেক পাগল উত্তর দেয়। তৃতীয় পাগল সেই দেখে হাসে।

প্রথম পাগল—তুই যে সাধনা করলি কত নম্বর সিদ্ধি পেলি?

দ্বিতীয় পাগল—বলব কেন?

প্রথম পাগল—বল।

দ্বিতীয় পাগল—বলব কেন? তোকে দেব কেন?

প্রথম পাগল—বললেই কি দেওয়া হয়ে যায়? এ রকম সিদ্ধি কি আছে?

দ্বিতীয় পাগল—হ্যাঁ। বললেই দেওয়া হয়ে যায়, এ রকম সিদ্ধিও আছে।

তাহলে দেখা গেল প্রথম পাগলের সিদ্ধি লাভের পরেও অভাব আছে। সিদ্ধি লাভের পরে নূতন দেহ নিয়ে এলে আবার নূতন করে সিদ্ধিলাভ করতে হয়। সিদ্ধির অন্ত নেই। যত রকম জীবন তত রকম সিদ্ধি হয়।

দ্বিতীয় পাগল—বললেই যদি দেওয়া হয়ে যায় তবে তা জ্ঞানের সিদ্ধি। বলামাত্র যা অনুভব করে তা-ই সিদ্ধি।

প্রথম পাগল—না, এ রকম সিদ্ধি পাইনি।

দ্বিতীয় পাগল—তাহলে এত দিন সাধনা করে কী লাভ করলি?

প্রথম পাগল—অনেক কিছু লাভ করেছি, কিন্তু এ রকম তো পাইনি।

দ্বিতীয় পাগল—তুই আবার সাধনা কর। তোর এখনও চিত্তশুদ্ধি হয়নি।

প্রথম পাগল—কেন?

দ্বিতীয় পাগল—তার কারণ তুই সিদ্ধিকে তোর নিজের থেকে আলাদা করে দেখেছিস। নিজ অপেক্ষা দ্বিতীয় কোনও বস্তু কল্পনা করে যে সিদ্ধি তা বিলাসিতামাত্র। যখন অনুভব করবি নিজ অতিরিক্ত জগতে কিছু নেই, তখনই আসল সিদ্ধিলাভ করবি।

প্রথম পাগল—তুই কী করে সিদ্ধি পেলি? তোকে তো এত সাধনা করতে দেখিনি। আর তুই তো আমার আগেই সিদ্ধিলাভ করেছিস। দেখছি তোর আর কিছু করার দরকার নেই।

এই প্রথম ও দ্বিতীয় পাগলের পরিচয় হল যথাক্রমে যোগী ও জ্ঞানী। প্রথম পাগল সিদ্ধি লাভের জন্য সাধনা করেছে। দ্বিতীয় পাগল সর্বপ্রশ্নের মীমাংসা জ্ঞানাগ্নি দিয়ে ভস্ম করে দিয়েছে। যেখানে জিজ্ঞাসা নেই সেখানে সাধনা নেই। যে প্রথম ও দ্বিতীয় পাগলের কাণ্ডকারখানা দেখে হাসে সেই তৃতীয় পাগল কে?

জ্ঞানের সাধনপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই জ্ঞানসিদ্ধি থেকে আসে ভক্তি। তা-ই অদ্বৈতভক্তি। তা দ্বৈতভাবনার অনেক উর্ধ্বের ব্যাপার। তৃতীয় পাগল সেখানে বসে শুধু মজা দেখে। দ্বিতীয় পাগল হল কেন্দ্রসত্তা। প্রথম পাগল হল অন্তঃসত্তা। বাইরে থেকে অন্তরে ঢুকে সে সিদ্ধিলাভ করেছে। অর্থাৎ তার তমোরজোগুণের কিয়দংশ অভিভূত হওয়াতে সত্ত্বগুণের বিকাশ লাভ করেছে। সত্ত্বগুণের একটি সিদ্ধি আছে। প্রথম পাগলের সিদ্ধি এই পর্যায়ের অন্তর্গত। দ্বিতীয় পাগল সত্ত্বগুণ অতিক্রম করে শুদ্ধসত্ত্বগুণে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর তৃতীয় পাগল হল গুণাতীত। তাই সে বলে—আমার বন্ধনও নেই, মুক্তিও নেই।

এই কথা শুনে প্রথম ও দ্বিতীয় পাগল বলল—তুমি তাহলে কী কর?

তৃতীয় পাগল—আমি বিচরণ করি।

প্রথম ও দ্বিতীয় পাগল—কোথায়?

তৃতীয় পাগল—যা নিত্যবস্তু তার মধ্যে। অর্থাৎ আমি আমার মধ্যে বিচরণ করি। চারদিকে যা দেখি সব আমার মানসরূপ।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই হল আধ্যাত্মিক পথের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম অবস্থা। এই অবস্থা যাঁরা লাভ করেন তাঁদের দিয়ে জগতের কাজ বেশি হয় না। কারণ জগৎ এঁদের কথার অংশমাত্র নিতে পারে, পূর্ণ ভাবে কেউ নেয় না। অংশমাত্র নিয়ে পূর্ণতা লাভ হয় না, সামান্য গুণের বিকাশ হয় মাত্র। যেমন রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়ে দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ কেউ হতে পারে না।

২১। ১২। ৭৫

২৫০

যা ভূমা বা অখণ্ড তা-ই আনন্দ। মানুষ যে আনন্দ ভোগ করতে চায় তা আনন্দের আভাসমাত্র। এই আনন্দের কথা যখন কেউ শোনে সে অবাক হয়ে যায় এই ভেবে যে, এত আনন্দের পরেও আরও আনন্দ আছে?

সেই আনন্দ যিনি দিতে পারেন তিনি আনন্দের বার্তা ছড়িয়ে দিয়ে বলেন—হ্যাঁ আরও আনন্দ আছে। সেই আনন্দ পেতে চাও তো আমার সঙ্গে চল। তাঁর এই কথা শুনে এক গৃহস্থের মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই আনন্দ পাওয়ার লোভে আনন্দময় পুরুষকে সে বলল—আচ্ছা দাঁড়াও, আমি বাড়িতে বলে আসি।

আনন্দময় পুরুষ—না, এখনই না-গেলে এই সুযোগ হারাবে।

গৃহী—(খুব চিন্তান্বিত, আনন্দের লোভ ছাড়তে পারছে না)। আপনার সঙ্গে গেলে কি এক্ষুনি পাওয়া যাবে? কতদিন লাগবে?

আনন্দময় পুরুষ—নিজেকে পূর্ণ করে দিয়ে দিলেই পাওয়া যাবে।

গৃহী—আমি না-থাকলে আনন্দ পেয়ে আমি রাখব কোথায়?

আনন্দময় পুরুষ—তার জন্য আলাদা পাত্র দেওয়া যাবে।

গৃহী—আলাদা পাত্র হলে তো আমি বুঝব না।

আনন্দময় পুরুষ—বেশ, তাহলে তুমি থেকে যাও, আমি চললাম।

আবার গৃহী দ্বিধায় পড়ল। স্ত্রী, পুত্রকে ফেলে যেতে মন সায় দিচ্ছে না। তাই তাঁকে পিছু ডেকে গৃহী বলল—শুনুন, একটু দাঁড়ান। আমার পরিবারকে নিয়ে আসি। সঙ্গে আমার পুত্রও থাকবে। তাহলে একসঙ্গে তিনজনেই পেয়ে যাব।

আনন্দময় পুরুষ—তা হয় না।

গৃহী যখন দেখল একসঙ্গে তিনজনকে তিনি আনন্দ দিতে রাজি নন তখন সে ভাবল, আমি একা গিয়েই নিয়ে আসি। আমি পেলে আমার পরিবারকে দিতে পারব।

খণ্ড আনন্দের স্মৃতি এসে অখণ্ড আনন্দ পাওয়ার পথে বাধা দেয়। তাঁরা পুনঃপুনঃ এসে সুযোগ দিয়ে যান। কিন্তু মানুষ খণ্ড আনন্দ ফেলে যেতে সাহস পায় না। এক দিকে সংসারের ক্ষণিক সুখস্মৃতির আকর্ষণ, অপর দিকে স্বতঃস্ফূর্ত অখণ্ড আনন্দের আকর্ষণ—কোন দিকে যে যাবে তা বুঝতে পারে না। তাই সে সুযোগ পেয়েও হারায়।

আনন্দময় পুরুষ—তোমার এখনও সময় হয়নি।

গৃহী—আপনি কৃপা করুন।

আনন্দময় পুরুষ—আমি কী করে কৃপা করব?

গৃহীর মনে আবার সংসারের নানা চিন্তা এল—পরিবারকে কাল গয়না দেবার কথা, সেই জন্য অনেক টাকাও দেওয়া আছে। কালকে ছেলের insurance-এর টাকাও পাওয়া যাবে। এগুলি সেরে গেলে ভাল হত। মহাত্মা তার এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দেখে রওনা দিলেন। একটু পরে পিছন ফিরে দেখেন গৃহী তাঁর পিছন পিছন আসছে। মহাত্মা বললেন—তুমি এলে কেন? কাল তোমার পরিবার গয়না পাবে, ছেলের insurance-এর টাকা পাবে, সেই সব ব্যবস্থা না-করেই চলে এলে? গৃহী বলল—বাবা, আপনি তো সব জানেন। দয়া করে দিয়ে দিন।

মহাত্মা—তোমাকে দিয়ে দিলে তোমার পরিবার, পুত্র কেউ থাকবে না। সেখানে এক-এর বেশি দুই-এর স্থান নেই।

গৃহী—তুমি বড় নিঠুর। ঠাকুরের মধ্যে যে প্রেম দেখেছি তোমার মধ্যে তাও নেই।

মহাত্মা—তুলনা করলে কৃপা পাওয়া যায় না।

গৃহী—(প্রণাম করে বলল) আমাকে কৃপা করবেন না?

মহাত্মা—দুইকে বা তিনকে অখণ্ড কৃপা করে না, এক-কে করে।

গৃহী—আমার আর কত দেরি?

মহাত্মা—সংসারকে যেদিন মারবে তুড়ি।

গৃহী—আপনি দেখছি সংসারের উপর খুব চটা। ছেলেমেয়ে বোধহয় আপনাকে খুব কষ্ট দিয়েছে।

মহাত্মা—হ্যাঁ, আমার ছেলেমেয়ে তোমরা। তোমাদের দেখে আমার কষ্ট হয়।

এই কথা বলে মহাত্মা চলে গেলেন। গৃহী তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে আছে। সে দেখল তার সামনে মহাজ্যোতির আকারে কী যেন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। তা দেখতে দেখতে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। যখন হুঁশ ফিরে এল তখন আর স্ত্রী, পুত্রের কথা, এমনকী নিজের দেহের কথাও তার মনে হল না। সেখানেই বসে পড়ল। ক্রমে সে দেহবোধ হারিয়ে তৃতীয় ভূমি বা তনুমনসায় প্রতিষ্ঠিত হল। তৃতীয় ভূমি থেকে সে চতুর্থ ভূমিতে এসে পড়ল। সেখানে সে দেখল কতগুলি ছায়া। তারা ভিক্ষা চায়। তারপর পঞ্চম ভূমিতে উঠে অদ্ভুত এক জ্যোতি দর্শন হল, কাছে এসে আবার সরে গেল। সেখান থেকে ক্রমে সে ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিতে চলে আসে। সপ্তম ভূমিতে এসে সে পৃথিবীর মানুষগুলিকে জলের ভিতরে ছোট ছোট পোকার মতো দেখতে পেল। সেই দেখে তার মনে উদয় হল, আমিও তো এর মধ্যে একদিন ছিলাম!

সে একজন ঐ রকম মহাত্মার সন্ধান পেয়েছিল বলেই মুক্তি শান্তি লাভ করল। এক ছাড়া অখণ্ড কৃপা করে না। এ সব কথা শুনে সংসারী মানুষদের হতাশা আসতে পারে—তাহলে আমাদের কী উপায়? তাদের জন্য বলা হয়, বাঁধ তাঁরে প্রতি বৃত্তির মধ্যে। লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখের মধ্যে তাঁকে রাখতে হয়। তাহলে পদ্ধতি ভিন্ন হলেও ফল একই হবে।

৩০। ১২। ৭৫

২৫১

নিজে আচরণ না-করে উপদেশ দিলে তা ফলপ্রদ হয় না।

এক মহাত্মা 'একে' (নিজেকে দেখিয়ে) একবার কয়েকটি সাধন প্রক্রিয়া সম্বন্ধে জানিয়ে বলেছিলেন যে, এগুলি অভ্যাস করলে এই রকম ফল পাওয়া যায়। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—আপনি সেগুলি করেছেন কী? তিনি বলেছিলেন—না, আমি আরেকজন মহাত্মার কাছে শুনেছি। তাঁকে তখন বলা হল—আপনার কথা মানব কেন? আপনি নিজে যদি করতেন তাহলে মানতাম। তিনি অবাক হয়ে বললেন—বড় বড় সাধু, মহাত্মারা বলে গিয়েছেন আর আপনি মানবেন না? সব কথা আচরণ করে বলা যায় না। তখন তাঁকে বলা হল—আচরণ না-করে বললে সেই কথা কোনও কাজে লাগে না। যে মহাত্মা যেটুকু আচরণ করেন তিনি সেটুকুই বলেন। ধর্মের কথাগুলি এইজন্যই অকেজো হয়ে যায়। যেমন রান্নার বই মুখস্থ করে যে রান্না করে তার রান্না অখাদ্য হয়। ডাক্তারি বিদ্যা না-জেনেও যেমন লোকে অপরের উপরে ডাক্তারি ফলায়, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতেও আচরণ না-করে লোকে অযাচিত ভাবে উপদেশ দেয়।

'এ' কারওকে বিশেষ নির্দেশ দেয় না। কারণ অখণ্ডবোধে মানা ছাড়া অর্থাৎ 'মেনে, মানিয়ে চলা' ছাড়া 'এ' কোনও আচরণ অভ্যাস করেনি। 'এর' দ্বারা কোনও ক্রিয়া-প্রক্রিয়া করা সম্ভব হয়নি। কাজেই আচরণ না-করে সে বিষয়ে 'এ' কী করে উপদেশ দেবে? তবে অখণ্ডবোধে মানার ব্যাপারে যদি কেউ কোনও পরামর্শ বা নির্দেশ চায় তবে সে বিষয়ে 'এ' বলতে পারে। জিজ্ঞাসা করতে পার, মানলে কী সেই একই ফল পাওয়া যায়? তার উত্তরে শুধু এটুকুই বলা চলে যে, মানার ফলে যা হয়েছে তা তোমরা সামনেই দেখতে পাচ্ছ। যদি 'এর' হয়েছে স্বীকার কর তবে হয়েছে, আর স্বীকার না-করলে হয়নি। তোমরা প্রশ্ন করতে পার যে, অখণ্ডবোধে সব কিছু মানলে কি সকলেরই হবে? তার উত্তরেও বলতে হয় যে, বিজ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে তাহলে একজনের হলে সকলেরই হবে। কোনও একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে যদি একজনের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয় তবে সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে সকলেরই উন্নতি হতে বাধ্য। তবে সকলের যে একই সময় লাগবে তা নয়। অন্তরের ভাব ও জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার অনুসারে ব্যাকুলতার মানের তারতম্য হয়। ব্যাকুলতা অনুসারে সাধনায় পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভ হয়। সিদ্ধি অনুসারে অনুভূতি হয়। এটাই হল formula বা বিধান। যেমন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে একজন পথ করে গেলে তার পিছু পিছু অনেক লোকই সেই পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারে। এ ছাড়া জীবনব্যাপী জপ-ধ্যান করেও ফল পাওয়া যায় না।

৪ । ১ । ৭৬

২৫২

সদ্‌গুরুই ধরিয়ে দেন যে, 'আমার' বলে যা-কিছু ব্যবহার করা হয় সেগুলি কোনওটিই আমার নয়। সবই গুরুর বা ভগবানের কাছ থেকে পাওয়া। 'আমার'

শব্দটি ব্যবহার না-করে 'তোমার' শব্দটি ব্যবহার করলে জীবনে উজান গতি বা উল্টো গতি আসে। আধ্যাত্মিক পথের গতি হল বাইরে থেকে কেন্দ্রের দিকে। বিকারের বিপরীত নির্বিকার, বহুর বিপরীত এক এবং মৃত্যুর বিপরীত অমৃত।

যে কোনও একটি পথ বা সূত্র ধরে চলার নাম পদ্ধতি। ঘন জঙ্গলে প্রবেশ করলে পথ হারাবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আগে একজন পথ করে গেলে সেই পথ ধরে আরও অনেকে যেতে পারে। সেইরূপ সংসার-অরণ্যে কেবল সদ্‌গুরুই পথ দেখাতে পারেন, আর কেউ পারেন না। গুরু হলেন তিনিই যিনি আগে গিয়ে পথ করে রাখেন। তাঁর পিছনে পিছনে যারা যায় তারা হল শিষ্য। বোধের পিছনে পিছনে মন চললে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয়ে যায় এবং মন বোধের কেন্দ্রে চলে যায়।

গুরু মহাত্মাগণ গল্প, উপদেশ ও উপমার মাধ্যমে মনকে অন্তর্বোধের দিকে ঘুরিয়ে দেন। অভ্যাসবশত মন বহির্জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই শান্তির ঘর অর্থাৎ আপনঘরের সন্ধান পেলেও বার বার বহির্জগতেই তাকে ফিরে আসতে হয়।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কোনও এক পরিব্রাজক দীর্ঘদিন তীর্থ, মঠ, মন্দির ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। শ্রান্তক্লান্ত হয়ে এক গাছের নিচে তিনি বিশ্রামেব জন্য একটু বসে পড়েন। ভগবানকে উদ্দেশ করে সেই সাধক বললেন—হে ভগবান! তুমি তো কল্পতরু। ইচ্ছা করলেই সব করতে পার। আমার এই খিদের সময় একটু খাবার ব্যবস্থা করে দিতে পার? এই কথা ভাবতেই তার সম্মুখে খাবার এসে গেল। একটি ইচ্ছা পূরণ হলেই আরেকটির অভাব জাগে। তার পরে তিনি বললেন—আমার পথযাত্রার শ্রান্তিক্লান্তি দূর করে দাও। অমনি এক সুন্দরী নারী এসে তার পা টিপতে লাগল। এ সব অদ্ভুত ঘটনা দেখে তিনি ভাবতে লাগলেন, এগুলি কী সত্য না কোনও ডাইনির ভেল্কিবাজি! এ যদি রাক্ষসী হয়ে আমাকে খেয়ে ফেলে! এই কথা ভাবামাত্র সেই নারী রাক্ষসীমূর্তি ধারণ করে সাধককে খেয়ে ফেলল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সাধকের সিদ্ধিই তাঁর নাশের কারণ হল। সাধনপথে সাধক ভুল করে ফেলে বলেই ভয় আসে। সকলেই জানে যে, প্রত্যেককেই মরতে হবে, তবুও মৃত্যুভয় যায় না। ভয়, সংশয় দূর হয় তখনই যখন গুরুর উপরে নির্ভর করে বা তাঁকে আশ্রয় করে চলে। তা ছাড়া নিজের চেষ্টায় ভয় দূর করা যায় না।

দড়িকে ভ্রমবশত সাপ বলে ভয় পায়, এ রকম উদাহরণ অনেক আছে। দড়ির সত্যজ্ঞানের অভাবেই ভ্রান্তিজ্ঞান হয়। সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে ব্রহ্মকেই ভ্রমবশত জগৎরূপে মনে হয়।

এক জ্ঞানী সাধক কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—অপরকে কত জ্ঞান দিচ্ছি সব মায়া মিথ্যা বলে, কিন্তু নিজেই একদিন দড়িকে সাপ মনে করে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। এমনকী ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পায়ের একটি অঙুলও হারালাম। এখন দেখছি ব্রহ্মজ্ঞানের কথা মুখে বললেও আসলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিনি।

তাঁকে বলা হল—তার কারণ গুরুকে অবলম্বন করে তো আপনি কিছু করেননি। বড় বড় মহাত্মা ও অবতারপুরুষগণ গুরুকে অবলম্বন করে চলেন।

১৮। ১। ৭৬

২৫৩

যাঁরা গুরু বা প্রভু হয়েছেন তাঁরা বলেন যে, সুদীর্ঘকাল গুরুসেবা করার পরে প্রয়োজন মতো যথোপযুক্ত সময়ে গুরু তাঁদের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং গুরুরূপে তাঁদের প্রকাশ করেন। তা না-হলে তাঁরা গুরু হবেন কী করে? এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

একবার এক ভক্ত সংসার ত্যাগ করেছে সন্ন্যাসী হবে এই আশায়। ব্রহ্মচারীর বেশ ধারণ করে সন্ন্যাসী হবার জন্য সে আশ্রমে আশ্রমে ঘুরে বেড়ায়। এক আশ্রমে যাবার পরে আশ্রমের মহান্তের সঙ্গে সে দেখা করল! আশ্রমবাসী হতে হলে প্রথমে কায়িক পরিশ্রম করতে হয়। কাজেই মহান্ত তাকে গোয়ালঘর পরিষ্কার করার কাজ দিলেন। কিন্তু সে বড় ঘরের ছেলে, সুখী মানুষ, সুতরাং গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে প্রভৃতি দিতে তার সংকোচ হল। সে ঐ আশ্রম ছেড়ে অন্য এক আশ্রমে চলে গেল।

সেখানে তাঁকে ঘর ঝাঁট দেবার কাজ দেওয়া হল। সে কয়েকদিন সেখানে ঘর ঝাঁট দিল। কিন্তু বাড়িতে সে কোনও দিন ঝাঁটা হাতে নেয়নি, তাই পরিচিত লোকের সামনে ঝাঁট দিতে খুব লজ্জা বোধ করত। কয়েকদিন পরে সে সেই আশ্রমও ছেড়ে চলে গেল।

পরে ঘুরতে ঘুরতে সে আরেক আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে মহান্ত তাকে আশ্রমের সাধুদের এঁটো বাসন মাজার কাজ দিলেন। এই কাজও তার পক্ষে করা সম্ভব হল না। তাই সেখান থেকেও ব্রহ্মচারী সরে পড়ল। এই ভাবে প্রায় সাত-আটটি আশ্রমে সে ঘুরতে থাকল, কিন্তু কোথাও তার মন বসল না। আবার এদিকে সংসারে ফিরে যেতেও পারছে না, কারণ সাধু হওয়ার সখ তার তখনও যায়নি: সে ভেবেছিল, সাধুদের আশ্রমে গিয়ে সেখানে থাকতে চাইলে তাকে গেরুয়া দিয়ে সন্ন্যাসী সাজিয়ে দেবে আর সে আরাম করে বসে থাকবে। অনেক আশ্রম ঘুরে ঘুরে তার এই ধারণা পাল্টে গেল।

অবশেষে কয়েকদিন পরে বাধ্য হয়ে আবার সে আরেক আশ্রমে উপস্থিত হল। এই আশ্রমে এসে মহান্তের সঙ্গে দেখা করে সে প্রথমেই জানিয়ে দিল আশ্রমের কাজকর্ম তার পক্ষে করা সম্ভব নয়, কারণ সে এ সব কাজ করতে অভ্যস্ত নয় এবং কোনও রকম কাজ সে জানেও না। সেই আশ্রমের মহান্ত এই কথা শুনে চিন্তায় পড়লেন। তিনি বললেন—তাই তো, তুমি কিছু জান না, তোমাকে কী কাজ দেওয়া যায় তাহলে? অনেক ভেবেচিন্তে তিনি বললেন—এক কাজ কর, মন্দিরে কোনও পাখার ব্যবস্থা নেই। মন্দিরের বিগ্রহ শিবজিকে প্রতিদিন দুপুরে ও রাতে হাওয়া করবে। সে মনে মনে ভাবল, পাথরের শিবকে হাওয়া করার প্রয়োজন হয় না কি! কিন্তু সে দেখল মহান্তের কাছে শিব পাথর নন। সবাই যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়ে

মহান্ত তখন জেগে থেকে শিবজিকে হাওয়া করেন। তিনি জানেন যে, ভগবানকে সেবা করার জন্যই তিনি ঘর ছেড়েছেন। এই সেবা করার মাধ্যমেই এমন কিছু তিনি পেয়েছিলেন যার জন্য পরবর্তীকালে মহান্তের পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। দুপুরে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে সব সাধুদের ঘরে গিয়ে তিনি দেখে আসতেন যাতে তাদের কোনও রকম অসুবিধা না-হয়। কারওকে গরমে কষ্ট পেতে দেখলে তাকে একটু হাওয়া করে দিতেন, কেউ বা প্রদীপ জ্বেলে পড়তে পড়তে আলো না-নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়লে আলোটি নিভিয়ে দিতেন।

এই গুরু বা মহান্ত ছিলেন যেন চৌকিদার, রাতে সকলের সুখসুবিধার দিকে নজর রাখতেন। আশ্রমের কোথায় কী হচ্ছে সেই দিকে তিনি দৃষ্টি রাখতেন। তাই বলা হয় গুরু যেন নাপিত ও ধোপা। সব দিক দিয়ে উপযুক্ত করে যথার্থ সাধু হওযার জন্য অন্তরের সমস্ত মলিনতা যিনি ধুয়ে দেন তিনিই অবধূত।

এদিকে সেই ব্রহ্মচারীর অবস্থাও খুব সঙ্গিন। এতদিন সে বাড়িঘরে শুধু আরাম করে এসেছে, অথচ এখানে এসে তাকে এত কষ্ট করতে হচ্ছে। আশ্রমে ভাল ভাল খাবারও তার জোটে না। একদিন রাতে মন্দিরে শিবজিকে হাওয়া করতে করতে তার খুব গরম লাগল। মন্দিরের ভিতরে সে ঘেমে অস্থির হয়ে গেল। তাই দরজার বাইরে খোলা আকাশের নিচে এসে সে দাঁড়াল। বাইরে বেশ ফুরফুরে হাওয়া বইছিল। সেখানে বসে আরাম করতে করতে এক ফাঁকে সে ঘুমিয়ে পড়ল। মন্দিরের দরজা খোলাই পড়ে রইল। এদিকে মহান্তজি ঘুরতে ঘুরতে তাকে ঐ ভাবে দেখে কিছু না-বলে মন্দিরের দবজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে শিবজিকে হাওয়া করতে লাগলেন।

হঠাৎ একটি বিশ্রী স্বপ্ন দেখে ব্রহ্মচারীর ঘুম ভেঙে গেল। সে উঠে মন্দিরে ঢুকতে গেল কিন্তু দেখতে পেল দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। তখন সে ভাবল, দরজা কে বন্ধ করল? নিশ্চয়ই শিব আমার উপরে রাগ করে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। তার খুব ভয় হল এই ভেবে যে, গুরুদেব যদি জানতে পারেন তাহলে তো তিনি রেগে যাবেন। ভোরবেলা মঙ্গলারতির আগে গুরু দরজা খুলে দিলেন।

দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পরে গুরুর কাছে গিয়ে সেই ব্রহ্মচারী নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। গুরুদেব ভাবলেন, এই কাজ তার মনঃপূত হয়নি বোধহয়। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কী হল? তোমাকে তাহলে অন্য কাজ দেব। ভয়ে ভয়ে ব্রহ্মচারী বলল—শিব কি আপনাকে সব বলে দিয়েছেন?

গুরুদেব—হ্যাঁ, বলে দিয়েছেন।

ব্রহ্মচারী—আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমি কোনও কাজেই অভ্যস্ত নই, আমি কী করে করব?

গুরুদেব—তাতে কী হয়েছে? আমিও খুব ছোটবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিলাম। আমারও কোনও কাজের অভ্যাস ছিল না। প্রথমে আমাকে কি কাজ করতে হয়েছে জান? মঙ্গলারতি শুরু হবার আগেই গোয়ালঘর পরিষ্কার করে গোবর কুড়িয়ে সব জড়ো করে রাখতে হত। তারপর মঙ্গলারতি হয়ে গেলে গোবরগুলি নিয়ে ঘুঁটে দিতে হত। এই কাজ আমাকে সাত বছর করতে হয়েছে।

তারপর আমাকে দেওয়া হয়েছে ঘর ঝাঁট দেবার কাজ। সেই কাজ করেছি প্রায় চার বছর। তারপর আমাকে করতে হয়েছে বাসন মাজার কাজ। সাধুদের সব ব্যবহৃত বাসন মাজতে হয়েছে আমাকে পাঁচ বছর। মন্দিরের কাজ করেছি তিন বছর। গুরুর পদসেবা করেছি আট বছর, আর গুরুর সঙ্গে ঘুরেছি এগারো বছর। তারপব গুরু একদিন বলেছিলেন—তুই এখান থেকে চলে যা। এই কথা শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম—এত বছর এখানে থাকার পরে কোন অপরাধে আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন? গুরু কোনও উত্তর দেননি। সেখানে থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করায় গুরু আরও ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে মারতে এসেছিলেন। তখন নিজের প্রতি ধিক্কার এল এই ভেবে যে, আমার এই দেহ গুরুসেবার উপযুক্ত নয়। কাজেই এই দেহ রেখে আর লাভ নেই বরং নাশ করে দেওয়াই ভাল। এই ভেবে পাহাড় থেকে লাফ দিয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম। এমন সময় গুরু এসে আমাকে ধরে ফেললেন। তাঁকে বললাম—তোমার কাজে তো এই দেহটা লাগবে না, তাই শেষ করে দিচ্ছি।

গুরু বললেন—কে বলেছে আমার কাজে লাগবে না? আরও বেশি কাজ আমার জন্য তোমাকে করতে হবে। এতদিন তুমি আমাকে দেহের বাইরে সেবা করেছ, এবার অন্তরে রেখে সেবা করতে হবে। আমার সব তোমাকে দিলাম—খেয়াল রেখ কিছু যেন নষ্ট না-হয়। তার পরে গুরু নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে দিয়ে বললেন যে, এই সময়ে গুরুর ভজন, তারপর পরমগুরুর ভজন ও পরাৎপরমগুরুর ভজন করবে। তারপর এই দেহ ছেড়ে যখন চলে যাব তখন কয়েকজন মহাত্মা ও গৃহী ভক্ত আসবেন, তাঁদের ঠিক মতো কাজ করতে দেবে।

ব্রহ্মচারী তখন গুরুর মুখ থেকে এই কাহিনি শুনে ভাবল, তাহলে তো প্রথম যে আশ্রমে মহান্ত আমাকে ঘুঁটে দিতে ও গোয়ালঘর পরিষ্কার করতে বলেছিলেন সেখান থেকে চলে না-এলে এতদিনে আমার অনেক উন্নতি হয়ে যেত। এতগুলি বছর ঘুরে বেরিয়ে আমি বৃথা সময় নষ্ট করেছি। এ সব কথা ভেবে তার মনে খুব অনুশোচনা জাগল।

কাজেই দেখা যায় যে, কর্মের মাধ্যমে চিত্তশোধনের একান্ত প্রয়োজন। সেবা, ভজন, কর্তব্য কর্ম প্রভৃতি শেষ না-করে সংসার ত্যাগ করলে অজ্ঞান-অন্ধকারে ঘুরে মরতে হয়।

মানুষ সাধারণত নিজের ত্রুটিগুলি শোধন না-করে ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে। অপর একজনকে বড় দেখলেই ঈর্ষা করে, কিন্তু অতীত ইতিহাস জানবার চেষ্টা করে না। যার মধ্যে বৈরাগ্য জাগেনি এবং যে সংসার ত্যাগ করে চলে যায় সে শুধু ভাল খাবার ও ভাল থাকার সন্ধানই করে। কে কী বলে বা না-বলে এই সব দিকে দৃষ্টি থাকলে বা এই সব গ্রাহ্য করলে সংসার ত্যাগ করা প্রহসনমাত্র। চিত্ত মলিন হয় নানা কারণে। গুরুকৃপায় তা আবার শুদ্ধ হয়। গুরু সর্বত্র বিদ্যমান—এটা যিনি ধরিয়ে দেন তিনিই হলেন যথার্থ সদ্গুরু। তিনি বিশ্বাতীত, জ্ঞানাতীত। তিনি অমূর্ত হয়েও মূর্তরূপ পরিগ্রহ করেন। তিনি যেখানেই থাকুন স্মরণমাত্র তাঁর স্পর্শ মেলে। কয়েকমুহূর্ত

চোখ বুজে নীরবে বসে থেকে ভাবাবেশে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গান ধরলেন—

ওঁ সচ্চিদানন্দসাগর ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
অন্তর্যামী নারায়ণ বাসুদেব নারায়ণ
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
বিশ্ব-আত্মা বিশ্বপ্রাণ সর্বজীবনের অধিষ্ঠান
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
বিজ্ঞান আত্মা অমৃত অক্ষর ব্রহ্ম-আত্মা-ঈশ্বর মহাপ্রাণ
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
শিবদুর্গা শিবরাম আত্মারাম প্রাণারাম
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
লক্ষ্মীবিষ্ণু সীতারাম রাধাকৃষ্ণ রাধাশ্যাম
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
প্রজ্ঞান আত্মা পরাৎপরম সত্য জ্ঞান সুন্দর
গুরু ঠাকুর ভগবান গুরু ঠাকুর ভগবান।।
ইষ্ট-গুরু-ভগবান নিত্য স্বয়ং বর্তমান
গুরু নিত্যবর্তমান গুরু নিত্যবর্তমান।।

৯। ৩। ৭৬

২৫৪

জড় বা চেতন যা-ই বলা হোক, উভয়ের মধ্যে একই উপাদান আছে। দুঃখ, বেদনা সকলেরই সমান ভাবে আসে। অন্যের দুঃখ দেখলে নিজের দুঃখের ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন।

দীর্ঘকাল হাসপাতালে রোগে ভুগে একজনের জীবনের প্রতি চরম বিরক্তি দেখা দিল। এক নার্স তাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য নিজের গুরুর সম্বন্ধে বলল যে, পক্ষাঘাতে তার গুরুর নিম্নাঙ্গ পঙ্গু হয়ে গিয়েছে এবং দীর্ঘদিনযাবৎ তিনি শয্যাশায়ী হয়ে আছেন। তিনি সর্বদা ভগবৎ প্রসঙ্গ আলোচনা করেন, কিন্তু নিজের রোগের কথা কখনও কারওকে বলেন না। নার্সটি আরও বলল—তোমার কথা গুরুকে জানাতে তিনি তোমার উদ্দেশে প্রণাম জানালেন। সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল—কেন? নার্স বলল—তুমি তাঁর থেকে ভাল আছ তাই। অসুস্থ লোকটি বলল—তিনি তাহলে গুরু হলেন কী করে?

নার্স একদিন তাকে তার গুরুর কাছে নিয়ে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে গুরুর অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে অবশ হয়ে গিয়েছে, নড়াচড়া করতেও পারেন না। সে গুরুকে দেখে প্রেরণা পেল যে, আমি তো তাহলে গুরুর থেকে ভাল আছি! সেই থেকে তার বিষাদ ও বিমর্ষতা কমে গিয়ে ধীরে ধীরে রোগ নিরাময় হতে লাগল। কারণ মনের

থেকে রোগ সরে গেলে দেহের থেকেও সরে যায়। মনই হল ব্যাধির কারণ এবং ব্যাধি হল মুক্তির কারণ।

সে সুস্থ হবার পর একদিন নার্সের কাছে গেল। সেখানে গিয়ে দেখে গুরুর রোগের কথা ভাবতে ভাবতে নার্সের অর্ধাঙ্গ পক্ষাঘাতে পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। নার্স তাকে বলল—তুমি তো ভাল থাকবেই। তুমি ভাল থাকার ভাবনা ভেবেছ। আর গুরুর রোগচিন্তায় আমার রোগ হল। এবার বোধহয় গুরু ভাল হয়ে যাবেন। সত্যিই তাই হল। গুরু সুস্থ হয়ে উঠলেন। গুরুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে গুরু তাকে বললেন—তোমার ও আমার রোগের একটা কাল ছিল। আমাদের সেই কাল শেষ হয়ে গেল। এবার ওর (নার্সের) ভোগ আরম্ভ হল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষের ভাল-মন্দ, সুখ-দুঃখ চক্রাকারে ঘোরে। কোনও অবস্থাই স্থায়ী নয়। কখনও দেখা যায় সাধক প্রারব্ধ ভোগ করছে আর গৃহী আনন্দে কাল কাটাচ্ছে, আবার এর বিপরীত অবস্থাও হতে পারে।

মহাপুরুষরা কখনও কারওকে তাঁদের কষ্টের কথা বলেন না এবং তাঁরা নিজেদের রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনাও করেন না। রোগ পুষে রাখেন কেন এর উত্তর দেওয়া মুস্কিল। কেউ বলেন তাঁরা প্রারব্ধ ভোগ করে যান, কেউ বলেন এতে তাঁদের মাহাত্ম্য বাড়ে, কেউ বা বলেন ভক্তরা ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সুযোগ পায় ইত্যাদি। যে যা বলে সব সত্য।

২৮। ৩। ৭৬

২৫৫

একটি উপমামূলক গল্পের মাধ্যমে গুরুকৃপাব তাৎপর্য ব্যক্ত করলেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

অনেকদিন আগে এক ভদ্রলোক কথায় কথায় বলেছিলেন—অনেক মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করেছি, অনেক আশ্রম ঘুরে ঘুরে দেখেছি। সব জায়গায় ঘুরে ফিরে মনে হয়েছে যে, শুধু মহাপুরুষদের কাছে গেলেই হয় না বা তাঁদের সঙ্গ করলেই হয় না, আমাদেরও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। অনেক সময় যোগ্যতা না-থাকলেও আমরা আশা করি অনেক, আর তা না-পেলে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি। আসলে মহাপুরুষদের কাছে যারা যায় তাদের অবস্থা হল ঠিক ছাগলছানার মতো। ছাগলের চারটি ছানা হয়, কিন্তু বাঁট দু'টি থাকে। বড় ছানা দু'টি বাঁট দখল করে থাকে, আর ছোট ছানা দু'টি লাফালাফি করে, কিছুতেই তাদের সরিয়ে দুধ খেতে পারে না। আমরা হলাম তা-ই। দু-একজন বাঁট দু'টি দখল করে বসে আছে।

তাকে তখন বলা হয়েছিল, সমস্ত নিকৃষ্ট বস্তুর মধ্যে উৎকৃষ্টকে দেখাই হল ঈশ্বরদর্শন। সেইজন্য বেদনা হল 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) কাছে বেদ। এই দৃষ্টিভঙ্গি খুলে গেলে প্রতিবন্ধক আর কিছু থাকে না।

ভদ্রলোকের উপমাটি খুব হাল্কা হলেও কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বেদনা থেকে পালিয়ে যাওয়াও যায় না এবং make up দেওয়াও যায় না।

এখন প্রশ্ন হল—মহাপুরুষই বা কে আর ছাগলছানাই বা কে? যে লাফায় সে-ই বা কে? ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করা হল—তুমি কোন দলে পড়?

সে বলল——লাফালাফির দলে।

তাকে তখন বলা হল——তোমার প্রথম বক্তব্যের সঙ্গে পরের বক্তব্য তো মেলে না। যে লাফায় সে তো নিজে লাফায়। তাহলে তোমার যোগ্যতা নেই। যোগ্যতা অর্জন করতে হলে বাঁট দু'টি দখল করতে হবে। বলতে পার যে, বাঁট দু'টি তো দখল হয়েই আছে। তবুও ছুটোছুটি না-করে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে থাকতে হয়। একদিন তুমিও পারবে, তখন আরেকজন হয়ত পারবে না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও বললেন——আচ্ছা, এবার তোমরা বল বাঁট দু'টি কী আর ছাগলছানাই বা কী? কেউ কোনও উত্তর দিল না। সকলকে নিরুত্তর দেখে তিনি বললেন——ভগবান তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করতে চাইলে তোমরা কি সহজে প্রবেশ করতে দেবে? এইজন্য গুরুকে বা ভগবানকে কৌশলে প্রবেশ করতে হয়। কারণ ভগবান রাজবেশে এলে মানুষ ভয় পায়। ভিখারির বেশে এলে মানুষ তাঁকে তাড়িয়ে দেয় আর গুরুবেশে এলে তাঁকে অনেক কথা শুনিয়ে দেয়। সেইজন্য আসল গুরু শব্দব্রহ্মের মাধ্যমে শিষ্যের মধ্যে প্রবেশ করেন। যতক্ষণ অহংকার-অভিমান থাকে ততক্ষণ সে মনে করে আমি যোগ্য বা উপযুক্ত। অহংকার-অভিমান সরে গেলে তার অনুভব হয় যে, যোগ্যতাও আমার নয় এবং অযোগ্যতাও আমার নয়। তখন তার কাছে বাঁট দু'টি ready হয়ে থাকে। যতক্ষণ যোগ্যতা-অযোগ্যতার মধ্যে লড়াই চলতে থাকে ততক্ষণ অহংকার-অভিমান পূর্ণমাত্রায় থাকে।

বাঁট দু'টি হল ভগবানের দু'টি চরণ। রাতুল চরণ পাবার আশায় ভক্ত ভজন-পূজন করে। ভক্ত ভজন করে পায় গুরুর দু'টি রাতুল চরণ। ছাগলের দু'টি বাঁটের মধ্যে যেমন একই দুধ পাওয়া যায়, সেই রকম গুরুর দু'টি চরণে একই সমরস অর্থাৎ স্ববোধানন্দ আছে।

বাবার দেওয়া সম্পত্তি সন্তান পায়, কিন্তু ব্যবহার না-জানা থাকলে তা পেয়েও নষ্ট করে, ফলে কোনও লাভ হয় না। সেই রকম গুরুর চরণ পেলেই বা কী হয়? গুরুকৃপা বলতে কী বোঝায় এবং ক'জনই বা তা পায়? বলতে পার——সবাই পায়। কিন্তু দেখা যায় কেউ অনেক বড় হয়ে যায়, আবার অনেকে যেমন ছিল তেমনই থাকে। প্রশ্ন উঠবে——গুরু কি তবে পক্ষপাতিত্ব করেন? না, তা নয়।

আসল কথা, গুরুবাক্য শ্রবণ করে মনে রেখে তা আচরণ করতে হয়। তন্ত্রের দৃষ্টিতে মনন ও আচরণ হল গুরুর দু'টি চরণ। বিজ্ঞানের বা আচরণের অভাবে জ্ঞান বা মনন কাজে লাগে না। গুরুর বাক্য মনে না-থাকলে ব্যবহার হয় না। আবার আচরণ না-করে শুধু মনে রাখলেও কোনও লাভ হয় না। গুরুবাক্য স্মরণে রেখে শ্রবণ অনুযায়ী তা আচরণ করাই হল গুরুকৃপা, অর্থাৎ যা করে পেতে হয় তা-ই কৃপা। যে-ভাবে গুরু নির্দেশ দেন সে-ভাবেই তা পালন করতে হয়। তাঁর দেওয়া বোধ নিজের মধ্যে সেই ভাবে খেললেই কৃপা লাভ হয়। এই হল 'কৃপা' শব্দের যথার্থ তাৎপর্য। অনুভূতিতে যতক্ষণ না-খেলে ততক্ষণ বোঝাও যায় না এবং বলাও যায় না।

৬। ৪। ৭৬

২৫৬

নিজেকে বাদ দিয়ে সব নয় এবং সবকে বাদ দিয়েও নিজে নয়। নিজেকে দেখতে ও জানতে হয় সর্ববস্তুর মধ্যে এবং সর্ববস্তুকে দেখতে ও জানতে হয় নিজের মধ্যে। অখণ্ডকে সবার মাঝে এবং সবাইকে অখণ্ডের মাঝে দেখার নামই হল স্বানুভূতি, ব্রহ্মানুভূতি বা ঈশ্বরাত্মানুভূতি। অখণ্ডের থেকে কারওকে বাদ দেওয়া যায় না। বাদ দিতে হলে আত্মানুভূতি হয় না। অথচ মন পুরোটা নিতেও চায় না, তার ফলে শান্তিও পায় না। এই প্রসঙ্গে তোমরা একটি গল্প শোন।

কোনও এক পাহাড়ে এক নির্জন স্থানে এক সাধু থাকতেন। তাঁর কাছে একবার এক গৃহী গিয়ে উপস্থিত হল। সে সেখানে কিছুদিন থেকে সাধুর খুব সেবা করল। তার পরে সংসারে ফিরে আসবার সময় গৃহী তাকে বলল—বাবা, আমার তো কেউ নেই। বিয়েও করিনি, এবার ভাবছি বাড়ি ফিরে গিয়ে বিয়ে করে সংসার পাতব। সেইজন্য তুমি আমায় আশীর্বাদ কর।

সাধু তার কথা শুনে একটু হেসে বললেন—বিয়ে করবি? বেশ। তাকে আশীর্বাদ করে বললেন—একটি কথা মনে রাখিস, বিয়ে করবি তাকেই যার কোনও দেহ নেই। গৃহী ভাল করে কথাটির তাৎপর্য না-বুঝেই দেশে ফিরে এল। পাত্রীর খোঁজ চলতে থাকে, কিন্তু সে যখনই মেয়ে দেখতে যায়, তখনই তাঁর মনে পড়ে সাধুর কথা। সে ভাবে, এর তো দেহ আছে, একে তো বিয়ে করতে পারব না, শেষ পর্যন্ত সে দেখল তার বিয়ে করা আর সম্ভব হচ্ছে না। সে খুব বিব্রত বোধ করে, তার ফলে সে শান্তিও পায় না। সে তখন আবার গেল সেই সাধুর কাছে। সাধুর কাছে গিয়ে সে বলল—বাবা, তুমি যে রকম বলেছিলে আমি তো সে রকম কোনও পাত্রী খুঁজে পেলাম না। সাধু বললেন—পেলি না? ঠিক আছে। তুই বসে বসে এই নাম জপ কর। এই কথা বলে তাকে জপে বসিয়ে দিলেন এবং কতক্ষণ জপ করতে হবে তাও বলে দিলেন। তারপর বললেন—জপ শেষ করে যাকে দেখবি তাকেই বিয়ে করবি। জপ করতে করতে গৃহী এক জ্যোতির্ময়ী নারীর দর্শন পেল। তখন সে ভাবল, এর স্থূল মূর্তি কোথায় পাব? এর কাছ থেকে কথাও ভেসে আসছে অথচ একে তো ধরতে পারছি না! গৃহী মহাত্মার কাছে গিয়ে সব কথা বলাতে, তিনি বললেন—ধরতে পারছিস না? এর সঙ্গেই তো আসল বিবাহ হবে।

গৃহী—এর সঙ্গে বিবাহ কে দেবে?

সাধু—আমি দেব। তোকে এমন বিবাহ দেব যা কোনও দিন কেউ কারওকে দেয়নি। তিনি বিবাহের সব আয়োজন করতে লাগলেন। সর্বপ্রথমে তিনি যজ্ঞ করলেন। প্রথমে তিনি শিষ্যের জীবন যজ্ঞে আহুতি দিলেন। তার পরে বললেন—সংসারে বিবাহের অর্থ কী? নূতন সৃষ্টি করা তো? নূতন সৃষ্টির মন্ত্র তোকে আমি শিখিয়ে দেব। এই মন্ত্রের শক্তি তোর মধ্যে কাজ করে নূতন সৃষ্টি করবে। ভার্যা মনোরমা দৈহিক সুখের জন্য নয়, দেহাতীত সুখের জন্য। এই শক্তি আর কিছুই নয়, এ হল সাধুর আত্মশক্তি।

সাধু বললেন—তোকে আমার শক্তি বহন করার জন্য দিলাম। যেমন সৃষ্টি করতে চাইবি তেমনই সৃষ্টি করে দেবে, কিন্তু তাতে স্থূলের দৃষ্টি দিস না। আধ্যাত্মিক বিবাহ কাকে বলে তিনি তা দেখিয়ে দিলেন। সব দেবদেবী, সিদ্ধপুরুষ ও মহাপুরুষগণকে এই বিবাহে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি এমন এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন যা পৃথিবীর বুকে সচরাচর কেউ দেখেনি। সকলের কাছে তিনি হাত জোড় করে বললেন—তোমরা সকলে আশীর্বাদ কর যেন আমার মানসপুত্র মানস সরোবরে হংসবলাকার মতো বিশ্রাম করে। তার মধ্যে থেকে যেন নিরন্তর হংসধ্বনি হতে থাকে এবং চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গুরুশক্তিকে বহন করার জন্য উপযুক্ত শিষ্যই দরকার। গুরুশক্তি বহন করা যায় তখনই, যখন অন্তরে "হংসঃ সোঽহং" ধ্বনি নিরন্তর ধ্বনিত হতে থাকে। গুরুশক্তি বহন করে চললেই সংসার সমসারে পরিণত হয়। সেই শক্তি বহন করতে না-পারলে মানস সরোবরে বিরাজ করা যায় না বা হংসদেবের মতো "সোঽহং" মন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মুক্তি আস্বাদন করা চলে না।

শয়নে-স্বপনে প্রতি শ্বাসে শ্বাসে যখন "হংসঃ ধ্বনি" বেজে ওঠে তখনই সে মানস সরোবরে পরমহংসরূপে বিরাজ করে। হংসের রূপটি হল শুভ্রশ্বেতবর্ণ। প্রজ্ঞান হল তার মস্তক। জ্ঞান ও ভক্তি হল তার ডানা। প্রেম তার হৃদয়। অনাসক্তি হল তার পুচ্ছ। বিবেক-বৈরাগ্য হল তার চরণ। চৈতন্য হল তার পালক। শান্তি হল তার প্রাণ। আনন্দ হল তার মন। সমতা হল তার ধর্ম। প্রকাশ হল তার কর্ম। নিত্যবর্তমানতা হল তার ছন্দ। এই হল মোটামুটি পরমহংসের পরিচয়।

এই পরিচয় প্রত্যেকের মধ্যে আবৃত হয়ে আছে। তা জাগ্রত হওয়ার জন্য প্রাণ কখনও কখনও উঁকিঝুঁকি মারে, কিন্তু ইন্দ্রিয় তাকে দাবিয়ে রাখে। তার প্রমাণ হল পক্ষপাতদৃষ্টি, ভেদদৃষ্টি বা স্বতন্ত্রতা। সেইজন্য ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ সকলকে বিবাহ দেন না। যাকে বিবাহ দেন তাকে পরমহংস তৈরি করে দেন। সে তখন মানস সরোবরে বিরাজ করে। এই পরমহংসের কথা প্রত্যেকেই তোমরা চিন্তা করে দেখবে। তবে দেখবে, শেষ পর্যন্ত যেন পাতিহাঁসে কেউ পরিণত না-হয়। মনে রাখবে, প্রত্যেকেই তোমরা আপন আপন গুরুর মধ্যেই আছ। প্রতিটি প্রাণের স্পন্দন ও বৃত্তিতে তিনি বসে আছেন। শরণাগতি নিয়ে যে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তার মধ্যেই তিনি প্রকাশিত হন। যে পূর্ণ শরণাগত তার মধ্যে একসময় তিনি আপনিই প্রকাশিত হবেন।

২৬। ৫। ৭৬

২৫৭

হিংসা করেও অহিংসার ফল এবং অহিংসা করেও হিংসার ফল আসে। তার বিকল্প ব্যবহার আরেক fold-এ গিয়ে ধরা পড়ে। কী করলে ধর্ম হয় এবং কী করলে অধর্ম হয়, তা সঠিক ভাবে কেউ বলতে পারে না। দেখা যায় ধর্মসাধনা করেও অধর্মের ফল এবং অধর্ম করেও ধর্মসাধনার ফল ভোগ করে অনেকে। জ্ঞানীগুণীরাও এর নিগূঢ় রহস্য অনুধাবনে অপারগ হয়ে সংস্কারের উপর ফেলে দিয়েছেন।

এর নিগূঢ় রহস্য হল, কর্মতত্ত্বের সঙ্গে ঈশ্বরতত্ত্ব যুক্ত, কিন্তু পরমেশ্বরতত্ত্ব যুক্ত নয়। একবার প্রশ্ন উঠল কর্মফলের জন্য কে দায়ী? অনেক আলোচনার পরে সবাই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে, ঈশ্বরই কর্মফলের জন্য দায়ী। ঈশ্বর বললেন—আমিও যে কোন কর্ম sanction করি বলতে পারি না। যাঁর কাছে এর উত্তর আছে তাঁর কাছে আমিও যেতে পারি না। যাঁর প্রশাসনে চন্দ্র, সূর্য, বায়ু পরিচালিত হয় তাঁকে যদি মেনে চলতে হয় সেখানে individual-এর কী উপায়? অধর্ম করেও ধর্মের ফল চায়, এখানে কী করণীয়? সত্য পালন করেও অসত্যের ফল এবং অসত্য আচরণ করেও সত্যের ফল পায় কেন? দেখা যায় হিংসা করেও স্বস্তি হল না, কিন্তু অহিংসা করে স্বস্তি হল।

কৌশিকী মুনি কদাচ মিথ্যা কথা বলতেন না, সত্যসাধনে রত থাকতেন। তিনি একদিন আশ্রমে আপনমনে বসেছিলেন। হঠাৎ দেখলেন কতগুলি লোক ভীত হয়ে এক দিকে দৌড়ে পালিয়ে গেল। একটু পরেই আবার কয়েকজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল যে, লোকগুলি কোন দিকে পালিয়েছে। তিনি ভাবলেন, তিনি যদি বলেন 'দেখিনি' তবে মিথ্যা কথা বলা হবে আর যদি সত্য কথা বলেন তাহলে তারা লোকগুলিকে মেরে ফেলবে। মুনি সত্যি কথাই বলে দিলেন। ফলে নিরীহ লোকেরা দস্যুদের হাতে প্রাণ হারাল। মৃত্যুর পরে দেখা গেল কৌশিকী মুনি নরকে গেলেন। চিত্রগুপ্তকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন যে, অতগুলি প্রাণনাশের জন্য তিনি দায়ী, তাই তাঁর এই গতি। প্রাণরক্ষা করা এবং সমষ্টির স্বার্থরক্ষা করাই হল সত্যধর্ম। অনেকে বলতে পারে, সমষ্টির স্বার্থ তো অনেক। নিজের স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থকে পৃথক করে ধরলে পূর্ণ সত্য হয় না। সমগ্র বিশ্বের স্বার্থ দেখার জন্যই সব মানার কথা বলা হয়। বহুজনের হিতকল্যাণের জন্য তাদের সত্যের প্রভাবে মুনির ঐটুকু মিথ্যা কথা বলার দোষ কেটে যেত। তাহলে individual মুক্তি ও সিদ্ধির ফল কোথায় থাকে?

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অনেক সময় দেখা যায় মিথ্যাকথা বললে বহু লোকের সুখশান্তি হয়। কিন্তু নিজের বিবেকদংশন হয় যে, মিথ্যার মধ্যে থেকে আমার আত্মিক উন্নতি কী করে হবে? সংসারের সব কিছুর ভিত্তি হল মিথ্যা। সংসারের পশ্চাতে আছে এক সত্য। তাতে মিথ্যার কোনও ব্যবহার নেই।

১। ৬। ৭৬

২৫৮

ধ্যান হল মনের বৃত্তিকে শূন্য করা, চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা, কামনার বৃত্তি নাশ করা বা চিন্তাশূন্য হওয়া অথবা অ-মন অবস্থায় আসা। তাহলেই হয় ধ্যানসিদ্ধি, যার ফলে হয় প্রশান্তি। তাহলে মহাশূন্যের চিন্তাই বা কোথা থেকে ওঠে? আর প্রাণই বা কোথা থেকে ওঠে? সেইজন্য বলা হয় 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) জন্মই হয়নি। জন্মের অর্থ বলতে যা বোঝায় তা নিয়ে হয়ত অনেক ব্যাখ্যা হবে। মহাশূন্যের জন্ম,

স্থিতি, বৃদ্ধি, বিকার, ক্ষয়, মৃত্যু এবং প্রতিদ্বন্দ্বীও নেই। তাই বলা হয়—

'ধ্যানে হয়ে হারা
অন্তরে পায় সাড়া।'

কার সাড়া পায়? নিজের প্রতিধ্বনি নিজেই শোনে, নিজের প্রতিবিম্ব নিজেই দেখে। নিজের সঙ্গেই হয় নিজের দ্বন্দ্ব বা ভাব।

এক পাগল ভগবানকে ডাকতে তার কাছে তিনি উপস্থিত হলেন।

পাগল ভগবানকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি কে?

ভগবান—আমি ভগবান। তুই ডেকেছিস আমাকে?

পাগল—তোমার সঙ্গে তো আমার কারবার চলবে না। আমি মানুষ আর তুমি ভগবান।

ভগবান—তুই যে ডেকেছিস আমাকে, তাই তো এলাম।

পাগল—না, আমি তো তোমাকে ডাকিনি! তোমার নাম কী?

ভগবান—হরি।

পাগল—হরি তো মানুষের নাম হয় বলে জানি। আমার বন্ধু হরি আছে। তার সঙ্গে আমি খেলাধুলা করি। তুমি চলে যাও এখান থেকে। নইলে এই যে চেলাকাঠ দেখছ এই দিয়ে তোমাকে পিটিয়ে ঠান্ডা করে দেব।

ভগবান—(স্বগতোক্তি) এ তো মহামুস্কিল হল! তারপর তিনি পাগলকে বললেন—চল, বৈকুণ্ঠে নিয়ে যাই তোকে। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটু থেমে বললেন—দেখ, ভগবানের কী দায়! পাগল ভগবানকে গ্রাহ্য করছে না আর ভগবান তাকে সাধাসাধি করছেন।

পাগল—কেন যাব তোমার সঙ্গে? তুমি ভগবান, তোমার খেয়াল হলে আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পার, তুমি এক্ষুনি চলে যাও। এই বলে পাগল ভগবানকে মারবার জন্য চেলাকাঠ নিয়ে তাড়া করল। ভগবান মারের হাত থেকে বাঁচবার জন্য ছুটতে লাগলেন আর পাগলও তাঁর পিছন পিছন ছুটতে লাগল। একটি গাছকে আড়াল করে দু'জনেই গোল করে ঘুরছে। একজন ভক্ত দূর থেকে এক দৃশ্য দেখল যে, একটি জ্যোতিবলয়ের মধ্যে একজন লোক সমানে ঘুরছে। সেই জ্যোতি দেখে ভক্ত বুঝতে পারল। পাগলের কাছে গিয়ে তাকে নিরস্ত করার জন্য বলল—আরে কী করছিস! ইনি তো স্বয়ং ভগবান। পাগলের জন্য ভগবানকে এই ভক্তকেও দর্শন দিতে হল। সেই ভক্ত ভগবানকে দেখে হাত জোড় করে প্রণাম জানাল। তাই দেখে পাগল তাকে বলে উঠল—তুমি যখন বৈকুণ্ঠে যাও তখন ভগবান কী হাত জোড় করেন? ভক্ত চুপ করে রইল।

ভগবান পাগলকে বললেন—আমি তোর মধ্যেই আছি।

পাগল—আমিও তোমার মধ্যে আছি। তুমি আমার আমিকে ধার করে জগৎ চালাচ্ছ।

ভগবান দেখলেন পাগলকে ঠান্ডা করা মুস্কিল, নাশ করতেও পারেন না।

ভগবান—(করুণ ভাবে) তুই আমাকে তাড়িয়ে দিলি?

পাগল—তুমি আমাকে তাড়িয়ে দিয়েছ। সৃষ্টির প্রাক্কালে কী করেছিলে মনে নেই? ভুলে গিয়েছ?

ভগবান ভাবলেন, এ তো সর্বনাশ, সব কথা ফাঁস করে দিল!

পাগল আবার বলল—যাঁকে না-হলেও আমার চলে তাঁকে নিয়ে আমি কী করব? আমি ছাড়া তো দ্বিতীয় কেউ নেই। আমার অসুখ হলে আমিই তো সব করি। ভক্ত-ভগবান, এই পার্থক্য কে সৃষ্টি করেছে?

কিছুক্ষণ পরে পাগল ভগবানকে আরও বলল—আমিই তোমাকে সৃষ্টি করেছি। তাই হরি বলে যেই ডাকলাম তুমি এলে।

ভগবান—আমি তোর মধ্যে এলাম।

পাগল—আমার দরকার নেই তোমাকে। অনেক করেছ। তোমার ভক্তদের নিয়ে তুমি থাক। আমি আমি-র ভক্ত।

ভগবান দেখলেন এবার তো আর কিছু করা যাবে না! তখন ভগবান তাকে ধরতে গেলে পাগল ছুটে পালিয়ে গেল। পাগল কিছুতেই ধরা দিল না। ভগবান তো আর পাগলের মতো পাগলামি করতে পারবেন না।

পাগল—বেশি যদি বাড়াবাড়ি কর আমি কাপড়চোপড় ফেলে নাচতে আরম্ভ করব। তোমার মান ইজ্জত সব যাবে।

ভগবান তখন বেগতিক দেখে সেই ভক্তের শরণাপন্ন হলেন।

ভক্ত—ওকে তোমার প্রিয় করতে হলে তোমাকে ওর মতো হতে হবে।

ভগবান—আমাকে কী করতে হবে?

ভক্ত—তোমাকে পাগল সাজতে হবে।

ভগবান পাগল সাজলেন। তখন দুই পাগলের মিলন হল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) মধ্যে সব পাগলামি চলছে। জগতে দুই রকম পাগল আছে। এক পাগল সবার কাছে মন ভিক্ষা চায়। দ্বিতীয় পাগল প্রথম পাগলের কাছে ভিক্ষা চায়। প্রথম পাগল হলেন ঈশ্বর। সকলকে মন দিয়ে মন চান। সেইজন্য জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত এক এক ভাবে মন দেয়। পাগল বলেছিল, তোমাকে দিয়ে আমার কারবার হবে না। সেই রকম সংসার-পাগলরা 'একে' বলে—তোমার এই সব কথা দিয়ে আমাদের সংসার চলবে না। দুই দলের পাগল এসে মিললে তবে তো হবে, নইলে এ ওর পিছনে ঘুরবে।

৩১। ৮। ৭৬

২৫৯

প্রথম প্রথম সংসার করতে সকলেরই ভাল লাগে। তারপর একে অপরকে ছাড়তে পারলে বাঁচে। কিন্তু ছাড়তেও পারে না, ফেলতেও পারে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক ভালুক জলে পড়ে গেল। উঠতে চেষ্টা করেও কিছুতেই উঠতে পারছে না, ভেসে চলে যাচ্ছে। তাই দেখে এক ভিখারি ভাবল, কম্বল ভেসে যাচ্ছে। কম্বল কাজে

লাগবে ভেবে জলে নেমে যেই ধরতে গেল, অমনি ভালুক তাকে জড়িয়ে ধরল। দু'জনে দু'জনকে জাপটে ধরল। ফলে দু'জনের কেউই আর পারে উঠতে পারল না। এই দৃশ্য দেখে পারের থেকে একজন বলল—আরে বোকা ওকে ছেড়ে দে! সে বলল—আমি ছাড়লেও কমলি যে আমাকে ছাড়ে না। তখন পারের লোক বলল—দাঁড়া এই বাঁশটা ধর এবং ভালুককেও ধরতে দে। তখন এই ভাবে দু'জনেই পারে উঠল। পারে উঠে এসে তারা আগুন জ্বালিয়ে বসল। ভিখারিকে দেখে ভালুক ভয়ে দৌড় দিল।

গল্পটি শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানে বাঁশ হল নাম বা গুরুকৃপা। আগুন হল তপস্যার তাপ। পারের লোকটি হল গুরু। কম্বল হল বিষয় যা অম্বল হয়ে জ্বালা দেয়। সৎসঙ্গের কথাগুলি শুনে জাবর কাটলে আগুন জ্বলবে।

নাম ও প্রার্থনা সর্বাগ্রে রাখতে হয়। প্রার্থনা তিনি পূরণ করলেন কি না তা দেখার দরকার নেই।

৫। ৯। ৭৬

২৬০

সৃষ্টির মধ্যে সব রকম ক্রমই আছে—যাকে সৎ-অসৎ, ভাল-মন্দ, দেবতা-অসুর দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়। কর্মের মাধ্যমে যে-সকল সাধনানুষ্ঠান সম্পাদিত হয় তা ক্রিয়াকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। ক্রিয়ার মধ্যে বারো আনা অবিদ্যার অংশ এবং চার আনা বিদ্যার অংশ থাকে। যথার্থ গুরুর সাহায্য না-পেলে বিদ্যার অংশে অবিদ্যার প্রভাব এসে পড়ে। সেইজন্য দেখা যায় মানুষ ধর্মকর্ম করেও ফল পায় না। কর্মবিজ্ঞানের এমনই রহস্য যে, দেবতাদের মধ্যেও অবিদ্যার প্রভাব এসে পড়ে। ফলে তাঁদেরও দেবলোক থেকে নেমে আসতে হয়।

অবিদ্যার পরিক্রমা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

জমদগ্নি ঋষি সকলের কাছেই সুপরিচিত। তিনি খুব তেজি তপস্বী ছিলেন। একবার ধ্যানে বসবার পূর্বে আশ্রমে তাঁর পুত্র ভার্গবকে বসিয়ে রেখে বললেন—আমার কাছে বসে থাক। আমার ধ্যানভঙ্গের পূর্বে উঠবে না।

ভার্গব পিতার আদেশ অনুসারে তাঁর পাশে এসে বসলেন। ভার্গবও খুব বড় ধ্যানীপুরুষ ছিলেন। পিতা ধ্যানে বসতেই তিনিও ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। কিন্তু জমদগ্নি ঋষি এমনভাবে ধ্যানে ডুবে গেলেন যে, দিনের পর দিন পার হয়ে গেল, কিন্তু তাঁর ধ্যানভঙ্গ হল না। এদিকে পুত্রের যে ক'দিন ধ্যানের অভ্যাস, সে ক'দিন পরে তাঁর আর ধ্যান হল না। অথচ পিতার আদেশ অমান্য করতেও পারছেন না এবং স্থান ত্যাগ করতেও পারছেন না। কিছুক্ষণ আসনে বসার পরই তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। ভার্গবের বয়সও তখন খুব কম, যৌবনের তেজঃশক্তি ও তপঃশক্তিতে তাঁর দেহ-মন ভরা, এমনকী অঘটন ঘটাবার ক্ষমতাও তিনি রাখতেন।

পিতার ধ্যানভঙ্গ না-হওয়াতে তিনি পুনরায় ধ্যানে বসলেন, কিন্তু তাঁর ধ্যান তো সীমাবদ্ধ। তিনি আপনভাবে আকাশপানে চেয়ে থাকতে থাকতে ধ্যাননেত্রে

দেখতে পেলেন দেবলোক থেকে একদল অপ্সরী নৃত্য করতে করতে চলে যাচ্ছে। সেই অপ্সরীদের মধ্যে প্রধানা অপ্সরীকে দেখে তাঁর খুব পছন্দ হল। তাদের দেখতে দেখতে তাঁর মন তাদের সঙ্গে ছুটে যেতে লাগল। তাঁর দেহ পড়ে রইল আসনে আর তিনি অপ্সরীদের সঙ্গে দেবলোকে চলে গেলেন। তিনি ইচ্ছামাত্র দেহধারণ করতে পারতেন। তিনি দেহধারণ করে অপ্সরীদের সঙ্গে রাজসভায় গেলেন।

ভার্গবকে দেখে দেবরাজ ইন্দ্র চিনতে পারলেন। তাঁকে খুব সমাদর করে দেবরাজ ইন্দ্র গ্রহণ করলেন ও যথাবিধি পাদ্যার্ঘ্য অর্পণ করলেন। তাপসকুমারও ইন্দ্রের পূজা ও বন্দনা করলেন।

ইন্দ্র ভার্গবকে বললেন—আপনি আমাদের এখানেই থাকুন। আপনার তো এখানে কোনও অভাব নেই।

ভার্গব দেবলোকে বাস করতে লাগল। দেবরাজ ইন্দ্রের কাছে ভার্গবের কোনও কিছুই অজ্ঞাত নেই। যে অপ্সরীর আকর্ষণে ভার্গব দেবলোকে চলে এসেছেন তার নাম বিশ্বচিতি। ইন্দ্র ভার্গবের সেবায় তাকে নিয়োগ করল। দীর্ঘকাল তার সঙ্গে থাকার ফলে ভার্গবের তপঃশক্তি ক্ষয় হয়ে গেল। তখন চিত্রগুপ্ত কালকে পাঠাল ভার্গবকে নিয়ে আসতে কারণ তাঁর ভাণ্ডার ও সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল।

পৃথিবীতে এসে তাঁকে দশবার দেহধারণ করতে হল। এর মধ্যে তিনি এক জনমে হলেন গরিব চাষি, দ্বিতীয় জনমে রাজা, তৃতীয় জনমে ধীবর, চতুর্থ জনমে বিদ্যাধর, পঞ্চম জনমে রাজা, ষষ্ঠ জনমে ব্রাহ্মণ, সপ্তম জনমে পশু মৃগ, অষ্টম জনমে মুনিপুত্র, নবম জনমে যুবরাজ এবং দশম জনমে তপস্বী হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন।

তপস্বী হয়ে যখন তিনি হিমালয়ে তপস্যায় রত তখন দীর্ঘকাল বাদে জমদগ্নি ঋষির ধ্যানভঙ্গ হল। ধ্যানভঙ্গের পরে পুত্রের দেহ ঐ ভাবে পড়ে থাকতে দেখে তিনি অবাক হয়ে গেলেন এই ভেবে যে, এরই মধ্যে তাঁর পুত্রের মৃত্যু হয়ে গেল! মৃত্যুর এত বড় স্পর্ধা যে, সময় না-হতেই তাঁর পুত্রকে নিয়ে গেল! তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকে স্মরণ করলে মৃত্যু এসে উপস্থিত হল।

মৃত্যু বললেন—আপনি আগে ক্রোধ সংবরণ করুন। আপনার তেজঃশক্তি ও তপঃশক্তি ক্রোধ করে কেন নষ্ট করছেন? আমাকেই বা কেন অনর্থক দোষারোপ করছেন? তাঁর কাল শেষ হয়ে গেলে আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। এটাই আমার কাজ। সময় উত্তীর্ণ হলে কাল কারওকে খাতির করে না।

ঋষি মৃত্যুকে জিজ্ঞাসা করলেন—এর মধ্যেই তার কাল শেষ হয়ে গেল?

মৃত্যু—আপনি একটু স্থির হয়ে ভাবলেই সব জানতে পারবেন, আপনার অজ্ঞাত তো কিছু নেই।

ক্রোধ এমনই বৃত্তি যে, ধ্যানের মাধ্যমে জমদগ্নি ঋষিকে পুত্রের বিষয়ে জানতে দিচ্ছে না! ক্রোধের প্রভাবে তিনি চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারছেন না। এই কারণে বলা হয় যে, ধ্যানে যখন যে বিষয়ে মন যায়, সেই বিষয় থেকে মনকে বিপরীতমুখী করতে হলে, স্থির না-হলে জানতে পারা যায় না।

মৃত্যু আরও বললেন—তাহলে পুত্রের ঘটনা আপনি শুনুন। ধ্যানরত অবস্থায় কিছুকাল থাকার পর তাঁর ধ্যানভঙ্গ হয়। দীর্ঘকালযাবৎ আপনার ধ্যানভঙ্গ না-হওয়াতে সে অসোয়াস্তি বোধ করে। তারপর পুনরায় ধ্যানাবস্থায় সে বিশ্বচিতিকে দেখে এবং তার ভাল লেগে যায়। তখন সে বিশ্বচিতির সঙ্গে স্বর্গে চলে যায়। ইন্দ্রের রাজ্যে দীর্ঘকাল স্বর্গসুখ ভোগ করে সে তাঁর তপঃশক্তি ক্ষয় করে এবং পৃথিবীতে এসে সে দশ জন্ম কাটায়।

জমদগ্নি ঋষি তখন বুঝতে পারলেন যে, তিনি সব কিছু না-জেনেই মৃত্যুর উপর ক্রোধ করেছেন, কারণ সৃষ্টির শুরু থেকেই মৃত্যুকে এই অধিকার দেওয়া আছে যে, সময় হলেই কাল সব সংহরণ করবে। এমনকী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকেও মৃত্যুরূপী কাল ছেড়ে দেন না।

মৃত্যু ঋষিকে বললেন—আপনি আমাকে অভিশাপ দিয়ে সুবিধা করতে পারবেন না। ঠিক আছে, সে সব কথা পরে হবে। আপনার পুত্রের কী অবস্থা হয়েছে তা একবার দেখবেন চলুন।

ঋষি হিমালয়ে গিয়ে দেখলেন তাঁর পুত্র তপস্যায় রত। কাল তাঁর তপঃশক্তির বলে ভার্গবের ধ্যানভঙ্গ করল। ধ্যানভঙ্গ হলে ভার্গব তাঁদের দু'জনকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা কে?

তাঁদের দেখে ভার্গব ভাবলেন, তাঁরা নিশ্চয় কোনও হিমালয়বাসী মহাত্মা হবেন!

মৃত্যু বললেন—তুমি এঁর পুত্র ছিলে। তুমি তোমার পূর্ব পূর্ব জন্ম স্মরণ কর, তুমি কোথায় ছিলে এবং তারপর কী কী অবস্থা হয়েছে তোমার!

ধ্যানে বসে ভার্গবের পূর্বজন্মের স্মৃতি জেগে উঠল। তিনি পিতার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বললেন—কী করে তুমি এখন আমাকে গ্রহণ করবে? নিয়ে চল আমায় সেই শরীরের কাছে।

কাল ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কী ইচ্ছা?

ভার্গব—আমি আমার সেই শরীরে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক।

জমদগ্নি ঋষি তখন মৃত্যুকে বললেন তাঁর দেহগুলি সংস্কার করে দিতে। কাল তাঁর কমণ্ডলু থেকে জল ছিটিয়ে ভার্গবকে সংস্কারমুক্ত করে দিলেন। তখন ভার্গব তাঁর তপস্বী দেহ ছেড়ে পূর্বের দেহে প্রবেশ করলেন। কাল ভার্গবের পরবর্তী দেহকে নাশ করে দিলেন।

কাল জমদগ্নি ঋষিকে বললেন—আপনার তেজ বীর্য দিয়ে তাঁর পূর্বের স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসুন।

তখন জমদগ্নি ঋষি যে-ভাবে সংকল্প করলেন সে-ভাবেই ভার্গবের স্মৃতি ফিরে এল।

ভার্গব পূর্বস্মৃতি ফিরে পেয়ে বলতে লাগলেন—পিতা কত কাল আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম!

জমদগ্নি ঋষি এই সব দেখে ভাবতে লাগলেন, আমি কী সিদ্ধি লাভ করলাম! কাল এসে এক মুহূর্তে আমার সব সিদ্ধি শেষ করে দিতে পারে।

জমদগ্নি ঋষি তখন কালের স্তবস্তুতি করতে লাগলেন—তুমিই অনাদি সর্বজ্ঞ সর্ববিদ্ সর্বশক্তিমান। তোমার ক্ষমতা অসীম। এখন আমার কী কর্তব্য তুমি বলে দাও।

কাল বললেন—আপনি যেমন ভাবে ছিলেন তেমন ভাবেই থাকবেন। তপঃশক্তি যেমন লাভ হয় তেমন বিনষ্টও হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সাধক স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না-হয় ততক্ষণ কোনও স্থিতি আসে না। বিদ্যাশক্তির দ্বারা অনেক সিদ্ধি ও বিভূতি লাভ করা গেলেও বিশ্বের নীতিকে লঙ্ঘন করা যায় না। আমি আশীর্বাদ করছি যে, স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে আপনি জীবন অতিবাহিত করুন।

জমদগ্নি ঋষি—আমি যে ক্রোধ করে অপরাধ করেছি।

মৃত্যু—তপস্বী হয়ে ক্রোধ করেছেন, কোনও এক জনমে এর ফল পাবেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয় প্রসঙ্গে বললেন—প্রতিটি ব্যষ্টিজীবন স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত না-হওয়া পর্যন্ত অবিদ্যাশক্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। তার অধীনে দেহধারণ করে অনন্ত কাল ঘুরতে হয়। বিদ্যাশক্তির দ্বারা কিছু লাভ হলেও তা স্থায়ী হয় না। স্থায়ী হওয়ার পদ্ধতি আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অন্তর্গত পরাবিদ্যা—আত্মবিজ্ঞানে মেলে। আত্মবিজ্ঞান হল বিশুদ্ধবোধের বিজ্ঞান। বিদ্যাশক্তি ও অবিদ্যাশক্তি হল তার অন্তর্গত।

অবিদ্যাশক্তি ছাড়া স্থূল বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায় না। বিদ্যাশক্তির প্রভাবে সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশের শক্তি লাভ হয়। সেই শক্তি লাভ হলে সূক্ষ্ম দেহ ধারণ করে অনন্ত পৃথিবীতে ঘুরে আসতে পারে। পরাবিদ্যা লাভ হলে অখণ্ড ভূমা পরম তত্ত্বস্বরূপের সঙ্গে বা পরমসত্তার সঙ্গে পূর্ণ ভাবে তাদাত্ম্য লাভ হয় অর্থাৎ ভূমা সর্বসম অদ্বয় বোধের সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়। এই হল জীবের পরমাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। একেই পরমার্থসিদ্ধি বলে।

'নিত্যাদ্বৈত এক জীববাদ'-এর যে দর্শন, তাতে দ্বৈতের কোনও ব্যাপার নেই। "এক জীববাদ" ও "অজাতবাদ" সাধনসিদ্ধির জগতে এক অভিনব সংবাদ। এর অধিকারী অতীব দুর্লভ, কিন্তু অসম্ভব নয়।

২৮। ১১। ৭৬

২৬১

বোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেলে অন্যান্য জগৎকে নিজের মধ্যে পাওয়া যায়। ভগবান যখন এই বিজ্ঞান দিয়ে যান মানুষ সহজে তা গ্রহণ করতে পারে না। গুরু কৃপা করে দিলে তবেই ধরা পড়ে। যখন ধরা পড়ে তখন সাধক বলে—তোমাকে ছেড়ে এক মুহূর্ত আমি নষ্ট করতে চাই না। তোমাকে ছাড়া প্রতি মুহূর্ত আমি যে কত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির কারণ হয়ে যাব এবং তার ফল আমাকে ভোগ করতে হবে। তোমার সেই পদ দাও যেখানে কাল স্পর্শ করতে পারে না। যত অনুভবসিদ্ধ মহাপুরুষ আছেন প্রত্যেকের জীবনে এ রকম একটি সময় আসে যখন তাঁকে না-পেলে এক মুহূর্ত তাঁরা দেহ রাখতে চান না। তারপর সব পরিষ্কার হয়ে যায়। অবশ্য আস্বাদনের

সখ যাদের আছে তাদের আরও ঘুরতে হয়। পৃথক করে আস্বাদনে স্থিতি আসে না, কিন্তু স্থিতি হলে আস্বাদন থাকবেই।

এক সাধক অনন্ত সিদ্ধি লাভ করেছে। সেই শক্তিবলে সে ইচ্ছামাত্র যত্রতত্র দেহের রূপান্তর করতে পারে। একবার সে বৈকুণ্ঠে গিয়ে বিষ্ণুর রূপ ধারণ করে তাঁর কাছে উপস্থিত হল। বিষ্ণু সব জানতে পারলেন। তিনি দেখলেন সাধক তপঃশক্তির বলে অনেক দূর উঠেছে। তিনি তাকে কিছু বললেন না। কারণ তিনি জানেন যে, এই শক্তি প্রয়োগ করতে করতে একদিন তার সব ক্ষয় হয়ে যাবে। তিনি ভাবলেন, আমি কেন শক্তি প্রয়োগ করে আমার শক্তি ক্ষয় করব? বিষ্ণু তাকে বললেন—তুমিও বিষ্ণু আমিও বিষ্ণু, তুমি আমার সখা হলে। এস আমরা কোলাকুলি করি। সে বলল—না, আমি বৈকুণ্ঠের সিংহাসনে বসব। তখন সে ইচ্ছামাত্র একটি সিংহাসন ও পাশে লক্ষ্মীসহ লক্ষ্মীর আসন সৃষ্টি করল। বিষ্ণু জানেন যে, এগুলি সব অস্থায়ী। এমনকী তাঁকেও কল্পান্তরে বিষ্ণুপদ ছেড়ে যেতে হবে। বিষ্ণু সগুণ, নির্গুণ থেকে এসেছেন। আবার নির্গুণে তাঁকে ফিরে যেতে হবে।

সাধক একবার মনস্থ করল তার নিজের স্থূল দেহকে আকাশের পরিধির মতো প্রসারিত করবে। এই বলে সে তার কলেবর বৃদ্ধি করতে লাগল। ফলে সব স্থূল বস্তু ধ্বংস হতে আরম্ভ করল। ধ্বংস দেখে কাল ভাবল, তাহলে কী এখন মহাপ্রলয়ের সময় এসে গিয়েছে! বিষ্ণু সবই জানতে পারলেন। তিনি ভাবলেন, একে রোধ করতে না-পারলে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু রোধ করতে গেলে আবার তাঁর নিজের সব শক্তি শেষ হয়ে যাবে। তখন বিষ্ণু এক কৌশল করলেন। সেই সাধকের এক ভক্ত ছিল। বিষ্ণু সেই ভক্ত সেজে তার কাছে এলেন। তিনি বললেন—আমার একটি প্রস্তাব আছে। আপনি যখন সবই পারেন তখন নিশ্চয়ই আপনার ঈশিত্বশক্তিও দিয়ে দিতে পারেন। সাধক বলল—হ্যাঁ পারি। যেই মাত্র সে তার শক্তি দিয়ে দিল বিষ্ণু সঙ্গে সঙ্গে তা নিয়ে নিলেন এবং আর ফেরত দিলেন না। সাধকের কাছে বিষ্ণুর পরিচয় অজ্ঞাত রইল না। সাধক বলল—আমি জেনেছি তোমারও বিষ্ণুত্ব পদ আর বেশিদিন নেই। ঠিক আছে, আমারও থাকল না, তোমারও থাকবে না। কিন্তু তুমি ছল করে নিলে বলে দ্বিতীয় কল্পে তোমার সব কিছু অবিদ্যাশক্তি গ্রাস করে নেবে।

গল্পটি শেষ হতেই জনৈক ভক্ত বলল—ঠিক হয়েছে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—এ রকম বলো না, শুনে যাও। বিদ্যা-অবিদ্যা কোনও পক্ষকেই সমর্থন ও বিরোধিতা করতে নেই।

জনৈক ভক্ত—ছল করেছেন ভগবান, তার ফল ভোগ করবেন না?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—যদি বলা হয় তুমিও অনেক ফল ভোগ করে এসেছ। প্রত্যেকের ভিতরেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর আছেন। অনুভবশক্তি সৃষ্টি করে। কাজেই এই ভাবনার গতিকে বা নিজেকে সংযত করতে না-পারলে বাইরে কেউ কিছু করে দিতে পারে না। স্থূল দেহ নষ্ট হলে আমি-র কেন্দ্রে যেতে পারবে না। কল্প কল্পান্তর বিষ্ণু কল্পের অতীতে চলে গেলেন। তা অনুভূতির বিজ্ঞান।

কখনও কারও পক্ষে বা বিপক্ষে যেতে নেই। এ হল স্বরূপস্থিতির বিজ্ঞান। এলোমেলো ভাবনাতে চক্রের মধ্যেই থাকতে হয়। বাইরে থাকতে হলে ভাল-মন্দ কারওকেই সমর্থন করবে না। যেমন তুলনা দেওয়া হয়—দেহের মধ্যে দু'টি পাখি বাস করে। একজন শুধু দ্বিতীয় পাখির কাজ দেখে। সে 'হ্যাঁ' বা 'না' কিছুই বলে না। আরেকটি পাখি আস্বাদন করে। সে যে কোনও একটি পক্ষ নিয়ে থাকতে চায়। কিন্তু শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষেরই বিকার আছে। অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে চন্দ্রের সংকোচন ও সম্প্রসারণ হয়। চন্দ্রের অধিপতি হল মন। তাই মনের যত সৃষ্টি আছে তার আবির্ভাব ও তিরোভাব হয়। এর ঊর্ধ্বে মনকে রাখতে গেলে যা প্রয়োজন তা-ই সদ্‌গুরুমুখে পরিবেষিত হয়।

ছোট ছেলেদের মধ্যে ভূতের ভয় ঢুকলে যেমন সহজে তা দূর হয় না, সন্ধে হলেই তারা যেমন সব জায়গায় ভূত দেখে, তেমনই সংসারভূত জীবের মধ্যে ঢুকে বসে আছে। প্রতি রূপে, নামে তা যেন গেঁথে গিয়েছে, সহজে ছাড়ে না। কিন্তু স্বরূপানুভূতির পরে দেখে সব কিছুর মধ্যে সে নিজেই আছে।

মন যা দিয়ে সৃষ্টি করে, তাতেই বাস করে। মনের সৃষ্ট সব কিছুই মিথ্যা। কারণ মনের নিজস্ব রূপ নেই, তার সৃষ্ট বস্তু কী করে থাকবে? গুরু শুদ্ধবোধ দিয়ে মনের কল্পনার জালকে ছিন্ন করে দেন। জপ-ধ্যান করার পর দর্শন হয় ঠিকই, কিন্তু দর্শনেই আটকে যায়। দৃশ্যকে অতিক্রম করে চলে যেতে হবে। স্বরূপে অন্য রূপ থাকে না, স্ববোধে অন্য বোধ থাকে না। চিন্তারূপে তিনি স্বয়ং থাকেন।

আত্মজ্ঞান লাভের জন্য কোটি কোটি চিন্তার বৃত্তির মধ্যে ছাপ মারতে হয় যে, এটাও চৈতন্য। এর নাম জ্ঞানচক্ষু। অজ্ঞান যতক্ষণ ভাল লাগে ততক্ষণই আস্বাদন করবে। দেহ থেকে বুদ্ধি পর্যন্ত কোনওটিই আপন নয়। চৈতন্যসাগরে 'আমি, আমি বোধ'-ও পর।

২৮। ১১। ৭৬

২৬২

আত্মা ও পরমাত্মার বিজ্ঞানের মাঝে আছে এক অদ্ভুত বিজ্ঞান যা সাধকরা মুখে মুখে রাখেন। তা প্রচারের জন্য নয়। প্রত্যেকেরই একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে। তা হল অন্তর্ভাষা, যাতে অন্তর্ভাব দিয়ে পরস্পরের মধ্যে আদান-প্রদান হয়। সেই ভাষার বিশেষ এক জায়গায় নির্দেশ আছে যে, ভাব যখন চতুর্বিধ স্তরে, যথা—রূপ-নাম-ভাব-বোধে আছে, তাহলে ভাষাও চতুর্বিধ স্তরে আছে। দৃষ্টির মাধ্যমে সাধকদের ভাব বিনিময় হয়। যদি ভাবের ব্যতিক্রম থাকে ওর মধ্যেই make up দিয়ে নেন।

একবার দুই মহাত্মা বৃন্দাবনে এসে মিলিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বহিঃপ্রকৃতিতে খুব রুক্ষ এবং কড়া কিন্তু অন্তঃপ্রকৃতিতে ছিলেন প্রেমঘন। আরেকজন বহিঃপ্রকৃতিতে প্রেমঘন, কিন্তু প্রয়োজনে দৃঢ় বা অটল থাকেন। উভয়ের সঙ্গে উভয়ের এক স্থানে দেখা হল। প্রথমজন কথা বলা তো দূরের কথা, মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইলেন। দ্বিতীয়জন ছিলেন সন্ন্যাসী। তিনি প্রথমজনকে স্তবস্তুতি করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি

ঘুমের ভান করে পড়ে রইলেন। এই যে পরস্পরের মধ্যে ভাবের উনিশ-বিশ ছিল, তাঁর স্তবস্তুতিতে ভাব সমান হলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তারপর দু'জনে হাসতে লাগলেন। কিছুক্ষণ একসঙ্গে থেকে তাঁরা চলে গেলেন, তাঁদের মধ্যে কোনও কথা হল না। প্রথমজনের ভক্তরা মহাত্মাকে বলল—উনি এতবড় একজন সন্ন্যাসী, তাঁর সঙ্গে আপনি কথা বললেন না? উত্তরে তিনি বললেন—তুমি কী দেখেছ? আর দেখেই কি সব বুঝে ফেলেছ?

এদিকে সেই সন্ন্যাসী কথাপ্রসঙ্গে তাঁর শিষ্যদের একদিন বললেন—অনেক জায়গায় ঘুরে অনেক জিনিস পেয়েছি, কিন্তু তাঁর সঙ্গে দেখা করে যে আনন্দ পেয়েছি এ রকম আর কোথাও পাইনি। একবাব কুম্ভমেলায় দুই মহাত্মার শিষ্যদের মধ্যে মিলন হয়। সন্ন্যাসীর শিষ্যরা অপর ভক্তদের বলল—গুরুদেব তাঁর দর্শন লাভের পর বলেছেন, এ রকম শান্তি ও আনন্দ তিনি আর কোথাও পাননি। দ্বিতীয়জনের শিষ্যরা তো এই কথা শুনে অবাক হয়ে গেল। একজন বলল—এদিকে গুরুদেবকে আমি তাঁর সঙ্গে কথা না-বলার জন্য কথা শুনিয়ে দিয়েছি। সন্ন্যাসী মহাত্মার শিষ্যরা বলল—আমরা গুরুদেবের মুখ থেকে তাঁর কথা শুনে রোজ তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানাই। তখন প্রথমজনের শিষ্যরা খুব অনুতপ্ত হয়ে গুরুদেবকে সব বলল। শুনে তিনি বললেন—তোমরা ঘোল খেয়েছ, শুকনো দইয়ের খবর জান না। আগে দই খাও।

অনুভূতির বিষয় অনন্ত। তার স্তরগুলি সবার কাছে সমান ভাবে আসে না। গুরুর রূপ, নাম, ভাব ও বোধকে যখন কেউ ব্যবহার করবে তখন অখণ্ড আকাশবৎ ধরে নিয়ে যেন ব্যবহার করে, তাহলে আর ত্রুটি থাকে না। গুরু একজনই যিনি নিত্য সচ্চিদানন্দস্বরূপ অখণ্ড আকাশবৎ। সর্বকালে সর্বতোভাবে গুরুভাব থাকলে গুরুর যথার্থ রূপ থাকে। এই ভাবে ভজন করলে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন ভাবযুক্ত হয় এবং ঈশ্বরের পরে পরমেশ্বরের ভাব সহজে প্রকাশ পায়।

৩০। ১১। ৭৬

২৬৩

অন্তরের ইচ্ছার দ্বারা মানুষ দেহধারণ করে। ইচ্ছাকে প্রকাশের ধারা অনুযায়ী ক্রমভাগ করা হয়েছে, যথা—মায়া ও মহামায়া রূপে। যখন মনের বৃত্তি বেড়ে যায় তখন মন শান্ত হতে পারে না। কোনও ঘটনার বা চিন্তার মাধ্যমে মনের বৃত্তি বেড়ে যায়। আবার কোনও ঘটনাতে চিন্তার স্রোত স্তব্ধ ও শান্ত হয়ে যায়। পুনঃপুনঃ এইরূপ হতে হতে মনের গঠন রূপান্তরিত হয়। ক্রমে স্থূল হতে সূক্ষ্মে যায় এবং সূক্ষ্ম থেকে ক্রমশ সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতমে প্রবেশ করে। সূক্ষ্মতম অবস্থা থেকে আবার ইচ্ছার মাধ্যমে স্থূলে নেমে আসে। সামান্য একটি ইচ্ছা থাকলেও আবার নেমে আসতে হয়।

একজন উচ্চকোটির জ্ঞানী সাধক মুক্তি লাভের জন্য সাধনা করেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র এসে তাঁকে বললেন—তোমার কী ইচ্ছা, বল? সাধক বললেন—আমি আমার মুক্তস্বরূপ আস্বাদন করতে চাই। ইন্দ্র বললেন—তা তো হবে না। তোমারই সৃষ্ট

কল্পনা বা সংকল্প অপূর্ণ রয়ে গিয়েছে। সাধক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—তার জন্য আমাকে কী করতে হবে? ইন্দ্র বললেন—তোমাকে আবার মৃগজন্ম নিতে হবে। অতীতে তুমি যে তপোবনে তপস্যা করতে সেখানে এক মৃগকে তুমি লালন পালন করেছিলে। সে যখন দেহত্যাগ করে তার বিরহে তুমি ব্যথিত হয়েছিলে। তুমি তখন বলেছিলে—আহা, ও মরে গেল! ওর জন্য কিছুই করতে পারলাম না! এটা যদিও সত্ত্বগুণের অভিব্যক্তি, তবুও সত্ত্বগুণকে অতিক্রম করতে হয়।

সাধক তখন মৃগজন্ম নিয়ে পৃথিবীতে আসলেন। সে তপোবনে ঋষিদের চার দিকে ঘুরে বেড়ায়। তাঁদের কাছে এসে বসে থাকে। তার ভিতরে ঋষিদের প্রভাবে এক শক্তি আসে। কিন্তু সে বুঝতে পারলেও তা প্রকাশ করার ভাষা তার ছিল না। তার চোখ দিয়ে শুধু জল পড়ত। এক মুনি ধ্যানে তার পরিচয় জানতে পারলেন। তিনি সহানুভূতির সুরে তাকে বললেন—আহা, ওর একটিমাত্র জন্ম বাকি আছে! আমার চিন্তার এক অংশ দিয়ে যদি ওকে মানুষ করে দিই তাহলে ও মুক্তি পেয়ে যাবে। এই মুনি আবার পড়ে গেলেন সংকল্পের জালে। সেদিকে তাঁর খেয়াল রইল না।

এই দৃষ্টান্ত দিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কোনও জন্মই ভুল বা হীন নয়। মৃগজন্ম না-পেলে সে মনুষ্যজন্ম লাভ করতে পারত না।

৫। ১২। ৭৬

২৬৪

বেদজ্ঞপুরুষ কী ভাবে অনুশাসন করেন তারই উদাহরণ গল্পের মাধ্যমে ব্যক্ত করলেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক জিজ্ঞাসু ভক্ত একবার তার বেদজ্ঞ গুরুকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে একের পর এক নানা রকম প্রশ্ন করতে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তর পর্ব চলার পরে শিষ্য এমন এক অবস্থায় এসে পৌঁছাল যে, সে বাধ্য হয়ে গুরুকে বলল—গুরুদেব, আমাকে ক্ষমা করুন, আমি কিন্তু আর গ্রহণ করতে পারছি না। আমাকে এবার ছেড়ে দিতে হবে।

গুরুর আদেশ পেয়ে শিষ্য চলে গেল।

কিছুদিন পরে তার মনে আবার প্রশ্ন উদয় হওয়াতে সে আবার জিজ্ঞাসু হয়ে গুরুর কাছে ফিরে এসে বলল—আমি এখান থেকে চলে গিয়ে ঠিক করিনি। সব প্রশ্ন একবারে নিরসন করে গেলেই ভাল হত।

গুরুদেব বললেন—বল তোমার কী প্রশ্ন আছে?

শিষ্য তখন আবার এক এক করে প্রশ্ন করতে লাগল। তারপর সে বলল—দেখলাম যে নিজের স্বরূপ না-জেনেই এতদিন সংসার করে এসেছি। স্বস্বরূপ জেনে দেখছি সংসারে কোনও জিনিসের সঙ্গেই বিরোধ নেই। আমি, আপনি এবং সকলেই সেখানে প্রকাশমাত্র।

গুরুদেব—এখন তুমি পূর্ণ হয়েছ। আগে তাহলে সংসারভ্রান্তি কার ছিল?

শিষ্য—কারও ছিল না।

গুরু—একটু আগে যে তোমার প্রশ্ন ছিল।

শিষ্য—কিছুক্ষণ আগে যে বলেছিলাম তার তো কোনও প্রমাণ নেই।

আপনার কাছে এসে বোধ সম্বন্ধে আমার ধারণা পরিষ্কার হয়েছে। যেমন আলো এলে আর অন্ধকার থাকে না।

গুরু—ঠিক আছে, এই বোধ নিয়েই তুমি জীবনে চল।

গুরুর কথা মতো সেখানেই সে বসে পড়ল। সম্বিৎ-এর সঙ্গে পরিচয় হলে দেশ-কাল থাকে না। তিনশো বছর পরে ধ্যানভঙ্গ হলে তার মনে হল, এই সেদিনমাত্র যেন গুরুদেব চলে গেলেন। তখন সে গাছের নিচে যেখানে গুরুদেবের আসন ছিল সেখানে গেল। আশ্রমের এক বৃদ্ধ সাধু তাকে দেখে বললেন—উঠে এলে কেন? আবার গিয়ে বস সেখানে।

শিষ্য—আমার গুরুকে প্রয়োজন।

বৃদ্ধ সাধু—গুরু তো তোমার মধ্যেই আছেন।

গুরুকে স্মরণ করামাত্র শিষ্য গুরুর দর্শন পেল। গুরু আবির্ভূত হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কেন আমাকে দেখতে চেয়েছিলে? আরও পরিষ্কার করে দেখতে হলে একেবারে আমার সঙ্গে মিশে যেতে হবে। ভ্রান্তি চলে গেলেও অনন্ত কাল ও ক্ষণ থাকে। তোমার কাছে দৃশ্য ও দর্শন পৃথক হল কেন?

শিষ্য—আপনিই তা বলে দিন। আমি প্রবুদ্ধ হয়েও আবৃত হয়ে আছি কেন?

গুরু—বিশুদ্ধচৈতন্যে মন নেই বলে। সেখানে কার্য-কারণ নেই। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। প্রকাশের কোনও হেতু নেই। দ্রষ্টা-দৃশ্য-দর্শনরূপে তিনি নিজেই আছেন। আরেক দিকে চৈতন্যের ত্রিবিধ ভেদ নেই। অনন্ত কাল ও ক্ষণকালের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। আরেক স্থানে ভেদ আছে। বহুরূপ হল চৈতন্যের নিজেরই। সোনা দিয়ে গয়না হয় কিন্তু অলংকারভাবযুক্ত সোনা ও অলংকারভাবশূন্য সোনা উভয়ের মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য কী করে বোঝাবে?

গুরু তখন মাটি নিয়ে এলেন। তালগোল পাকিয়ে সেই মাটি দিয়ে তিনি একটি মূর্তি গড়লেন, তারপর তা ভেঙে ফেললেন। পরে তিনি শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—মূর্তিটি কোথায় গেল?

শিষ্য—আমার মধ্যে আছে।

গুরু তখন মাটি সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তিনি বললেন—এবার তুমি বানাও।

শিষ্য—আপনার কৃপা দরকার।

গুরু—তুমি নিজে, মাটি ও কৃপা এই তিনটিকে পৃথক জ্ঞান করছ।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চৈতন্যের দর্শন হয় অংশমাত্র। মন দ্বারা আরও একটু বেশি হয় এবং চিৎ অর্থাৎ অখণ্ড আপনবোধ দিয়ে ব্যবহার হলে বোধাত্মার অনুভূতি পূর্ণ ভাবে হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভ্রান্তি বা কল্পনা যা আছে তা শোধন করতে হয় ভ্রান্তির অধিষ্ঠান আত্মবোধের দ্বারা। কল্পনা শোধন হলে কেবল আত্মবোধের স্ফূর্তি হয়, তখন মাটি বলে পৃথক কিছু থাকতে পারে না। বিগ্রহ হল

তাঁর অনন্ত মহিমার একটি উদাহরণ। বিগ্রহকে ভক্ত যে সাজায়, খাওয়ায়—এ সব কল্পনা নয়। কল্পনা বললে, সাধারণ মানুষের কথা বলাও কল্পনার পর্যায়েই পড়ে। ভক্তের কল্পনা বড় মধুর।

ভ্রান্তি ও দুঃখকষ্টের মধ্যে চৈতন্যকে দেখতে হয়। চৈতন্যই হল চৈতন্যের পরিচয়। শুধু ব্যবহারের তারতম্য হয়। অন্নকে জড় বলে গ্রহণ করতে নেই। প্রাণরূপে গ্রহণ করলে আবার প্রাণের অনুভূতি লাভ হয়। জড়ভাব সরাবার জন্য আকাশের ভাবনা করতে হয়। চৈতন্য আকাশের মতো স্বচ্ছ। ভিতরে এবং বাইরে আছে আকাশ। এই চৈতন্য হল প্রিয় হতে প্রিয়তম এবং শ্রেয় হতে শ্রেয়তম।

২৬। ১২। ৭৬

২৬৫

অন্তরে গুরু জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেন গুরুভাব দিয়ে, কেন না তিনি তো বোধময়। বিকল্প ভাবনা দিয়ে নয়, সহজ ভাবেই দেন। শোনা কথাগুলি মনে রেখে চলাই হল বিচার করা। বিচারশীল না-হলে মন তলিয়ে যায়। সাত্ত্বিক আহার হল তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকা। এগুলি সবই গুরুভাবের অন্তর্ভুক্ত।

এক ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের কাছে গিয়ে কয়েকজন ব্রহ্ম বিষয়ে প্রশ্ন করল। উত্তরে তিনি বললেন—যা প্রশ্ন করলে, তার উত্তর তোমাদের সাথেই আছে। কয়েকদিন কাছে থাক তারপর বুঝবে। তারা মহাত্মার সঙ্গে কয়েকদিন বাস করল। সেই সময় কয়েকটি ঘটনা ঘটল। তিনি দেখিয়ে দিলেন কী ভাবে এই সকল ঘটনার সঙ্গে তাদের প্রশ্নের সম্বন্ধ আছে, চৈতন্য কী ভাবে যুক্ত আছে। তারা বলল—এ তো আমরা প্রতিদিন দেখি! ঋষি বললেন—প্রতিদিন যাঁকে দেখ তাঁকে বাদ দিয়ে কাকে খুঁজছ? তিনি তো নিত্যবর্ত্তমান। স্ববোধ বা আপনবোধ সহজে জাগে না। প্রথম প্রথম দেহকেই আপন মনে হয়। এই হল অবিদ্যা-অজ্ঞানের বৈশিষ্ট্য। দেহবোধ ততক্ষণই থাকে যতক্ষণ জেগে থাকে। গাঢ় ঘুমের মধ্যে একটি আনন্দধারা বয়ে যায়।

২। ১। ৭৭

২৬৬

বিনা শ্রবণে আধ্যাত্মিক সাধন ফলপ্রদ হয় না। অনুভূতির রাজ্যে প্রথম কথা হল সাধনা ছাড়া কেউ কোনও দিন অনুভূতি লাভ করতে পারে না। যারা সাধনা করে তাদের কাছে সাধারণ বিজ্ঞান পাওয়া যায়। সেই অনুভূতিস্বরূপকেই গুরু বলা হয়। যাঁরা শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন তাঁরাই বোধের বিজ্ঞানের রহস্য খুলে দিতে পারেন।

শ্রবণ না-করে অধ্যাত্মবিদ্যা চর্চা করা যায় কি না, শ্রীরামচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে ঋষিগুরু বশিষ্ঠদেব তাঁকে যে গল্পটি বলেছিলেন, শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সেই গল্পটি এখানে উল্লেখ করলেন।

তিনজন কাঠুরে ছিল। তারা বড় গরিব। অতি কষ্টে দিনযাপন করে। শেষে একসময় তাদের এমন অবস্থা হল যে, অন্ন আর জোটে না। না-খেতে পেয়ে তারা দুর্বল হয়ে পড়ল। তখন তারা পরামর্শ করে রোজগারের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। একজন

পেটের দায়ে অন্য বৃত্তি নিল। আরেকজন গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে সেখানে অনেক কাঠ দেখতে পেল। সে ভাবল, কাঠগুলি কাটবে, কিন্তু কুড়ুল তো নেই—সুতরাং সে পয়সা রোজগারের জন্য অন্য বৃত্তি নিল। তারপর সেই কাজেই সে লেগে গেল। কুড়ুল কিনবার কথা ভুলে গিয়ে দিব্যি সে ঘরসংসার পেতে বসল।

তৃতীয়জন পাহাড়ের দিকে এগিয়ে গিয়ে গাছের নিচে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। সেখানে সে এক মহাত্মার দর্শন পেল। তাঁর কাছে গিয়ে বলল—আজ আমার কিছু খাওয়া হয়নি, পেটের জ্বালায় মরছি। একটু খাবার জোগাড় করা যায় কী করে? মহাত্মা এ কথা শুনে তাকে কিছু খাবার খেতে দিলেন। সে বলল—আজ তো দিলেন, কাল কী হবে? মহাত্মা তাকে বললেন—আচ্ছা, কাল তুমি এস। আসবার সময় কিছু শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে এস।

পরদিন কাঠুরে শুকনো ডালপালা নিয়ে এসে হাজির হল। মহাত্মা তাকে খেতে দিলেন। এই ভাবে পরপর কয়েকদিন সে সাধুর দেওয়া খাবার পেয়ে প্রাণ বাঁচাল। তারপর কাঠুরে একদিন বলল—আপনি এ ভাবে ক'দিন আমাকে খেতে দেবেন? আমার জীবন চলবে কী করে?

মহাত্মা তখন তাকে একটি কুড়ুল দিয়ে বললেন—সামনের ঐ জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে এসে এখানে কিছু রাখ এবং বাকিটা নিয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলে দেখবে সেখানে আমার মতো একজন বসে আছেন। তাঁকে এই বাকি কাঠগুলি দিয়ে এস, তাহলে তিনি তোমাকে কিছু পয়সা দেবেন।

কাঠুরে কাঠ নিয়ে পাহাড়ের আরও উপরে উঠে গিয়ে একজন মহাত্মার দর্শন পেল। তাঁকে কাঠ দিতেই তিনি কাঠুরেকে দু'টি পয়সা দিলেন। কাঠুরে নেমে এসে প্রথম মহাত্মাকে বলল—বাবা, এর চেয়ে আরেকটু বেশি রোজগার হতে পারে না?

সাধু বললেন—ওখান থেকে আরেকটু উপরে উঠে যাও, সেখানে আমার মতো আরেকজনকে পাবে, তাঁকেও কাঠ দিয়ে এস। কাঠুরে মহাত্মার কথা মতো কাঠ দেওয়াতে তৃতীয় মহাত্মা তাকে আটটি পয়সা দিলেন। পরদিন প্রথম মহাত্মা তাকে আরও উপরে এগিয়ে যেতে বললেন। এ ভাবে পরপর তিনি দশটি জায়গার সন্ধান দিলেন এবং কাঠুরেও বেশ পয়সা রোজগার করতে লাগল।

গুরু বশিষ্ঠদেব তখন রামচন্দ্রকে বললেন—দেখ, তৃতীয় ব্যক্তি জিজ্ঞাসা ও উত্তরের দ্বারা কত ধন উপার্জন করল!

রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন—অপর দু'জন পেল না কেন?

বশিষ্ঠদেব—তাদের তো জিজ্ঞাসা জাগেনি।

রামচন্দ্র—আপনার কথা বুঝতে পারলাম না!

বশিষ্ঠদেব তখন রামচন্দ্রকে আরেকটি ঘটনা বললেন—একজন গৃহী সংসারে স্ত্রী ও পুত্রের কাছে ভাল ব্যবহার না-পেয়ে রাগ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু কী করে তার দিন চলবে!সে ভাবল; সাধু হয়ে যাবে। তখন সে সাধুর পোশাক পরে নিল। কিন্তু শাস্ত্র পড়েনি, কাজেই কোনও কথা আর বলতে পারে না। তাই এক

মহাত্মার কাছে সে শাস্ত্র পড়তে গেল। তিনি তাকে শাস্ত্র পড়ান, কিন্তু লোকটি কিছুই বোঝে না।

মহাত্মা তাকে বললেন—তুমি বুঝতে চাও তো কিছুদিন এখানে থাক। লোকটি তাঁর আশ্রমে থাকতে লাগল। নির্জনে গিয়ে সে জোরে জোরে উচ্চারণ করে মহাত্মাকে অনুকরণ করার চেষ্টা করত।

যেখানে সে এই অভ্যাস করত সেখানে একটি গাছে এক শাপভ্রষ্ট পাখি থাকত। পাখিটিকে যিনি শাপ দিয়েছিলেন তিনি বলেছিলেন যে, শাস্ত্রের কয়েকটি কথা পরপর যদি সে শুনবার সুযোগ পায় তাহলে সে মুক্ত হয়ে যাবে।

পাখিটি পরপর কয়েকদিন তার কাছে শুনল—সবই ব্রহ্ম, সবই চৈতন্য ইত্যাদি, ইত্যাদি। ফলে কয়েকদিন পরেই সে শাপমুক্ত হয়ে গেল।

বশিষ্ঠদেব তখন রামচন্দ্রকে বললেন—শ্রবণ ও শাস্ত্রপাঠের কী ফল দেখ! রামচন্দ্র তখন জিজ্ঞাসা করলেন—গুরুবরণ না-করলে কি জীবন্মুক্ত হওয়া যায় না?

উত্তরে তিনি বললেন—জীবন্মুক্ত হওয়া মানেই গুরু হয়ে যাওয়া। গুরুর সান্নিধ্য ব্যতীত গুরু হওয়া যায় না।

রামচন্দ্র তখন বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—এগুলি আপনি জানলেন কী করে?

বশিষ্ঠদেব বললেন—আমার পিতা ব্রহ্মাজ্ঞ চৈতন্যময়। ব্রহ্মাজ্ঞের সমপর্যায়ে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত তাঁদের সাহায্য ছাড়া এই বোধ জাগে না। তুমিও স্বরূপত চৈতন্য। কিন্তু কল্পনা করছ অচৈতন্যের। এই কল্পনা থেকে মুক্ত হও। চৈতন্যের পরিচয় হল, যা নিজের বক্ষে, নিজের জন্য, নিজের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করে। মনের সেই সত্তার নেই। মন চৈতন্যের সাহায্য ছাড়া নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না এবং পৃথক হয়েও থাকতে পারে না। মন চৈতন্যের মধ্যে থেকেও চৈতন্যকে ভুলে থাকে বলে চৈতন্যের স্বরূপকে ধরতে পারে না।

রামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে প্রশ্ন করলেন—আপনি যা বলছেন ছোট শিশুরা কি তা বুঝতে পারছে?

বশিষ্ঠদেব বললেন—শুদ্ধবোধে প্রতিষ্ঠিত হলে দেখবে তোমার সঙ্গে তাদের কোনও তফাত নেই। তুমি ভগবান হতে পার কিন্তু যতদিন না চিৎতত্ত্ব উপলব্ধি করবে ততদিন তোমার রেহাই নেই। জগতে চৈতন্যই যে সব, এই পরিচয় না-পাওয়া পর্যন্ত শান্তি কেউ পেতে পারে না। বশিষ্ঠদেবের কথা শুনতে শুনতে রামচন্দ্র অন্তরের গভীরে তলিয়ে গেলেন, মন বলে কিছু আর খুঁজে পেলেন না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষ যখন কল্পনা করে বা স্বপ্ন দেখে তখন বৃত্তি বেশি হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছিলেন—"সরষের পুঁটলি ছড়িয়ে গেলে তাকে গুটিয়ে আনা কষ্টকর। ঝাঁট দিয়ে গুটিয়ে আনতে হয়।" কিন্তু ঝাঁট দিয়ে গুটিয়ে আনতে গেলে জীবন সেই আঘাত সহ্য করতে পারে না।

আত্মতত্ত্ব থেকে সরে গেলে কী অবস্থা হয় তা বশিষ্ঠদেব সাতবার বুঝেছেন। বশিষ্ঠদেবের এত মহিমার কারণ হল তিনি রামচন্দ্রকে স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে

দিয়েছিলেন। বশিষ্ঠদেব জীবন্মুক্ত হয়েও মুক্তির স্তরে মিশে যাননি। মানুষ যতদিন মুক্তির জন্য চেষ্টা করবে ততদিন তিনি তাদের সাহায্য করবেন।

আত্মবোধ না-আসা পর্যন্ত ঈশ্বর কল্পনামাত্র। প্রথমে সবাই দ্বৈতবোধের মধ্যেই বাস করে। জীবের কষ্টের শেষ নেই ঠিকই। তার কষ্ট শেষ করার জন্য বলা হয় যে, বহির্জগতের সব কিছুই কল্পনামাত্র। এটা না-ভাঙা পর্যন্ত কষ্টের শেষ নেই। কল্পনা কখনও এক রকম থাকে না। ক্ষণে ক্ষণে তার স্বরূপ পাল্টায়। অসৎ বা মিথ্যা নিত্য এক রকম থাকে না। অসৎ হল তা-ই যা কখনও সৎরূপে নিরূপিত হয় না। মিথ্যা হল যা সৎরূপে প্রতিভাত হয়, কিন্তু কখনও সত্য হয় না। আকাশবৎ অবস্থা না-হওয়া পর্যন্ত দুঃখকষ্ট যায় না। আকাশকে কে সৃষ্টি করেছে? সেই একমাত্র বস্তু ছিল, আছে ও থাকবে। মনকে জানতে গেলে যার সাহায্য নিতে হয় তা-ই হল সত্য বস্তু। গাঢ় ঘুমে মন থাকে না, থাকে সাক্ষী আত্মা। আত্মা কোনও সময়ের জন্য লুকাতে পারে না। আকাশবৎ ভাবনা হল একমাত্র ধ্যান, অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপের ধ্যান হল যথার্থ ধ্যান।

"সচ্চিদানন্দস্বরূপ অহং" মহাবাণী হল তাদের জন্য, যারা সংসারের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছে বা মনের বৈচিত্র্যের প্রভাব হতে মুক্ত হতে চায়। মনকে অর্থাৎ এই দৈত্যকে প্রশমিত করতে পারলে সংসারকে সমসারে আনা যায়। মন অবলম্বন সহজে ছাড়তে চায় না, নিজেকে বিলীন করতে ভয় পায়। বৈরাগ্যে প্রতিষ্ঠিত না-হলে অনুভূতির জ্যোতি বা আলো পাওয়া যায় না।

৯। ১। ৭৭

২৬৭

দৈব, কর্ম, বাসনা, সিদ্ধি, চিত্ত প্রভৃতির সংজ্ঞা সম্বিৎস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন অভিব্যক্তি। নিজেকে নিয়ে নিজের খেলা। যা জানি, যা দিয়ে জানি এবং যে জানে— এক চৈতন্যের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি। কিন্তু এই ত্রিবিধ অভিব্যক্তির অভিন্ন জ্ঞান না-জাগলে বিব্রত হতে হয়। প্রশ্নশূন্য হওয়ার এক পদ্ধতি হল নিজের মধ্যে শ্রুত বিষয়ের ভাবনা করা। ফলপ্রদ পুরুষকারের পরিচয় দেওয়া হয়, অনুভবসিদ্ধ জীবনের কাছ থেকে উপদেশ অনুসারে নিজের দেহ, বাক্, মনকে পরিচালিত করার মাধ্যমে। এর দ্বারা নিশ্চিত সিদ্ধিলাভ করা যায়। এই প্রসঙ্গে চারটি প্রশ্ন মনে জাগে—(১) কী করবে (২) কী ভাবে করবে (৩) কেন করবে এবং (৪) কে করে। এই চারটি প্রশ্নের উত্তর, পদ্ধতি ও সাধনসিদ্ধি গুরু দিয়ে দেন।

রাজা জনক প্রায়ই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে প্রশ্ন করতেন এবং তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে সহস্র ধেনু পুরস্কার দিতেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি একদিন বললেন—আজ আমি আপনাকে প্রশ্ন করি আর আপনি উত্তর দিন। দেহধারণের আগে আপনি কোথায় ছিলেন, দেহধারণ করে কোথায় আছেন এবং দেহ ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাবেন? জনক রাজা ভাবলেন, সত্যিই তো কোথায় যাব জানি না, কোথায় ছিলাম তাও জানি না! কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন—এবার আমি প্রশ্ন করব। আমি যা জানি না

তার উত্তর আপনাকে দিতে হবে। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—আপনি রাজর্ষি, আত্মজ্ঞান লাভ করেছেন, আপনি বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি আরও বললেন—আপনি কোনও জায়গাতেই ছিলেন না, বর্তমানে আপনি যেখানে আছেন সেইখানেই থাকবেন। আপনার বিকার নেই মহারাজ, আপনার স্বরূপ মাপা যায় না, প্রশ্ন দিয়ে শেষ করা যায় না। উত্তর জেনেও শেষ করা যায় না। তা মৃতবৎ নয়, সর্বজীবনের সার নিয়ে গড়া। আমি কোনও সাধনা করে এই অবস্থায় আসিনি। তিনি নিজেকে আমার মধ্যে প্রকাশ করে অনুভব করেছেন। জনক রাজা তখন যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিকে আপন সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি তখনও নির্বিকার ভাবে বললেন—এই ভাবে চৈতন্য খেলল। আমি, আপনি কেউ রাজা ছিলাম না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—স্বপ্নবিলাস ভঙ্গের সময় হলে নিজের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য, জনক প্রকাশ হয়ে পড়ে। সর্বোত্তম অধিকারী সে যে নিজেকে সাধনায় অবলম্বন করে। সম্বিৎ-এর ভাবনা যত বাড়ে ততই স্বপ্ন ভেঙে যায়।

কেউ যেন নিজেকে হীন না ভাবে। চৈতন্যকে কোনও অবস্থাতেই যেন অপমান করা না-হয়। অপমানের অর্থ হল নিজেকে সংকুচিত করা। পূর্ণস্বরূপের ভাবনা সংকুচিত হয় না।

১৬। ১। ৭৭

২৬৮

সৎসঙ্গের প্রধান বিষয় হল—সত্য কী এবং তার ব্যবহার কী? সেই আলোচনা শোনার পরে যদি তা মনে না-থাকে তবে সত্যের যথার্থ ব্যবহার হয় না। ঋষিযুগে পরস্পর পরস্পরের কাছে শুনেই এগিয়ে যেত এবং শোনার আগ্রহ ক্রমশ বৃদ্ধি পেত। শতবার শুনেও তাদের তৃপ্তি হত না।

এখন প্রশ্ন হল কেউ যদি শুনবার সুযোগ পায় তবে সেখানে গিয়ে কী গ্রহণ করতে হয়? নিত্য বা সৎ বস্তু কী? তার পরিচয় ও ব্যবহার কী? এই দু'টি জানা বেশি দরকার। কেউ যদি বলে সৎসঙ্গে গিয়ে আমরা ঐ দু'টি সম্বন্ধে জানতে পারিনি তাহলে বুঝতে হবে যে, শ্রোতার ত্রুটি আছে অথবা সেখানে সে মন দেয় না। কিন্তু সৎসঙ্গে যদি সত্য না-থাকে লোকে সেখানে যাবে কেন? আর সত্য যদি থেকেই থাকে তবে সত্য নিয়ে না-আসলে সে কী নিয়ে আসে? এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

কোনও একজন বিরাট ঋষিকে এক বেদজ্ঞ যোগশাস্ত্রে সিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্ রাজর্ষি প্রশ্ন করেছিলেন—সদ্গুরু মহারাজ, আপনি বলুন ব্রহ্মজ্ঞপুরুষের বাণী শুনে যদি সত্যবোধ না জাগে তাহলে দোষ কার? বক্তার না শ্রোতার? ঋষি বললেন—মহারাজ, আপনার এই বিষয়ে যে ধারণা হয়েছে তা আগে বলুন। তারপর যদি আমার বলার কিছু থাকে তখন আমি বলব। রাজর্ষি বললেন—উভয়েরই দোষ। ঋষি বললেন—আপনি বুঝিয়ে দিন। মহারাজ উত্তরে বললেন—বক্তার শক্তি যদি শ্রোতার মধ্যে কাজ না-করে তাহলে বক্তার কথা উহ্য থেকে যায়। অথবা শ্রোতার অজ্ঞানজনিত চিত্ত যদি

অশুদ্ধ হয় তাহলে বক্তার দোষ কোথায়? যেহেতু সে শ্রোতাকে পূর্ণ করে দিতে পারল না। ঋষি বললেন—মহারাজ, এ বিষয়ে আপনার ধারণা যথার্থ নয়। আপনি প্রথমেই বললেন ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ, তাঁর আবার দোষ কোথায়? তাহলে চিত্ত আপনার বিকৃত আছে। এই কথা শুনে মহারাজ নিজের ভুল বুঝতে পেরে বললেন—এ বিষয়ে আমি আর কোনও কথা বলতে চাই না।

যে মুহূর্তে শ্রোতা জানতে পারে বক্তা ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ সেই মুহূর্তে শ্রোতার অজ্ঞান দূর হয়। ব্রহ্মজ্ঞপুরুষকে ব্রহ্মরূপে জানাই হল জ্ঞানের লক্ষণ। মৌখিক জানা যথার্থ জানা নয়। জিজ্ঞাসু যদি বক্তার দোষ ধরে তাহলে তার প্রশ্নের উত্তর সে পেতে পারে না অথবা পেলেও গ্রহণ করতে পারবে না। দোষদর্শন থাকলে উপযুক্ত প্রশ্ন করতে পারবে না। ব্রহ্মজ্ঞ ঋষির সঙ্গ লাভ করা তাঁর ইচ্ছা ছাড়া কখনও সম্ভবপর নয়। তাঁর ইচ্ছা ছাড়া সঙ্গ করা যায় না। তাঁর ইচ্ছা তো সব সময় মঙ্গলময়। তা অমঙ্গলজনক হয় ব্যবহারের ত্রুটির জন্য। বাবা-মা শুভ্র বস্ত্র পরে বসে আছেন, সেখানে গিয়ে যদি সন্তান ধুলো কাদা মেখে তাঁদের জড়িয়ে ধরে তবে শুভ্র বস্ত্র মলিন হয়ে যায়। শুভ্র আর থাকে না। এ ক্ষেত্রে দোষ কার? সন্তানের? যদি বাবা-মা জড়িয়ে ধরেন তাহলে সন্তানের দোষ হয় না। যেখানে অজ্ঞানের প্রভাব সেখানে সন্তান মাকে ধরে আর যেখানে জ্ঞানের প্রভাব সেখানে বাবা-মা সন্তানের বস্ত্র পাল্টিয়ে ধরেন অথবা নিজেরা বস্ত্র ছেড়ে ধরেন।

ব্রহ্মজ্ঞপুরুষরা আগে শ্রোতার অজ্ঞান শোধন করে নেন। তিনি নিত্যশুদ্ধ বলে অজ্ঞান, অপবিত্রতা বিলীন হয়ে যায়। যেমন আঁধারে আলো গেলে আঁধার বিলীন হয়ে যায়। ঋষি বললেন—মহারাজ, আর যদি কিছু জানার থাকে বলুন। রাজা বললেন—আপনি কী ভাবে জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন? ব্রহ্মর্ষি বললেন—আপনার কি এখনও অজ্ঞান আছে? রাজা বললেন—না। ব্রহ্মর্ষি বললেন—আমি আমার গুরুর কাছে ব্রহ্মতত্ত্ব শুনে অজ্ঞান দূর করেছি এবং জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—তোমাদের (উপস্থিত ভক্তবৃন্দদের উদ্দেশ করে) জন্য এগুলি বলা হয়নি। তোমাদের মধ্যে যে শুদ্ধ আত্মা আছে, তাঁর জন্য বলা হয়েছে। শুদ্ধ আত্মার কথা যদি মনে জাগে তখন দেখবে অজ্ঞান জ্ঞানে এবং অসৎ সৎ-এ পরিণত হয়েছে। তখন আমার বলে আর কিছু থাকবে না। নিজের পরিচয় তোমরা যে-ভাবে ভাবতে অভ্যস্ত সে-ভাবে আর ভেব না। সত্যস্বরূপ ছাড়া অন্য কিছুর ভাবনা শুদ্ধবোধের ভাবনাকে কমিয়ে দেয়। যখন কোনও বিষয়ে চিন্তা বা দুর্ভাবনা হতে থাকে, তখন সেটা যেমন বেশ কিছুক্ষণ চলতে থাকে, সেইরূপ সৎসঙ্গের মাধ্যমে সৎ-এব ভাবনা হতে থাকে। যদি ভাবনা করতে না-পার তবে সেই বিষয়ে প্রশ্ন করতে হয় যে, কেন পারছি না। তা না-করে তোমরা উল্টোপাল্টা প্রশ্ন কর। যখন একজনের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, তখন তা যে শুধু তাব জন্যই দেওয়া হল, এটা মেনে নিতে পার না। এখন বল সৎসঙ্গে এত কথা শুনে কার কতখানি চেষ্টা, ইচ্ছা ও সামর্থ্য জেগেছে?

'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) গুরু সবাই। এমনকী অসৎ ব্যক্তি, পকেটমারদের সঙ্গে আলাপ করে তাদের অভিজ্ঞতা ও বিদ্যা আয়ত্ত করা হয়েছে। এখন সে সব বলা হবে না, কারণ তার প্রয়োজন নেই। সব বিদ্যারূপে মাকেই রাখা হয়েছে। মা তো নয়, ব্রহ্ম স্বয়ং। সর্বত্র চৈতন্যের খেলা চলছে। চৈতন্যস্বরূপ যখন নিজেকে নিজে ব্যবহার করে তখন তার প্রত্যবায় হয় না। কিন্তু নিজেকে অন্য রূপে ব্যবহার করছি ভাবলে বিকার হয়। অদ্বয়তত্ত্বের সাহায্যেই কেবল বিকারের ঊর্ধ্বে বা কালাতীতে যাওয়া যায়।

সৎসঙ্গে পূর্ণ মনোযোগ (full attention) দিলে তবেই এক-এ প্রতিষ্ঠিত হবে। দুই না-থাকলে দ্বন্দ্ব ও বিকার আসতে পারে না। Defective body থেকে mind-কে সরিয়ে নিয়ে গেলে defect আর থাকে না।

২০। ২। ৭৭

চতুর্থ অধ্যায়

২৬৯

সকাম কর্মে 'আমারবোধকে' কী করে বাড়ানো যায় তার অনেক ব্যবস্থা দেওয়া আছে। তাতেই মানুষ বেশি অনুপ্রাণিত হয়। তার ফল ভালও হতে পারে আবার খারাপও হতে পারে। সৎ কর্ম করেও কী ভাবে নরকবাস করতে হয় সেই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা শোন।

ত্রেতা যুগে শমীক বলে এক রাজা ছিলেন। রাজার কোনও সন্তানাদি ছিল না। রাজা তখন পুত্র লাভার্থে যজ্ঞ করলেন। তিনি একশোটি বিবাহ করেছিলেন। প্রতিটি রানিই ধর্মপরায়ণা, রাজার অনুগত, বাধ্য ও প্রিয় ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কোনও রানিরই সন্তান হল না। এদিকে রাজার বয়স হয়ে গেল। তখন রাজ্যের যিনি কুলপুরোহিত ঋত্বিক শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত তাকে দিয়ে রাজা এক যজ্ঞ করালেন। এর ফলে রাজা এক পুত্রসন্তান লাভ করলেন। রানিরা সেই পুত্রকে পেয়ে খুব আনন্দিত হল ও আদর যত্নে মানুষ করতে লাগল। শিশু যদি সামান্য কারণে কাঁদে তবে রানিরা কাজ ফেলে ছুটে আসে। ডাক্তার, বদ্যি ডাকে এবং তাই নিয়ে খুব মাতামাতি করে। রাজাও রাজকার্য ফেলে রাজসভা থেকে ছুটে আসেন। একদিন শিশুটি খুব কাঁদছিল। কান্না শুনে রানিরাও খুব কান্নাকাটি শুরু করল। রাজা সভায় বিচার করছিলেন। তিনি বিচার ফেলে ছুটে আসেন, পুত্র কেন কাঁদছে তা জানতে। তিনি এসে জানতে পারলেন যে, শিশুটিকে পিঁপড়ে কামড়েছে। তখন তিনি তাকে শান্ত করে এসে আবার বিচারসভায় বসলেন। তিনি পাত্রমিত্রদের বললেন—দেখ, যার একটিমাত্র পুত্র তার দুঃখের আর শেষ নেই। তারা সায় দিয়ে বলল—হ্যাঁ মহারাজ, আপনি ঠিকই বলেছেন। রাজা বললেন—যে অপুত্রক সে-ই সুখী। এই একটিমাত্র পুত্র যেমন আমার মনকে চঞ্চল করছে, তেমন তোমাদের এবং রানিদেরও বিচলিত করছে। রাজা তখন কুলপুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন—এমন কোনও যজ্ঞ আছে কি যার দ্বারা একাধিক পুত্র লাভ করতে পারি? পুরোহিত বললেন—আপনি বললেই সেই ব্যবস্থা করতে পারি। রাজা বললেন—তার জন্য যা করতে হবে আমি তা-ই করতে প্রস্তুত আছি। পুরোহিত বললেন—আপনার ঐ একটিমাত্র পুত্রকে বধ করে যজ্ঞে আহুতি দিতে হবে। সেই যজ্ঞের চারপাশে রানিরা বসে থাকবেন যাতে তাদের নাকে মেদের ঘ্রাণ যায়। তাহলেই সব রানিরা পুত্রলাভ করবে। সেই পুত্রের নাম ছিল জন্তু। রানিরা এই কথা শুনে বাধ সাধল যে, জন্তুকে তারা বধ করতে দেবে না। রাজা তাদের বোঝালেন—এক পুত্রের বিনিময়ে শতপুত্র লাভ করবে, এটা কি ভাল নয়? তারা বলল—আমরা কিছুতেই জন্তুকে বধ করতে দেব না।

যাই হোক, যজ্ঞ আরম্ভ হল। জন্তুকে রানিরা কিছুতেই বধ করতে দেবে না আর এরাও জোর করে ছিনিয়ে নেবে। শেষ পর্যন্ত কোনও জোর টিকল না। জন্তুকে তারা ছিনিয়ে নিয়ে গেল। রাজা তখন পুরোহিতকে জিজ্ঞাসা করলেন—এই পুত্রই যে ফিরে আসবে তার কোনও প্রমাণ আছে কি? পুরোহিত বললেন—হ্যাঁ আছে। জন্তু জ্যেষ্ঠ পুত্র হয়ে ফিরে আসবে আর বাকি নিরানব্বইজন ভাগ ভাগ হয়ে আসবে। প্রমাণস্বরূপ জ্যেষ্ঠ পুত্রের ডান হাতের পাশে সুবর্ণ চিহ্ন থাকবে। যজ্ঞভূমিতে তাকে বধ করা হল। রানিরা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে লাগল। কেউ কেউ আবার ঘন ঘন মূর্ছা যেতে লাগল। রাজার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। জন্তুর মেদের গন্ধে যজ্ঞভূমি ভরে উঠল।

এই যজ্ঞের পর যথাকালে প্রত্যেক রানি গর্ভবতী হল। প্রত্যেকেরই একটি করে পুত্রসন্তান হল. রাজার তো মহানন্দ। পুরোহিত অর্থাৎ যিনি রাজার কল্যাণের জন্য যজ্ঞ করলেন তিনিও সৎ কর্মের ফলের ভাগ পেলেন এবং যথোচিত ভাবে পুরস্কৃত হলেন। প্রত্যেক রানিই কিন্তু আপন সন্তানের থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্রকেই বেশি ভালবাসে। রাজা সাহস করে এ বিষয়ে পুরোহিতকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। রাজার বয়স হয়েছে। পুরোহিত রাজার আগেই দেহরক্ষা করলেন। কিছুদিন পরে রাজাও দেহরক্ষা করলেন। কিন্তু স্বর্গে গিয়ে রাজা দেখলেন কুলপুরোহিত সেখানে যাননি। তিনি স্বর্গের কর্তাব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করলেন—আমার গুরু শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ ব্রাহ্মণ, তিনি কেন নরকে গেলেন? তাহলে আমাকেও নরকে নিয়ে চল। তারা স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের কাছে অনুমতি নিয়ে রাজাকে নরকে পাঠিয়ে দিল।

সেখানে গিয়ে যমরাজকে রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—এ কেমন বিধান? আমার গুরু নরকে গেলেন কেন? যমরাজ বললেন—সে তার কর্মফল ভোগ করতে গিয়েছে। রাজা বললেন—এ রকম কোনও বিধান আছে কি যাতে আমার সৎ কর্মের ফল দিয়ে তাঁকে নরক থেকে উদ্ধার করা যায়। আর তা যদি না-হয় তাহলে আমিও নরকে থাকব। উনি আমার গুরু। তাঁর সঙ্গে সুখে-দুঃখে দীর্ঘকাল ছিলাম। এখনও তাকে ছেড়ে থাকতে পারব না। যমরাজ বললেন—রাজা তুমি জান না যে, তোমার সামান্য ইচ্ছাপূরণের জন্য সে তাঁর সব সৎ কর্মের ফল উজাড় করে দিয়েছে। একজনের প্রাণের বিনিময়ে একশো জনের জন্ম হয়েছে। একশো পুত্রের যে পুত্ররা জন্মাবে তাদের জন্য কে দায়ী হবে?

একটি সাধপূরণের জন্য যে কতগুলি কষ্টের কারণ জমা হয় তা কেবল সিদ্ধপুরুষগণই জানেন। সিদ্ধপুরুষ অর্থে কর্মের সিদ্ধি যিনি লাভ করেছেন তিনি নন, যিনি জ্ঞানের সিদ্ধি লাভ করেছেন তিনিই। কর্মজ সিদ্ধি বিকারযুক্ত, কিন্তু জ্ঞানের সিদ্ধি বিকারযুক্ত নয়। জ্ঞান অজ্ঞাননাশক। কর্মের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হলেও অজ্ঞান নাশ হয় না। এটাই শাস্ত্রনির্দেশ।

রাজা যখন দেখলেন তারই কল্যাণ উদ্দেশে কর্মের জন্য গুরুকে নরকে যেতে হয়েছে তখন যমরাজকে অনুরোধ জানিয়ে তিনি বললেন—আমার সব সৎ কর্মের ফল তাঁকে দিয়ে দাও, তারপর আমরা যেখানে থাকার থাকব। যমরাজ বললেন—

তা হয় না। কারও কর্মের ফল অন্য কেউ ভোগ করে না। তবে তুমি যখন অনুরোধ জানাচ্ছ তখন তোমার শুভ ইচ্ছার সঙ্গে তাকে যুক্ত করা হল এবং সে যে মঙ্গল কর্ম তোমার জন্য করেছিল তার যে ফল এই দু'টি মিলিয়ে তোমরা কতদিন একসঙ্গে থাকতে পার হিসাব করে দেখি। হিসাব করে যমরাজ বললেন—তোমরা একশো বছর একসঙ্গে থাকতে পারবে, কিন্তু তার পরে আর পারবে না।

দীর্ঘকাল একসঙ্গে থাকার পর গুরুদেব চলে গেলেন। রাজা বললেন—আপনি চলে গেলে আমি একা কী করে থাকব? রাজত্বকালেও আপনি আমার আগে চলে গিয়েছিলেন। কুলগুরু বললেন—দেখা যাক কর্ম আমাকে কোথায় নিয়ে যায়! রাজা তখন জিজ্ঞাসা করলেন—কর্মফল থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কী? পুরোহিত বললেন—এতদিন তো আমাদের মনে এই প্রশ্ন জাগেনি, আবার কোনও জন্মে যদি এই প্রশ্ন জাগে তখন উত্তর দেব।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কর্মজ সিদ্ধি যারা লাভ করেন তারা জগতের কল্যাণসাধন বা বস্তুজগতের অভাবপূরণ করতে পারেন। কিন্তু এর পরিণামে যে কী ফল ভোগ করতে হয় তা তারা জানেন না। যারা জানেন তারা কর্মজ সিদ্ধি লাভ করতে চান না। সংসারী মানুষ এই সিদ্ধি লাভ করার জন্যই বেশি ছুটোছুটি করে। জ্ঞানজ সিদ্ধির স্বরূপ সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে প্রতি পদে নিজেকে বিচার করতে হয়। অর্থাৎ জ্ঞানজ সিদ্ধির সাধনা হয় নিজেকে অবলম্বন করে। সংসারে যুক্ত থেকে যতই সিদ্ধিলাভ করা হোক সংসারের বাইরে কেউ যেতে পারে না। বস্তুজগতের অন্তর্গত কর্মচিন্তা যতই সুপরিকল্পিত বা সুনিপুণ হোক না কেন তার কর্মফল বিকারযুক্ত থাকে। সেইজন্য জ্ঞানের দ্বারা চিত্ত শোধন করে শুদ্ধ জ্ঞানের আশ্রয় নিতে হয়। তাহলে অজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত হওয়া যায়। কর্ম বিকারধর্মী। সেইজন্য কালের সঙ্গে কর্মের সম্পর্ক আছে। কাল কর্মকে গ্রাস করে নেয়। কাল ও কর্ম অভেদ। আবার কর্ম ও কামনা অভেদ। কামনাই কর্মরূপে আসে। এরই নাম অবিদ্যা-অজ্ঞান।

২০। ২। ৭৭

২৭০

এই যুগে গুরুর সাহায্য ছাড়া অর্থাৎ বৃহত্তর শক্তির সাহায্য ছাড়া গুরুকৃপা লাভ করা যায় না।

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ঘটনা দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করলেন।

এক বাড়িতে একজন খুব অসুখে ভুগছিল। তার জন্য হরিবৈদ্যকে ডাকা হল। তিনি এসে রোগীর জন্য ওষুধের সঙ্গে নানা রকম পথ্য ও খাবারের বিধান দিলেন। রোগী সে সব শুনে বলল—তোমার এত বিধি-নিষেধ মেনে পথ্য খেতে পারব না। হরিবৈদ্য বললেন —তাহলে আমি আর কী করব? এবার আমি যাই। রোগী বলল—হ্যাঁ যাও।

তারপর এরকম আরও কয়েকজন বৈদ্যকে ডাকা হল, কিন্তু তাঁদের নির্দেশও সে শুনতে রাজি হল না। তখন তাঁরা বললেন—তাহলে তোমার রোগও আমরা সারাতে পারব না।

গল্পটি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—চিত্তশুদ্ধির প্রসঙ্গেই এই ঘটনাটি বলা হল। বৈদ্যের নির্দেশিত ওষুধ ও পথ্য খেয়ে যেমন রোগ নিরাময় করতে হয়, সেইরূপ চিত্তশুদ্ধির অন্তরায়গুলিকে গুরুমহারাজের নির্দেশ অনুসরণ করেই অপসারিত করতে হয়।

শম-দমের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি হয়। এই যুগে সকলের পক্ষে শম-দম অভ্যাস করা সম্ভবপর নয়। এ সব খুবই কঠিন। অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম পাঁচটির মধ্যে আরও বিভাগ আছে। যেমন যম[১], নিয়ম[২] মিলে দশটি পৃথক পৃথক অভ্যাস, সেইরূপ আসনের[৩] মধ্যে চুরাশি লক্ষ আসন এবং প্রাণায়াম[৪] আছে বিরাশি প্রকার, তারপর আছে প্রত্যাহার[৫]। তাও অতীব কঠিন। তারও পরে আছে ধারণা[৬], ধ্যান[৭] ও সমাধি[৮]। এই অষ্টাঙ্গযোগের প্রথম পাঁচটি হল বহিরঙ্গ এবং বাকি তিনটি হল অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ সাধনগুলি সম্যক্‌রূপে সাধিত হলে অন্তরঙ্গ সাধনগুলির অভ্যাস সম্ভব হয়। সর্বশেষ সাধন হল ধ্যানপক্ক সমাধি। সমাধির পরিপক্ক অবস্থায় হয় আত্মসিদ্ধি, আত্মজ্ঞান লাভ ও মুক্তি। বহিরঙ্গ সাধন সম্যক্‌রূপে অভ্যাস করা বর্তমান যুগে সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়, অন্তরঙ্গ সাধন তো দূরের কথা আর সমাধিসিদ্ধি তো বলাই বাহুল্য। এই কারণেই এ যুগের সাধনা শুধু কৃপাসাপেক্ষ।

ইষ্টের বা গুরুর রূপ মহাত্মা মহাপুরুষদের মাধ্যমে যে-ভাবে অভিব্যক্ত হয় তা সে-ভাবে গ্রহণ করার জন্য যা প্রয়োজন তা পালন করাই হল কৃপা লাভের একমাত্র উপায়। কারণ নিজের ভিতরে নিজের ইচ্ছাশক্তি যে-ভাবে ক্রিয়া করে তার চাইতে আরও বৃহত্তর শক্তিকে কাজ করতে দিতে হয়। বৃহত্তর শক্তিকে না-মানলে তা সম্ভবপর হয় না।

১৯। ৪। ৭৭

১। যম—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ—এই পাঁচটি।

২। নিয়ম—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রণিধান। যম ও নিয়মাদির অভ্যাসে চিত্ত-মন শোধিত হয়। শুদ্ধ চিত্তে আত্মজ্ঞান স্ফুরিত হয়।

৩। আসন—সুখাসন, পদ্মাসন, বজ্রাসন প্রভৃতি।

৪। প্রাণায়াম—রেচক, পূরক, কুম্ভকাদি তিন প্রকার প্রাণের সংযম দ্বারাই সর্ববিধ প্রাণায়াম সুসিদ্ধ হয়।

৫। প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়ের বিষয় হতে ইন্দ্রিয়কে এবং মনের বিষয় হতে মনকে নিবৃত্ত রাখার অভ্যাস হল প্রত্যাহার। প্রত্যাহারের ফল চিত্তের স্থিতি।

৬। ধারণা—মনকে বাইরে এবং অন্তরে স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর কোনও একটি বিষয়ে নিবদ্ধ রাখার চেষ্টাই হল ধারণা। দীর্ঘকাল ধারণা ধ্যানে পরিণত হয়।

৭। ধ্যান—তৈলধারাবৎ চিত্তের একতান গতিই হল ধ্যান। দীর্ঘমাত্রার ধ্যানই সমাধিতে পরিণত হয়।

৮। সমাধি—সমাধি হল ধ্যেয় বস্তুর সঙ্গে অভিন্নতা/তাদাত্ম্য স্থিতি। সমাধির কাঁচা অবস্থা সবিকল্প এবং পাকা অবস্থা হল নির্বিকল্প। সবিকল্প সমাধিতে ধ্যাতা, ধ্যেয়, ধ্যান—এই ত্রিপুটির সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে। কিন্তু নির্বিকল্প সমাধিতে এই ত্রিপুটি থাকে না। তা সর্ব সংস্কারমুক্ত বিশুদ্ধ চিদানন্দস্বরূপে অভিন্নরূপে (সমবোধে/একবোধে বা আপনবোধে) স্থিতি ও অধিষ্ঠান।

২৭১

সদ্‌গুরু রূপ পরিগ্রহ করে প্রয়োজন মতো শিষ্যকে দর্শন দেন। কারণ গুরু হলেন সর্বভাব ও সর্বতত্ত্বের ঘনীভূত মূর্তি। সত্য এক। এই সত্যের পরিচয় যিনি পেয়েছেন তিনি হলেন শ্রুতি শিরোমণি[১]। তাঁর পদাম্বুজে সর্বস্তর আছে, অর্থাৎ বোধস্বরূপ গুরুর পদমূলে সর্বতত্ত্ব আছে। গুরু হলেন প্রেমঘন, আনন্দঘন ও চৈতন্যঘন। এক কথায় সচ্চিদানন্দঘন। সব দিকেই তাঁর গতি ও দৃষ্টি। সর্বত্র চৈতন্য অনুভূত হলে ব্যষ্টিভাব হতে সমষ্টিভাবে যাওয়া যায়। সেখান থেকেই নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত তুরীয় অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব হয়।

ঋষিযুগের একটি উপাখ্যান আছে। একজন ঋষিপুত্র গুরুর আশ্রমে শিক্ষা সমাপ্ত করে আরেকজন ঋষির আশ্রমে গিয়ে তাঁকে বলেছিল—আমাদের বংশের ধারা অনুযায়ী আমি আপনাকে গুরুরূপে বরণ করলাম। আপনি আমাকে জ্ঞানদান করে অজ্ঞানমুক্ত করুন।

ঋষি বললেন—আমি জানি তুমি কোন ঋষির পুত্র। তুমি অজ্ঞান দূর করবার জন্য আমার কাছে এসেছ, কিন্তু তুমি কি যথার্থ বিধি-নিয়ম অনুযায়ী চলতে পারবে?

শিক্ষার্থী—সে দায়িত্ব আপনার। এখানে আসবার সময় মা আমাকে বলেছেন, যাঁর কাছে তুমি নিজেকে সঁপে দেবে তখন তুমি তাঁর সম্পত্তি হয়ে যাবে, আমার সম্পত্তি আর থাকবে না।

শিক্ষার্থীর মুখে তার মায়ের নির্দেশবাণী শুনে ঋষি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার মা যথার্থ ঋষিপত্নীই বটে। কিন্তু শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোনও নির্দেশ না-দিয়ে শুধু বললেন—আচ্ছা আমি দেখব। এই বলে তিনি তাকে আশ্রমে থাকতে বললেন।

প্রথম প্রথম ঋষি তার সম্বন্ধে খুব উদাসীন হয়ে রইলেন। তারপরে শিক্ষার্থীর ধৈর্য পরীক্ষা করার জন্য বিরক্তিকর সব কাজের ভার দিলেন। আশ্রম মানেই বৃহৎ সংসার। জীবনকে তৈরি করার জন্য যা প্রয়োজন সে সব কিছুরই ব্যবস্থা রাখতে হয়। সারাদিন খেটে সে আর সময় পায় না। অন্য শিষ্যরা তাকে বলে—আমরা তো কাজে ফাঁকি দিই। তোর জন্য আমাদেরও আজকাল খাটতে হচ্ছে।

ঋষিগুরু একদিন তাকে বললেন—আমি তোমাকে জ্ঞান দিতে পারব না। তুমি অন্য কারও কাছে যাও।

শিক্ষার্থী ঋষিপুত্র বলল—মা বলে দিয়েছেন, নিজেকে দেওয়া হয় একবারই, দ্বিতীয়বার আর দেওয়া যায় না।

তার কথা শুনে ঋষিগুরু অবাক হয়ে গেলেন। এবার তিনি তার জন্য অন্য ব্যবস্থা করলেন। তাকে বললেন—তোমাকে আরেকজনের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি আপনজনের মতোই তাঁর কাছে থাকতে পারবে।

১। শ্রুতি শিরোমণি—'শ্রুতি' অর্থে বেদান্ত বা উপনিষদ বিদ্যাকে বলা হয়, যার প্রতিপাদ্য বিষয় হল ব্রহ্মাত্মৈক্যানুভূতি। জীবজগৎ হল অদ্বয় ব্রহ্মেরই বিবর্ত। তা যিনি সম্যক্‌রূপে জানেন তিনি অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। তাঁকেই 'শ্রুতি শিরোমণি' বলা হয়।

শিষ্য এ কথা শুনে কোনও উত্তর না-দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

গুরু আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—কই কিছু বললে না তো?

শিষ্য—আপনি যে-ভাবে তৈরি করবেন সেই ভাবেই হবে। আপনি যদি আমাকে একটি খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন তাহলে আমি তা-ই মেনে নেব।

ঋষি তখন তাকে নিয়ে গেলেন তাঁরই গুরুভাইয়ের কাছে। গুরুভাইকে তিনি বললেন—তোমার কাছে একে রেখে গেলাম কয়েকদিনের জন্য। ফিরে যাবার সময় আমি একে আবার নিয়ে যাব। তুমি তোমার খুশি মতো একে চালিয়ে নিও।

গুরুভাই তাকে নিজের কাছে রেখে দিলেন এবং নিজের খুশি মতো তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। যে কাজই তাকে করতে বলা হত সেই কাজই সে নির্বিচারে করত। তার এই রকম কাজ দেখে গুরুভাই অবাক হয়ে ভাবলেন, আমার গুরুভাই একে কী সুন্দর শিক্ষাই যে দিয়েছে!

শিক্ষার্থী সঠিক ভাবে কর্ম করার ফলে তার গুরুর মহিমা চার দিকে ছড়িয়ে পড়ল। গুরুভাই সেই শিষ্যকে বললেন—তোমাকে পেয়ে আমরাও ধন্য হলাম।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভক্তদের দিকে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে সকলকে সচেতন করার জন্য বললেন—দেখ, শিষ্য যদি অনুগত হয় তাহলে গুরুর মহিমাও বাড়ে!

এই সময় ঋষিগুরু ফিরে এসে গুরুভাইদের মুখে সব শুনে ভাবলেন, এ সব তো শিক্ষার্থীর মায়ের শিক্ষা, আমি তো কিছুই করিনি।

অধ্যাত্মবিদ্যার অন্তর্গত কতগুলি শিক্ষা আছে, তা পরীক্ষা করার জন্য নয় প্রকার পদ্ধতি আছে, যথা—শাসন, তাড়ন, পীড়ন, ভর্ৎসনা, উপেক্ষা, অবহেলা, কর্তব্য ও সেবায় ত্রুটিদর্শন, কঠোর আজ্ঞা বা নির্দেশ পালন প্রভৃতি। ছয়টি পরীক্ষা নেবার পর গুরুদেব ভাবলেন, কেন মিছিমিছি এর পরীক্ষা নিচ্ছি? এর পরীক্ষা নেবার তো প্রয়োজন নেই।

এদিকে শিক্ষার্থীর অন্যান্য গুরুভাইরা তার বিরুদ্ধে গোপনে বিদ্রোহ করল। তারা তাকে শাসিয়ে বলে গেল—তুই যদি বেশি রকম বাড়াবাড়ি করিস তবে তোকে গলা টিপে মেরেই ফেলব।

গুরুদেব একদিন তার শিক্ষার্থী এই শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—আচ্ছা, আমার আসনে (গদিতে) যদি তোমাকে বসিয়ে দিই তবে তুমি কী ভাবে চলবে?

শিক্ষার্থী—আপনি যাবেন কোথায়?

গুরুদেব—আমি যদি দেহরক্ষা করি।

শিক্ষার্থী—এই দেহ তো আপনারই দেহ। আপনি কোথায় চলে যাবেন? এই দেহেই তো তখন থাকবেন।

গুরুদেব—আমার শিক্ষা এই পর্যন্তই। এর পরে যদি আরও উচ্চতর শিক্ষা কোথাও পাও তবে তা গ্রহণ করো।

শিক্ষার্থী—আমার আর জানার দরকার নেই।

গুরুদেব প্রীত হয়ে বললেন—তুমি এখন নিজেকে দিয়ে দিলে আমাকে, আর আমি তোমার হয়ে গেলাম।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—এই ভাবেই শিষ্য নিজেকে দেয় গুরুর কাছে, আবার গুরুও নিজেকে দিয়ে দেন শিষ্যের কাছে, অথবা জীবাত্মা পরমাত্মাকে সঁপে দেয় এবং পরমাত্মা জীবাত্মাকে সঁপে দেন অর্থাৎ জীবাত্মার মধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েন। আত্মদানের মাধ্যমে হয় আত্মপ্রতিষ্ঠা। তাই বলা হয়—

'যে করে প্রাণ দান
সে-ই হয় প্রাণবান।'

যত মহাত্মা ও মহাপুরুষ আছেন তাঁদের সকলের জীবনেই দেখা যায় যে, তাঁরা আপন আপন গুরুর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করে দিয়ে তবেই গুরুতাদাত্ম্য লাভ করেছেন।

গুরুর নাম, নামকারী, গুরু ও নামের যে শক্তি সব একতত্ত্বেরই চারটি ভাগ। সবগুলি যখন মিলে যায় তখন হয় স্বতঃস্ফূর্ত ধ্রুবাস্মৃতি। নিজের ভিতরে তাঁর প্রকাশ নিত্য হয়ে চলেছে। তা লক্ষ্য করতে করতে 'গুরুর আমি' ও 'আমি-র গুরু' এক হয়ে যায়।

'তোমাতে আমাতে যে মিলন
চলিছে যুগযুগান্ত ধরে
কভু আমি চাই কভু তুমি চাও মোরে
তোমাতে আমাতে মিলে একাকার
সেই সচ্চিদানন্দসাগর নিত্যনির্বিকার।'

১৪। ৮। ৭৭

২৭২

ভণ্ড গুরুর কাছে শিক্ষা নিয়ে কী ভাবে উন্নতি লাভ হয় সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একজন ভণ্ড সাধু এক দরিদ্র গৃহস্থের বাড়িতে মাধুকরী করতে গিয়েছিল। গৃহস্থ সাধুকে দেখে জিজ্ঞাসা করল—বাবা, ভগবানের কবে দয়া হবে? কী করে তাঁকে পাওয়া যায়?

সাধু—ডাকার মতো ডাকলেই তাঁকে পাওয়া যায়।

গৃহস্থ—কী ভাবে তা সম্ভব?

সাধু—তাঁকে আপন ভাবতে হবে। তোমাব আপন কে আছে?

গৃহস্থ—কেউ নেই আমার। থাকবার মধ্যে শুধু একটি ভেড়া।

সাধু—তাতেই হবে। এই ভেড়াকেই আপন ভাববে। ভাববে এই ভেড়াই হল নারায়ণ। তাহলেই হবে। এই নির্দেশ দিয়ে সাধু চলে গেল।

এদিকে সেই গৃহস্থ সাধুর কথা মতো ভেড়াকে নারায়ণ ভেবে খাওয়ায় ও আদর যত্ন করে। সারাক্ষণ নারায়ণের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন ভেড়ার মধ্যে নারায়ণ প্রকাশ হয়ে পড়লেন।

অনেকদিন পরে সেই ভণ্ড সাধু বহু জায়গায় ঘুরে ফিরে আবার সেই গ্রামে এসে উপস্থিত হল। তার খুব কৌতূহল হল যে, যাকে আন্দাজেই একদিন উপদেশ দিয়ে মাধুকরী গ্রহণ করে সে চলে গিয়েছিল সেই গৃহস্থটি কেমন আছে দেখতে হবে। গ্রামের একজনকে সে জিজ্ঞাসা করল—এই বাড়িতে যে থাকত সে কোথায় গেল বলতে পার?

লোকটি বলল—সে তো পাগল হয়ে গিয়েছে। এ কথা শুনে সাধুটি ভয় পেয়ে সরে পড়তে চেষ্টা করছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে গৃহস্থ তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল এবং তার চরণে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানাল। সে সাধুকে বলল—গুরুদেব, আপনি কী অপরাধে আমাকে দর্শন না-দিয়েই চলে যাচ্ছিলেন? আপনাকে আমার বাড়িতে একবার পদধূলি দিতেই হবে এবং নারায়ণদর্শনও করে যেতে হবে।

সাধু—তোমার নারায়ণ কী রকম? আমাকে কি তাঁকে দেখাতে পার?

গৃহস্থ—হ্যাঁ, নিশ্চয় পারব। এ কথা বলে সে ভেড়াটিকে সামনে নিয়ে এসে বলল—আপনিই তো একে নারায়ণজ্ঞানে আপনবোধে সেবা করতে বলেছিলেন। এই ভাবে সেবা করলেই ভগবৎ দর্শন হবে বলেছিলেন। আপনার কথা মেনে ও সে-ভাবে চলেই আমি এর মধ্যে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী নারায়ণকে দর্শন করেছি। ইনিই আমার অন্ন সংস্থান করেন।

সাধু—কই, ভগবানের সেই রূপ আমাকে দেখাও তো। গৃহস্থ তখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে বলতে লাগল—প্রভু, তুমি গুরুদেবকে দেখা দাও। ভগবান তাকে বললেন—ওর চিত্ত তো শুদ্ধ হয়নি। ও আমার দর্শন কী করে পাবে?

গৃহস্থ—সে সব আমি বুঝি না। আমি কী শেষ পর্যন্ত গুরুর কাছে মিথ্যাবাদী বলে প্রতিপন্ন হব?

তখন ভগবান ভক্তের কাতর প্রার্থনায় প্রকাশ হয়ে পড়লেন সেই ভেড়ার মধ্যে। সাধু দেখতে পেলেন—ভেড়া নাচছে এবং তালে তালে নূপুরের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। এ সব দেখে-শুনে সাধু গৃহস্থের পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল—আজ থেকে তুমি আমার গুরু, আমি তোমার গুরু নই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গুরু যা দেন তা যথার্থ ভাবে পালিত হলে শিষ্যের অপ্রাপ্য আর কিছুই থাকে না। ভগবানকে আপনবোধে মানাই হল জীবের যথার্থ ধর্ম। তা কাল্পনিক নয়। যিনি সকলের প্রাণের প্রাণ তাঁকে নির্জনে আপন করে প্রাণ পেতে চায়। এই ব্যাকুলতার পরিণামেই অন্তরের গভীরে প্রীতমের সঙ্গে সকলের যে নিত্য সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে তা অনুভূত হয়। সেই আমি-র স্বরূপ অনুভূত হলে দেখা যায় 'সেই আমি'-র'[১] কৃপায় 'এই আমি'[২] চলে এবং এই আমি-র মাধ্যমে 'আমারবোধ'[৩] খেলে।

১৪। ৮। ৭৭

১। সেই আমি— ব্রহ্ম, আত্মা বা ভূমা আমি।

২। এই আমি— জীবের আমি বা কাঁচাআমি।

৩। আমারবোধ— সংসারবোধ।

২৭৩

অসৎ ভাবের থেকে সৎ ভাব কী করে বিকাশ লাভ করে সেই প্রসঙ্গে একটি গল্প শোন।

একজন দুষ্টু মতির লোক ছিল। দুষ্টু মতি বলতে অপরের উন্নতি সইতে পারে না, ঈর্ষা জাগে, সুন্দর জিনিস দেখলে মনে কুবৃত্তি জাগে এমন। তার একজন ধর্মপরায়ণ বন্ধু ছিল। সে ধর্মকর্ম করে আর এই বন্ধুকে প্রায়ই বলে—সারাজীবন তুই আড্ডা মেরে আর যা-তা খেয়েই জীবনটা নষ্ট করলি। আয় না আমার সঙ্গে একটু সৎসঙ্গ করবি। দুষ্টু বন্ধু বলে—দূর এ সব আমার সয়না। পেটে খেলে পিঠে সয়। তবু তাকে সেই বন্ধুটি সৎসঙ্গে নিয়ে যায়। এদিকে সে মদ খেয়ে মাতলামি করে বলে সৎসঙ্গের লোকেরা অনুযোগ করে তার বন্ধুকে বলে—একে কেন এখানে নিয়ে আস? বন্ধু বলে—ও যদি সৎ হবার সুযোগ না-পায় তাহলে তো আরও খারাপ হয়ে যাবে। গুরুর কৃপা লাভের জন্য ওকে এখানে আনি। গুরু কিন্তু তাকে কৃপা করেন না। কিন্তু সে প্রায়ই বন্ধুকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় নিয়ে যায়। কখনও কখনও মহাত্মাদের মুখের উপরেই সে যা-তা বলে ফেলে। তাঁরা কোনও কিছু বলেন না, শুধু হাসেন।

একদিন কথা কাটাকাটি হতে হতে অসৎ বন্ধু তাকে এমন মারধর করল যে, তাকে হাসপাতালে যেতে হল। সৎসঙ্গের অন্যান্য বন্ধুরা তাকে শাস্তি দিতে চাইল। কিন্তু ধার্মিক বন্ধু বলল—ওকে শাস্তি দিলে আমরা যে সৎসঙ্গ করেছি তা প্রমাণ হবে না বরং ও কী করে ভাল হয় সেই চেষ্টাই করতে হবে।

একদিন অসৎ বন্ধুকে সে বলল—তোকে নিয়ে কত চেষ্টা করলাম, কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। চল আমরা কোথাও বেরিয়ে আসি। বন্ধু বলল—এ সব ধর্মকর্ম আমি করতে পারব না বরং তুমি একদিন চল আমাদের আড্ডাখানায়। সেখানে মজা লুটবে! ধার্মিক বন্ধু বলল—সে ক্ষমতা আমার নেই। কিছুদিন পর অসৎ বন্ধুর এক বন্ধুর হাতে নিহত হল ঐ ধার্মিক লোকটি। মৃত্যুকালে অসৎ বন্ধুর কথা তার মনে থেকে গেল। পরে যখন সে দেহধারণ করল তখন এত শুভ সংস্কার থাকা সত্ত্বেও শৈশব থেকে সে রোগে ভুগতে লাগল। তার রোগের কারণ কেউ ধরতে পারল না। পরে এক সাধু তাকে তার পূর্বজন্মের গুরুর কাছে নিয়ে গেলেন। তার গুরুদেবকে তিনি বললেন—তোমাব সন্তান এত বোঝা নিয়ে ফেলেছে, এখন আর সামলাতে পারছে না। বন্ধুর জন্যও কিছু করতে পারল না আবার নিজেরও এত কষ্ট। সুবৃত্তি ভাল ভাবে তৈরি না-হলে কুবৃত্তির প্রভাবে তা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এ বড় কঠিন বিজ্ঞান। সেই জন্য প্রথম অবস্থায় পরের খারাপ নিতে মহাত্মারা অনুমতি দেন না। অসৎ বন্ধুর প্রভাব তার পরের জন্মের মধ্যম বয়স পর্যন্ত ক্রিয়া করে। তারপর সে পরবর্তীকালে সাধনায় উচ্চ অবস্থা লাভ করে তার নিজের অতীতের সব কথা জানতে পারে এবং অসৎ বন্ধু পুনরায় কোথায় জন্মগ্রহণ করেছে তাও জানতে পারে। সে এ সব জানতে পেরে এক মহাত্মাকে গিয়ে অনুরোধ করে বলে—ওকে আপনি

রক্ষা করুন। মহাত্মা বললেন—ওকে উদ্ধার করার জন্য ওর গুরু অপেক্ষা করে বসে আছেন। তোমার বা আমার ওর জন্য চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সদ্‌গুরু ছাড়া কেউ কারওকে উদ্ধার করতে পারে না। আবার পূর্ণ শরণাগত না-হলে অর্থাৎ পূর্ণ আত্মসমর্পণ না-করলে গুরু কারও অন্তরে আত্মবোধের সহায়ক হতে পারেন না। অন্যান্য গুরু শরণাগত ভক্তকে সদ্‌গুণ অর্জন করতে সাহায্য করেন। গুণই হল ভাব। সদ্‌গুণ মানে হল সদ্‌ভাব, যা সত্ত্বগুণের বিশেষ রূপ। সত্ত্বগুণকে সত্ত্বভাব বা দৈবীভাব বলা হয়। সদ্‌গুরুর কৃপায় এবং স্বকীয় চেষ্টার বা পুরুষকারের মাধ্যমে আন্তরিক ভাবে যে সত্ত্বগুণের অনুশীলন করে, তার মধ্যেই সাত্ত্বিক বা দিব্য ভাবের প্রকাশবিকাশ ঘটে। দিব্যভাবের সম্যক্ প্রকাশের ফলে আত্মগুরুর অভিব্যক্তি অর্থাৎ প্রকাশের লক্ষণ ধরা পড়ে। সদ্‌গুরুর কৃপায় শুদ্ধসাত্ত্বিক ভক্তের অন্তরে প্রথমে বিবেকবিচার ও একনিষ্ঠ ভক্তির উদয় হয়। তার উৎকর্ষের ফলে বিবেকসিদ্ধি ও বুদ্ধিশুদ্ধি হয়। তখন সদ্‌গুরু আত্মগুরুরূপে ভক্তের হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ হন। শুদ্ধ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠাই হল সদ্‌গুরুর সর্বোত্তম অনুগ্রহ। আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান অভিন্ন বলে আত্মজ্ঞানকেই অদ্বৈতজ্ঞান বলা হয়। অদ্বৈত জ্ঞানসিদ্ধিই হল সদ্‌গুরুর সঙ্গে তাদাত্ম্যসিদ্ধি। এই জন্য আত্মবিদ্যাকে বা গুরুবিদ্যাকে সমজ্ঞান, একজ্ঞান ও সমরস বলা হয়। সদ্‌গুরু স্বয়ং ব্রহ্ম-আত্মা বলে তাঁর কৃপা, অনুগ্রহে একনিষ্ঠ সেবক আত্মবোধের অধিকারী হয়ে ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়। ধন্য হল সদ্‌গুরু, ধন্য হল তাঁর শরণাগত সেবক ভক্ত। গুরুতত্ত্ব ও গুরুবাদ, আত্মতত্ত্ব ও আত্মবাদ, ব্রহ্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মবাদ সবই এক, তা নিত্য অদ্বয় একবোধের বা সমবোধের ভিন্ন ভিন্ন নামমাত্র। গুরুবোধ, ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মবোধকে স্বসংবেদ্য স্বানুভূতি বলা হয়। আত্মজ্ঞানই স্বানুভূতি, তা-ই সর্বজীবনের সর্ব অনুভূতির অধিষ্ঠান ও সমাধান।

১৬। ৮। ৭৭

২৭৪

গুরুভাব ও সদ্‌ভাব কী ভাবে অপরকে সাহায্য করে সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক সাধক বেশ কিছুদিন সাধনভজন করে অপর একজন মহাত্মার কাছে যায়। মহাত্মা তাকে জিজ্ঞাসা করেন—তুমি কী চাও? উত্তরে সাধকটি বলে—আমার অন্তরে যদি কোনও অজ্ঞাত দোষত্রুটি বা সুপ্ত অসৎ ভাব কিছু থাকে তা জাগিয়ে দিয়ে আপনি তা শোধনের ব্যবস্থা করে দিন।

মহাত্মা বললেন—অতি উত্তম কথা। এই ব্যাপারে কোনও অসুবিধায় পড়লে নিশ্চয়ই আমার সাহায্য পাবে। এই বলে তিনি স্থানান্তরে চলে গেলেন।

কিছুদিন পরে সাধকটি খুবই বিপদে পড়ে। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাত্মার কাছে যে আশ্বাসবাণী সে পেয়েছিল তা সম্পূর্ণ ভুলে গেল। নিজের গুরুর কথাও স্মরণ করতে গিয়ে তার জপ মানসপটে আসে না, কখনও যদিও বা আসে আবার তা কয়েকমুহূর্ত

পরেই সরে যায়। তা সত্ত্বেও সে গুরুর ধ্যান করতে চেষ্টা করত। হঠাৎ একদিন মানসপটে তার গুরুর ধ্যান করার সময় গুরুর স্থানে সেই মহাত্মার মুখ ভেসে উঠল। ইতিমধ্যে সেই মহাত্মাও দেহরক্ষা করেছেন। দেহরক্ষা করা সত্ত্বেও সেই মহাত্মা দেখা দিলেন কারণ সদ্ভাবাপন্ন যাঁরা, তাঁরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। মানসপটে সেই মহাত্মার মুখ দেখে সাধকের পূর্বের কথা স্মরণ হয় যে, বিপদে পড়লে তিনি সাহায্য করবেন বলে একসময়ে কথা দিয়েছিলেন।

সাধকের শরীরে তখন খুব কষ্ট হচ্ছিল। নিজের গুরুকে ডাকা সত্ত্বেও গুরু আর আসেন না। তখন অভিমানভরে সে বলল—গুরু তোমাকে ডেকে যদি বিপদের সময় না-পাই তাহলে কী লাভ? তার পরে মহাত্মার উদ্দেশে সে বলতে থাকে—তুমি কথা দিয়েছিলে বিপদে পড়ে ডাকলে তুমি এসে আমাকে সাহায্য করবে, কিন্তু এখনও তো তুমি এলে না! তুমি এলে তো আমি আর এত কষ্ট পেতাম না। সেই মুহূর্তে সে মহাত্মার কণ্ঠস্বর শুনতে পায়—বেদনারূপে এসে আমি একসঙ্গে তোর সব গলদ নিয়ে যাচ্ছি। তুই আমার উপরে ভরসা রাখতে পারলি না?

বেদনার মাধ্যমে এসে মহাত্মা যে তার কত জন্মের মলাবরণ নিয়ে গেলেন তা সে জানতেও পারল না। যাই হোক, মহাত্মার সাহায্যে উত্তরোত্তর সাধনায় তার উন্নতি হল এবং দিব্যভাবের প্রকাশ হতে লাগল, কিন্তু সে নিজের গুরুর সন্ধান আর পেল না। গুরুর দর্শন না-পেয়ে সে খুব অস্থির হয়ে পড়ল। সে শুধু ভাবে, গুরুর দর্শন পাচ্ছি না কেন! অন্যান্য কয়েকজন সাধককে জিজ্ঞাসা করেও তার সদুত্তর সে পেল না।

একদিন সারারাত সে গুরুর ধ্যান করতে লাগল। ধ্যানে ইষ্টের রূপ আসে, কিন্তু গুরুর রূপ আর আসে না। পরদিন রাতেও সে গুরুর ধ্যান করল। তার পরের দিন সে উপবাস করে রইল। চতুর্থ দিন সে গুরুর কথা শুনতে পেল—তুই সাধনভজন না-করে ফাঁকি দিয়ে তোর গলদগুলি একজন মহাত্মার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলি, আমাকে একবার জিজ্ঞাসাও করলি না? সে এখন খুব কষ্ট পাচ্ছে। সে তোর মল নিয়ে মরলোক ছেড়ে চলে গেল, সেইজন্য আমাকে তাঁর সঙ্গে থাকতে হয়। যতদিন পর্যন্ত না তোর এই গলদগুলি তাঁর মধ্যে নির্মূল হয়ে যায় ততদিন পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে থাকব এবং যতটা সম্ভব তাঁকে সাহায্য করব। তার পরে আমি তোর কাছে আসব।

তারপর ঘুরতে ঘুরতে সাধকের সঙ্গে সেই মহাত্মার এক গুরুভাইয়ের দেখা হয়। সাধক নিজের কৃত কর্মের জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করে এবং অনুতপ্ত হয়। গুরুভাই তাকে বলল—তুমি এত ভাবছ কেন? গুরুকে তো সব জানিয়ে রেখেছ তবে আর ভাবনা কী?

সাধক তবুও নিশ্চিন্ত হতে পারল না। গুরুভাই আরও বলল—মহাত্মাদের মহিমা আমরা বুঝব না। আরও কিছু প্রকাশ করবেন বলেই হয়ত তোমার গুরু সরে গিয়েছেন। রাগ করে তিনি নিশ্চয়ই চলে যাননি।

কিন্তু সাধকের মন আর কিছুতেই শান্ত হয় না। দীর্ঘকাল পরে গুরুর সঙ্গে তার দেখা হল। মিলন হতেই সে গুরুর পা জড়িয়ে ধরল। অশ্রুবিগলিত কণ্ঠে সে বলতে

লাগল—তোমার মহিমা আমি বুঝতে পারিনি। এত অধম জেনেও তুমি আমাকে কৃপা করেছ। ভুলত্রুটির জন্য আমাকে তুমি শাস্তি দাও।

গুরু তাকে শান্ত করে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন—দাঁড়া তোকে শাস্তি দেব। আমার গুরুভার যখন তোর উপরে চাপিয়ে দেব তখনই তোর শাস্তি হবে। এই বলে গুরু আবার স্থানান্তরে চলে গেলেন। সাধক সাহস করে গুরুকে আর জিজ্ঞাসা করতে পারল না যে, কী ভাবে তার শাস্তি হবে।

বেশ কিছুদিন পরে গুরু তাঁর দেহত্যাগের পূর্বে শিষ্যকে ডেকে পাঠালেন। শিষ্য সাধক গুরুর কাছে আসতেই গুরু তাকে বললেন—মুক্তি লাভের জন্য, আনন্দ আস্বাদনের জন্য যা চেয়েছিলি সব তোর ভিতরেই রয়েছে। এখন থেকে তোর কাছে যারা আসবে, দুঃখকষ্টের কথা জানাবে তাদের ভার তোকেই নিতে হবে। আমি যেমন তোর ভার নিয়েছিলাম, সেই রকম তোকেও তাদের ভাব নিতে হবে।

শিষ্য—আমি কী করে তা পারব?

গুরু—হ্যাঁ, ঠিক পারবি।

যথাসময়ে গুরু দেহত্যাগ করেন। শিষ্য মুক্তপুরুষ হলেও তার খুব কষ্ট হল। গুরুর আদেশ অনুসারে তাকে গুরুর আসনে বসতে হল। তার পরে সে বুঝতে পারল যে, গুরুর ভার নেওয়া কত কঠিন। তাঁদের ভালবাসতে গেলে দেখা যায় যে, তাঁদের ভাব চলে আসে দেহেন্দ্রিয়-প্রাণে। তখন সে ভাবতে থাকে, গুরু তুমি আমাদের জন্য কত কষ্ট যে করেছ, আর আমরা শুধু মজা লুটেছি। ভাবতে ভাবতে তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তখন সে বুঝতে পারল সত্যিকারের সদ্‌গুরু হওয়া ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত কখনও সম্ভব নয়।

গল্পটি শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—

গুরুমহারাজগণ যতদিন দেহে থাকেন ততদিন শিষ্যদের তৈরি করেন। যতদিন তাঁরা দেহে থাকেন ততদিন শিষ্যরা তাঁদের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করতে পারে না। গুরুর দেহরক্ষার পরেই তাঁর মহিমা বোঝা যায়।

স্থূল ইন্দ্রিয়ের জগতে, স্থূল মানসজগতে ও কারণজগতে শিষ্যদের যাতে কোনও অন্তরায় না-থাকে সেই বিষয়ে গুরু সর্বদাই খুব সচেতন থাকেন। সদ্‌গুরু হলেন তিনিই যিনি তিন কালে ও তিন গুণে সমান ভাবে থাকেন। সদ্‌গুরুর কাজ হল শিষ্যসন্তানদের সৎ-এ রাখার জন্য যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করা। তাঁদের কাজ স্থূলদৃষ্টিতে বুঝতে পারা যায় না। গুরুদায়িত্ব পাবার পরে গুরুর মহিমা উপলব্ধি করার সুযোগ মেলে। পিতামাতা যেমন করে শিশুকে আগলে রেখে বড় করে, গুরুও ঠিক সেই রকম ভাবে শিষ্যদের উপযুক্ত করে তৈরি করেন। শিষ্যের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে, গুরু এক মুহূর্তের জন্যও শিষ্যের আড়াল হন না। শিষ্যসন্তানকে তৈরি করার জন্য তিনি নানা ভাবে আয়োজন করে রেখেছেন। গুরুকে কেন্দ্র করে মনে যতবেশি চিন্তাভাবনা হবে, ততবেশি গুরুভাব অন্তরে প্রবেশ করবে। গুরুভাবের প্রভাবে অনেক সময় অদ্ভুত

অদ্ভুত অনুভূতি হয়। তখন নিজের অণু-পরমাণুর মধ্যে এমন কোনও জায়গা খুঁজে পাওয়া যায় না যেখানে গুরু নেই। গুরুর মধ্যে সমস্ত দেবদেবী, সিদ্ধ মহাত্মা ও মহাপুরুষগণ বাস করেন। গুরু কৃপা বা করুণাবশত শিষ্যদের কল্যাণের জন্য মনুষ্যরূপ ধারণ করে আসেন।

১৬। ৮। ৭৭

২৭৫

সর্বত্র চৈতন্যই আছে। স্বানুভূতিতে সর্ববোধেশ্বরের সঙ্গে identity কখনও বিচ্যুত হয় না। গুরু সর্বব্যাপী। এখানে চৈতন্যকেই গুরু বলা হয়েছে। এ হল তাঁর আরেকটি অপূর্ব মহিমা। তিনি সব কিছুকে বরণ করে গুরু হয়েছেন। 'আমিই' আছি—এটা অহংকার নয়।

একবার ব্রহ্মজ্ঞানীদের আশ্রমে এক পাগল সাধক এসে উপস্থিত হয়। সে গড়গড়িয়ে এক নাগাড়ে 'গুরু, গুরু' বলে যায়। কিন্তু অন্যান্য ব্রহ্মজ্ঞানীদের শান্তভাব ভাল লাগে। তাঁরা তন্ময় হয়ে থাকতে ভালবাসেন। পাগলের ঐ শব্দ তাঁদের কাছে বিরক্তিকর লাগে। তাকে কিছু বললে সে বলে--আও মেরে সাথ খেলো। তুমভি গুরু, হামভি গুরু। এই বলে সে সর্বদাই নাচে, হাসে, গায়। তাঁরা পাগলের আচরণ দেখে ভাবে, কই আমাদের তো এ রকম হয় না, এ আবার কোন ভাব! একদিন প্রধান ঋষিকে পাগলের ভাব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি বললেন—এই ভাব হল তোমার আমার মধ্যে যে অভাব রয়েছে, সেই ভাব। তাঁরা বলল--ব্রহ্মজ্ঞান লাভের পরেও আমাদের মধ্যে অভাব আছে? ঋষি বললেন—হ্যাঁ, আনন্দব্রহ্মকে আমরা জানি, উপলব্ধি করেছি, কিন্তু প্রকাশ নেই। ওর মধ্যে প্রকাশ হচ্ছে।

২৩। ৮। ৭৭

২৭৬

একজনের ভিতরে কোনও কিছু প্রকাশ হতে গেলে প্রস্তুতির প্রয়োজন। মহাবীরের মতো হওয়া দরকার। তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাতে হয় যে, তুমি এত সুন্দর হয়ে আছ আর আমার শরীরকে এ রকম (শুকনো) তৈরি করেছ কেন? বীর ভাবের চিন্তা করলে মনে বীর ভাবেব তেজ আসবে।

যারা কুস্তি করে তারা মহাবীরকে আরাধনা করে। এ রকম একজন কুস্তির পালোয়ান ছিল। তার অনেক সাগরেদ ছিল। কুস্তির আখড়ায় অনেক রকম শিক্ষা দেওয়া হত। সেখানে একদিন এক ক্ষীণকায় লোক এসে উপস্থিত হল। সে পালোয়ানের মাষ্টারকে বলল—আমাকে কুস্তি শেখাতে হবে। তিনি কিছু বললেন না, শুধু তাকিয়ে দেখলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, এ রকম চেহারায় কুস্তি শেখানো তো মুস্কিল হবে। ছেলেটি জাতিতে মুসলমান ছিল। জ্ঞাতীরা তাদের অত্যাচার করেছে, তারই প্রতিশোধ নেবার জন্য সে কুস্তি শিখতে চায়।

পালোয়ান বললেন—আমি তোমাকে শেখাব। কিন্তু এখন তুমি তো কিছু পারবে না, নিজেকে আরও একটু তৈরি করে নাও। প্রথমে তুমি এই শ্রীঅঙ্গনকে একটু সেবা কর। তারা মাটিকে বলে শ্রীঅঙ্গন। প্রত্যেক ভাবকে দিব্যভাবে রাঙিয়ে বলে। যেখানে কুস্তি শেখানো হত সেই মাটির সামনে ছিল মহাবীরের মূর্তি। ছেলেটিকে শ্রীঅঙ্গন পরিষ্কার রাখার ভার দেওয়া হয়েছিল। কয়েকমাস তার আখড়ায় এ ভাবেই কেটে গেল। সে ভাবল, কই ওস্তাদ তো আমায় কিছু শেখান না। কেউ শেখালে তবে তো হবে! মহাবীরের মূর্তির দিকে সে তাকিয়ে বলল—তুমি সবাইকে কৃপা কর আর আমাকে করবে না? গুরুর কৃপা কী করে পাব তার ব্যবস্থা করে দাও। মুসলমান হলে কী হবে দেবদ্বিজে তার খুব বিশ্বাস ছিল। সে গুরুর কাছে দাঁড়িয়ে থাকে চুপ করে, কিছু বলে না। একদিন মহাবীরের সামনে কেঁদে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—প্রভু, তুমি যদি কৃপা না-কর গুরু আমাকে শেখাবেন না। মায়ের কাছে বলে এসেছি আমি মহাবীর হব। কিন্তু কথা তো রাখতে পারব না। ছেলেটি ভাবল, আজই গুরুর সঙ্গে দেখা করে সব জানাবে। এই বলে যেই মুখ ফিরিয়েছে দেখে ঠিক তার পিছনেই গুরু দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন—তোমাকে যে কাজ দেওয়া হয়েছে তা তুমি কী রকম করছ দেখি তো। সে গুরুকে সব দেখায়। তারপর সে গুরুর কাছে কুস্তি শেখাবার কথা বলে। গুরু তাকে বললেন—হ্যাঁ শেখাব। তিনি কুস্তির চার-পাঁচটি প্যাঁচ এমন শেখালেন যা খুব কম (ওস্তাদ) পালোয়ানই জানেন। তিনি চলে যাবার আগে তার পিঠে এক চড় মারলেন। তিনি চলে যেতে ছেলেটি যখন মন দিয়ে নিজের কাজ করছিল সেই সময় গুরু আবার এসে উপস্থিত হলেন। এবার তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্তি। তার কাজ দেখে তিনি রেগে গিয়ে বললেন—এ কী করেছ তুমি? এরকম ভাবে ভূমি ঠিক করেছ কেন? বেরিয়ে যাও। গুরুর কথা শুনে সে কাঁদতে লাগল। সে বলল—আপনি তো আমাকে শিখিয়ে দিলেন। গুরু আরও ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন—আমি শিখিয়েছি? যুবক বলল—হ্যাঁ, আপনি শিখিয়ে যাবার সময়ে আমার পিঠে এক চড় মারলেন। গুরুদেব সেই দিন তাকে কিছু বললেন না। তিনি দেখলেন যুবকের পিঠে পাঁচ আঙুলের দাগ। তিনি বুঝলেন এ মহাবীরের কৃপাশীর্বাদ। তখন তিনি ছেলেটিকে বললেন—দেখি তো তুমি কী শিখেছ! অপূর্ব দু-একটি কুস্তির প্যাঁচ দেখে তিনি খুব খুশি হয়ে বললেন—কাল থেকে আধ ঘণ্টা করে তোমাকে আমি শেখাব। শিখতে শিখতে সে ছয় মাসের মধ্যে বড় পালোয়ান হয়ে গেল এবং পরবর্তীকালে সে রামভক্ত হল। যেখানেই মহাবীরের মূর্তি দেখে সেখানেই তাঁকে প্রণাম জানিয়ে পূজা করে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মহাজনদের কাছে যে সত্য আছে তা শুনলে মন-প্রাণ শিউরে ওঠে। কৃপার হাওয়া তিনি বইয়ে দিচ্ছেন। আমরা শুধু তাকিয়ে থাকব, তিনি টেনে নিয়ে যাবেন। মহাবীর তো অমর। অমর মানে কতগুলি দেহ আছে, যেগুলি প্রকৃতির বিকারের অধীন নয়। বিশেষ বিশেষ কারণে প্রয়োজনবোধে তাঁরা আবির্ভূত হন। এ রকম কিছু অমর দেহ আছে, তার মধ্যে হনুমানের দেহ একটি। কাজেই কলি যুগে তাঁর কৃপা পাবার সহজ উপায় হল রামভজন করা। রামভজন করলে মহাবীরের কৃপা পাওয়া যায়।

২৩। ৮। ৭৭

২৭৭

মানুষের একমাত্র বন্ধু হলেন গুরু—এই প্রসঙ্গ আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একজন রাজা এক বড় ঋষির শিষ্য ছিলেন। রাজা অনেক বিবাহ করেছিলেন এবং স্ত্রীদের মধ্যে অধিকাংশই গত হয়েছিল। বহু স্ত্রী থাকা সে যুগে সম্মানজনক ছিল। সেই জন্য রাজা পুনঃপুনঃ অনেক বিবাহ করেন।

সেই যুগে বহু বিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। জীবনধারণের কোনও সমস্যা ছিল না, সর্বোপরি পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যা অধিক ছিল। কাজেই রাজাদের হাজার পত্নীও থাকত। সেই রাজার মন্ত্রী একদিন রাজাকে সংবাদ দিল—মহারাজ, এক দেশের খবর পেয়েছি যেখান থেকে আপনি অনেক পত্নী আনতে পারবেন কারণ সেখানে বহু বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। রাজা মন্ত্রীর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে বিবাহে সম্মতি দিলেন।

কিন্তু এ কথা শুনে গুরুদেব রাজাকে বললেন—মহারাজ, আপনি আর কত বিবাহ করবেন? এবার বন্ধ করুন এ সব।

রাজা—আপনি এ সবের মর্যাদা কী করে বুঝবেন? আপনি তো কৌপীন পরে ঘুরে বেড়ান। একদিন আমার জায়গায় বসে রাজত্ব চালান দেখি, তাহলে পাগল হয়ে যাবেন।

গুরুদেব—হ্যাঁ, সে কথা আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনাকে তো এগিয়ে যেতে হবে! এক অবস্থার মধ্যে তো থাকতে পারবেন না। তখন অন্য চিন্তা আসবে। আমি অনেক রাজার খবর জানি যারা আমার নির্দেশেই ওঠে বসে—তাদের যে কী অবস্থা হয় সে সংবাদও আমি জানি।

রাজা—(মন্ত্রীকে উদ্দেশ করে) গুরুদেব কি আমাকে সন্ন্যাসী বানাতে চান?

মন্ত্রী—হয়ত তাঁর তা-ই ইচ্ছা।

রাজা—আমি সন্ন্যাসী হলে তুমি কী করবে?

মন্ত্রী—আমিও সন্ন্যাসী হব।

তাদের কথাবার্তা জানতে পেরে গুরুদেব বললেন—আপনাদের এখন আমি সন্ন্যাসী বানাব না। সেই অবস্থায় আসতে আপনাদের আরও অনেক জন্ম লাগবে। রাজা এখন আপনি বুদ্ধির জোরে রাজ্য চালাচ্ছেন, কিন্তু মনে রাখবেন আমার বুদ্ধি আপনার থেকে অনেক বেশি। আমি আপনার মতো এই অবস্থা অতীতে পার হয়ে এসেছি।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন—গুরুদেবকে পরীক্ষা করতে হবে। গুরুদেবের সেবার জন্য তিনি এমন লোক রাখবেন যারা আধ্যাত্মিকতার মর্ম বোঝে না এবং তার গুরুত্বও দেয় না। তারা বাস্তব বুদ্ধিতে গুরুদেবের উপর অত্যাচার করতে লাগল, এমনকী বিষ পর্যন্ত খাওয়াল।

গুরুদেব সবই বুঝতে পেরে বললেন—তোমরা আমাকে যে জিনিস খাওয়ালে তা খেলে তোমরা কি বাঁচবে? আর আমি যদি না-মরে বেঁচে যাই তখন এই দুষ্কর্মের ফল তোমাদেরই তো ভোগ করতে হবে। তোমরা তো কেউ রেহাই পাবে না। গুরুদেব

তখন মন্ত্রশক্তি দ্বারা বিষকে অমৃতে পরিণত করে দিলেন। সেই অমৃতের গন্ধে চার দিক ভরে গেল। তখন দেহরক্ষীরা ভয় পেয়ে রাজাকে গিয়ে বলল—আমরা আর গুরুদেবকে পরীক্ষা করতে পারব না। যা করবার আপনি করুন।

রাজা গুরুদেবের কাছে গেলে তিনি আবার তাকে বোঝালেন—মহারাজ, আপনি এ সব ছেড়ে দিন। আপনি তো এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আর আমি আপনার পিতামহকে পর্যন্ত দেখেছি। অথচ আমার দেহ এখনও বৃদ্ধের মতো জরাজীর্ণ হয়নি।

রাজা আবার মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলেন। মন্ত্রীকে তিনি বললেন—আমি যদি গুরুর আদেশ পালন না-করি তবে তিনি হয়ত রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন। তখন আমার উপায় কী হবে? আবার রাজ্যে থাকলে হয়ত আদেশ দেবেন যে, রানিদের মুখ দেখতে পারবে না। এই রকম ব্যবস্থা মেনে চলা আমার পক্ষে কী ভাবে সম্ভব হবে?

মন্ত্রী বললেন, গুরুদেবের সাহায্য আমাদের একান্ত দরকার। গুরুদেব রাজাকে বললেন—মহারাজ, আমি আপনাকে মহারানিদের ত্যাগ করতে আদেশ দেব না। তবে এখন থেকে তাদের ভোগ্য বলে গ্রহণ না-করে মাতা বলে গ্রহণ করবেন।

গুরুদেবের কথা শুনে রাজা সারারাত ভাবলেন, এ কী করে সম্ভব! রাজার চোখে ঘুম নেই দেখে রানিরা এসে খোঁজ করতে লাগলেন।

সকালে উঠে রাজা গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কী ভাবে রানিদের মাতৃবোধে গ্রহণ করা সম্ভব? তখন গুরুদেব রাজাকে সাতদিন ধরে ঈশ্বরীয় তত্ত্ব শোনালেন এবং নির্দেশ দিয়ে বললেন—প্রতিদিন প্রত্যেক রানির দুয়ারে ভিক্ষা করবে। তার পরে সেই ভোগের প্রসাদ আমি যে-ভাবে তোমাকে দেব সে ভাবেই তুমি গ্রহণ করবে এবং রানিদেরও দেবে।

এই ভাবে গুরুর নির্দেশ মেনে চলার ফলে রাজার মনে পরিবর্তন এল। তখন তাঁর মধ্যে দিব্যভাবের প্রকাশ হতে লাগল। শেষ পর্যন্ত এই ভাবে গুরুর নির্দেশ অনুযায়ী সাধনা করে রাজা অনেক উন্নত স্তরে পৌঁছলেন। পরবর্তীকালে তিনি শাস্ত্রগ্রন্থও রচনা করেছিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গুরু হলেন তিনি, যিনি অজ্ঞান থেকে জ্ঞানে নিয়ে যান। অজ্ঞান হল জ্ঞানের বিকল্প বা বিপর্যয়। অপূর্ণ জ্ঞান, স্বল্প জ্ঞান, খণ্ড জ্ঞান বা বিকৃত জ্ঞান হল জ্ঞানের আভাস বা ইঙ্গিত; অন্যথা জ্ঞান আবৃত জ্ঞান, বিকল্প জ্ঞান এবং জ্ঞান অতিরিক্ত যে-সব ভাবনা বা কল্পনা তা ছাড়াও আছে জ্ঞানের প্রস্তুতি বা আয়োজন। এ সবই অজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত, কারণ সবই ভাবমিশ্রিত জ্ঞানাভাস। সোজা কথায়, জ্ঞানবক্ষে জ্ঞান অতিরিক্ত কল্পিত ভাবনামাত্রই হল অজ্ঞান। সুতরাং দ্বৈতভাবই হল অজ্ঞান। অনাত্মভাবই হল অজ্ঞান। যা আমরা জানি তা যথার্থ জানা নয়। জৈবিক চাহিদা মেটাতে কত লক্ষ কোটি জন্ম নিতে হয় তা জানেন একমাত্র সদ্‌গুরু। আপনঘরে যাওয়ার টিকিট হল ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতা কী করে জাগ্রত হয় তাও আত্মগুরুই বলে দেন।

১১। ৯। ৭৭

২৭৮

সকলের গুরুর মধ্যে যে নিত্য এক গুরুই বর্তমান—এই সত্য একটি উপাখ্যানের মাধ্যমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ব্যক্ত করলেন।

একবার এক মহাত্মা একটি বিরাট গাছের নিচে তাঁর আসন পেতে বসেছিলেন। কয়েকদিন সেখানে থাকবার পরে তিনি দেখলেন সেখানে অনেক বিদেহী আত্মা ও ব্রহ্মদৈত্যরা আসছে। তারা তাঁকে রাতে সাধনাতে বাধা দিত। তারা মহাপুরুষকে বলত—আমাদের ভজন শোনাও। তিনি যখন ভজন করতেন তখন তারা সব এলোমেলো করে দিত। কিন্তু তাতেও তিনি ক্রোধ বা বিরক্তি প্রকাশ করতেন না। তিনি একদিন তাদের বললেন—বাবা, তোমরাই দয়া করে ভজন কর। আমি তো ভাল জানি না। আমি যদি কিছু ভুল করি, তাহলে তোমাদের গুরু আমার উপর রাগ করবেন।

এক ব্রহ্মদৈত্য জিজ্ঞাসা করল—আমাদের গুরু রাগ করবেন কেন?

মহাত্মা বললেন—তোমাদের গুরু আমারও গুরু। এ কথা শুনে ব্রহ্মদৈত্যরা তুষ্ট হল, তার ফলে মহাত্মাকে তারা আর বিরক্ত করত না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভজনের কেন্দ্র ও লক্ষ্য হল নিত্য অমৃতত্ব, মুক্তিশান্তি, পূর্ণতার ঘর বা সমতার ঘর।

১৮। ৯। ৭৭

২৭৯

ভজনের মাধ্যমে দ্বন্দ্ব তাড়াতাড়ি চলে যায়। সুর, তাল, লয়ের এমনই মহিমা যে, সব কিছুর মধ্যে একতার বিধান করে দেয়। ছন্দের উপর প্রতিষ্ঠিত বেদ, সমগ্র সৃষ্টি। ছন্দ হল মাতা, ধাতা বা বিষ্ণুশক্তি, প্রজ্ঞা, প্রাণ, আত্মা।

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক গৃহী ভক্ত একজন খ্যাতনামা মহাপুরুষকে দর্শন করতে গেল। সেখানে প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে। গৃহী ভক্তটি ভিড় ঠেলে গিয়ে মহাপুরুষকে প্রণাম করল। মহাপুরুষকে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই সে প্রাণত্যাগ করল। মহাপুরুষ তো সবই বুঝতে পারলেন। তিনি নিজের গলা থেকে মালা খুলে ভক্তটির গলায় পরিয়ে দিলেন। ভক্তটির বাড়ির লোকেরা খুব কান্নাকাটি করতে লাগল। তাই দেখে মহাপুরুষ বললেন—এটাই তো স্বাভাবিক, আর সব অস্বাভাবিক!

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—তাঁর সঙ্গে নিত্যকালের যে সম্বন্ধ তা প্রকাশ হয়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক। মনের সব রকম ইচ্ছা যদি কার্যকরী হয়, তবে এগুলি হবে না কেন?

১৮। ৯। ৭৭

২৮০

ভেদজ্ঞান রেখে গুরুভক্ত হওয়া যায় না। গুরুর কোলে বসতে হলে অভিমানের পোশাক বাইরে রেখে আসতে হয়। শরণাগত ভাব নিয়ে এলে গুরু তাকে গ্রহণ করবেনই।

এক রাজা একজন ঋষির আশ্রমে গিয়েছিলেন। রাজকীয় পোশাক পরে ঘোড়ায় চড়ে তিনি আশ্রমের কাছে উপস্থিত হলেন। কিন্তু ঘোড়া কিছুতেই আশ্রমে প্রবেশ করতে চাইল না। তখন বাধ্য হয়ে রাজা আশ্রমের বাইরে ঘোড়াকে রেখে নিজে হেঁটেই আশ্রমে প্রবেশ করলেন। কিন্তু আশ্রমে এসে তিনি ঋষির দেখা পেলেন না।

এই ভাবে সাত দিন চেষ্টা করেও ঋষির দর্শন তিনি পেলেন না। তারপর বাধ্য হয়ে তিনি মন্ত্রীর শরণাপন্ন হলেন। তিনি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন—মন্ত্রী, আমি কেন ঋষির দর্শন পেলাম না?

মন্ত্রী—মহারাজ, আপনার দরবারে আপনি যেমন রাজা, আশ্রমের দরবারে ঋষিও তেমন রাজা। সেখানে আপনাকে আশ্রমের সব নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।

মন্ত্রী পরদিন রাজাকে অত্যন্ত সাধারণ পোশাকে সাজিয়ে পায়ে হাঁটিয়ে আশ্রমে নিয়ে গেলেন। সেদিন রাজা ঋষির দর্শন পেলেন।

রাজা ঋষিকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি সাত দিন দর্শন না-দিয়ে আমাকে কেন ঘোরালেন?

ঋষি—রাজা, আপনার দরবারে যখন বিচার করেন তখন তো আপনিই শাস্তি দেন। সেই রকম ভগবানের দরবারে ভগবান শাস্তি দেন, অর্থাৎ নিজেকে আবৃত করে রাখেন। আমি তো এখানেই ছিলাম, আপনি দেখতে পাননি।

রাজা—বলেন কী! তা কী করে হয়?

ঋষি—হ্যাঁ মহারাজ। বলুন তো প্যাঁচা দিনের বেলায় দেখতে পায় না কেন?

রাজা—প্যাঁচার চোখের দোষ।

রাজাকে ব্যাখ্যা দিতে দিতে ঋষি এমন সব তত্ত্বপূর্ণ কথা বললেন যে, তিনি আর তর্ক করতে পারলেন না।

গল্পটি শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভজনের মধ্যে চার স্তরের জিনিস রয়েছে—শক্তি, জ্ঞান, আনন্দ ও প্রেম। তবে চারটি একসঙ্গে খুব কমই দেখা যায়। কিন্তু বুদ্ধি যদি সমানে এসে যায় তাহলে সব সাধনা সমান হয়ে যায়, যাকে প্রয়াগক্ষেত্র বা গুরুচরণ বলা হয়। তার স্থান হল আজ্ঞাচক্রে, যেখানে প্রাণের তিন গতি মিলিত হয়। গুরু সেই তিন গতির মিলনের বিজ্ঞান দিয়ে দেন। বাম, দক্ষিণ ও মধ্যম অঙ্গের যে ক্রিয়া বা গতি, তার যে মিলনের স্থান তা হল আজ্ঞাচক্র। বাম অঙ্গে রয়েছে ক্রিয়াপ্রধান শক্তির অংশ এবং দক্ষিণ অঙ্গে রয়েছে তত্ত্বপ্রধান শক্তির অংশ। তার মাঝখানে রয়েছে সমানের অংশ। অর্থাৎ পৃথক করে জ্ঞান বা কর্ম নয়। সুসমতা যেখানে বিরাজ করে তা-ই হল সুষুম্না। পৃথক করে সেখানে জ্ঞানের বা কর্মের ফল ফলে না। কর্ম ও জ্ঞান যেখানে সমতা প্রাপ্ত হয় সেখানেই আজ্ঞাচক্র। আজ্ঞাচক্রই হল জ্যোতির স্থান। এর মধ্যে আছে বিন্দু। বিন্দুর দর্শন পেলে সিন্ধুর দর্শন মেলে।

শ্রদ্ধা ও ভক্তি হল গয়া। লোকে গয়াতে পিণ্ড দেয়, কিন্তু গয়ায় পিণ্ড দিলেও আত্মা পিণ্ড পায় না। বিন্দু হল হংসপদ, যেখান থেকে উঠে এসে চৈতন্য স্থূল রূপ

ধারণ করে। বুদ্ধির মূলে এই পিণ্ডের সন্ধান পাওয়া যায়। গুরুর নির্দেশে ভজনের মাধ্যমে আপনিই খুলে যায়। তখন বিন্দু প্রত্যক্ষ অনুভবগম্য হয়। বিন্দু এসে রূপ ধারণ করে। তখন মন আর মন থাকে না, মন অ-মন হয়ে যায়।

ব্রজের পথ হল গুরুনির্দেশিত পথ। গুরুর নির্দেশ পালন করে চললেই রাধা-কৃষ্ণের দর্শন পাওয়া যায়।

আপন প্রকৃতি যতই গোলমাল করুক, একসময় তাকে স্থির হতেই হবে। তখন দেখা যায় অখণ্ড এক শান্তির পারাবার আপনার মধ্যেই ছিল। দ্বৈতকে টেনে নিয়ে এলে হয় না।

নিজের 'আমিকে' জানতে পারলে মুক্তি লাভ হয়। কিন্তু এই মুক্তি আর ভগবৎ দর্শনের পরে যে মুক্তি—এই দু'য়ের মধ্যে তফাত আছে। একটি হল লীন হয়ে যাওয়া এবং আরেকটি হল স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া। প্রথমটির কথা নির্গুণতত্ত্বের মধ্যে এবং দ্বিতীয়টির কথা নির্গুণগুণীর মধ্যে পাওয়া যায়।

অমর আত্মা সচ্চিদানন্দ ভূমা অখণ্ড
আপনাতে স্বয়ং আপনি বিরাজে।
আমি তুমি সবাই প্রকাশ তঁাহার
ওঠে ভাসে ডোবে সবে তাঁরই মাঝে।
আমি তুমি বোধের মাঝে
অমর আত্মা নিজেই আছে।
প্রকাশ করে স্বমহিমা
নিত্যনূতন কারণ-কার্যে।।

এই অনুভূতি হলে দ্বন্দ্ব আর কার সঙ্গে কার হবে? এক আত্মাই যদি সব হয়ে থাকে তাহলে কোনও শোক, দুঃখ থাকে না, অভিমান-অহংকার সরে যায়। মনে মল হয় ব্যবহারদোষে। অপরকে দোষারোপ করলেই মল সরে যায় না। নিজের মধ্যে দোষ দেখতে হয়। অপরের মধ্যে যা দেখা যায় তা নিজেরই প্রতিবিম্ব। বুদ্ধিকে সেই ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সময় লাগে। শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধিকে শোধন করতে হলে মনকে গুরুগত হতে হবে।

১। ১০। ৭৮

২৮১

প্রহ্লাদকে ভক্তরা পায় পরম ভক্ত হিসাবে। প্রহ্লাদ বিচারের মাধ্যমে একসময় এই তত্ত্ব পেয়েছিল। অসুরদের চির শত্রু হলেন দেবতারা। দেবতারা যখন নিজেরা পারেন না তখন বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। মানুষের মধ্যে অসুরভাব প্রধান। অসুরভাব অতিক্রম করতে গেলে দেবতারা বাধা সৃষ্টি করেন, উঠতে দেন না। প্রহ্লাদ এই তত্ত্ব উপলব্ধি করার জন্য নির্গুণ বিষ্ণুর ধ্যানে বসল। সেখানে বিষ্ণুর কোনও রূপ নেই এবং তিনি কোনও উপাদান সৃষ্টি করেন না। প্রহ্লাদের তপস্যা দেখে ইন্দ্রদেব শঙ্কিত হয়ে ভাবলেন,

আমার গদি বুঝি গেল! ইন্দ্র বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। বিষ্ণু বললেন—দেখি কী করতে পারি! ইন্দ্র তখন শিবের কাছে গেলেন। শিব বললেন—আমি কিছু করতে পারব না। তোমরা কেবল নালিশ কর। নিজেরা তপস্যা কর। ইন্দ্র আবার স্তবস্তুতি করে, যেমন government level-এ manipulation করে, ঠিক সেই ভাবে বিষ্ণুকে তুষ্ট করে শিবের সঙ্গে যুক্ত করে ব্রহ্মাকে আহ্বান করলেন। ব্রহ্মা প্রথমেই অসুরদের অমরত্বের বর দিয়ে দেন। পরে অবশ্য তিনি বিকল্প বর দিয়ে নাশ করার ব্যবস্থা করেন। এই হল কর্মবিজ্ঞানের নীতি। তা পরিশুদ্ধ হলে হয় জ্ঞানের বিজ্ঞান। প্রহ্লাদ সব দিক চিন্তা করে ধ্যানে বসে ভাবল, আমি ও বিষ্ণু একই। এই মন্ত্র ভাবনা করতে লাগল, কোনও ভেদ চিন্তা করল না। আমি সে-ই, এই ভাবনা করতে করতে সে তাঁর সঙ্গে identified হয়ে গেল। ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতারা তা দেখে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শিবের কাছে গেলে শিব আরও ক্রুদ্ধ হয়ে গেলেন। দেবতাবা নিজেরাও তাঁদের status high করবেন না আবার কারওকে উঠতেও দেবেন না। প্রহ্লাদের তপস্যা দীর্ঘকাল চলতে থাকে। তখন ভগবানের নির্গুণগুণীর যে aspect আছে, সেখানে যে বিষ্ণুর যোগাযোগ, সেখান থেকে বিষ্ণুর রূপ এসে প্রহ্লাদকে বলল—তুমি আত্মজ্ঞানী হয়েছ। তোমার কী প্রার্থনা বল। প্রহ্লাদ বলল—আমার কোনও প্রার্থনা নেই। বিষ্ণু বললেন—আমি বর দেব, তুমি কিছু প্রার্থনা কর।

সাধারণত অসুরগুলি একটু বোকা হয়। অভিমানবশত তারা বলে—তুমিই বর চাও। এই সুযোগে দেবতারা বিকল্প ব্যবস্থা নিয়ে নেয় যে, তুমি আমার বধ্য হও।

ভগবান দেখলেন প্রহ্লাদকে নামিয়ে আনা খুব মুস্কিল। তখন তিনি প্রহ্লাদের ভিতরে যে identity বোধ তা আবৃত করে দিলেন। প্রহ্লাদ এটা বুঝতে পারল না। কিন্তু সে আর নিচে নামতে পারল না। সে নিজেই নিজেকে বলল—প্রভু, তুমি কৃপা করে চাইছ যখন, তখন দেহ আমাকে ধারণ করতেই হবে। কারণ একঘেয়ে হয়ে যায় বলে ভগবান নিজেই বহু সাজেন। আমি তা অনুভব করি। অখণ্ড বিষ্ণুর সঙ্গে আমার যে নিত্য সম্বন্ধ তা যেন স্মরণে থাকে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—identified হবার পরে বিষ্ণু নিজেই ভক্ত সাজেন। দেবতাদের শিব বললেন—তোমরা যদি তপস্যা না-করতে পার তাহলে দেবলোকে তোমাদের স্থান নেই। ব্রহ্মার বর দেবার right আছে, কিন্তু অভিশাপ দেবার right নেই। বিষ্ণুর ধ্বংসের right আছে। প্রয়োজন অনুসারে বিষ্ণুকেও অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছে, কিন্তু ব্রহ্মা তা পারেননি। তাই ব্রহ্মার হাতে থাকে করমালা ও কমণ্ডলু। অস্ত্র থাকে না অর্থাৎ তিনি অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত করতে পারেন কিন্তু ব্যক্ত থেকে অব্যক্তে নিতে পারেন না। ব্রহ্মাকে ধরতে পেরেছিলেন শুক্রাচার্য। তিনি সঞ্জীবনী মন্ত্র পেয়েছিলেন। অর্থাৎ মৃত্যু যে মিথ্যা তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ভোগেচ্ছা রোধ করলে মনে বহুভাব থাকে না। এই ভাবে মনকে যুক্ত রাখলে বিষ্ণুভাব আসে।

১২। ১১। ৭৮

২৮২

ভজন আরম্ভ হয় 'তোমার' দিয়ে। তুমি শিব, রাম, কৃষ্ণ, গুরু, আত্মা স্বয়ং। তার পরে 'তোমার আমি-র' মধ্যে 'আমার আমি' মিশে যায়। দুঃখকষ্টে ভয় করতে নেই বা ঈশ্বর থেকে নিজেকে পৃথক ভাবতে নেই। ঈশ্বরকে সর্বত্র বসানো যায়, এমনকী কুপ্রবৃত্তির মধ্যেও বসানো যায়। তার ফলে কুবৃত্তি একসময় কুবৃত্তি আর থাকে না।

দৃষ্টান্তস্বরূপ শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি কাহিনি বললেন।

একজন দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক জীবনে অনেক খুন করেছে। একবার ঘটনাচক্রে এক মহাত্মার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। কথায় কথায় মহাত্মা তাকে একদিন বললেন—তুই যে এত পাপ করেছিস তোর গতি কী হবে?

খুনি বলল—কেন, তুমি তো আছ।

মহাত্মা বিস্মিত হয়ে বললেন—তুই আমার কথা ভাবিস?

খুনি—হ্যাঁ, সব সময় ভাবি।

মহাত্মা—তুই আমাকে এত ভালবাসিস? আমিও তোকে খুব ভালবাসি। এই বলে মহাত্মা তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন।

এই ঘটনার পরে খুনি আর খুন করতে পারে না। খুন করতে গেলেই মহাত্মার কথা মনে পড়ে যায়। কিছুদিন পর তার এই কুবৃত্তির পরিবর্তন হয়। তার খুন করার বৃত্তি একেবারে চলে যায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—জ্ঞানের উদয় হলে কুবৃত্তি আর থাকে না। তখন এই সকল মানুষই আবার মহাত্মা হয়ে যায়। এই সব কারণে গুরু তাড়াহুড়ো করে সহসা কিছু করেন না। গুরু ধৈর্য সহকারে সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকেন। অশান্তির মধ্যে শান্তি, অজ্ঞানের মধ্যে জ্ঞান, 'আমি আমার বোধের' মধ্যে 'তুমি তোমার বোধ' কী ভাবে উপলব্ধি হয় তা-ই গুরু শিক্ষা দেন।

৫। ১২। ৭৮

২৮৩

গুরুপ্রসঙ্গে আলোচনার আরম্ভেই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক পাগল ছোটবেলা থেকেই দেখত যে, সবাই গুরুজনদের প্রণাম করে। পাগল সকলের প্রণাম দেখে নিজের মনে খিলখিল করে হাসত। একদিন একজন তাকে জিজ্ঞাসা করল—তুই কারওকে প্রণাম করিস না কেন?

পাগল—আমাকে তো কেউ প্রণাম করে না, আমি কেন করব?

ইতিমধ্যে এই পাগলকে আরেকজন বড় পাগল এসে দীক্ষা দিয়ে গেলেন। তার পরে তিনি তাকে কতগুলি নির্দেশ দিয়ে বললেন—তুই এই নিয়মে ভজন কর। কোনও মুস্কিলে পড়লে আমার কাছে আসিস। মহাত্মা (পাগল) তাকে প্রতিদিন প্রসাদ দিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

একদিন পাগল (শিষ্য) বলল—আমি আর ভজন করব না। তুমি মিছিমিছি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে প্রসাদ দাও। গুরু বললেন—আমার পাগলামিটা তোকে দিয়ে দিই, আর তোর পাগলামিটা আমি নিয়ে নিই।

এই প্রস্তাব শিষ্যের খুব ভাল লাগল। সে ভজন করতে রাজি হল। গুরু একদিন তাকে বললেন—তোর পাগলামিটা আমি নিয়ে নিয়েছি। কিন্তু তুই আমার পাগলামিটা কতখানি নিয়েছিস? আমি দেহরক্ষা করলে কতগুলি কাজ তোকে করতে হবে। গুরু তাকে নির্দেশ দিয়ে বললেন যে, তাঁর দেহত্যাগের পর কী কী কাজ করতে হবে, কত সাধু ভোজন করাতে হবে, কখন ভজন করতে হবে ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গুরুর নির্দেশ শুনে সে বলল—তুমি এত করবে কেন? তুমি তো আর থাকবে না, মরেই যাবে!

গুরু—আমি মরে কোথায় যাব? আমি তো তোর মধ্যেই থাকব।

পাগল শিষ্য মনে মনে ভাবল, দেখাই যাক কী করে যান!

শিষ্যের গুরুনিষ্ঠা খুব ছিল। ফলে গুরুর দেহরক্ষার পরে তার মধ্যে সদ্‌গুণ প্রকাশ হতে লাগল। যেখানে সদ্‌গুণ সেখানে সবাই ভ্রমরের মতো ছুটে আসে। গুরুর কাজের দিন সবাই উপস্থিত। গুরু তাকে যা যা বলেছিলেন নিষ্ঠাভরে সে তা করল। গুরু তাকে গদিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন বলে সকলে তাকে প্রণাম করতে লাগল।

সারাদিন প্রণাম নেবার পরে সে গুরুর কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—এবার আমায় ক্ষমা কর। সারাদিন প্রণাম নিতে নিতে শরীর-মন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

রাতে সে আবার ভাবতে লাগল, আমাকে এত লোক প্রণাম করছে কেন? তখন তার মনে পড়ল যে, গুরু একদিন তাকে বলেছিলেন—একদিন আসবে যেদিন সবাই তোকে প্রণাম করবে, তুই আমাকে প্রণাম করেছিস, আর আমি সারা দুনিয়াকে প্রণাম করছি। তাই সারা দুনিয়া তোকে প্রণাম করবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই গল্পটির মধ্যে গুরুতত্ত্ব রয়েছে। সদ্‌গুরু মহাত্মাগণ পাগল[১]। তাদের 'পা' গোল হয়ে যায়। 'পা' মানে গতিচক্র বা কর্মচক্র। গতিচক্র বা কর্মচক্র 'পা' দিয়ে চলে। চরণ, 'ণ' যার মধ্যে চরে। 'ণ' বর্ণের অর্থ আত্মশক্তি, ব্রহ্মশক্তি, মুক্তিশান্তি। কার মধ্যে দিয়ে চলে? আত্মদানের মধ্যে দিয়ে চলে। গুরু আত্মদানরূপ কর্ম শিখিয়ে দেন। শিষ্য তার ফলে একতত্ত্বে এসে পৌঁছায়। সদ্‌গুরু পাগল (পা+গোল), শিষ্যকেও পাগল (পা+গোল) হতে হবে। বিষয়ের পাগল নয়, বিশুদ্ধবোধের পাগল হতে হবে। এই পাগল বস্তুর পাগল নয়, বস্তুতত্ত্বের পাগল।

৪। ৩। ৭৯

১। 'পাগল' শব্দের গূঢ়ার্থ হল জীবনের চরমলক্ষ্যে পৌঁছানো অর্থাৎ আপন দিব্য মুক্ত পূর্ণ অমৃতময় অখণ্ড ব্রহ্ম-আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। সোজা কথায়, সমবোধে বা অখণ্ড একবোধে স্থিতি।

২৮৪

প্রত্যেকের ভিতরে আমি যে কোথা থেকে এল কেউ তা জানে না। তা-ই নকল আমি। আসল আমি কারওকে ধরে না। কিন্তু তাকে তোয়াজ করে কে? নকল আমি আসল আমিকে ধরতে পারে না। তার ব্যবহার কারও জানা নেই। 'আমারভাব' না-থাকলে সংসারও থাকে না। কে ধরে রেখেছে এই 'আমারভাব' নিজের ভিতরে? আমি তো ধরতে জানে না। 'আমারভাব' ধরে আছে একটি মিথ্যা 'আমি' যার কোনও অস্তিত্ব নেই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

এক শিষ্য তার গুরুকে বলছে—গুরু সংসার যে চেপে বসে আছে। উত্তরে গুরু বললেন—তুই যে চেপে বসেছিলি, তাই সংসারও চেপে বসে আছে। ছেড়ে দে।

শিষ্য বলল—পারছি না।

গুরু বললেন—পারছিস না? এই ভাবে ছেড়ে দে। এই বলে গুরু পদ্ধতি দেখিয়ে দিলেন। তারপর তিনি শিষ্যকে বললেন—কল্পনা ছাড়, সংসারও ছাড়বে।

শিষ্য—কী করে?

গুরু—শুনলি কী এতদিন? গুরুর কথা এতদিন কী শুনলি আর কী বুঝলি বল।

শিষ্য প্রশ্নের উত্তরে গুরুর কাছে শোনা সব কথা বলে যেতে লাগল।

গুরু শিষ্যের কথা শুনে বললেন—এটা তোর কথা, গুরুর কথা বল। শিষ্য সারাদিন ধরে বলতে লাগল, কিন্তু কিছুতেই গুরুর কথা যথার্থ ভাবে প্রকাশ করতে পারল না। গুরু কেবলই বলেন—এটা তোর কথা, গুরুর কথা বল। দেখছি তুই আমার কথা শুনিসওনি, বুঝিসওনি। তখন শিষ্য গুরুকে বলল—তাহলে এবার আমার উপায় কী? গুরু উপায় বলে দিলেন—শুধু 'না'-এ থাক। 'না' নিয়ে কারবার কর। এতদিন যা করেছিস তার উল্টোটা কর।

শিষ্য—তাহলে তো আমি থাকব না।

গুরু—হ্যাঁ নকল আমি থাকবে না।

শিষ্য—তাহলে তোমার কথা কে শুনবে?

গুরু—গুরুর আমি শুনবে।

শিষ্য—সে কোথায় আছে?

গুরু—তোর কেন্দ্রে বসে আছে।

শিষ্য বাড়ি ফিরে ভাবল, আমার মধ্যে গুরুর আমি আছে, কিন্তু বুঝতে পারছি না কেন! আবার গেল গুরুর কাছে এবং এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করল। গুরু উত্তরে বললেন—গুরুর আমি বুঝতে চায় না। তুই যখন 'না'-তে থাকবি বুঝতে চাইবি না। তখনই ঠিক ঠিক বুঝবি।

দিনকয়েক পরে শিষ্য গুরুর কথা ভাবতে লাগল। ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে গেল। নানা রকম উল্টোপাল্টা ব্যবহার আরম্ভ করল। সকলে ভাবল, তার মাথা বোধহয় খারাপ হয়ে গিয়েছে। তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেওয়া হল' ডাক্তাররা চিকিৎসা করে কিছুই করতে পারল না, ফলে আরও মাথা খারাপ হয়ে গেল। কিছু

হল না দেখে পাগলা গারদ থেকে তাকে ছেড়ে দিল। তখন সে আবার গুরুর আশ্রমে গেল। সে কোনও কথা বলে না, গুরুও কিছু বলেন না তাকে। তাকে বাড়ির লোকেরা আনতে গেল। তাদের সঙ্গেও সে কোনও কথা বলল না এবং বাড়িও ফিরে গেল না।

তেরো বছর এই ভাবে থাকার পর গুরু একদিন তাকে নিয়ে বেড়াতে গেলেন। বেড়িয়ে এসে শিষ্য চুপ করে বসে রইল গুরুর আসনের পাশে। গুরু নিজের মধ্যে নিজে ডুবে রইলেন, যা তাঁর স্বভাবধর্ম। বসে থাকতে থাকতে শিষ্যেরও ঘুম এসে গেল। এ রকম ঘুম পূর্বে তার কখনও হয়নি। এ এক নূতন পর্যায়ের ঘুম (সমাধি)। এতদিন গুরুর কাছে যত তত্ত্বকথা শুনেছে, সে সব তাব অন্তরে জেগে উঠল এবং বাইরেও স্বগত ভাবে ব্যক্ত হতে লাগল। যখন তার খেয়াল হল তখন সে দেখল গুরুর আসনে গুরু নেই। গুরুর দেহ সেখানে নেই। দিন শেষ হয়ে রাত হয়ে গেল, ধীরে ধীরে রাতও শেষ হয়ে গেল। এদিকে গুরুমুখে শোনা সব তত্ত্বকথা শিষ্যের মুখ থেকে অনর্গল বেরোতে লাগল। তিন দিন পরে শিষ্য প্রকৃতিস্থ হল। এদিকে গুরু যে কোথায় চলে গিয়েছেন তা কেউ জানে না। বহু স্থানে খোঁজ করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। শিষ্য স্বাভাবিক ভাবে আশ্রমেই রইল। তার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন হয়েছে।

তিন বছর পর এক মহাত্মা এসে তাকে প্রণাম করলেন। শিষ্য কিছু না-বলে শুধু তাকিয়ে রইল। মহাত্মা বললেন—তোমাকে কত জন্ম খুঁজছি আর তুমি এখানে আছ! শিষ্য আরও অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। মহাত্মা বললেন—তুমি আমার সেই প্রভু যাঁকে আমি জন্ম জন্মান্তর খুঁজে বেড়াচ্ছি। এ রকম মহাত্মা পরপর সাতজন এলেন। তাঁরা এসে ঐ এক কথাই বললেন। যাঁরা এলেন তাঁরাও সব বিরাট বিরাট মহাত্মা। এ সব দেখে আশ্রমের সব লোক অবাক হয়ে গেল। শিষ্য কেবল দেখছে যে, গুরুমুখে শোনা সব তত্ত্বকথা তার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ফুটে উঠছে।

সাতজনের পর অষ্টমজন এল এক পাগল। সে তিন দিন আশ্রমে রইল। তার বিশেষত্ব হল, যখন সে পাগলামি করত তখন 'জয় গুরু, জয় গুরু' বলে গান করত ও হাতে তালি দিয়ে সেই শিষ্যকে প্রদক্ষিণ করে নৃত্য করত। পাগল যাবার আগে মহাত্মাদের এবং আশ্রমস্থ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে বলল—

'গুরুর আমি খেলে গুরুবোধে
সে বোধের হলে উদয় হৃদে
সত্য গুরু ভক্ত যাদের কাছে প্রিয়
ব্রহ্ম-আত্মা এক তত্ত্ব
লুটায় তারা সেই গুরুর পদে।'

এই তত্ত্ব বলে পাগল সেই শিষ্যকে একটি প্রণাম করে যে কোথায় চলে গেল আর খোঁজ পাওয়া গেল না।

শিষ্য দেখে তার মধ্যে কেবল গুরুবোধ খেলে, আর মহাত্মারা দেখেন তার মধ্যে আদিগুরুর আবির্ভাব হয়েছে।

'গুরুবোধে হয় গুরুভজন
গুরুবোধে হয় গুরুদর্শন
গুরুবোধে হয় গুরুর সঙ্গে মিলন।'

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—যে শিষ্য প্রথমে সংসার ত্যাগ করতে পারেনি তার মধ্যেই গুরুবোধ অদ্ভুত ভাবে উদয় হল। গুরু demonstration দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, তাতেই তার সব খুলে গেল। হৃদয়ের যেখানে গুপ্ত স্থান সেখানে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। একমাত্র আদিপুরুষ বাসুদেব হিরণ্যগর্ভ সদ্‌গুরুরই সেই ঘরে প্রবেশের অধিকার আছে, আর কারও নেই।

৪। ৯। ৭৯

২৮৫

আজ সান্ধ্য ভাষণ আরম্ভ করার পূর্বে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এক ভক্তকে উদ্দেশ করে বললেন—সোজা হয়ে বস। দশ বছরেও সোজা হয়ে বসার অভ্যাস কেউ করতে পারলে না। তোমাদের বাঁকা দেহে বাঁকা মন। ভগবান সোজা। এই রকম দেহে তাঁর প্রকাশ কী করে হবে?

জনৈক ভক্ত—অষ্টাবক্র মুনি কি সোজা হয়ে বসতে পারতেন?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—হ্যাঁ, পরে তিনি সোজা হয়ে গিয়েছিলেন। বর্তমানের বিজ্ঞান যে মানুষকে কী শিখিয়েছে! মানুষের মেরুদণ্ড নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাতে তিনি কী করে প্রকাশ হবেন? তাই মানুষ এখন ভ্রান্তির পর ভ্রান্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জনৈক ভক্ত—সব তাঁরই ইচ্ছা।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—অত সোজা নয়। তাহলে সাধকরা এত সাধনা করতেন না।

জনৈক ভক্ত—তাঁরা তো কত কঠিন সাধনা করেন। মাথা নিচের দিকে দিয়ে পা উপর দিকে করে চার দিকে আগুন জ্বালিয়ে। আমরা পারছি না কেন?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—তাঁর ঘাড়ে সব চাপিয়ে দিলেই হল!

জনৈক ভক্ত—সেই শক্তি দাও। আমি সব ছেড়ে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—বাড়িতে নুন ভাত খাও, কিন্তু নেমন্তন্ন বাড়িতে তো নুন ভাত দিলে হয় না।

জনৈক ভক্ত—ছোটবেলা থেকে কত চেষ্টা করে যাচ্ছি, কিন্তু হচ্ছে না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—ভগবান সোজা। সোজা হয়ে বসলে হবে না কেন? কথা শুনে অভ্যাস করতে না-পারলে সে কি দেবে? ঈশ্বরীয় অনুভূতি কী? সামগ্রিক বোধের মধ্যে একটি সমতান গতি। অর্থাৎ দেহ, প্রাণ, মন ও বোধের মধ্যে একটি সমান গতি। সমান গতি কারও ভিতরে কম, কারও ভিতরে বেশি।

জনৈক ভক্ত—কিছু চাই না, শুধু তাঁকে চাই।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—চাই বললেই ভগবান এসে জুটবে না। অত সোজা নয়।

জনৈক ভক্ত—সেইজন্যই তো আপনার কাছে আসা।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—সাধনা করতে হয় না, কিন্তু সেটা কোন স্তরে? বাজারে গিয়ে জিনিস কিনব অথচ মূল্য দেব না, তা হয় না। রাধারানি মাকে শ্রীকৃষ্ণের জন্য কম কাঁদতে হয়নি। রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছর কত কষ্ট করতে হয়েছে। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) ভিতরটা পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। এর সামান্য একটু আঁচ যদি তোমাদের লাগে তবে জ্বলে যাবে। ভগবান জ্বলে যাচ্ছেন, জ্ঞানময় তপঃ সূর্যদেব জ্বলে যাচ্ছেন। কিন্তু আমরা কী করছি? দিব্যি ঘুমিয়ে কাটাচ্ছি। ভগবান তার কাছেই ধরা দেন যে সাধনা করে অন্তরকে শুদ্ধ করে নিয়েছে। ভগবান এমনই একজন যাঁকে মিশ্রণ বা গোঁজামিল দিয়ে পাওয়া যায় না। নিজেকে নিজে প্রশ্ন করতে হয় যে, কেন আমি কষ্ট করব না? কষ্ট যদি করতে হয় তবে নিজের অন্তরকে জাগাবার জন্য করো।

জনৈক ভক্ত—তাঁকে আমার সব দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—প্রতি পদে পদে দিতে হবে, ঐ একবার মুখে বললে হবে না।

জনৈক ভক্ত—কী দেব? তিনিই তো সব হয়েছেন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—তাহলে চুপ করে বসে থাক।

জনৈক ভক্ত—এর আগের দিন আপনি বলেছিলেন যে, তিনিই আগুন জ্বেলেছেন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—কোথায় আগুন?

জনৈক ভক্ত—(নিজের ঠোঁটের কাছে আঙুল চেপে) এখানে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—না, ওখানে নয়। সোজা হয়ে বসে থাকতে বলা হয়েছিল। বাড়িঘরে তো সোজা হয়ে বসা হয় না। এখানে কিছুক্ষণ অন্তত বসার চেষ্টা কর। বাঁকা তো তাঁরই। তাঁর কাছে ফিরে যাব ঠিকই। যেখানে ফিরে গেলে বিকার থাকে না, সেখানে ফিরে না-যাওয়া পর্যন্ত রেহাই নেই।

কোনও একজন মহাপুরুষকে তাঁর এক শিষ্য জিজ্ঞাসা করেছিল—দীর্ঘকাল তোমার কাছে বসে থেকে কী পেলাম? তার উত্তরে অপর একজন শিষ্য বলল—এখানে তো পাওয়ার কিছু নেই। দেখে যাও। অনেক সম্পত্তি আছে। অনেক কিছু পাবে। কিছু না-দিলে কিছু পাওয়া যায় না।

প্রথম শিষ্য—আপনি কী দিয়েছেন?

দ্বিতীয় শিষ্য—আমি নিজেকেই দিয়েছি, তাই আনন্দে আছি। সেই আনন্দ আমি পেলাম তাঁকে পরিপূর্ণ মন দেওয়ার পর।

প্রথম শিষ্য—আপনি ধন্য।

প্রথম শিষ্য ছিল কোটিপতি। একদিন সে সব বিলিয়ে দিয়ে মহাত্মার পদতলে মৌন হয়ে বসল। সেই যে বসল তাতেই তার কাজ হয়ে গেল।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পটি শেষ করে বললেন—ভগবানকে মানুষ পেতে চায় নিজের মতো করে। মানুষ নিজেই বিকৃত, নিজের মতো করে পেতে চাইলে বিকৃত করেই পাবে। সে 'আমার, আমার' বলে, কিন্তু কিছুই ধরে রাখতে পারে না। 'আমারবোধ' জ্বালিয়ে দিতে হবে। দেহ-প্রাণ-মন জ্বলে গেলে তাঁর হয়ে যাবে। পাওয়াতে বিকার থাকবেই।

গোপীসাজে এসেছিল মুক্তপুরুষরা। গোপীসাজে এসে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে দিয়ে দিল। আমরা তাঁকে কিছুই দিই না, তাঁকে দিই পচা ফুল ও বাতাসা আর নিজেরা ভাল ভাল খাই। পাটোয়ারি বুদ্ধি নিয়ে চলি বলে সব বিকৃত হয়। পরিপূর্ণ ভাবে তাঁর হয়ে গেলেই সোজা হয়ে যায়। সোজা হয় এক-এ। সোজা না-হলে বহুর মধ্যে বা বিকারের মধ্যেই থাকবে।

১১। ১২। ৭৯

২৮৬

প্রত্যেকে যা জানে তা নিজ অতিরিক্ত বিষয়। ভগবানকে দেখার উপায় হল নিজের আমিকে দেখা। আর শয়তানকে দেখার উপায় হল নিজেকে বাদ দিয়ে দেখা। শয়তানের অর্থ হল শয়ে শয়ে বিস্তার। সেই বস্তুকে যখন point out করা যাবে তখন সব একাকার হয়ে যাবে। Chemistry-তে আছে যে, একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সব metal crystal হয়ে যায়। কিন্তু সেই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা না-হলে তার আগে বা পরে metal crystal হতে পারে না। সেই জন্য উপাদানের দৃষ্টিভঙ্গিতে এক রকম এবং জগতের দিক থেকে আরেক রকম দেখায়। বহু দেখা স্বাভাবিক। বহুর মধ্যে যে এক আছে সেই এক-কে না-দেখে বহুকে দেখা ভুল।

জনৈক ভক্তের প্রশ্ন—যে খুনি তাকে Oneness-এর মধ্যে দেখব কী করে?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—যারা Oneness-এ প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের কাছে manyness থাকে না। খুনির অভিনয় সিনেমা থিয়েটারে দেখে তো স্থির থাকতে পার, তখন তো ক্ষেপে যাও না। যদি বলি বাইরে যা-কিছু দেখছ তা আরও বড় অভিনয়।

জনৈক ভক্ত—চর্মচক্ষুতে দেখছি, তা কী করে অভিনয় বলব?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—সিনেমাও তো চর্মচক্ষু দিয়ে দেখছ।

জনৈক ভক্ত—সিনেমায় আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু খুন দেখলে আনন্দ পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—ওটা আরও বৃহত্তর আনন্দ। এগুলি সব অভিনয়। জানতে চাইছ কী করে? তোমাদের একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

পাঁচজন লোক একটি বট গাছের ছায়াতে বসে বিশ্রাম করছে। তাদের প্রকৃতি পাঁচ রকমের। তাঁরা যাওয়ার সময় শুনল যে, এর ছায়াতে বহু পথিক শান্তি পেয়েছে। বট গাছ সত্যিই ভাগ্যবান!

পাঁচজন বিশ্রাম করছে। তাদের মধ্যে একজন হল খুনি। সে অনেক খুন করেছে এবং শ্রান্তক্লান্ত হয়ে গাছতলায় এসে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিছুক্ষণ পরে সেখানে আসে এক সাধু। সেও একটু পরে এসে ঘুমিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পরে এল এক ধনী। তারপর এল এক ব্যবসাদার। তার পরে এল এক সৈনিক, সকলেই শ্রান্তক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। পাঁচজনের পাঁচ রকমের character! কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় পাঁচজনের character বোঝার উপায় আছে কি? তাদের মধ্যে সবার আগে ঘুম ভাঙল সাধুর। তিনি ঘুম

থেকে উঠে ভগবানের নাম করতে করতে চলে গেলেন। তারপর একে একে ধনী, ব্যবসাদার, সৈনিক এবং খুনির ঘুম ভাঙল।

তার পরের দিন রাতে সেখানে এল দুই ডাকাত। তারা বট গাছের নিচে বসে তাদের লুটের মাল ভাগবাটোয়ারা করতে বসল। ভাগ করা নিয়ে তাদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়ে গেল। তারা একে অপরকে বলল—তুই কিন্তু মিথ্যা কথা বলবি না। তারা নিজেরা সত্য আচরণ করছে না, কিন্তু অপরের কাছে সত্য চাইছে। কথা কাটাকাটির সুযোগে আরেকজন লোক এসে তাদের মাল নিয়ে পালিয়ে গেল। তারা দেখল এ তো চোরের উপর বাটপাড়ি হয়ে গেল। তারা তার পিছনে ছুটল। তখন তাদের আবার এক উদ্দেশ্য হয়ে গেল। একটু আগেই different point ছিল তাদের মধ্যে। সেই চোর জিনিসগুলি নিয়ে এক সাধুর আশ্রমে গিয়ে আশ্রয় নিল। সেখানে গিয়ে বলল—আমার এই মাল এখানে থাক, কাল নিয়ে যাব। সাধু বললেন—না, গৃহীদের জিনিস রাখলে আমার এই আশ্রম কলুষিত হয়ে যাবে। সাধুর এক শিষ্য ছিল। সে খুব লোভী প্রকৃতির। সে বলল—থাক না, কাল তো নিয়ে যাবে বলছে। এতদিন সাধুসঙ্গ করেও তার সুপ্ত লোভ জেগে উঠল। আরেকজন শিষ্য সাধুকে বলল—গুরুদেব আপনি যদি আদেশ করেন এগুলি আমি ছুঁড়ে ফেলে দিই। সাধু বললেন—না, তুমি ছোঁবে না। প্রথম শিষ্য বলল—আমি তো ছুঁতে পারি। সাধু বললেন—ওকে ছুঁতে দিলে এতদিনকার শিক্ষা সব বৃথা যাবে। এদিকে না বললে শিষ্য অসন্তুষ্ট হবে। এই অবস্থায় গুরুদেব কারওকে কিছু না-বলে চলে গেলেন। কোথায় যে তিনি গেলেন কেউ কিছু বুঝতে পারল না।

Consciousness যখন inactive হয় তখন কত powerful হয় দেখ! ইতিমধ্যে দু'জন ডাকাত খুঁজতে খুঁজতে আশ্রমে এসে উপস্থিত হল। তারা এসে তাদের জিজ্ঞাসা করল, আশ্রমে কেউ এসেছে কি না। দ্বিতীয় শিষ্য ভাবল, এই অবস্থায় কী বলা যায়! গুরুদেব তো বলেছেন অপ্রিয় সত্য বলবে না। 'আসেনি' বললে মিথ্যা কথা বলা হবে। আবার যদি সত্য কথা বলে তাহলে আশ্রমে ঢুকে তারা সব তছনছ করে দেবে। এই সব ভেবে সে মৌন হয়ে রইল। প্রথম শিষ্য ভাবল, সত্য কথা বললে সব জিনিস নিয়ে যাবে। তাই সে ডাকাতদের বলল—আসেনি। ডাকাতরা তার কথা বিশ্বাস করল না। তারা বলল—আসেনি? আমরা তোমাদের আশ্রম দেখব। প্রথম শিষ্য বলল—এটা সাধুর আশ্রম, তবুও দেখবে? ডাকাতরা বলল—দেখব, নইলে সবাইকে মেরে ফেলব। প্রথম শিষ্য অবস্থা বেগতিক দেখে যেই পালাতে গেল ডাকাতরা তার মতলব বুঝে গেল এবং তার পায়ে লাঠি মেরে বসিয়ে দিল। সেই চোরটি এই সব দেখে গেরুয়া পরে কমণ্ডলু হাতে নিয়ে সাধু সেজে বসল। দ্বিতীয় শিষ্য মৌন হয়ে রইল। চৈতন্য যখন নিষ্ক্রিয় তখন কত powerful! প্রথম শিষ্য বাইরে সত্যের আচরণ দেখালেও অন্তরে তার সত্যবোধ জাগেনি। তাই সে ডাকাতদের হাত থেকে রেহাই পেল না। ইতিমধ্যে গ্রামের লোক এসে পড়ল এবং তাদের দেখে ডাকাতরা ভয়ে পালিয়ে গেল।

সাত দিন পর গুরু এলেন দ্বিতীয় শিষ্যের জপের টানে। সে গুরুকে জিজ্ঞাসা করল—গুরুদেব কোথায় ছিলেন? গুরুদেব বললেন—তোর ভিতরে ছিলাম। শিষ্য

বলল—আমি দেখতে পাইনি কেন? গুরু বললেন—আমি না-থাকলে তোকে রক্ষা করল কে? শিষ্য বলল—তুমি চলে গেলে কেন? গুরুদেব বললেন—আমি থাকলে ডাকাতরা সব ধরা পড়ত।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—যে সৎ তার কাছে অসৎ বিকারের বস্তু নয়। সৎ-কে যে চায় না সে মার খায়। চৈতন্যকে আবৃত করলেও ভিতরে চৈতন্য থাকে, চৈতন্যের অভাব হয় না।

নিজেকে সর্ববস্তুর মধ্যে যুক্ত করা হল মন-প্রাণ দিয়ে পূজা করা। সৎ-এর মধ্যে চিৎ-কে এবং চিৎ-এর মধ্যে সৎ-কে ভাবনা করা হল পূজা। Awakening of inner Consciousness হল পূজা। Reawakening of inner Consciousness হল বোধন। চৈতন্য নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার সব এক করার জন্য এই আয়োজন। যেখানে চৈতন্য সেখানে সব পূর্ণ। অপূর্ণতার মধ্যেও চৈতন্য আছে।

১১। ১২। ৭৯

২৮৭

সাধনার পথে যত অগ্রসর হওয়া যায় বিকারের সম্ভাবনা তত বেশি হয়। সেই জন্য গুরুর প্রতি একাগ্রতা ও নিষ্ঠা যেন বৃদ্ধি পায়। এই গুরুই হলেন ব্রহ্ম-আত্মা। চিত্ত একটু বিমুখ হলেই নিষ্ঠা চলে যায়। সাধক যতই উচ্চ স্তরে উঠুক তার চিত্ত যেন বিমুখ বা ভ্রষ্ট না-হয়। সেই জন্য গুরু তার চিত্তকে balance দেবার জন্য বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। শেষের দিকে গুরু balance না-দিলে কোনও সাধকের ক্ষমতা নেই final gate পার হয়। গুরুর প্রথম ও শেষ কাজ হল 'আমারভাবের' যত প্রকার মল আছে তা শোধন করে জীবভাবকে শিবভাবে রূপান্তরিত করা। তাঁর কর্তব্য পূর্ণ হয় তখনই যখন জীবচৈতন্য পরিপূর্ণ শিবচৈতন্যে রূপান্তরিত হয়। তখন গুরু মিশে যান। তার আগে শিষ্যের অপূর্ণতা কেউ দূর করতে পারে না।

উপরোক্ত বিষয়টিকে সহজে বোধগম্য করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প উল্লেখ করলেন।

গুরু যে ক্ষেত্রেরই হন তিনি গুরুই। এক গুণী যাদুকর অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা জানতেন। তিনি উৎসাহী এক যুবককে যাদুবিদ্যা শেখালেন। তাঁর চেষ্টা, উৎসাহ, উদ্যম ও গুরুভক্তি দেখে যাদুকর স্বেচ্ছায় যাদুবিদ্যার সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কৌশল শেখালেন এবং তাকে পারদর্শী করে তুললেন। দর্শকরা যুবকের খেলা দেখে অবাক হয়ে গেল। একদিন যুবকের খুব অভিমান হল এই ভেবে যে, আমি তো এবার self-sufficient হয়ে গিয়েছি।

সে খুব সুন্দর একটি খেলা দেখাত। গুরু একটি বংশদণ্ড নিজের হাতের তালুতে রাখতেন। যুবকটি গুরুকে একবার প্রদক্ষিণ করে এক লাফে এসে দণ্ডটি ধরত এবং ধীরে ধীরে বাঁশের মাথায় উঠে যেত। বাঁশের মাথায় গোল চাকতির মতো একটি জিনিস বাঁধা থাকত। তার উপরে দাঁড়িয়ে সে নানা ভঙ্গিমায় খেলা দেখাত। আর গুরু হাতের তালুতে রেখে এক আঙুল থেকে আরেক আঙুলে দণ্ডটি সরিয়ে নিতেন। এই

থেকেই বোঝা যায় যে, গুরুর কতখানি concentration ছিল এই ব্যাপারে। কখনও কখনও তিনি এক হাতের তালু থেকে আরেক হাতের তালুতে নিয়ে আসতেন, আবার কখনও নিয়ে আসতেন কপালে ভ্রূদ্বয়ের মাঝখানে। এই অবস্থায় গুরু কখনও কখনও নিজের পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং সেই অবস্থায় যুবকটি চাকতির উপরে দাঁড়িয়ে অদ্ভুত অদ্ভুত খেলা দেখাত।

অভিমানবশত যুবকটি গুরুকে একদিন একটি অসঙ্গত কথা বলে ফেলল খেলা দেখাবার আগে। শিষ্যের এই সামান্য ত্রুটিকেও শোধন করতে হয়। তাকে শিক্ষা দেবার জন্য গুরু একদিন তাঁর আঙুল থেকে বংশদণ্ডটি ছেড়ে দিলেন। যুবকটি পড়ে মরেই যেত, কিন্তু গুরু তা হতে দিলেন না। পড়ে যাবার সময় তিনি শিষ্যকে ধরে ফেললেন। তারপর তিনি শিষ্যকে বললেন—আজ থেকে আর আমি তোমার গুরু নই।

শিষ্য নিজের ভুল বুঝতে পারল। কিছুক্ষণ পরে গুরুর পা জড়িয়ে ধরে বলল—আমার ভুল হয়ে গিয়েছে, এই ভুল আর হবে না। যতক্ষণ শ্বাস আছে আমি তোমার। সব ভুলে গিয়ে তোমাকে আমি যে আঘাত দিয়েছি তা ফিরিয়ে নিতে চাই। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। আজ হয় তুমি আমাকে ক্ষমা কর, নয়ত নাশ কর।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গুরু কখনও শিষ্যকে নাশ করেন না। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সব জ্ঞান শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত না-হয় ততক্ষণ পর্যন্ত গুরুর দায়িত্ব থাকে। শিষ্য যে কতবার ভুল করে এবং সেই ভুল যে গুরুকে কত আঘাত দেয়, শিষ্য তা জানতেও পারে না। এই জন্য সাধকের সাধনার ফল আবৃত হয়ে যায় এবং সে এগোতে পারে না।

চরম দুর্গতিকেও গুরুর দান বলে যখন গ্রহণ করা হয় তখনই সাধনার পথ সুগম হয়। এটা অভিমাননাশের একটি বিশেষ পদ্ধতি। গুরু চান শিষ্যের ব্যষ্টিভাবকে সমষ্টিভাবে লীন করতে আর জীব চায় সমষ্টিভাব থেকে পুষ্টি অর্জন করে ব্যষ্টিভাবকে রক্ষা করতে।

২৯। ১। ৮০

২৮৮

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভক্তদের উদ্দেশ করে বললেন—অনেক পর্যায়ের কথাই তোমাদের শোনবার সুযোগ হয়েছে, কিন্তু এই সব কথার সারমর্মকে যদি ধরে না-রাখা যায় তাহলে গুরু কাজ করতে পারেন না। গুরু কাজ করেন বাণীর মধ্যে দিয়ে। সেই বাণী আবার বোধের মধ্যে দিয়ে কাজ করে। সেখানে কোনও ফাঁকি চলে না। কিন্তু অভিমানবশত ফাঁকি দেওয়া হয় কখনও কখনও, তার ফলে রহস্যগুলি আর ধরা পড়ে না। যেমন ভাবে শোনা হয় ঠিক তেমন ভাবে গ্রহণ করতে হয়। জীবের যে জিভ আছে তা যতক্ষণ পর্যন্ত গুরুর কাছে সমর্পণ করা না-হয় ততক্ষণ গুরুবাণী কার্যকরী হয় না।

জনৈক ভক্ত—এক কথা সবাই শুনছে, কিন্তু সবাই তো এক অর্থে গ্রহণ করছে না।

ভক্তের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক রাজার এক অপরূপ সুন্দরী রানি ছিল। কিন্তু তার স্বাস্থ্য খুব খারাপ ছিল। রানির অসুস্থতার জন্য পাঁচজনে তাকে নানা ভাবে পরিচর্যা করত।

রানি সন্তানসম্ভবা হল। তখন পরিচর্যার মাত্রা আরও বেড়ে গেল। যথাসময়ে একটি শিশুসন্তান হল। তার পরে রানির স্বাস্থ্য আরও ভেঙে গেল। প্রায় সর্বদাই শুয়ে থাকে এবং পরিচারিকাগণ যথাসাধ্য সেবাযত্ন করে।

রাজা সেই সময় কোনও এক বিশেষ কার্যোপলক্ষ্যে পার্শ্ববর্তী এক রাজ্যে গেলেন। দিনকয়েক পরে ফেরার পথে এক সরাইখানায় রাজাকে রাত্রিযাপন করতে হল। সেখানে বিশ্রামের সময় হঠাৎ দেখতে পেলেন এক বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবতী যুবতী মাথায় একটি বোঝা নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। যুবতীটি রাস্তার ধারে এক গাছতলায় বসল। সেখানেই সে একটি শিশুসন্তান প্রসব কবল এবং নিজেই নাড়ি কাটল। তারপর শিশুটিকে একটু স্তন্য পান করিয়ে তাকে বোঝার মধ্যে নিয়ে আবার চলতে শুরু করল।

রাজা তো এই দৃশ্য দেখে অবাক। তিনি ভাবলেন, এ কী অদ্ভুত! একে তো কোনও পরিচর্যাই করতে হল না আর আমি রানির জন্য কত ডাক্তার, বদ্যি ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করি। কত দাসী রানির পরিচর্যা করছে। রাজা ফিরে এসে সব ঘটনা রানির কাছে বললেন।

রানি খুবই বুদ্ধিমতী ছিল। কয়েকদিন পরে রাজাকে আবার কার্যোপলক্ষ্যে বাইরে যেতে হল। রাজার একটি বাগান ছিল। রাজা যেই দিন বাইরে চলে গেলেন সেই দিনই রানি বাগানের মালিকে তাড়িয়ে দিল। কয়েকদিন পরে রাজা ফিরে এসে দেখেন তার সুন্দর বাগান একেবারে শুকিয়ে গিয়েছে। রাজা পরে জানতে পারলেন যে, রানি মালিকে ছাড়িয়ে দিয়েছে। রাজা রানির উপর খুব ক্ষেপে গেলেন।

রানি তখন রাজাকে বুঝিয়ে বলল—মহারাজ, আপনি যখন ভ্রমণে গিয়েছিলেন তখন বনের মধ্যে কত রকম গাছ-ফুল-ফলের শোভা দেখে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে কি কোনও মালি জল দেয়?- এতবড় বন যদি মালি ছাড়া চলতে পারে তবে আপনার বাগান মালি ছাড়া চলবে না কেন? মহারাজ এই যুক্তি খণ্ডন করতে পারলেন না।

রানি আরও বলল—মহারাজ, প্রকৃতির রাজ্যে প্রতিটি প্রকাশের গুণ, শক্তি ও সামর্থ্য পৃথক। যার যে রকম ব্যবহারের প্রয়োজন প্রকৃতি সেই রকম ভাবেই সব সাজিয়ে দিয়েছে। সেই জন্য আপনি একজনের সঙ্গে আরেকজনের তুলনা করবেন না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করে বললেন—এখানকার বক্তব্যগুলির ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য। যার যেমন শক্তি সে সেই অনুযায়ী গ্রহণ করছে। অপরে কী পারছে বা পারছে না তা দেখার দরকার নেই। তুমি কতটুকু গ্রহণ করতে পারছ তাই দেখ। যে যতটা accurate ভাবে নিতে পারে বা গুরুর মতো করে নেয় তার তত আনন্দ হয়। যেমন গুরু কয়েকজনকে গান শেখালেন, কেউ চার আনা

গুরুর মতো করে গাইছে, কেউ বা আট আনা গুরুর মতো করে গাইছে। ষোলো আনা কেউ নিতে পারছে না। তবু যে যতটুকু গুরুর মতো করে গাইতে পারছে তার তাতেই আনন্দ হচ্ছে।

গুরুবিদ্যা এমনই যে, গুরুর পূর্ণ জ্ঞানধারা শিষ্যের মধ্যে রূপায়িত হয়। গুরু নিজেকে শিষ্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করে দেন।

গুরু জ্ঞানমূর্তি—জ্ঞান প্রবিষ্ট হয় শিষ্যের মধ্যে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং তদ্রূপ ধারণার মাধ্যমে।

দীক্ষাগ্রহণ করার অর্থ হল, গুরুর ভাবধারাকে গ্রহণ করে পরিপূর্ণ রূপায়ণের জন্য সাগ্রহে চেষ্টা করা। গুরুবাণীর এক বিরাট চিন্তাধারাকে নিয়ে রূপ দেবার জন্য যে চেষ্টা করে সে-ই দীক্ষিত। কানে মন্ত্র দিয়ে যে দীক্ষা তাও ঐ শব্দ দিয়ে বিরাটকে (Infinite-কে) ইঙ্গিত (indicate) করে।

Infinite-কে তো কেউ নেয় না। Infinite-কে মানলে নিজে free থাকা যায়। গুরুর কাছে যা পাওয়া যায় গুরুর ধারা অনুযায়ী তা যদি ছড়িয়ে দিয়ে যাওয়া হয় তাহলে কোনও reaction আর হয় না। এ যেন ঠিক relay-race-এর মতো। মাঝখানে যদি কেউ আটকে রাখে তবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ধারা ব্যাহত না-করে সাবলীল ভঙ্গিমায় প্রবাহিত করে দিলে নিজেও মুক্ত থাকা যায় এবং তাতে জগতেরও কল্যাণ হয়।

গুরু হলেন ত্যাগের প্রতিমূর্তি। সেই জন্য তিনি চেষ্টা করেন যাতে শিষ্যের মধ্যেও ত্যাগের ধারা প্রবাহিত হয়। যদি তা না-হয় তবে শিষ্য সাধনার মাঝপথে আটকে যায়। কিন্তু ত্যাগের ধারা প্রবাহিত হতে দিলে শিষ্যও গুরু হয়ে যায়।

নিজের উপরে গুরুবাণী যাতে ষোলো আনা কাজ করতে পারে সেই চেষ্টা করতে হয়। এর নামই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা থাকলেই গুরুকৃপা অনুভব করা যায়। আর তা যদি না-হয় তবে বুঝতে হবে গুরুর বাণী যে যতটুকু গ্রহণ করতে পারে তা-ই গুরুকৃপা।

২৯। ১। ৮০

২৮৯

এক অখণ্ড এবং তার মহিমাও অখণ্ড। এক-এর স্মৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মহাপুরুষরা স্তব্ধ হয়ে যান। বহুর মহিমা বহু রকম ভাবে ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু এক-এর মহিমা এমনই যে, সেখানে দ্বৈতের বা বহুর কথা মনে থাকে না। তখন দেহের কথাও মনে থাকে না। মহাপুরুষগণ লক্ষ লোকের সঙ্গে থেকেও বৈচিত্র্য দেখেন না, নিজেকেই দেখেন। যে বহুর মধ্যে এক-কে এবং এক-এর মধ্যে বহুকে দেখে সে-ই ভাগ্যবান। তার আগে ভূতের কিল খেতে হয়। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা আছে, মন দিয়ে শোন।

একজন ব্রহ্মজ্ঞ দেখলেন একটি লোক নিজেকে নিজে মারছে আর চিৎকার করে বলছে—আমাকে মারল, আমাকে মারল! ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ তাকে শান্ত করে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমাকে কে মারছে? এই কথায় সে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ঐ একই কাণ্ড করতে লাগল। সে নিজেকে মারতে মারতে কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল! ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ তাকে কুয়ো থেকে উঠিয়ে দিলেও সে ঐ কাজ থেকে বিরত হল না। এই দেখে

ব্রহ্মাজ্ঞপুরুষ চলে গেলেন। কিছু দূর যাওয়ার পর ব্রহ্মাজ্ঞপুরুষ দেখলেন একজন লোক নিজের চুল নিজে টানছে আর চিৎকার করে বলছে—মরে গেলাম, মরে গেলাম! তাকেও নিবৃত্ত করার চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হলেন। তখন মহাত্মা ভাবতে লাগলেন, আমি বন্ধ করার কে? আত্মা আপন আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উঠন্ত তরঙ্গকে পড়ন্ত তরঙ্গ বাধা দিতে পারে না।

৩। ২। ৮০

২৯০

সত্যের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করছে—সত্য কী?

গুরু—এই যে জিজ্ঞাসা করছ এটাও সত্যের নমুনা। আমি যা বলছি তাও সত্যের নমুনা বা পরিচয়।

শিষ্য—তারপর?

গুরু—তারপর যা বলছ তাও সত্যের নমুনা।

শিষ্য—তাহলে সত্য কী?

গুরু—বাইরের জগৎ হল ব্যবহারিক সত্য এবং অন্তরের চিন্তা হল প্রাতিভাসিক সত্য। কোনওটিকেই ফেলা যায় না, তাই আগেই জগৎকে মিথ্যা বলা যায় না। তার দ্বারাই সত্যকে জানতে হয় বা এ-ই হল সত্যের expression। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পরেও জগতের অস্তিত্ব থাকে। নিজের থেকে জগৎ পৃথক নয়। এই সত্য জেনে নিলে আর কোনও বাধা থাকে না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সংসার কী? আমি দিয়ে বললে সব রূপ-নাম-ভাব-বোধ আমি। আর তুমি দিয়ে বললে সব তুমি। এই আমি বা তুমি কিন্তু limited নয়, all-pervading One or Supreme One। এ ছাড়া আর সব expression হল intermediary fraction। এর নাম বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের জ্ঞান থাকলে জ্ঞানের ভুল বা অজ্ঞান হয় না।

জ্ঞান হল এক-কে বা আপনাকে জানা। বিজ্ঞান হল আপনাকে জেনে আপনবোধ দিয়ে ব্যবহার করা। বিজ্ঞান দিয়ে জ্ঞানের ব্যবহার করা হল প্রেম। আপনবোধে বাস করা হল প্রেম।

অখণ্ড তুরীয়বোধ অর্থাৎ নিত্য অদ্বৈত বোধই হল পারমার্থিক সত্য। এই সত্য দেশ-কাল-পাত্র, কার্য-কারণ সম্বন্ধ নিরপেক্ষ। এক কথায়, দ্বৈতভাববোধের অতীত, অন্তর-বাহিরশূন্য, সর্ব উপাধি বর্জিত, নাম-রূপাদি ভেদ রহিত, ষড়ভাবশূন্য (ষড়ভাব হল উৎপত্তি, বৃদ্ধি, সাময়িক স্থিতি, পরিণাম, ক্ষয় ও বিনাশ) কেবল সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ভূমা।

ব্যবহারিক সত্য দেহেন্দ্রিয়-মন সহযোগে অনুভূত হয়। প্রাতিভাসিক সত্য বহিরিন্দ্রিয় নিরপেক্ষ, কেবল মনের দ্বারা স্বপ্ন ও সমাধির মাধ্যমে অনুভূত হয়। পারমার্থিক সত্য হল ব্রহ্মাত্মবোধের পরিচয়।

৩। ২। ৮০

পঞ্চম অধ্যায়

২৯১

মানা সম্বন্ধে যেটুকু বলা হয়েছে তা জাগতিক ভাব নিয়ে বলা হয়নি। জাগতিক ভাব নিয়ে বললে হয় প্রহসন। আর অধ্যাত্মবাদে মানা হল একমাত্র অনুভূতি। তোমরা অন্তরে-বাইরে কোন কাজটা নিজেরা কর? মন, প্রাণ, বুদ্ধি, অহংকার—এরা যে যার কাজ করছে। ইন্দ্রিয়বর্গ তাদের কাজ করে যাচ্ছে। তোমরা কেবল ফুটানি কর। মানা কিন্তু ফুটানিতে হয় না। মানুষের ধর্ম হল নিজেরা কিছু করবে না অথচ ফলটা চাই। এটা তো চোরের লক্ষণ। চোর ধরা পড়লে মার খায়।

এক মহাত্মা স্নান করবার উদ্দেশ্যে গুহা থেকে নেমে এলেন গঙ্গার পারে। সেখানে একটি লোক জিলিপি ভাজছিল। সকলেই স্নান করে উঠে জিলিপি খাচ্ছে আর চলে যাচ্ছে। তাই দেখে মহাত্মারও সাধ জাগল জিলিপি খাওয়ার। তিনি আট আনা পয়সা হিসাবে পেট ভরে জিলিপি খেলেন। এটা প্রায় ৬০/৭০ বছর আগেকার ঘটনা।

তিনি খেয়েদেয়ে চলে যাচ্ছিলেন। দোকানি জিলিপির দাম নেওয়ার জন্য তাঁকে ধরল। কিন্তু তিনি তো সাধু মানুষ, তাঁর কাছে এক কৌপীন ছাড়া কোনও সম্বল নেই। তিনি কোথা থেকে দেবেন পয়সা? কিন্তু দোকানি তাঁর কোনও কথাই শুনল না। সে মহাত্মাকে পয়সা না-দিতে পারার জন্য মারতে আরম্ভ করল। সাধু মার খাচ্ছে আর নিজেই বলছেন—শালা! জিলিপি খায়েগা, খা যা। বহুত আচ্ছা। তাঁর পিঠ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এই দেখে অন্যান্য মহাত্মারা দোকানদারকে বাধা দিয়ে বলল—ওঁর পয়সা আমরা দিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তাঁরা চাঁদা তুলে পয়সা দিয়ে দিলেন। আর এদিকে সেই সাধু নিজেই নিজেকে বলছেন—এক দফে খায়া তো ইতনা মার খায়া, দো দফে খায়েগা তো জান চলা যায়েগা।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—একটি ইচ্ছা থেকেই আসে অর্জন, গর্জন ও বর্জন। যোগ্যতা থাকুক আর না-ই থাকুক ইচ্ছা থাকবেই। ইচ্ছাকে কে বাধবে? ইচ্ছা মানুষকে একবার স্বর্গে ওঠায় ও একবার নরকে ফেলে দেয়। ইচ্ছার দাস হয়ে যে চলে, সেই অজ্ঞানবদ্ধ কখনওই মুক্তি লাভ করতে পারে না। ইচ্ছাতেও বিরক্তি আসে, তখন বলে 'আর করব না', কিন্তু আবার করে। এত সত্যের কথা শুনেও তো মনের অখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হবার ইচ্ছা জাগে না।

১১। ৩। ৮০

২৯২

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনার সময় গুরুপ্রদত্ত নামের মহিমা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার বাসে দু'জন সাধু এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় কোনও কার্যোপলক্ষ্যে যাচ্ছিলেন। তাঁদের দেখে বাসের লোকেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল—এঁদের পরিধানে রয়েছে কৌপীন, কিন্তু কী রকম সুন্দর স্বাস্থ্য দেখেছ! অথচ আমরা এত পুষ্টিকর খাবার খাই, ডাক্তারদেরও কত fees দিই তবুও স্বাস্থ্য আর ফেরে না, দিনরাত অসুখবিসুখ লেগেই আছে। একজন মনের ভাব চাপতে না-পেরে সাধুদের জিজ্ঞাসা করেই ফেলল—বাবাজিদের কোন আশ্রমে থাকা হয়?

সাধুদ্বয়—আমরা সর্বাশ্রমের।

প্রশ্ন—কোথায় কোথায় কাজ করতে হয়?

সাধু—সব জায়গাতেই ঘুরতে হয়।

প্রশ্ন—খুব ভাল ভাল জিনিস খাওয়া হয় নিশ্চয়ই। সাধুদ্বয় হাসতে লাগলেন। তাঁদের হাসতে দেখে তারা জ্বলে গেল। একে তাদের অম্বলের জ্বালা, তার উপরে ঈর্ষার জ্বালা!

প্রশ্ন—কী আহার করা হয়?

সাধু—যা জোটে তা-ই খাওয়া হয়। কখনও রুটি আবার কখনও বা তুলসীপাতা ও গঙ্গাজল।

(প্রশ্নকারীদের স্বগতোক্তি—দেখেছিস সাধুরা মিথ্যা কথা বলছে!)

প্রশ্ন—এ সব খেয়ে কি আর তোমাদের এই রকম শরীর হয়? লোকে যে ঘি, দুধ দেয় সেগুলি কোথায় যায়?

সাধু—ঘি, দুধ তো গৃহস্থরা খায়।

প্রশ্ন—তোমাদের স্বাস্থ্য এ রকম কী করে হল?

সাধু—আমরা একটি সালসা খাই।

প্রশ্ন—কে দেয়?

সাধু—সদ্‌গুরু দিয়েছেন আমাদের।

প্রশ্ন—কোন কবিরাজ বানান?

সাধু—সদ্‌গুরুই দেন, এর নাম নামামৃত সালসা।

প্রশ্ন—নামামৃত সালসায় কি এত গুণ আছে?

সাধু—নামামৃত সালসায় গুণ কতখানি তা যে সাধু গুরুকৃপা পেয়েছে সে-ই একমাত্র জানে। গুরুকৃপা যাঁর কাছ থেকে পায় তাঁকে সে মন, প্রাণ, হৃদয় সব সঁপে দেয়। ভজনে নাম, নামী ও নামকারী এই তিনের মধ্যে কি ভেদ আছে? অভেদ অনুভূত হলেই নামামৃত সালসার গুণের ফল পাওয়া যায়। কিন্তু সব কিছুরই সময় ও মাপ ঠিক করা আছে।

গল্পটি শেষ করে ভক্তদের উদ্দেশ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—'মেনে, মানিয়ে চলা'-র কথা তোমাদের বারবার বলা হয়। মানলে মনের আবরণ সরে যায়। তোমাদের চিত্তের এক কোণাতে গুরু যেন ঠাঁই পান। যে চিত্তে দোষত্রুটি থাকে সেই চিত্তে গুরু ঠাঁই পান না। গুরু হলেন সর্বদেবদেবীর প্রতিমূর্তি। গুরু যদি আসন না-পান

তবে কোনও দেবতাই খেলতে পারেন না এবং ঈশ্বরও আসন পান না। তখন অসুর ও অপদেবতা খেলে। তার লক্ষণ প্রকাশ পায় আচরণে।

অনেকে অনুযোগ করে বলে—এতদিন সৎসঙ্গ করে কী লাভ হল? উত্তরে বলা যায়—সৎসঙ্গ করে তার ছাপটা ঠিক মতো অন্তরে পড়েনি। সৎ-এর ছাপ থাকলে তবে তো হবে সৎসঙ্গ। বাজারে গেলেই কি বাজারের থলিটা ভর্তি হয়ে যায়? পায়েসের হাতা সারাদিন পায়েসের বাটিতে ডোবানো থাকলেও পায়েস আস্বাদন করতে পারে না। এই পায়েসের হাতার মতো সৎসঙ্গে থাকলেই কি আর সৎসঙ্গ করা হয়? রসগোল্লার মধ্যে যেমন চিনির রস জড়িয়ে থাকে সেই রকম ঠিক মতো সৎসঙ্গ করা হলে সৎসঙ্গের রস মনের মধ্যে প্রবেশ করে মিশে যায়। এটা হল চিদ্‌রস, অচিৎ নয়। চিদানন্দ না-খেললে নিরানন্দ বা অজ্ঞান খেলে, গুরু সেখানে খেলেন না। কারণ গুরু তো অজ্ঞানে খেলতে পারেন না। গুরু না-খেললে সেখানে ইষ্টও খেলেন না।

এক গুরুমহারাজ 'একে' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) দোষারোপ করে বলেছিলেন—আপনি তো এদের সাধনভজন কিছুই দিলেন না!

তাঁকে বলা হয়েছিল—তোমরা তো সব দিয়েছ, তাতে কী হাল হয়েছে? 'এর' কাছে বীজ ধান নেই। 'এ' তো দেনেওয়ালা মালিক নয়। 'এর' function কিছু নেই, আছে শুধু ষোলো আনা মানা। এই অব্যয় বীজটি সে রেখে দিয়েছে, যা কোনও দিন নষ্ট হয় না। 'এর' কাছে কাল, কাল নয়। জগতের কাছে কাল একটি বিরাট factor—কিন্তু 'এর' কাছে কালের গুরুত্ব নেই। যেখানে অহংকার-অভিমান নেই সেখানে কালের প্রতিক্রিয়াও নেই। সেখানে কাল হল কালাতীত। আগুন যেমন আগুনকে পোড়ায় না, সেখানে কালও কালকে গ্রাস করতে পারে না। মাকে বরণ করলে মায়া গ্রাস করতে পারে না। অহংকার নাশ করতে হলে নিজের দিকে তাকিয়ে দেখতে হয় যে, নিজের তো কোনও যোগ্যতা নেই।

'এ' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) কিছু দাবি করতে পারে না। জগৎকে তাক লাগিয়ে দেবার মতো 'এর' কোনও যোগ্যতা নেই। যা আছে সবই সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের। ফলে মহাশূন্য মহাশূন্যই থেকে যায়।

উপরোক্ত এই কথাগুলি তোমাদের ভিতরে যাতে আসন পায় সেই জন্যই এত বলা। এই কথাগুলিই সাধনার ত্রুটিগুলিকে অজ্ঞাতসারে শোধন করে দেবে, বুঝতে দেবে না। বুঝতে দিলে অহংকার-অভিমান আরও বাড়বে।

১৮। ৩। ৮০

২৯৩

গুরু হলেন স্বানুভবদেব স্বয়ং, শিবরাম, আত্মারাম, আনন্দঘনশ্যাম, সচ্চিদানন্দস্বরূপ, অন্তর্যামী নারায়ণ। এই হল প্রাণারাম। শুধু প্রাণ বা মন বা চিত্ত অথবা অহংকার নয়, গুরুকৃপা ছাড়া মন-প্রাণ-বুদ্ধির কোনও উপায় নেই। তাঁর জীবন তাঁর কাছে সঁপে দেবার ইচ্ছা না-জাগলে তাঁর দর্শন মিলবে কী করে? দর্শন হয় তখনই যখন দেহ-প্রাণ-

মনের সমস্ত বৃত্তিগুলি এক সুরে, ভাবে ও বোধে গতি লাভ করে বা সমত্বে স্থিতিলাভ করে। এই হল আত্মরতি। তখন যা দেখবে, শুনবে ও বুঝবে তার মধ্যে থাকবে শুধু সমরস।

যে গুরুকে ভালবাসে, গুরু যার হৃদয়ে থাকেন তার দুঃখ আত্যন্তিক সুখে এবং অজ্ঞান জ্ঞানে পরিণত হয়। সব কিছু তাঁর হয়ে গেলে সব সহজ হয়ে যায়, নইলে বসে বসে অঙ্ক মেলাতে হয়। দিব্যনয়ন গুরু খুলে না-দিলে প্রতি পদে পদে তাঁর অভিব্যক্তি কী করে দেখা যাবে? তাঁর কাছে একমাত্র নয়ন—বিদ্যারূপে বিশালাক্ষী চিদ্‌ঘন কেবল জ্ঞানমূর্তি।

"নিত্যংশুদ্ধং নিরাভাসং নিরাকারং নিরঞ্জনম্
নিত্যবোধ চিদানন্দং গুরুং ব্রহ্ম নমাম্যহম্।।"

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক ভক্ত একবার তার গুরুমহারাজকে জিজ্ঞাসা করল—তুমি আমাকে কিছু দিলে না তো? গুরু বললেন—তুমি একটু অপেক্ষা কর আমি আসছি। এই বলে গুরু চলে গেলেন। দু-এক ঘণ্টা সময় পার হয়ে গেল—গুরু আর আসেন না। এক দিন, দুই দিন, এক বছর, দুই বছর এই ভাবে সময় পার হয়ে যায়। শিষ্য আর অপেক্ষা করতে পারল না। কাঁদতে কাঁদতে সে অজ্ঞান হয়ে গেল। তখন গুরু এসে তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার সেবা ও শুশ্রূষা করলেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে শিষ্য বলল—কত যুগ যুগান্তর পার হয়ে গেল, এতদিনে তুমি এলে?

গুরু বললেন—এই তো আমি গেলাম আর এলাম।

শিষ্য বলল—গুরু, লক্ষ বছর তোমার কাছে এক মুহূর্ত, এটা আমাদের কবে হবে?

গুরু—যেদিন 'আমারবোধ' ছেড়ে দেবে। চাওয়ায় যে কী সুখ সে কাঙাল জানে। গুরুকে যদি হৃদয়ে বসানো হয় তাহলে আর চাইতে হবে কেন? গুরু তো সর্বব্যাপী।

'সবার মাঝে তুমি হলে
আমার আমি কোথায় থাকে?'

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রতি ঘটে ঘটে বসে আছেন আত্মা স্বয়ং। এই অবিনাশী আত্মা হলেন সদ্‌গুরু স্বয়ং। শুনতে শুনতে প্রথমে ক্লান্তি আসে। তার পরে দেখবে তার কোথায় আদি, কোথায় কেন্দ্র ও কোথায় অন্ত! যতক্ষণ সেই ভাব না-জাগবে শ্রবণধারার প্রয়োজন। শ্রব + ণ—'শ্রবধারা' মানে চিদানন্দধারা! 'ণ' হল মূর্ধা, মূর্ধার স্থান হল সদ্‌গুরুর স্থান। তাঁর বাক্‌ধারা হল চিদানন্দধারা।

নদীতে যখন কেউ স্নান করতে যায় তখন গাড়ু, কলসি প্রভৃতি যার যেমন পাত্র আছে তা-ই নিয়ে যায়। পাত্র না-পেলে কেউ গামছা ভিজিয়ে নিয়ে আসে। যদি হৃদয়ক্ষেত্রে unbiased mind নিয়ে কেউ গুরুবাণী শ্রবণ করে তাহলে গুরু তার কাছে আপনিই ধরা দেবেন।

'আপনার কাছে আপনবোধে আপনি দেয় ধরা
তাঁকে অপরবোধে অন্যবোধে যায় নাহি ধরা।'

১৮। ৫। ৮০

২৯৪

আত্মজ্ঞপুরুষরা রাজনীতির অধিকারী কি না—জনৈক ভক্তের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আত্মজ্ঞপুরুষ হলেন সর্বনীতির অধিকারী। সুতরাং তিনি রাজনীতির অধিকারী তো বটেই, তবে কূটনীতির নয়। রাজনীতি হল শ্রেষ্ঠনীতি। আত্মজ্ঞপুরুষ না-হয়ে শ্রেষ্ঠনীতি পালন করা অর্থাৎ রাজনীতি করা যায় না। একেই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস চাই, না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে।

তোমরা সবাই জান যে গতানুগতিক ভাবে বলা হয় ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই প্রসঙ্গে সচ্চিদানন্দময়ী মা এবার প্রকাশ করলেন ছয় নম্বর ধর্ম। ধর্মের ছয়টি অঙ্গ—মোক্ষের পরে পাঁচ নম্বর হল গুরুবাণী মানা এবং ছয় নম্বর হল আপনবোধ দিয়ে তার ব্যবহার; অর্থাৎ নিজেকে দিয়ে সব কিছুর ব্যবহার। তাহলে সপ্তম ভূমিতে পৌঁছানো যায়। সেখানে বিকার স্পর্শ করে না। এই অনুভূতি না-জাগলে পূর্ণতা লাভ হয় না। যেমন আগুন আগুনকে পোড়ায় না, সেইরূপ 'আত্মার আমি' সব কিছুর কারণ হলেও নিজে বিকৃত হয় না। তাঁ কারণ হয় না—কারণাতীত। বিকার হওয়া মানেই কল্পনা এবং কল্পনাই হল বিকার।

এই প্রসঙ্গটি আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একবার এক শিষ্য গুরুকে প্রশ্ন করল—বন্ধন থেকে মুক্তির উপায় কী?

গুরু—মুক্তি, তা কী বস্তু?

শিষ্য—এই যে চার দিকে দুঃখকষ্ট, এটা তো বন্ধন?

গুরু—কার বন্ধন?

শিষ্য—এই যে আমি ভোগ করছি।

গুরু—কে পায় দুঃখকষ্ট?

এইরকম ভাবে গুরুর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে শিষ্য একসময় আর কোনও কথা বলতে পারল না। তারপর সে গুরুকে বলল—এবার আপনি বলুন।

গুরু—তোমার বলা শেষ না-হবার আগে যদি আমি বলি তবে তুমি চুরি করবে। গুরুবাণী তোমার প্রথম গ্রহণযোগ্য, যা তোমার আগে ছিল না।

যে মুক্তির কথা চিন্তা করে সে আত্মা নয়। তুমি স্বরূপত আত্মা। এই প্রশ্ন আত্মার নয়। কাজেই তুমি disqualified, জগতের অন্তর্গত সব প্রশ্নই বৃথা।

গল্পটি শেষ করে ভক্তদের উদ্দেশ্য করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বন্ধনের কথা কে বলে? যে বন্ধন ও আত্মার কথা চিন্তা করে সে আত্মা নয়। আত্মাতিরিক্ত যে, তার তো সত্য অস্তিত্বই নেই। সুতরাং তার প্রশ্নও নেই। এখন প্রশ্ন হল, আমরা যে কথা বলি তা কি আত্মার কথা না অনাত্মার কথা?

জনৈক ভক্ত—দেহের কথা।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—ওটা তো real নয়, ভাসমান।

ভক্ত—তবুও কথাগুলি প্রচলিত কেন?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—একটা false idea থেকে মানুষ বলে।

ভক্ত—দেহের থেকে বলে?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—মনের অন্তর্গত হল দেহ।

ভক্ত—মনের কি পৃথক অস্তিত্ব আছে?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—যতক্ষণ আলোচনা আছে ততক্ষণ মনের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। কী দিয়ে প্রমাণ করবে যে নেই? কেবলমাত্র গুরুবাণী দিয়ে পারবে। নিজেদের চেষ্টা বা আলোচনা দিয়ে পারবে না।

ভক্ত—আত্মাই যদি সব হয় তবে আর তো কিছু নেই।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—হ্যাঁ ঠিক তাই, সব কল্পনা।

ভক্ত—কল্পনা কে তৈরি করে?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—এতদিন তো এটা করেই এসেছ। আগে সত্যবাক্‌কে নাও, আগে light নাও। সেই light দিয়ে কল্পনাকে নাশ কর। প্রশ্ন করলে convention-এর মধ্যে পড়ে যাবে।

ভক্ত—এই ইচ্ছা জাগে কেন?

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—সাগরে যেমন বুদ্‌বুদ্ ওঠে, মনে সেরকম ভুরভুরি উঠবেই। মন manyness তৈরি করে। Oneness হল real, manyness-এর দিকে সবাই যায়। এটাই হল মনের ধর্ম। কথা কে বলে? মন না আত্মা?

ভক্ত—কথা মনই বলে।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর—সেই মন তৈরি করতে হবে, যে গুরুবাণী গ্রহণ করে তা অনুসরণ করতে পারে।

২৪। ৬। ৮০

২৯৫

সদ্‌গুরুর সঙ্গ সকলে সমান ভাবে পায় না আবার যারা পায় তাদের মধ্যেও সবার উন্নতি ও সিদ্ধি সমান ভাবে হয় না। গুরুশক্তি তো অমোঘ, তা গুরুসঙ্গ থেকেই পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তার ফলসিদ্ধির জন্য বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক সিদ্ধ গুরুর সাথে তাঁর এক নিষ্ঠাবান সেবক বা চেলা বেশ কিছুদিন একসঙ্গে ছিল। সেবক সেবা দ্বারা গুরুর কৃপালাভ করার জন্য সবসময়ই সচেষ্ট থাকত। তার শাস্ত্রজ্ঞান বিশেষ ছিল না সত্য, কিন্তু গুরুসেবায় খুব নিষ্ঠা ছিল। তার সেবায় গুরু খুব তুষ্ট ছিলেন। গুরু যখন যেখানে যেতেন সেবকটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

একবার এক জায়গায় তিনি সেবকটিকে সাথে নিয়ে গেলেন। সেখানে এক বিশেষ দেববিগ্রহের সামনে বসে গুরুদেব জপ-ধ্যান-পূজা করছিলেন। তার পরে বিগ্রহের গলায় মালা পরাতে গিয়ে হঠাৎ মালা হাতে নিয়ে স্থির হয়ে গেলেন। বিগ্রহের গলায় আর মালা পরানো হল না। বেশ কিছুক্ষণ এই ভাবেই কেটে গেল। সেবকটি নিষ্পলক

দৃষ্টিতে গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে বসেছিল। কিছুকাল পরে সে গুরুদেবকে উদ্দেশ করে বলল—গুরুদেব এবার আপনি মালাটি পরিয়ে দিন। যে কাজে আপনি গিয়েছিলেন তা তো শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার মালাটি বিগ্রহের গলায় পরিয়ে দিন।

সেবকের মুখে এই কথা শুনে গুরুদেব একটু বিস্মিত হলেন। কারণ তিনি এই মালাটি বিগ্রহের গলায় পরাবার পূর্বক্ষণেই অন্তর্দৃষ্টিবলে তাঁর এক প্রিয় শিষ্যকে বিপদ হতে রক্ষা করার জন্য সূক্ষ্ম দেহে তার বাড়িতে উপস্থিত হন। শিষ্যটির গায়ে আগুন লেগেছিল। তিনি সূক্ষ্ম দেহে উপস্থিত হয়ে অগ্নিদাহ হতে শিষ্যটিকে রক্ষা করেন। তাঁর এই সূক্ষ্ম কাজের সাক্ষী এই অজ্ঞানী সেবক কী করে হল, তা ভেবেই তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন।

গুরুদেব বিগ্রহের গলায় মালাটি পরিয়ে দিলেন। তার পরে সেবককে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন—তুই কী করে জানলি যে আমি বিশেষ কাজে অন্যত্র গিয়েছিলাম।

তখন সেবকটি খুব শান্ত ও বিনীত ভাবে বলল—আপনার বিশেষ শরণাগত অমুক ভক্তের কাপড়ে অসতর্কতাবশত আগুন লেগে যায়। তার অবস্থা খুবই সঙ্গিন হয়েছিল। আপনি অন্তর্দৃষ্টিতে ক্ষণিকের মধ্যে তা দেখে ও জেনে সূক্ষ্ম দেহে সেখানে গিয়ে তাকে উদ্ধার করেন। দীর্ঘকাল আপনার কৃপায় আপনার সেবা করেছে এই অধম সেবক। তার প্রতি আপনি প্রীত হয়েছেন বলেই সে নিষ্ঠা সহকারে সতত আপনার প্রতি দৃষ্টি রেখে চলার অভ্যাস করে এসেছে। সেই অভ্যাসের ফলে স্থূল দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সব সময় আপনার সেবা করার সুযোগ পেয়ে যথাসাধ্য তা সুসম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। আপনার কৃপায় আপনার সূক্ষ্ম দেহের সাথে চলবার যোগ্যতাও হয়েছে এই সেবকের, যাতে আপনার সূক্ষ্ম দেহেরও সেবা করতে পারে। সেই জন্য আপনার কৃপাতেই আপনার সূক্ষ্ম দেহের সাথে সাথে সেখানে আমার যাবার সুযোগ হয়েছিল। আপনার সেখানকার কাজ শেষ হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে যখন আপনি চলে এলেন তখনও আপনার মনে সেখানকার স্মৃতি যুক্ত ছিল। তাই এখানে বিগ্রহের গলায় মালাটি আপনি পরাতে ভুলে গিয়েছিলেন। সেই জন্য আপনার কৃপা ভরসা করেই আপনাকে বিগ্রহের গলায় মালা পরাবার কথা বলেছিলাম। আমার অপরাধ নেবেন না গুরুদেব। আমি আপনার চরণাশ্রিত শরণাগত ভক্ত। কৃপা করে আপনি চরণে স্থান দিয়েছেন। দয়া করে আপনার সেবার কাজ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।

সেবকের মুখের দিকে তাকিয়ে গুরুদেব দেখলেন তার দু'নয়নে প্রেমাশ্রুধারা বইছে এবং মুখে দিব্যজ্যোতি ফুটে উঠেছে। সেবকের কথা শুনে তিনি হৃষ্ট চিত্তে তার দিকে এগিয়ে এসে মাথায় হাত রেখে বললেন—তোর জীবন সার্থক।

মস্তকে গুরুর স্পর্শ পেয়ে সেবক গুরুপদে লুটিয়ে পড়ে। গুরু তাকে তুলে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—তুই শুধু গুরুসেবা দ্বারাই পরমসিদ্ধি লাভ করেছিস। আজ থেকে আমি তো আর তোর সেবা নিতে পারব না। আত্মগুরুর কৃপায় তোর অন্তরের মল বিদূরিত হয়েছে। তোর দিব্যনয়ন খুলে গিয়েছে। এখন তুই অপরকে কৃপা করার যোগ্য হয়েছিস। আমার সমগ্র শক্তির যোগ্য অধিকারী তুই হয়েছিস। সার্থক আমার জীবনসাধনা। সার্থক তোর গুরুসেবা।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কেবলমাত্র নিষ্ঠা সহকারে গুরুসেবার ফলে একজন শাস্ত্রজ্ঞানহীন সাধারণ ব্যক্তি কী করে সদ্‌গুরুর কৃপাগুণে আত্মগুরুর পূর্ণ অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারই পূর্ণ আলেখ্য হল এই গল্পটি।

ঈশ্বরের শরণাগত ভক্ত নিরন্তর গুরুসেবা ও ইষ্টচিন্তার মাধ্যমে দিব্যজীবন লাভ করে। এইরূপ জীবন্ত উদাহরণ খুব কম দেখা যায়। অপরের পক্ষে তা শিক্ষাপ্রদ ও প্রেরণামূলক। অতি দুর্লভ এইরূপ শুদ্ধসাত্ত্বিক ভক্তের জীবন। ভক্তিসাধনার সর্বোত্তম অবলম্বনই হল অন্তরের ব্যাকুলতা ও নিষ্ঠা।

(স্বজ্ঞানুগ্রহসুধা ২য় খণ্ড হতে গৃহীত)

২৯৬

গুরুকৃপা লাভের যোগ্যতা প্রসঙ্গে একটি কাহিনি বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক গুরুর কাছে একবার গ্রামের দু'জন গরিব লোক দীক্ষাগ্রহণের জন্য আসে। দু'জন দুই গ্রামে বাস করত, কিন্তু তাদের সঙ্গে উভয়ের জানাশোনা ছিল। একজনের অবস্থা মোটামুটি চলনসই এবং আরেকজন খুবই গরিব। গুরুদেবকে প্রণাম করে তারা তাদের মনের অভিলাষ জানায়। গুরুদেব দু-এক দিনের মধ্যে বিশেষ কাজে অন্যত্র যাবেন বলে তাদের পরে দেখা করতে বললেন এবং তাদের দীক্ষার ব্যবস্থা পরে করবেন সে কথাও তিনি জানালেন। কিন্তু লোক দু'টি বিশেষ ভাবে গুরুদেবকে অনুরোধ করে বলে—আপনি যাবার আগে আমাদের দীক্ষা দিয়ে যান। আমাদের মন দীক্ষার জন্য বিশেষ ভাবে ব্যাকুল হয়েছে।

তাদের কথাবার্তা শুনে গুরুদেব তাদের যোগ্যতা পরীক্ষা করার জন্য একটি ব্যবস্থা করলেন। তিনি দু'জনকে দু'টি আস্ত গম দিয়ে বললেন—এই দু'টি গম তোমাদের কাছে রাখ। আমি বিশেষ কাজে অন্যত্র যাচ্ছি। ফিরে এলে আমাকে এই দু'টি তোমরা ফিরিয়ে দেবে। তখন দীক্ষা দেওয়া হবে। এই দু'টি নষ্ট হয়ে গেলে কিন্তু আমি দীক্ষা দেব না।

গম দু'টি পেয়ে দুই বন্ধু গুরুকে প্রণাম করে বাড়ি ফিরে যায়। তাদের মধ্যে যার অবস্থা একটু ভাল ছিল সে ভাবল, গমটি হারিয়ে যেতে পারে, পাখি বা পোকামাকড় খেয়ে যেতে পারে, তাহলে তো মুস্কিল হবে কারণ গমটি আবার গুরুদেবকে ফিরিয়ে দিতে হবে, নইলে গুরুদেব দীক্ষা দেবেন না। সে গমটি কাপড়ে জড়িয়ে যত্ন করে একটি কৌটোয় ভরে রেখে দিল।

দ্বিতীয় লোকটি খুবই গরিব। সে ভাবল, মুস্কিল হল! গুরু তো এটা দিয়ে গেলেন কিন্তু কী ভাবে রাখব? যদি কোনও কারণে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো দীক্ষা নেওয়াই হবে না। কোথায় রাখব? কৌটোয় ভরে রাখলে তো পোকায় খেয়ে ফেলবে! অনেক ভেবেচিন্তে সে একটি মাটির পাত্রে মাটি ভরে তার মধ্যে গমের দানাটি পুঁতে রাখল। প্রতিদিনই সে নজর রাখে যাতে পোকা বা পাখি না-খায়। প্রতিদিন সে একটু একটু করে তাতে জল দিতে থাকে।

কিছুদিন পরে সে দেখল বীজ থেকে গাছ বেরিয়েছে এবং তাতে গমও হয়েছে। গমগুলি নষ্ট হয়ে যাবে মনে করে সেই গমগুলি আরেকটি বড় পাত্রে আরও মাটি ভরে সযত্নে পুঁতে দিল এবং যথানিয়মে যত্ন করতে লাগল। এবার অনেক বেশি গাছ হল এবং অনেক গম হল। এদিকে গুরুদেব তখনও ফিরে আসেননি। নূতন গমগুলি নষ্ট হয়ে যাবে মনে করে এবার আরও একটি বড় পাত্রে নূতন করে গমগুলি পুঁতে রাখল। কিছুদিন পরে সেগুলি থেকেও অনেক গাছ হয় এবং আরও বেশি গম হয়। ক্রমশ গমের পরিমাণ এত বেড়ে গেল যে, মাটির পাত্রে না-পুঁতে ঘরের পাশে এক খণ্ড জমিতে সেগুলি পুঁতে রাখল, ফলে আরও বেশি গম হল। এই ভাবে গম হয় এবং সেগুলি সে জমিতে পুঁতে রাখে। ক্রমশ গমের পরিমাণ এত বেশি হতে থাকে যে, সে কিছু কিছু বিক্রিও করতে শুরু করে। এই ভাবে তার নিজের আহারের সমস্যাও মিটে গেল এবং সে বাড়িতে বসে গমের চাষ করতে লাগল। অল্প জমিতে আর কুলায় না, অনেক জমির প্রয়োজন। সে জমি কিনে বড় রকম ভাবে গমের চাষ শুরু করে দেয়। লোকটি গম আর জমিয়ে রাখে না, অনবরত গমের চাষ করে। এই ভাবে প্রচুর ফসল উৎপন্ন হল।

এদিকে অনেকদিন হয়ে গেল কিন্তু গুরুদেব আর ফিরে আসেন না। লোকটি গম বিক্রি করে বাড়িঘর বানিয়ে ফেলল। তার নিজের অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হল।

প্রায় চার-পাঁচ বছর পরে গুরুদেব ফিরে এলেন। ফিরে এসে তিনি লোক দু'টিকে ডেকে পাঠালেন। প্রথম লোকটি কৌটো বার করে দেখে যে, তার গমের বীজটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

দ্বিতীয় লোকটি গুরুদেবকে বলল—আপনার দেওয়া গমের বীজটি যত্ন করে রাখতে গিয়ে সারাদিনই আমাকে এর পিছনে পরিশ্রম করতে হয়েছে। আর কোনও দিকেই আমার দৃষ্টি দেবার অবসর ছিল না। সেই গম থেকে চাষ করে লোকটি যে সম্পদ লাভ করেছে তা গুরুকে দেখায়। সে ধামা ভরে ভরে যে গম রেখেছিল তাও গুরুকে দেখায়।

গুরু বললেন—তুই যে বীজমন্ত্র রক্ষা করতে পারবি সেটাই বুঝলাম। আয় তোকে আমি এক্ষুনি দীক্ষা দেব। এখানেই দু'জনের পরীক্ষা হয়ে গেল। তিনি প্রথম লোকটিকে বললেন—দেখ, সামান্য জিনিস এটাকেও তুই নষ্ট করে দিলি, আর এই লোকটি একটি দানা থেকেই অবস্থা কী রকম পাল্টে ফেলেছে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—সত্যি সত্যি গুরুদত্ত বীজ ব্যবহার করার জন্য ক'জন তৈরি হয়? তাই তো এই প্রসঙ্গে দু-একটি গানে বলা হয়েছিল—

(১) ও মন চাষিরে! তোর দেহক্ষেত্র আবাদ ভূমি
তুমি চষতে শিখলে না তুমি চষতে শিখলে না।।
(কর্ম ও সাধন তত্ত্ব, গান নং ২০, *স্বানুভবসুধা* ২য় খণ্ড)

(২) মানব দেহ জমি উর্বরা ভূমি ফেলে কেন রাখ আর
ফসল ফলাও ফলাও ফসল ফসল ফলাও এবার।।
(কর্ম ও সাধন তত্ত্ব, গান নং ২১, *স্বানুভবসুধা* ২য় খণ্ড)

সাধক রামপ্রসাদেরও এই প্রসঙ্গে একটি গান আছে—

"মন রে কৃষি কাজ জান না
এমন মানবজমিন (জীবন) রইল পতিত
আবাদ করলে ফলত সোনা।"

মানুষ সব কাজ করতে পারে, কিন্তু ভগবানের নাম করতে বললেই কত অজুহাত দেখায়। ভগবান সকলের হৃদয়ে লুকিয়ে আছেন। তাঁকে আদর করে চাষ করে বার করতে হয়।

(*স্বজ্ঞানুগ্রহসুধা* ২য় খণ্ড হতে গৃহীত)

২৯৭

ভক্তকে ভগবান কী ভাবে কৃপা করেন সেই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে।

একবার ভগবান স্বর্গের দেবদেবীদের বলে দিলেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় ভক্তদের পুরস্কার দেবেন। সুতরাং দেবদেবীরা যেন ভক্তদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছে দেন এবং ভগবানের সঙ্গে তাদের মিলিত হওয়ার জন্য যথাযথ আয়োজন করেন—এই আদেশ দিলেন।

পরমেশ্বরের নির্দেশ পেয়ে দেবদেবীরা স্বর্গ-মর্ত-পাতালে সব ভক্তদের কাছে এই সংবাদটি পৌঁছে দেন। নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট দিনে, ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে সকল ভক্তরা এসে উপস্থিত হয় ভগবানের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য।

অন্তর্যামী ভগবান তাঁর প্রিয় ভক্তদের অন্তরের বাসনা পূরণ করেন। তাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে যোগ্যতা অনুসারে প্রত্যেককেই দুর্লভ দিব্য পুরস্কার দানে সন্তুষ্ট করেন। ভগবানের কাছ থেকে দুর্লভ দিব্য পুরস্কার লাভ করে সবাই প্রীত মনে ভগবানের জয়-গান গাইতে গাইতে একে একে চলে যায়। তারপর ভগবানও বিশ্রাম করার জন্য তাঁর ধামে চলে যান। দেবতারাও যথাবিধি তাঁদের কর্তব্য সমাপন করে আপন আপন স্থানে চলে যান।

ইতিমধ্যে সেই নির্দিষ্ট স্থানে এক বিশেষ তত্ত্বজ্ঞ ভক্ত এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু তখন পুরস্কার বিতরণ করা শেষ হয়ে গিয়েছে এবং সবাই চলেও গিয়েছে। ভক্তটি দ্বারের কাছে কারওকে দেখতে না-পেয়ে ভগবানকে স্মরণ করতে থাকে। অন্তর্যামী ভগবান তা জানতে পেরে এক দ্বারীকে পাঠিয়ে দেন দ্বারের কাছে। তিনি এসে আগন্তুককে দেখে তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

উত্তরে সে বলে—ভগবান পুরস্কার দেবেন বলে সর্বত্র ঘোষণা করেছেন। তাই তাঁকে দর্শন করার জন্য এসেছি।

এই কথা শুনে সেই দ্বারীরূপী দেবতা তাকে জানান যে, পুরস্কার বিতরণ শেষ হয়ে গিয়েছে এবং ভগবান এখন বিশ্রাম করছেন, সুতরাং তাঁর সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দ্বারীর মুখে এই কথা শুনে ভক্তটি ঈশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে যখন ফিরে যাবার জন্য তৈরি, তখনই আরেকজন দেবতা এসে তাকে ভগবানের কাছে নিয়ে যান। ভক্তটি হাত জোড় করে ভগবানকে প্রণাম করে স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

ভগবান তাকে বললেন—পুরস্কার দেওয়া তো শেষ হয়ে গিয়েছে, তুমি এত দেরি করে এলে কেন?

বিনীত ভাবে সেই ভক্ত বলল—প্রভু, আমি সাধনায় রত ছিলাম, তাই খেয়াল ছিল না। খেয়াল হওয়া মাত্রই ছুটে এসেছি আপনার দর্শন ও কৃপা লাভের জন্য।

ভগবান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কিসের সাধনা করছিলে?

ভক্তটি তখন হাত জোড় করে বলল—আপনার তত্ত্বস্বরূপের ধ্যানে রত ছিলাম।

তার কথা শুনে ভগবানের হৃদয় করুণায় বিগলিত হল। তিনি সজলনয়নে বললেন—তুমি আমার উত্তম প্রিয় ভক্ত, কিন্তু আমি তো সব কিছুই বিলিয়ে দিয়েছি। এখন তো আমার আর কিছুই দেবার নেই।

এই কথা শুনে ভক্তটি অধিকতর বিনীত ভাবে ভগবানকে বলল—প্রভু, আপনি বিব্রত হবেন না। আপনার দর্শন ও কৃপা পেয়েছি, তাতেই আমি ধন্য। আমি কোনও পুরস্কারের আশা নিয়ে আসিনি। আমি এখন যাই।

ভগবান তার কথা শুনে বললেন—তুমি এখন গিয়ে কী করবে?

ভক্তটি বলল—কেন পূর্বের মতো আপনার তত্ত্বস্বরূপের ধ্যানে মগ্ন হয়ে থাকব।

উত্তম জ্ঞানী ও প্রেমিক ভক্তের এই কথা শুনে ভগবান খুবই প্রীত হয়ে বললেন—তোমার মতো যোগ্য উত্তম ভক্তকে কোনও মতেই আমি বিমুখ হয়ে যেতে দিতে পারি না। আমার ঐশ্বর্য সম্পদ সবই আমি বিলিয়ে দিয়েছি এবং তোমাকে দেবার মতো আর কিছুই নেই সত্য, তথাপি আমার ভক্তকে আমি সব সময়ই নিজ অপেক্ষা অধিক ভালবাসি বলে আমি নিজেকেই তোমাকে দিয়ে দিলাম। তোমার হৃদয়ে আমি সব সময় থাকব। কখনওই তোমার দৃষ্টির আড়াল হব না।

ভক্তটি ভক্তির আতিশয্যে গদগদ ভাবে ভগবানকে প্রণাম জানাল। ভগবান তাকে বুকে টেনে নিলেন। এই ভাবেই সেই ভক্ত ভগবানের সঙ্গে সাযুজ্যযোগে যুক্ত হল।

কিছুক্ষণ পরে দ্বারে এক ভাস্কর ভক্ত এসে উপস্থিত হল। পূর্বজনের মতো দ্বারীর প্রশ্নের উত্তরে সেও বলল যে, ভগবানকে দর্শন করতে ও পুরস্কার পাবার জন্য সে এসেছে। দ্বারী তাকে জানালেন যে, ভগবানের দর্শন দান ও পুরস্কার বিতরণ পর্ব অনেক আগেই শেষ হয়েছে। এখন তিনি বিশ্রাম করছেন, সুতরাং তাঁর দর্শন আর পাওয়া যাবে না।

অলক্ষ্যে ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ভক্ত ফিরে যাবার উপক্রম করতেই সেই মুহূর্তে অন্তর্যামী ভগবান এক দেবতাকে পাঠিয়ে ভক্তকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠালেন। তাকে তিনি তার আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং তার উত্তর শুনে বিলম্ব হওয়ার কারণও জিজ্ঞাসা করলেন।

ভক্তটি উত্তরে জানাল যে, প্রভুর মন্দিরে তাঁর পাথরের মূর্তি নির্মাণের কাজে সে মগ্ন থাকাতে তার সময়ের খেয়াল ছিল না। সেই জন্যই সে যথাসময়ে আসতে পারেনি।

তার কথা শুনে ভগবান বললেন—আমি তো আমার সমস্ত ঐশ্বর্য ভক্তদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছি। এখন তো তোমাকে দেবার মতো কিছুই আমার নেই। অথচ তুমি

আমার ভক্ত এবং তুমি আমার কাজেই রত ছিলে। তুমি তো পুরস্কার পাবার যোগ্য, তবে এখন আমি কী করব?

প্রভুর কথা শুনে ভক্তটি খুব বিব্রত বোধ করে বিনীত ভাবে বলল—আপনার কৃপায় আপনার দর্শন পেয়েছি, তাতেই আমি ধন্য। পুরস্কার না-পাওয়াতে কোনও দুঃখই আমার নেই। এই বলে ভগবানকে প্রণাম করে সে যখন ফিরে আসছিল তখন ভগবান তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি এখন ফিরে গিয়ে কী করবে?

ভক্ত বলল—আপনার মূর্তির অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করব।

ভক্তবৎসল ভগবান ভক্তের অকৃত্রিম ভগবৎ ভক্তি ও তার সাধননিষ্ঠার গুণে অতীব প্রীত হয়ে করুণার্দ্র হৃদয়ে সজলনয়নে প্রণত ভক্তকে আলিঙ্গন করে বললেন—তোমার মতো ঐকান্তিক ভক্তকে আমি কখনও প্রত্যাখ্যান করতে পারি না। তোমাকে দেবার মতো অন্য কিছু না-পেয়ে আমি নিজেকেই দিলাম তোমাকে। তোমার হৃদয়ে আমি সর্বদা প্রত্যক্ষ বিদ্যমান থাকব। এই ভাবে আপন ভক্তকে ভগবান সারূপ্যমুক্তি প্রদান করে কৃপা করলেন।

কিছুক্ষণ পরে এক চিত্রকর ভক্ত এসে দ্বারে উপস্থিত হল। দ্বারী তার আসবার কারণ জেনে পূর্বজনের মতো তাকেও বিদায় করে দিচ্ছিলেন। সেই সময় ভগবানের দূত এসে তাকে ভিতরে নিয়ে যান। ভগবান তার পরিচয় ও আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে জানাল যে, সে চিত্রশিল্পী। ভগবানের লীলা মহিমা চিত্রাঙ্কনে ব্যস্ত ছিল বলে তার সময়ের খেয়াল ছিল না। সেই জন্য সে দুঃখ প্রকাশ করে ভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। তার ব্যবহারে প্রীত হয়ে ভগবান তাকে সালোক্য মুক্তি দানে কৃপা করলেন।

তার পরে আসে এক দার্শনিক কবি ভক্ত। তাকেও ভগবান ডেকে পাঠান এবং তার পরিচয় ও যথাকালে না-আসার কারণ জেনে তাকে সামীপ্যমুক্তি দানে কৃপা করলেন।

সব শেষে আসে ভগবানের নামকীর্তন ও ভজনকারী এক ভক্ত। পূর্বের ভক্তদের মতো তার যথার্থ পরিচয় ও যথাসময়ে না-আসার কারণ জেনে ভগবান তাকে সার্ষ্টিমুক্তি দানে কৃপা করেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন –উপরোক্ত গল্পটির মধ্যে যোগ্য ভক্তের উত্তম গতি লাভের সত্য পরিচয় বিশেষ ভাবে পাওয়া যায়। ভগবৎ মহিমা তত্ত্বের দৃষ্টিতে অতীব জটিল ও দুর্বোধ্য, কিন্তু গল্পটির মাধ্যমে তা কত সরস ও সুবোধ্য করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

(***স্বজ্ঞানুগ্রহসুধা*** ২য় খণ্ড হতে গৃহীত)

২৯৮

বিশ্বাসী ভক্ত খুব সহজ ও সরল স্বভাবের হয়। বিশ্বাসী ভক্ত প্রসঙ্গে একটি সুন্দর কাহিনি বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক ভ্রাম্যমাণ সাধু ঘুরতে ঘুরতে শহরের প্রান্তে চৌরাস্তার মুখ হতে অনতিদূরে এক বড় গাছের নিচে তাঁর আসন পেতে বেশ কিছুদিন অবস্থান করছিলেন। তাঁর স্থান

থেকে অনতিদূরেই গ্রামের বসতি, দোকানপাট, হাটবাজার এবং দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ত লোকসকল চলাফেরা করত। সাধুর আসনটি একটু আড়ালে ছিল। আসনে বসেই তিনি প্রতিদিন দেখতেন কাছেই এক মিষ্টির দোকানে খরিদ্দার এসে মাঝে মাঝে মিষ্টি কিনে নিয়ে যায়। তার দোকানে খুব ভিড় না-হলেও মোটামুটি রোজই কিছু কিছু খরিদ্দার এসে মিষ্টি কিনত। এ ছাড়াও সাধুটি দেখত যে, প্রতিদিন সকালে ভাঁড়ে করে এক চাষি দুধ এনে ঐ দোকানে একটি বড় পাত্রের মধ্যে না-মেপে ঢেলে দিয়ে যেত। মধ্যবয়সি সেই দোকানি তার থলে থেকে না-গুনেই মুঠো করে কিছু পয়সা দিয়ে দিত দুধের দাম হিসেবে। প্রতিদিনই সাধু এই ব্যাপারটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতেন এবং অবাক হয়ে ভাবতেন যে, এরা দু'জনেই ব্যবসা করে অথচ ব্যবসার নিয়ম মানে না কেন? অর্থাৎ ময়রাও দুধ মেপে নেয় না এবং চাষিও দুধ মেপে দেয় না। আবার ময়রাও পয়সা গুনে দেয় না এবং চাষিও পয়সা গুনে নেয় না। প্রতিদিন এই ব্যাপার লক্ষ্য করে সাধুর মনে এক বিস্ময় জাগে যে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য আছে। নতুবা সংসারী মানুষ সাধারণত বিষয়ী, তারা পেটের দায়ে ব্যবসা করে এবং মেহনত করে পয়সা রোজগার করে সংসার চালায়। কিন্তু এই ময়রা ও চাষির ব্যবসার মধ্যে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করে সে বিস্মিত হয়।

সেই সাধু একদিন ঘুরতে ঘুরতে সেই ময়রার কাছে উপস্থিত হল। ময়রা সাধুটিকে দু'টি মিষ্টি হাতে দিয়ে তার গদিতে বসায় এবং বিনীত ভাবে বলে—আপনি তো সাধু মানুষ আর আমরা গরিব সংসারী। কী ভাবেই বা আপনার সেবা করব? সুতরাং এই দু'টি মিষ্টি আপনি গ্রহণ করুন। আশীর্বাদ করবেন আমাদের যেন ঈশ্বরে ভক্তি হয়।

ময়রার ব্যবহারে সাধুটি প্রীত হয়ে বললেন—তোমার দোকানে যে-সমস্ত খাবার আছে তার কতটা প্রতিদিন বিক্রি হয় এবং কতটা তোমার লাভ হয়? তাতে তোমার সংসার কেমন চলে? তোমার অন্য কোনও রোজগারের বা উপার্জনের ব্যবস্থা আছে কি?

সাধুর কথা শুনে ময়রা খুব বিনীত ভাবে বলল—সাধুজি, আমার আটজনের পরিবার। বৃদ্ধ বাবা-মা, আমরা স্বামী-স্ত্রী, এক বিধবা বোন ও অন্ধ ভাই এবং আমার দু'টি সন্তান। ভগবানের দয়ায় কোনও রকমে পেটের ভাত এই দোকানের আয় থেকেই আমাদের জুটে যায়। জমিজমা কিছু নেই। এই দোকানের আয় আমাদের সম্বল।

ময়রার কথা শুনে সাধু অবাক হয়ে ভাবলেন, সারাদিন তার যা বিক্রি হয় তা তো মোটামুটি তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন। যাই হোক, এর পরেই আসল কথা সাধু ময়রাকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেখ, প্রতিদিনই আমি গাছের তলায় আমার আসনে বসে দেখি চাষি তোমাকে দুধ দিয়ে যায় না-মেপে এবং তুমি নিজেও তা মেপে নাও না। কতটা দুধ দিল তা আন্দাজে কী করে অনুমান কর? আবার দুধের দাম হিসেবে তুমি মুঠো ভরে পয়সা দিয়ে দাও না-গুনেই এবং সেও পয়সা গুনে নেয় না। প্রতিদিনের দুধ মাপে কম-বেশি হয় কি না এবং দামেও কম-বেশি হয় কি না এর কোনও হিসাবই তোমরা কেউ রাখ না। তোমরা কী করে এই ভাবে ব্যবসা কর?

সাধুর কথা শুনে ময়রা বিস্মিত হয়ে বলল—সাধুজি, আপনার এই প্রশ্ন করার কারণ আমি বুঝতে পারছি না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে যে কারবার তা সহজ সরল

বিশ্বাসের কারবার, হিসাবনিকাশের কারবার নয়। আমি বিশ্বাস করি যে, সে আমাকে দুধের মাপে ঠকাবে না এবং সেও আমাকে বিশ্বাস করে যে, আমি তাকে দামে ঠকাব না। আমাদের পরস্পরের মধ্যে দীর্ঘকাল এই বিশ্বাসের জোরেই কারবার চলছে।

ময়রার সব কথা শুনে সাধুটি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারলেন না যে, এরা দু'জনে কেউ কারওকে ঠকায় না। সাধু তাকে বললেন—সব দিন তো সে দুধ তোমাকে সমান দেয় না এবং তুমিও সব দিন তাকে সমান পয়সা দাও না। কম-বেশি তো হতেই পারে।

ময়রা হেসে বলল—হ্যাঁ, কম-বেশি হতে পারে সত্য, কিন্তু গড়ে কম-বেশি হয় না। কারণ আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাসের বাঁধুনি খুব দৃঢ়, কেউ মতলবি নই। কারওকে ঠকাবার ইচ্ছা বা চেষ্টা কারও মনে কখনওই জাগে না। সেই জন্য কোনও দিন কম দুধ দিয়েও সে বেশি পয়সা নিয়ে যায় আবার কোনও দিন বেশি দুধ দিয়েও কম পয়সা নিয়ে যায়। গড়ে আমাদের কারওরই লোকসান হয় না। আমাদের মধ্যে শান্তি ও সদিচ্ছা বজায় আছে ঈশ্বরের দয়ায় এবং আপনাদের মতো সাধুসন্তদের কৃপায় ভালই আছি। ময়রার মুখে এই কথা শুনে সাধু চুপ করে সেদিন চলে গেলেন। কয়েকদিন পরে তিনি রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, সেই সময় পথে ময়রার দোকানের দুধের ব্যাপারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তিনি ময়রাকে যেমন প্রশ্ন করেছিলেন তাকেও সেই রকমই প্রশ্ন করলেন।

ময়রা যেমন ভাবে উত্তর দিয়েছিল সেই দুধওয়ালাও ঠিক একই রকম ভাবে সাধুকে বলল—আমাদের পরস্পরের মধ্যে আপনজনের সম্পর্ক। বিশ্বাসের ভিত্তিতেই আমরা কারবার করি। আমরা কেউ কারওকে ঠকাই না। গড়ে আমাদের কোনও লোকসান হয় না। ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের দিন চলে যায়। আমাদের বেশি লোভও নেই, বেশি চাহিদাও নেই। যে-ভাবে ঈশ্বর রেখেছেন আমরা তাতেই তুষ্ট, গতরে খেটে খাই। কারও কোনও নিন্দা করি না, সমালোচনা করি না, কারওকে দুঃখও দিই না, কারও কোনও রকম কষ্টের কারণ সৃষ্টি করি না। পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে আমরা সবাইকে আপনজনের মতোই দেখি এবং সে-ভাবেই মেনে চলি। আমাদের বিশ্বাস ভগবান আমাদের প্রতি বিরূপ হবেন না। তাঁর দয়াতেই তো বেঁচে আছি। তিনি দয়া করে আমাদের জীবন দিয়েছেন, খাটবার শক্তি দিয়েছেন। পরস্পরকে আপনজনের মতো দেখা ও মানার বুদ্ধি দিয়েছেন। আমাদের মতো গরিব মানুষের পক্ষে এর চাইতে বেশি কী আর পাওয়া সম্ভব? তাঁর দয়ায় আমরা এতেই সন্তুষ্ট। ঈশ্বরের দয়া সংসারের চার দিকেই ছড়িয়ে আছে। সংসারে সকলে তাঁর দয়াতেই বেঁচে আছি। আমরা গ্রামের লোক। সকলেই মোটামুটি খেটে খাই। পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকি। পরস্পরের সুখে-দুঃখে পরস্পরকে সাধ্য মতো সেবা করি। এটাই আমাদের সহজ কর্ম ও ধর্ম।

চাষির কথা শুনে সাধু অতি বিস্মিত হয়ে কিছু না-বলেই চলে যান। কিছুদিন পরে আবার তিনি ময়রার দোকানে যান এবং ময়রাকে কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাঁর

প্রশ্নের উত্তরে ময়রা যা বলে সেই কথার সঙ্গে তিনি চাষির কথার হুবহু মিল খুঁজে পান। তার কথা শুনে সাধুর এক অদ্ভুত অনুভূতি হল যে, জীবনের যে কোনও অবস্থা থেকে মানুষ যদি সহজ সরল প্রাকৃতিক নিয়ম ও জীবনের ধর্ম পালন করে তবে ঈশ্বরের দয়া সকলেই লাভ করতে পারে। তিনি দীর্ঘকাল আগে সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বরের তপস্যায় জীবনযাপন করে যে ঈশ্বরীয় অনুভূতি লাভ করেছেন তার চাইতে এই ময়রা ও চাষির অনুভূতি কোনও অংশে হেয় বা ছোট নয়। এই নূতন জায়গায় এসে এই ভাবে সত্যানুভূতির নূতন আলো পেয়ে সাধুটি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং সেখানকার সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সেই আসন ছেড়ে ভগবানের জয়গান গাইতে গাইতে অন্যত্র চলে যান।

পরবর্তীকালে জিজ্ঞাসু ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি তাঁর এই অভিনব অভিজ্ঞতামূলক কাহিনিটি শোনাতেন এবং এর থেকে যথার্থ শিক্ষা তিনি কী ভাবে পেয়েছেন সে কথাও সবাইকে বলতেন।

"বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর"—এই বাক্যের মর্মার্থ সাধুটি বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন ময়রা ও চাষির দৈনন্দিন ব্যবহার বা আচরণ লক্ষ্য করে। সুতরাং জীবনে শান্তি পাবার অন্যতম উপায় হল অখণ্ড বিশ্বাস। কারওকে বিশ্বাস করে ঠকলেও বিশ্বাস ছাড়তে নেই। পরিণামে বিশ্বাসের জয় অবশ্যম্ভাবী। অবিশ্বাস হল অবিদ্যা-অজ্ঞানের কাজ, আসুরিক সম্পদ। কিন্তু বিশ্বাস হল বিদ্যা ও ভক্তির কাজ, দৈবী সম্পদ।

অবিশ্বাসীর সুখশান্তি নেই, মুক্তির তো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু বিশ্বাসী সাময়িক ভাবে কখনও ঠকলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তার পরিণাম শুভ হয়। তার সুখশান্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে মুক্তির অধিকারী হয় সে। তা ঈশ্বরের কৃপার অন্যতম লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য।

(*স্বজ্ঞানুগ্রহসুধা* ২য় খণ্ড হতে গৃহীত)

২৯৯

সাধারণ মানুষ ও অনুভবসিদ্ধ পূর্ণ দিব্য মানবের মধ্যে অনুভূতির যে তারতম্য তা বাইরে থেকে সাধারণত অনেকের পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। তাঁদের বাহ্যিক আচরণের বা ব্যবহারের মধ্যে সেই পূর্ণতার কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়, আবার কারও মধ্যে সে রকম প্রকাশ দেখা যায় না। একটি সাধারণ কাহিনির মাধ্যমে এই তত্ত্বটি সহজ ভাবে বলা হয়েছে।

এক মঠাশ্রমের দু'টি যুবক সন্ন্যাসী খুব দূরে এক জায়গায় যাবার জন্য তৈরি হয়ে চলেছেন। সন্ধেবেলায় তাঁরা এক নদীর তীরে এসে উপস্থিত হলেন। নদীটি পেরিয়ে ওপারে তাঁদের যেতেই হবে। নদীটি খরস্রোতা ছিল। শীতের সন্ধে সুতরাং নদীর পারে কোনও নৌকা বা মাঝিও ছিল না। ওপারে দূরের গাঁ দেখা যায়, এ পারে কোনও লোকজন নেই।

সন্ধের সময় অন্ধকার ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। ওপারে যাবার জন্য কোনও নৌকা না-পেয়ে সন্ন্যাসী দু'জন ঠিক করলেন, সাঁতার কেটেই ওপারে চলে যাবেন। এই ভেবে তাঁরা জলে নামার জন্য তৈরি হলেন। সঙ্গে তাঁদের বিশেষ জিনিসপত্রও ছিল না। তাঁরা যখন জলে নামবেন ঠিক সেই মুহূর্তে পরমা সুন্দরী এক যুবতী মহিলা তাঁদের সামনে এসে বলল যে, বিশেষ প্রয়োজনে তাকে নদীর ওপারে আজ যেতেই হবে অথচ ওপারে যাবার জন্য কোনও নৌকা নেই এবং সে সাঁতারও জানে না। সুতরাং সে নিরুপায় হয়ে খুব বিনীত ভাবে সন্ন্যাসীদের কাছে সাহায্য চাইল।

সন্ন্যাসী দু'জন তো সাঁতরে পার হবার জন্য তৈরিই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে বড় সন্ন্যাসীটির নাম সচ্চিদানন্দ। তিনি উত্তম সাঁতারু ছিলেন। স্বাস্থ্যও তাঁর খুব সুস্থ ও সবল ছিল। তিনি বিনা দ্বিধায় কালবিলম্ব না-করে মহিলাকে বললেন—তুমি যদি আমার বুকের উপরে আমাকে ধরে থাকতে পার তবে আমি তোমাকে সাঁতরে ওপারে পৌঁছে দিতে পারব।

মহিলাটি খুশি মনেই তাতে রাজি হয়ে গেল। তিনজনে তখন একই সঙ্গে জলে নামলেন।

যেমন খরস্রোত তেমনই শীতকালের ঠান্ডা জল। সুতরাং সন্ন্যাসী দু'জনকে স্রোতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই নদীর ওপারে যেতে হল।

মহিলাটি সাঁতার জানত না। সে যতক্ষণ জলে ছিল ততক্ষণ জলের ঠান্ডায় ও ভয়ে সচ্চিদানন্দকে একেবারে বুকে জড়িয়ে ধরে ছিল। অনায়াসেই তাকে নিয়ে সচ্চিদানন্দ নদী পার হয়ে তীরে উঠলেন। অপর সন্ন্যাসীও তাঁর পিছনে পিছনে নদী পার হয়ে তীরে উঠে পড়লেন।

পারে ওঠামাত্র তিনজনেই ঠান্ডায় খুব কাঁপতে থাকেন। ভিজে কাপড়ে তাঁদের শীতও খুব করতে থাকে। তিনজনেরই জামাকাপড় ভিজে দেহের সঙ্গে লেপটে গিয়েছে। তাঁদের তিনজনেরই দেহকান্তি ভিজে কাপড়ের মধ্যে দিয়ে বাইরে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। জল থেকে তীরে উঠে মহিলাটি তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য উভয়ের কাছে গেল এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে উভয়কেই ধন্যবাদ জানাল। এমন অসময়ে তার বিপদকালে এই রকম অভিনব ভাবে নদীটি পার হতে সাহায্য করাতে তার যে উপকার হয়েছে সেই জন্য সচ্চিদানন্দের কাছে এসে তাঁর হাত ধরে চোখের জলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তাঁর হাতে একটি চুম্বন দিল। পরে উভয় সন্ন্যাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে চলে গেল।

সন্ন্যাসী দু'জন শুকনো ডালপালা সংগ্রহ করে আগুন জ্বেলে বসে নিজেরাও গরম হয়ে নিলেন এবং জামাকাপড়ও শুকিয়ে নিলেন। সাথি সন্ন্যাসীটি সচ্চিদানন্দ নামক সন্ন্যাসীকে তখন প্রশ্ন করলেন—তোমার মতো সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী কেমন করে সুন্দরী যুবতী নারীদেহকে আপনবক্ষে এতক্ষণ ঘনিষ্ঠ আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় বরদাস্ত করতে পারল?

উত্তরে সচ্চিদানন্দ বললেন—তুমি কি সেই ঘটনা এখনও মনে করে রেখেছ? সেই প্রসঙ্গ তো আমার মনে কোনও ছাপ ফেলেনি। সে অসহায় হয়ে সাহায্য চেয়েছিল

এবং আমি তাকে সাহায্য করেছি। এ বিষয়ে তো আর বেশি কিছু বলবার নেই। ঘটনাও শেষ হয়ে গিয়েছে এবং আমার মনের থেকেও তা চলে গিয়েছে। তুমি এখনও এই নিয়ে ভাবছ?

গল্পটি এখানেই শেষ, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

দু'জনেই মঠবাসী যুবক সন্ন্যাসী। তাঁদের মনের অবস্থা সন্ন্যাস আশ্রমের জীবনযাত্রা ও কঠোর নিয়মশৃঙ্খলায় বাঁধা। তাঁদের সংযম, ব্রহ্মচর্য প্রভৃতি নৈতিক উন্নত মানের শৃঙ্খলা ও আদর্শ গৃহস্থদের কাছে শ্রদ্ধার কারণ। খুব কঠোর নিয়মের অধীনে না-চললে সন্ন্যাসীর ধর্ম যথার্থ ভাবে রক্ষা করা সম্ভব হয় না। জাগতিক প্রলোভন, আসক্তি ও মোহ অতিক্রম করার জন্য সন্ন্যাসীদের এই সকল কঠোর নিয়ম পালন করতে হয় এবং তাদের জন্য বিশেষ বিধি-নিয়ম ও নিষেধ আছে। সন্ন্যাসীদের সংযম রক্ষা করা, নৈতিক মানের বিজ্ঞানকে পূর্ণ ভাবে অনুসরণ করা, আজীবন ব্রহ্মচর্য রক্ষা করা, নারীসঙ্গ পরিত্যাগ করা, নারী সহবাস বর্জন করা ইত্যাদি অনেক কঠোর নিয়ম জীবন দিয়েও পালন করতে হয়। সাধুসন্ন্যাসীর জীবন অপরের কাছে অধ্যাত্মদর্শনের চরম। সন্ন্যাসীরা যদি সংযম, ব্রহ্মচর্য ও মানসিক নিয়মনিষ্ঠাকে লঙ্ঘন করেন তাহলে তাঁরা আর যথার্থ সন্ন্যাসী থাকতে পারেন না। সাধু হওয়া কঠিন, কিন্তু সাধুতা রক্ষা করা ততোধিক কঠিন।

অধ্যাত্মজীবনের পক্ষে সাধুত্ব ও সন্ন্যাসীত্ব একটি বিশেষ অবস্থা। এর পূর্ণতা সাধিত হয় তখনই যখন সর্ববিধ নিয়ম সর্বতোভাবে সাধিত হয় এবং জীবনে কারণ-কার্যের ও স্বভাবের সর্ববিধ প্রতিক্রিয়াগুলিকে অতিক্রম করা সম্ভব হয় কারও পক্ষে। তৎপূর্বে কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করে সন্ন্যাসীর ন্যায় জীবনযাপন আরম্ভ করতে পারে এবং সিদ্ধি ও পূর্ণতা লাভের জন্য ঐকান্তিক ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে পারে।

জীবনের পরমশুদ্ধি ও পূর্ণতা হৃদয়ে নিহিত থাকে। সন্ন্যাসীর বাইরের আচরণ দেখে সাধারণের পক্ষে তা বোঝা কঠিন। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি, পূর্ণতা ও অপূর্ণতা হল অন্তর্ভাববোধের বিষয়। সুতরাং সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষকে অপর একজন সিদ্ধ ও মুক্ত পুরুষই অবগত হতে পারেন সম্যক্‌রূপে, সাধারণ মানুষ তা পারে না। অসিদ্ধপুরুষ তো সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু সিদ্ধপুরুষ কদাচিৎ দু-একজন মেলে। আবার সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে অবহিতও নয় এবং আপনার দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য যত্নবানও নয়। সাধারণত অসিদ্ধির লক্ষণ হল সসীমতা, উপাধি, দ্বৈতবোধে ভেদসৃষ্টি ও দোষদৃষ্টি, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি এবং সিদ্ধির লক্ষণ হল এই সকল দোষ থেকে মুক্তি অর্থাৎ এই সকল দোষের একান্ত অভাব। আপনার সত্যস্বরূপ আত্মার জ্ঞান সম্বন্ধে নিরন্তর সচেতন হলেই এই সকল দোষত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব।

সচ্চিদানন্দ নামক সন্ন্যাসীটি আত্মবোধে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সর্ববিকার হতে মুক্ত ছিলেন। আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সাক্ষিমাত্র—এই সত্য তিনি বিশেষ ভাবেই জানতেন। যা-কিছু ঘটে তা মনেরই অন্তর্গত মনের ভাব বিষয়। যখন ভাব বিদূরিত হয় তখন মনের স্মৃতি থেকে সেই ঘটনা লুপ্ত হয় এবং তার গুরুত্ব বা বিশেষত্ব

আর থাকে না। আত্মবোধে জীবভাব থাকে না, সুতরাং জীবের ভেদ বা পার্থক্য জ্ঞান, তার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি এবং দ্বৈত ও নানাত্ব বোধ সাক্ষিচৈতন্যের তত্ত্বে থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় সন্ন্যাসী আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন না, সেইজন্য তিনি ঘটনার ভাবটি সম্পূর্ণরূপে অন্তর থেকে মুছে ফেলতে পারেননি। সংশয়, ভয় এবং প্রতিক্রিয়ার ফল তাঁর মনে স্বাভাবিক ভাবেই জেগে ওঠে। তাঁর নিজস্ব শুভাশুভ ধারণা হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সন্ন্যাসীর কঠোর নিয়ম, বিবেক, বৈরাগ্য ও ত্যাগের প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁর ধারণা সামাজিক ও অধ্যাত্ম ধর্ম ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল, যা পূর্ণতা ও সিদ্ধির পরিপন্থী। মঠের নিয়মকানুন তাকেই সাহায্য করে যে সিদ্ধি ও পূর্ণতা লাভের পথে চলে। তার পক্ষে এ সব লঙ্ঘন করা চলে না।

এখানে পরিষ্কার ভাবেই বোঝা যাচ্ছে অশুদ্ধ ও অপূর্ণ সন্ন্যাসীটি তাঁর সঙ্গী সন্ন্যাসী শুদ্ধ বুদ্ধ পূর্ণ সচ্চিদানন্দকে সমর্থন করতে পারেননি তাঁর বাহ্যিক স্বভাব ও কার্যাদির জন্য।

প্রশ্ন হতে পারে—শুদ্ধ মন বলতে কী বোঝায়? শুদ্ধ মন হল দেশ-কাল, কার্য-কারণের ভাব ও সম্বন্ধ বর্জিত। এই রকম মনই আত্মবোধের সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ করে। তার ফলে তা পরম দিব্য অনুভূতি, আনন্দ ও তার জ্যোতি প্রকাশের মুক্তদ্বাব হয়। তাতে সৎ-চিৎ-আনন্দ-প্রেম অর্থাৎ অদ্বয়তত্ত্ব স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অভিব্যক্ত হয়।

অপরপক্ষে অশুদ্ধ মন বলতে সেই মনকেই বোঝায় যা তমোরজোগুণপ্রধান এবং নিম্ন প্রকৃতির দ্রষ্টা-দৃশ্য ও কর্তা-ভোক্তা ভাবের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তা দেশ-কাল, কার্য-কারণ সম্বন্ধযুক্ত এবং তার ভোগাসক্তি, ফলাকাঙ্ক্ষা, জীবত্ববোধের পার্থক্য, ভ্রান্তধারণা ও পরস্পরের প্রতি ভেদদৃষ্টি থাকে। সত্য আত্মজ্ঞানের পরিবর্তে সংসার মূর্তিকেই সে সত্য বলে বোধ করে। অনিত্য, অদিব্য, অস্থায়ী, মিথ্যা বস্তু লাভ এবং যশ-খ্যাতি লাভের প্রতি তার লালসা থাকে। যার মন-বুদ্ধি শুদ্ধ সে দ্বৈত ও নানাত্ব ভাব হতে মুক্ত এবং সহজেই স্বতঃস্ফূর্ত পূর্ণ ব্রহ্ম-আত্মা অদ্বয়বোধের অধিকারী। অশুদ্ধ মন-বুদ্ধি অসংযত, চঞ্চল, অবিনীত, সংশয়ান্বিত এবং বৈচিত্র্যময় বিকারী সংসারের মধ্যে ঐক্য, সামঞ্জস্য ও সমতা অনুভব করতে অসমর্থ। তার ফলে তাকে অন্তরে-বাইরে জীবনে সব সময়ই প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়। নিজের অসংযত চিন্তা ও কর্মের দুর্ভোগ তাকে ভুগতে হয়। সুসংযত শুদ্ধ অধ্যাত্ম দিব্য মনের সঙ্গে সাধারণ মন ও সাধকের মনের মৌলিক পার্থক্য এখানেই।

দু'জন সন্ন্যাসীর মধ্যে পার্থক্য তাঁদের কথা ও আচরণে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে এই গল্পের মাধ্যমে। তাই খুব সূক্ষ্ম বিচারপূর্বক ও নিপুণ ভাবে বৌদ্ধিক যুক্তির প্রভাবমুক্ত থেকে কেবল স্বানুভবসিদ্ধির দৃষ্টিতে তা ব্যক্ত করা হয়েছে। গল্পটির তাৎপর্য অদ্বয়বোধের দৃষ্টিতে স্বানুভূতির জ্যোতিতে ব্যক্ত করা হয়েছে। গল্পটি বলার উদ্দেশ্যই হল, অদ্বয়জ্ঞান যা সর্বকালে সর্বাবস্থায় পরম দিব্য অমৃতত্বের স্বরূপ তা তিনটি মানব চরিত্রে এবং দুইটি প্রাকৃত বস্তুর সাহায্যে নিখুঁত ভাবে, সুন্দর ও সুবোধ্য করে ব্যক্ত করা হয়েছে।

উপরোক্ত প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে গল্পটি বলা হয়েছিল এবং তার বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করার জন্য পাঁচটি বিষয়ের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হয়েছে। এই পাঁচটি বিষয় হল তিনটি মানুষ, একটি নদী ও একটি নৌকা। এই পাঁচটি তত্ত্বের মধ্যেই 'All Divine for All Time, as It Is'-এর সার বস্তু নিহিত আছে। কেবলমাত্র করুণাঘন সদ্‌গুরুই অনুভবসিদ্ধির জ্যোতিতে এই সার তত্ত্বটি চয়ন করে পরিবেষণ করতে পারেন অপরের পরম অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্ম-আত্মার স্বানুভূতি লাভের জন্য।

সচ্চিদানন্দ নামক সন্ন্যাসী প্রকাশ করছেন সত্যস্বরূপকে, যা পূর্ণ ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত এবং অখণ্ডের সঙ্গে একীভূত, যা অদ্বয়জ্ঞানে ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনার মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় সন্ন্যাসীর মন এবং স্বভাব সুনিয়ন্ত্রণ ও শুদ্ধির অভাবে পরম অদ্বয়তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল না। তাঁর অদ্বয়জ্ঞান পরমতত্ত্বের সাধনা প্রথম সন্ন্যাসীর জ্ঞানসিদ্ধি অপেক্ষা অনেক নিম্ন পর্যায়ের। সেই জন্য সাধক হিসাবে সতীর্থের কর্ম ও ব্যবহারকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর সংশয় ও অজ্ঞানতা পূর্ণ মাত্রাতেই ছিল। তাঁর জীবভাব, কর্তৃত্ব, জ্ঞাতৃত্ব প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি ছিল। সেই জন্য দৃশ্য ও বৈষয়িক নিয়মের প্রভাবেই তিনি বিকৃত ও বিব্রত হয়েছিলেন।

যুবতী মহিলাটি হল এখানে জ্ঞানের বিষয়, যে সর্বদা কর্তা ও জ্ঞাতার সঙ্গেই যুক্ত থাকে নিম্ন প্রকৃতির প্রীতি ও আসক্তির নিয়মানুসারে। আত্মজ্ঞানী সর্বদাই কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভীতি, আসক্তি, বিকার, বিকল্প, দ্বৈত ও নানাত্ব ভাবের কার্য এবং তার প্রকাশাদি থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত থাকেন।

এবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে গল্পের বিষয়বস্তুর তাৎপর্য বর্ণিত হল—গল্পের মধ্যে যুবতী মহিলাই হল মায়ার মূর্ত বিগ্রহ। পরমতত্ত্ব ও অমৃতত্ব স্বরূপ অনুভবসিদ্ধপুরুষের কাছে মায়ার কোনও কার্য নেই। সংসারী মানুষের কাছে অথবা প্রবর্তক সাধকের কাছে সম্মোহিনী মায়ার প্রভাব সর্বকালেই বিশেষ ভাবে কার্যকরী। পরমসিদ্ধ ও মুক্তপুরুষকে মায়া যে কেবল মোহমুগ্ধকর সরঞ্জামসহ তার জাদুখেলায় বদ্ধ রাখে তা নয়, তাঁর বিশেষ অনুগত হয়ে সেবাও করে। সত্যবেত্তা অনুভবসিদ্ধপুরুষ আপনার মধ্যেই আপনি নিমগ্ন থাকেন।

আনন্দঘন পরমাত্মদেবতা, জগৎনাট্যের যিনি প্রভু ও বিভু, তাঁর অনন্ত অচিন্ত্য সেমেটিক (Semitic) ভাব ও দর্শনে মায়াকে যে-ভাবে স্যাটানিক (Satanic) বলা হয়েছে, তা ততটা অশুভ (absolute evil) নয়। ঈশ্বর ও তাঁর শক্তি ভিন্ন নয়, অভিন্ন। ঈশ্বর স্বয়ং হলেন দিব্য অদ্বয়তত্ত্ব এবং বিজ্ঞান ও প্রকাশশক্তি রূপ হল তাঁর স্বভাব। উভয় ভাবে তিনিই স্বয়ং। তাঁর প্রকাশশক্তি হল প্রকৃতি। এক অদ্বয় পরমতত্ত্ব সত্তা ও শক্তি, তুরীয় ও ব্যক্ত, অমূর্ত ও মূর্ত, নির্গুণ ও সগুণ, নিরাকার ও সাকার, নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিক উভয়ই এবং তদূর্ধ্বে স্বয়ং তিনিই। তা-ই 'নিত্যাদ্বৈত'-এর যথার্থ দর্শন ও অনুভূতি।

গল্পের অন্তর্গত খরস্রোতা নদীটি হল অবিদ্যা-অজ্ঞান-মায়া সংসারসাগরের প্রতীক। গল্পের মধ্যে নদী পারাপারের ফেরিটির (নৌকা) অভাব ছিল। তা-ই হল অজ্ঞান নদী

পার হবার জন্য অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ। তা গল্পের মধ্যে উহ্য আছে। কারণ সচ্চিদানন্দ নামক সন্ন্যাসী স্বয়ং ঈশ্বর ও গুরুর মূর্ত বিগ্রহ। তিনি স্বয়ংপূর্ণ, সবার আশ্রয় ও আশ্রয়ী উভয়ই এবং সর্ব অধিষ্ঠান। তাঁর কোনও দ্বৈত নেই, তিনি অদ্বয়পুরুষ। সুতরাং তাঁর অন্য কারও সাহায্য প্রয়োজন হয় না। ঈশ্বর বা গুরু রূপে স্বয়ং তিনি এখানে তাঁর সন্ন্যাসী ভ্রাতা ও যুবতী মহিলা উভয়েরই জীবন্ত আশ্রয়। প্রকৃতি তাঁর কাছে স্বরূপত অন্তরায় নয়---তাঁরই স্বয়ংপ্রকাশ জ্যোতি, যা সব সময় তাঁর বাধ্য ও অনুগত সেবিকা। তা অদ্বয় পরমার্থদেবতার অর্থাৎ পরমপুরুষের অদ্বৈত স্বরূপ ও স্বভাবের পরম প্রেম, প্রীতি, ভাতি, জ্যোতি ও নীতি স্বরূপ। অদ্বৈতের স্বরূপ ও স্বভাব অবিনাভাবী। তাঁর মধ্যে যা-কিছু স্বতঃস্ফূর্ত স্বতঃসিদ্ধ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হয় তা অদ্বৈত অতিরিক্ত পৃথক কিছু নয়। তা স্বানুভূতির বিষয়, অনুমানের বিষয় নয়।

গল্পটির অন্তর্নিহিত পাঁচটি তত্ত্ব অপরোক্ষানুভূতির অর্থাৎ অদ্বৈত স্বানুভূতির মৌলিক ও কেন্দ্রের দৃষ্টি থেকে বর্ণিত হয়েছে। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান/ অদ্বয়জ্ঞানকেই তৃতীয়নয়ন বা জ্ঞাননয়ন বলা হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে তা আবৃত ও অব্যক্ত থাকে। কিন্তু পরমাত্মগুরুর বা দিব্যপুরুষের পরমানুগ্রহ ও আশীর্বাদে তা খুলে যায় বা উন্মুক্ত হয়, অর্থাৎ প্রকাশ পায়। কেবল তখনই শরণাগত বিনীত অনুগত যথার্থ ভক্ত পরমাত্মদেবতার সঙ্গে অখণ্ডবোধে তাদাত্ম্য লাভ করার সর্বোত্তম সুযোগ পায়। তার ফলে অখণ্ড সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মাত্মস্বরূপে হয় তাঁর চিরতরে প্রতিষ্ঠা, হয় তাঁর জীবন চিরমুক্ত, কৃতকৃত্য ও অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত। এই ভাবে ব্রহ্মাত্মস্বরূপ সদ্‌গুরু তাঁর শরণাগত সর্বোত্তম অধিকারী ভক্ত, যোগী, জ্ঞানী শিষ্যকে আপনার মধ্যে বরণ করে আত্মসাৎ করে নেন এবং তাঁর অখণ্ড আপনবোধের নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্যস্বরূপটি পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে দেন। অদ্বৈতের বক্ষে অদ্বৈতই ভাসে। দ্বৈতের বিকার ক্ষণিকের বিলাসও চিরতরে মিলিয়ে যায়।

(*স্বজ্ঞানুগ্রহসুধা* ২য় খণ্ড হতে গৃহীত)

৩০০

সদ্‌গুরুর সঙ্গে বিশেষ ভাবে যোগাযোগের কারণ সাধারণ মানুষ জানে না। কী ভাবে যথার্থ আত্মজ্ঞপুরুষের সঙ্গে যোগ্য অধিকারীর যোগাযোগ সাধিত হয় সেই প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি আছে।

কোনও এক সময়ে খুব বড় একজন রাজা ছিলেন। তিনি প্রজাদের মঙ্গল কল্যাণের জন্য মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করে রাজ্য চালাতেন। মন্ত্রীরাও ছিলেন খুব বুদ্ধিমান ও প্রাজ্ঞবিজ্ঞ। রাজার বয়স হয়েছে। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ, সুতরাং সদ্‌গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করার সময় হয়েছে। এই বিবেচনা করে তিনি মন্ত্রীদের আদেশ করলেন একজন অনুভবসিদ্ধ সন্তগুরুর সন্ধান করে তার কাছে নিয়ে আসতে। মন্ত্রীরা তৎক্ষণাৎ চার দিকে ছুটলেন যথার্থ সন্তগুরুর সন্ধানে।

কিছুকাল সন্ধানের পর তারা যথার্থ সন্ত বলে পরিচিত এই রকম একজনের সন্ধান পেলেন। মন্ত্রিগণ খুব বিনীত ভাবে তাঁর কাছে তাদের ইচ্ছা নিবেদন করলেন এবং

তাঁকে তাদের রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ করলেন। সন্তমহারাজ তাঁর অনুভূতির স্বভাব অনুসারে নির্বাক বা মৌন হয়ে কোনও রকম নড়াচড়া না-করে স্থির হয়ে বসে রইলেন।

মন্ত্রিগণ বিশেষ হতাশ হয়ে সেখান থেকে অন্যত্র সন্তগুরুর সন্ধানে বেরোলেন। বনের গভীরে এক সন্ত বাস করতেন। এই দ্বিতীয় সন্তের কাছেও তারা উপস্থিত হয়ে রাজদরবারে তাঁকে রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য বিনীত ভাবে অনুরোধ করলেন। প্রথম সন্তমহারাজ তো বাক্যালাপই করেননি। দ্বিতীয় সন্ত প্রজাদের বললেন, রাজার যদি কোনও চাওয়া থাকে তবে রাজা যেন তাঁর কাছে আসেন, কারণ প্রয়োজন রাজার, সন্তের কোনও প্রয়োজন নেই।

মন্ত্রীরা ভাবলেন, রাজার কাছে এই রকম সংবাদ দেওয়া তো অসম্ভব। সুতরাং তারা স্থির করলেন অন্যত্র গুরুর সন্ধানে যাবেন। অনেক সন্ধানের পর তারা তৃতীয় এক সন্তের সন্ধান পেলেন। মন্ত্রীরা তাঁকেও পূর্বের মতো যথাবিধি রাজদরবারে রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ জানালেন।

সাধুটি তাঁদের কথা শুনে রাজদরবারে যেতে রাজি হলেন এক বিশেষ শর্তে যে, সন্ত অধ্যাত্মানুভূতির যে স্তরে পৌঁছেছেন সেই স্তরে না-পৌঁছানো পর্যন্ত রাজাকে সন্তের কথা বা নির্দেশ অনুযায়ী চলতে হবে। মন্ত্রীরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করে স্থির করলেন যে, রাজকার্য অবহেলা করে সন্তের অনুগত হয়ে সব সময় রাজাকে চলতে হবে—এই প্রতিজ্ঞা করা বা তা মেনে চলাও অসম্ভব। তারা আরও ভেবে দেখলেন যে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য এই সন্তগুরুর সঙ্গ করতে গেলে রাজাকে রাজকার্য ও রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে। তার ফলে পররাজ্য দ্বারা রাজ্য আক্রান্ত হতে পারে এবং শত্রু ও বিদেশিদের দ্বারা নানা রকম অশান্তিকর অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং তারা সাধুমহারাজকে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে সেখান থেকে বিদায় নিলেন। তারপর তারা খুঁজতে খুঁজতে চতুর্থ সাধুর দেখা পেলেন। তাঁকেও তারা পূর্বের মতো রাজপ্রাসাদে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য অনুরোধ করলেন এবং রাজার ইচ্ছাও তাঁকে জানালেন। সব শুনে সন্তমহারাজ একটি শর্তে রাজপ্রাসাদে যেতে রাজি হলেন যে, রাজাকে প্রথম থেকেই তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। কারণস্বরূপ তিনি বললেন—গুরু শিষ্যকে যথার্থ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন তখনই, যখন শিষ্য সর্ব আশা ত্যাগ করে গুরুর কাছে নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবে সমর্পণ করতে পারে।

এ ক্ষেত্রেও মন্ত্রীরা পূর্বের মতো এরকম শর্ত স্বীকার করে মেনে নিতে পারলেন না। তারা তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে অন্যত্র চলে গেলেন। তারপর তারা বহু খোঁজাখুঁজি আরম্ভ করলেন। অর্ধেক রাজ্যে সন্তগুরুর সন্ধানে ঘুরে বেরিয়ে তারা পঞ্চম এক সাধুর সন্ধান পেলেন, যিনি এক গুম্ফার মধ্যে বাস করতেন। তাঁর কাছেও মন্ত্রীরা রাজার নিবেদনটি পূর্ববৎ জানালেন। মন্ত্রীদের কথা শুনে সন্তগুরু বিনা শর্তেই রাজি হয়ে গেলেন।

সন্তমহারাজ বললেন, তিনি নিশ্চয়ই রাজার কাছে যাবেন এবং তাকে অনুশাসন করবেন। তাঁর কথা শুনে মন্ত্রীরাও সবাই খুব খুশি হলেন এই ভেবে যে, অবশেষে একজন সাধুগুরুকে পাওয়া গেল যিনি বিনা শর্তে অনতিবিলম্বে রাজার সঙ্গে দেখা

করতে রাজি আছেন। এই সাধু মহাত্মা ছিলেন বিবস্ত্র উলঙ্গ এক ফকিরের মতো। সেই জন্য অবশ্য মন্ত্রীদের কোনও আপত্তি ছিল না। দীর্ঘকাল মন্ত্রীরা গুরুর সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছেন। মন্ত্রীরা আর ফিরছেন না দেখে রাজাও খুব চিন্তিত হলেন। গুরুকে না-নিয়ে মন্ত্রীরা ফিরবেন না, এ কথা তারা আগেই রাজাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন।

সুতরাং পঞ্চমবার এই ফকির গুরুকে পেয়ে কালবিলম্ব না-করে তারা রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হয়ে রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা ফকিরকে সামাজিক রীতি অনুসারে কোনও রকম শ্রদ্ধা-ভক্তি, যা সাধুদের একান্ত প্রাপ্য, তা না-দেখিয়ে তাঁকে গ্রহণ করলেন এবং রাজসিংহাসনের সামনে তাঁকে বসতে আজ্ঞা করলেন। রাজা সিংহাসন থেকে উঠে তাঁকে প্রণামটি পর্যন্ত জানালেন না।

সন্তগুরু নিচে বসে রাজাকে উদ্দেশ করে বললেন—হে রাজা, তুমি তো এই বিকারী ও মরণশীলদের রাজা, কিন্তু আমি অখণ্ড জ্ঞানের রাজা। তুমি ভুলে যেয়ো না যে, তুমি সিংহাসনে বসে সত্যজ্ঞান অর্জন করতে পারবে না, যা একমাত্র চরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত সাধকই অর্জন করতে পারেন। সাধুর কথা শুনে রাজা শ্রদ্ধা জানাবার জন্য সিংহাসন থেকে নেমে আসতে চাইলেন। কিন্তু তার সংস্কারজাত স্বভাব, গর্ব ও আভিজাত্যের অভিমান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা বাধা দিল তাকে এই ব্যাপারে।

সন্তগুরু সাধারণ মানুষের স্বভাব ভাল ভাবে জেনেই রাজাকে আবার বললেন—হে বৎস রাজা, তুমি তো মরণশীল বস্তুর জন্য ভিখারি। তুমি প্রতিদিন প্রার্থনা কর তোমার পার্থিব সম্পত্তি ও ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য এবং তার স্থিতি ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য। এই ঐশ্বর্য ও রাজ্য নাশের ভয়ে তুমি সদা চিন্তিত এবং ভীত। তার জন্য তোমার কত ব্যয়বহুল প্রচেষ্টা ও আয়োজন, কিন্তু দেখ আমার কামনাবাসনা, ক্রোধ, ভয় কিছুই নেই। সেই জন্য আমি ফকিরবেশে আছি, যদিও তোমার চাইতে আমার মনের বেশি সত্যজ্ঞান, শক্তি ও ঐশ্বর্য আছে। সেই কারণে তুমি হলে ভিখারি রাজা, যদিও রাজবেশে কর অবস্থান। আর আমি হলাম রাজা ভিখারি।

ফকির গুরুর কথা শুনে রাজা বিভ্রান্ত হলেন এবং রাজাভিখারির বক্তব্যের সারমর্ম বুঝতে না-পেরে নিজেকে ভিখারি রাজা ভাবতে তিনি খুব কষ্ট বোধ করলেন। সুতরাং সাধু ফকিরকে কিছু না-বলে সিংহাসন ছেড়ে তিনি অন্দরমহলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে সন্ত ফকিরও চলে গেলেন।

মন্ত্রীদের বিরাট এক কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হয়েছে, তারা তা যথার্থ ভাবে পূর্ণ করতে চান। তাই কী করা কর্তব্য, এই নিয়ে তাদের পরস্পরের মধ্যে আলোচনা হল। সেই সময় রাজপ্রাসাদের কর্মচারীদের মধ্যে একজন বলল—এ রাজ্যের খুব কাছেই একজন সাধু মহারাজ আছেন, তাঁর কাছে গিয়ে একবার দেখলে হয় না? মন্ত্রীরা ভাবলেন, ঠিক কথা, তাঁর কাছে গিয়ে একবার চেষ্টা করে দেখা যাক। মন্ত্রীরা সেই ব্যবস্থাই করলেন এবং তাদের পক্ষ থেকে এটা শেষ সম্ভাবনা ভেবে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট হলেন।

এই ষষ্ঠ সন্তের কাছে তারা উপস্থিত হলেন এবং রাজার ইচ্ছা, দীক্ষাগ্রহণের কথা তাঁকে জানালেন। সেই মুনি রাজি হলেন রাজপ্রাসাদে আসতে। তাঁকে নিয়ে মন্ত্রীরা

প্রাসাদে ঢুকলেন এবং রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজা সেই সন্তমুনিকে দেখামাত্র ছুটে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন এবং এক বিশেষ নির্দিষ্ট আসনে বসবার জন্য অনুরোধ করলেন যথাবিধি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। সন্তমুনি শান্ত ভাবে রাজার প্রস্তাব শুনলেন। তার পরে তিনি তাঁর বক্তব্য আরম্ভ করলেন--রাজামশাই আমাকে বল তুমি কি প্রভু এবং আমি কি দাস এই অধ্যাত্ম ব্যাপারে?

রাজা সন্তমুনির কথার মর্ম বুঝতে পেরে তাঁর আসনের কাছে গিয়ে করজোড়ে প্রণাম জানালেন তাঁকে। রাজা এই ভাবে আত্মনিবেদন করলেন এবং মুনিকে বললেন যে, তিনি পূর্বে অধ্যাত্মজ্ঞানে কখনও কারওকে সেবা করতে শেখেননি।

রাজার কথা শুনে বিনা দ্বিধায় মুনি বললেন—আমি যা করি পূর্বাপর তুমি তা-ই অনুসরণ কর। এই ভাবে অনুসরণ করে তুমি তোমার আত্মস্বরূপকে অবগত হতে পারবে।

রাজা মুনিকে সন্তুষ্ট করার জন্য ব্যস্ত হলেন এবং রাজপ্রাসাদে তাঁকে সর্বতোভাবে অনুসরণ করে চললেন যেমন তিনি করেন সেই ভাবে এবং প্রভুর মতো কথা বলতে চেষ্টা করলেন। রাজা খুব বিনীত ভাবে অধ্যাত্মগুরুর কথা শোনেন এবং গুরুবাক্যের মর্মার্থ অনুভব করার চেষ্টা করেন। রাজা বাহ্য আচরণে দেখাচ্ছেন যে, অন্তরে তিনি মুনিকে গুরুরূপেই গ্রহণ করেছেন। কিছুকাল পরে রাজা খুব আশ্চর্যের সঙ্গে অবগত হলেন যে, গুরু স্বয়ং তার প্রতি, তার পরিবারবর্গ ও অনুচর অপেক্ষা অধিক সচেতন, যত্নবান এবং সহানুভূতিসম্পন্ন।

গুরু এক বিশেষ রাতে রাজাকে তাঁর কথা অধিক মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য আজ্ঞা করলেন। প্রাথমিক শিক্ষার কিছুকাল পরে গুরু দেখলেন উচ্চ পর্যায়ের অধ্যাত্মজ্ঞান প্রকাশের পক্ষে এই রাত খুব শুভ। সেই রাতে রাজা জানতে পারলেন যে, আরও অনেক রাজ্য আছে যেখানে ভ্রান্তি, অবজ্ঞা, ঘৃণা এবং অন্যান্য দোষাদির অস্তিত্ব নেই। বাস্তবিক পক্ষে সেই সন্তমুনি 'Science of Oneness' প্রকাশ করলেন সুযোগ বুঝে।

গুরু রাজাকে আদেশ করলেন যে, সেই রাত থেকে রাজা ঐ কথাগুলি যেন মনন করেন প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে দিনে তিনবার এবং ধীরে ধীরে এই মননের কালকে চব্বিশ ঘণ্টা দিব্যচিন্তায় পরিণত না-হওয়া পর্যন্ত চালিয়ে যেতে হবে। এমনকী রাজার কার্যে, চিন্তায় ও ইচ্ছায় সত্য আত্মবোধের জ্যোতিরই প্রকাশ হওয়া চাই।

রাজা গুরুর বাক্য কিছুকাল হুবহু অনুসরণ করে যথার্থ ভাবে পালন করলেন। তারপর গুরু একদিন রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি তাঁর অধ্যাত্মজ্ঞানের ব্যাখ্যা বিশদ ভাবে বলতে পারবেন কি না। রাজা যথার্থ শব্দের মাধ্যমে তা ব্যক্ত করার জন্য খুব দৃঢ় ভাবে চেষ্টা করলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত না-পেরে গুরুর সামনে শান্ত হয়ে বসে পড়লেন। গুরু রাজার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে হেসে বললেন যে, আত্মজ্ঞান অথবা সত্যজ্ঞান সাধারণ শব্দ প্রয়োগের অতীত এবং গতানুগতিক ভাষায় তা ব্যক্ত করা যায় না। গুরু আরও বললেন—কেউ ইঙ্গিতমাত্র করতে পারে অথবা আত্মজ্ঞানের অভিজ্ঞতা এবং বিজ্ঞানকে উপমামূলক গল্পের মাধ্যমে বর্ণনা করতে পারে, কিন্তু কথার মাধ্যমে তার সত্যরূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না।

দৈনিক সাহায্য ব্যতিরেকেই রাজা যাতে সাধনা চালিয়ে যেতে পারেন, এই বিবেচনা করে সেই মুনি রাজাকে আধ্যাত্মিক অভ্যাসের উপর আরও কিছু উপদেশ দিয়ে বিদায় নিলেন।

গুরু চলে যাচ্ছেন দেখে রাজা খুব দুঃখিত হলেন, কিন্তু তাকে যে, মেনে নিতেই হবে। সন্তমুনি যে-ভাবে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন রাজা সে-ভাবেই রাজকার্য পরিচালনায় কোনও প্রকার ভুল না-করে তা মেনে চলেন। তার প্রজাবর্গের উন্নতি এবং সমগ্র দেশের সমৃদ্ধি এই নূতন পদ্ধতিতে রাজ্য শাসন করার ফলে সবই পূর্ণ হল। প্রতিবেশী রাজারাও সেই পদ্ধতি অনুসরণ করে রাজ্য চালাতে লাগলেন।

এই ভাবে বেশ কয়েকবছর অতিবাহিত হয়ে গেল। রাজা তার সাধনা নিষ্ঠা সহকারে করে যাচ্ছেন এবং রাজকার্যও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালনা করছেন। এর মধ্যে একদিন রাজা এক ঝলকে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করলেন যা পরমানন্দ, শান্তি ও অখণ্ড প্রেমের স্বরূপ। রাজার মনে সেই অনুভূতির স্তরে স্থায়ী ভাবে অবস্থান করার ইচ্ছা জাগল, কিন্তু তিনি জানতেন যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না জগতের সর্বনিয়ম পরিপূর্ণ ভাবে বোধস্বরূপে লীন হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। এই বিষাদপূর্ণ অভিজ্ঞতা ছাড়াও তিনি জানতেন যে, তা তার পক্ষে একটা আভাসমাত্র যে, তিনি অধ্যাত্মপথে সঠিক ভাবেই এগিয়ে চলেছেন। কাজেই তিনি পূর্বের অভ্যাস খুব দৃঢ় ভাবে চালিয়ে যেতে লাগলেন। মুনি তাকে বলে গিয়েছিলেন যে, নিষ্ঠা সহকারে এই অভ্যাস চালিয়ে গেলে সর্বাবস্থায় তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপেই অবস্থান করতে পারবেন। এতদিনে তা তার সিদ্ধ হল। সেই চরমতম অনুভূতি নিয়ে তিনি সকলের তুষ্টি বিধান করে সুখে পঁচিশ বছর রাজত্ব করলেন।

রাজার রাজত্ব ছাব্বিশ বছরে যখন পড়ল তখন হঠাৎ একদিন সেই সন্তমুনি রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে তাকে বললেন—অধ্যাত্মবোধের চরম স্তরে উপনীত হবার সময় উপস্থিত হয়েছে। তুমি এবার আমাকে অনুসরণ কর, আমার সাথে চল। রাজা তৈরি ছিলেন। তিনি রাজ্য, পরিবার, সম্পদ, শক্তি, ঐশ্বর্য, যশ, খ্যাতি ইত্যাদি ত্যাগ করলেন বিনা দ্বিধায় ও বিনা শোকে। তিনি এখন আর মর্তজগতের জন্য নন। রাজা শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর-আত্মার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে পূর্ণতার অনুভূতি লাভ করলেন। সেই সন্তমুনি রাজাকে সদ্‌গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করলেন। এই সন্তগুরুপদ হল সর্বশ্রেষ্ঠ পদ বা গতি, যা শিষ্য সদ্‌গুরুকৃপায় প্রাপ্ত হয়। তা কিন্তু সবাই পায় না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সদ্‌গুরুর সঙ্গে সৎ শিষ্যের যে অতি প্রত্যাশিত যোগ তাকেই মণিকাঞ্চনযোগ বলে। এই যোগে সিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত অধিকারী পুরুষ অতীব দুর্লভ। তা সাধারণ গুরুপদ নয়। সদ্‌গুরু ব্রহ্মাত্মস্বরূপ। সুতরাং গুরুনিষ্ঠ ভক্ত তার সংস্কারজাত আত্মপ্রচেষ্টা বা পুরুষকার দ্বারা আত্মগুরুর সেবা করে ও তাঁর নির্দেশ অনুসারে চলে সর্বোত্তম সিদ্ধির অধিকারী হয়। এই সর্বোত্তম সিদ্ধিই হল অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাত্মবোধে প্রতিষ্ঠা।

গল্পটির অন্তর্নিহিত তত্ত্ব ও গূঢ় রহস্য যদি তোমাদের যথার্থ ভাবে বলে না-দেওয়া হয় তবে এর মর্ম অনুভব করতে পারবে না। এখানে প্রথম সন্তের অনুভূতির মান

সর্বোত্তম। তাঁর মধ্যে দ্বৈতবোধের একান্ত অভাব বলে শিক্ষাদীক্ষার প্রশ্ন তাঁর কাছে অবান্তর। শিষ্য হবার মতো যোগ্য অধিকারী না-হলে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগই হবে না। সেই জন্য তিনি মন্ত্রীদের আবেদন-নিবেদনের কোনও প্রত্যুত্তর দেননি। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সন্তগুরুও অনুভবসিদ্ধ পূর্ণ সদ্‌গুরু। কিন্তু তাঁদের শিষ্য হবার জন্য তাঁরা পৃথক পথক ভাবে যে শর্ত পূরণের কথা বললেন, তা রাজার পক্ষে অসম্ভব জেনে সেখান থেকেও মন্ত্রীরা সরে গিয়েছিলেন। যোগ্য গুরুর অধিকারী শিষ্যের কী রকম যোগ্যতার মান থাকা উচিত তা রাজা ও মন্ত্রীদের জানা ছিল না। সেই জন্য পর পর প্রথম তিন-চারজন সন্তের কাছ থেকে আশানুরূপ কোনও সমর্থন ও উত্তর না-পেয়ে পঞ্চম সন্তের সঙ্গে কথা বলার পরে তিনি যখন রাজি হলেন তখন তাঁকে রাজদরবারে আনা হল এবং রাজাকেও সংবাদ দেওয়া হল। কিন্তু রাজা গর্ব, অভিমান ও অজ্ঞতাবশত যাঁকে গুরুরূপে বরণ করবেন তাঁর প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করতে না-পারাতে সন্তগুরু তার অযোগ্যতার পরিচয় পেয়ে তাকে শিষ্য করতে রাজি না-হয়ে দু-একটি উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন। অবশ্য একটি কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে যে, মন্ত্রীরা যখন যে সন্তের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন তার ফলাফল রাজাকে সবই এসে জানিয়েছেন।

প্রথম থেকে শুরু করে ষষ্ঠ সন্তমুনি প্রত্যেকেরই অনুভবসিদ্ধির বৈশিষ্ট্য ও তাৎপর্য পৃথক পৃথক ভাবে না-বললে তোমরা তাঁদের যথার্থ মর্ম ও রহস্য এবং গল্পটির মৌলিক ও অন্তর্নিহিত শিক্ষা বুঝতে পারবে না। সেই জন্য প্রত্যেক সন্তকে উপলক্ষ্য করে রাজা ও মন্ত্রীর সম্বন্ধে, কী ভাবে কোন অবস্থায় কী রকম ঘটনার মাধ্যমে তাদের ভাববোধের রূপান্তর ও পরিণতি ঘটেছে তাও সংক্ষেপে বলা হবে। এ সবই খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও অনুধাবনযোগ্য।

প্রচলিত ও গতানুগতিক ধারার যে শিক্ষাদীক্ষা দেখা যায় তার মধ্যে বিশেষ কোনও বৈশিষ্ট্য বা গুরুত্ব পাওয়া যায় না। গৃহস্থাশ্রমে যারা বাস করে তাদের অর্থাৎ সংসারী মানুষের জীবনের চতুর্বিধ লক্ষ্যের মধ্যে অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের মধ্যে প্রথম তিনটির প্রতিই আকর্ষণ ও লক্ষ্য অধিক থাকে। মোক্ষপদে বিশেষ কারও আগ্রহ বা ব্যাকুলতা দেখা যায় না। কলি যুগ হল অর্থভিত্তিক ও বস্তুতান্ত্রিক যুগ। সুতরাং ধর্মের গুরুত্ব অপেক্ষা অর্থ উপার্জনের গুরুত্ব মানুষ বেশি বোঝে। তাই যে ধর্ম অর্থের পূর্বে ছিল, তাকে অর্থ ও কাম ভোগের পিছনে ফেলেছে। মোক্ষের কথা তো মানুষের মনেই পড়ে না! প্রায় সকলেরই জীবনের লক্ষ্য হল কামভোগ। তা পূরণের জন্য চাই অর্থ, সুতরাং অর্থই হল সর্বশ্রেষ্ঠ।

বর্তমানে মানুষের চিন্তাধারা এবং কর্মধারা মোক্ষ ও ধর্ম ছাড়া, কেবল ভোগের নিমিত্ত অর্থ ও অর্থের নিমিত্ত ভোগ—এই ভাবেতেই গড়া। কিছু মানুষ লোকদেখানো ধর্ম করে এবং মন্দির, মসজিদ, গির্জা, মঠ, আশ্রম ও তীর্থে গিয়েও ভিড় করে, কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য ধর্ম লাভ করা নয়। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রে অর্থ উপার্জনের সুযোগসুবিধা বেশি বলে তার চেষ্টাই বেশির ভাগ লোকের মধ্যে থাকে। কাজেই আশ্রম, মঠ

প্রভৃতিতে যে ধর্ম তাও নামমাত্র ধর্মশিক্ষা যা গতানুগতিক রীতিকে অনুসরণ করেই হয়। মঠ, আশ্রম, মন্দির প্রভৃতিতে তিথিভিত্তিক পূজা-পাঠাদি উপলক্ষ্যে যে লোক সমাগম হয় তাতে ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষার বিশেষ কোনও সুযোগসুবিধা থাকে না— উৎসব ও প্রসাদ নিয়েই সকলে মাতামাতি করে এবং পরে যার যার বাড়িতে চলে যায়। তার মধ্যে ধর্মশিক্ষা ও দীক্ষার বিশেষ কোনও ব্যবস্থা থাকে না।

ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুরুগণ শিষ্যদের যে পাইকারিহারে দীক্ষা দেন তার মধ্যে গুরু ও শিষ্য উভয়েরই যোগ্যতার মানের প্রশ্নটি উহ্যই থেকে যায়। বর্তমানে লোকসংখ্যার অনুপাতে আশ্রম, মঠ, প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অধিক এবং গতানুগতিক র্মশিক্ষা ও দীক্ষার ক্ষেত্রেও গুরু-শিষ্যের সংখ্যা অধিক। কিন্তু যোগ্যতা ও অধিকারীর প্রশ্ন সব জায়গাতেই উহ্য। দীক্ষাদাতা গুরু ও দীক্ষাগ্রহীতা শিষ্য উভয়ের মধ্যে যোগ্যতার মানের তারতম্য যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তা বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই ভেবে দেখে না। শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের অন্তরের ভাববোধের বিকাশ ক্রমধারায় সাধিত হয় বিজ্ঞানসম্মত ভাবে। দীক্ষার মাধ্যমে গুরুশক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তার হৃদয়ে সুপ্ত ভাববোধের জাগরণ ও বিকাশকে ক্রমধারায় অনুভূতির পর্যায়ে নিয়ে আসে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে।

কোথাও কোনও ক্ষেত্রে যোগ্যতার মানের অভাব বা ন্যূনতা থাকলে তা পূরণ না-করে ভাববোধের ব্যাপক প্রকাশ বা অনুভূতি সম্ভব হয় না। সোজা কথায়, অন্তরে রজোগুণ ও তমোগুণের মল থাকলে চিত্ত মলিন থাকে। মলিন অন্তঃকরণ শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। সেই জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় গুরু ও শিষ্যের সম্বন্ধ অন্তরের ভাববোধের উৎকর্ষ-অপকর্ষকে ভিত্তি করেই প্রকাশ পায়।

দীক্ষাগ্রহণে ইচ্ছুক যে, সে অতি উন্নত উচ্চ শিক্ষিত, মধ্য শিক্ষিত, সাধারণ শিক্ষিত বা অল্প শিক্ষিত হতে পারে আবার অশিক্ষিত অতি সাধারণ স্তরের মানুষও হতে পারে।

অপরপক্ষে দীক্ষাদাতা গুরুও আবার ব্রহ্মজ্ঞ/আত্মজ্ঞপুরুষ হতে পারেন এবং দিব্য মুক্ত মানবও হতে পারেন, আবার কেবল দৈবীশক্তির অধিকারীও হতে পারেন অথবা কেবল শাস্ত্রভিত্তিক জ্ঞানের অধিকারীও হতে পারেন। তা ছাড়া সাধারণ স্তরের অসিদ্ধ অমুক্ত গতানুগতিক গুরুসম্প্রদায় তো আছেই।

উত্তম জিজ্ঞাসু অধিকারী পুরুষের জন্য যেমন অনুভবসিদ্ধ গুরুর প্রয়োজন, অন্য স্তরের গুরু সেখানে কার্যকরী হবে না, সেই রকম অতি সাধারণ বা মধ্য স্তরের জিজ্ঞাসুর সঙ্গে অনুভবসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞ/আত্মজ্ঞগুরুর যোগসম্বন্ধ সম্ভব নয়। এই গুরুতত্ত্ব, গুরুবাদ ও গুরুদীক্ষা প্রণালী যে অতীব সূক্ষ্মতত্ত্বভিত্তিক, বিজ্ঞানভিত্তিক ও যুক্তিভিত্তিক অতি জটিল বিষয় তা বলাই বাহুল্য। এই সম্বন্ধে সম্যক্‌রূপে অবগতির জন্য অনুভবসিদ্ধ, যুক্তিপূর্ণ ও বিজ্ঞানসম্মত, যা সর্ববিধ সমস্যার ও জটিল তত্ত্বের সমাধান, তা একান্ত প্রয়োজন। উল্লিখিত গল্পটির মধ্যে তা-ই বিশদ ভাবে পাওয়া যায়।

দীক্ষাগ্রহণের জন্য তৈরি হলেন রাজা। তাঁর দীক্ষাগ্রহণের যোগ্যতা আছে কি না সে সম্বন্ধে তাঁর নিজের এবং মন্ত্রীদের কোনও ধারণাই ছিল না। সুতরাং গুরুকরণের

আন্তরিক তাগিদ অন্তরে জাগার পরে রাজার জন্য যোগ্য গুরুর সন্ধান করতে গিয়ে মন্ত্রীরা পর পর পাঁচজন সন্তমহারাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু যোগ্য ও উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পাঁচজনের মধ্যে কেউই রাজার জন্য নির্দিষ্ট ছিলেন না। সেই জন্য ষষ্ঠ সন্তগুরুর সঙ্গে যোগাযোগ হল শেষে। তিনি রাজার গুরুরূপে পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট ছিলেন।

এখন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হল এই ছয়জন সন্তপুরুষের আচারব্যবহার তাঁদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অনুসারেই প্রকাশ পেয়েছে। অবশ্য সাধারণের দৃষ্টিতে তা সহজবোধ্য নয়। তবে তা বলাই বাহুল্য যে, অন্তরের প্রস্তুতি, যোগ্যতা ও সংস্কারের ভিত্তিতেই গুরুকরণ নির্ভর করে।

গতানুগতিক যে-সকল দীক্ষা প্রচলিত সেই প্রসঙ্গে না-গিয়ে গল্পটির অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তুর আলোচনাতে দেখা যায় প্রথম পাঁচজন সন্তমহারাজ রাজার গুরু হবার যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গুরু হলেন না। পঞ্চম সন্ত সর্বত্যাগী ফকির গুরুর আগে যে পর পর চারজন সন্তগুরুর সঙ্গে মন্ত্রীদের দেখা ও কথা হয়েছিল তাঁরা রাজার যোগ্যতার অভাব লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজাকে তাঁরা দীক্ষা দেবার জন্য নির্দিষ্ট নন। কিন্তু পঞ্চম সন্তগুরু রাজাকে যা বলে গেলেন তাতে রাজার মনে কিছু পরিবর্তন হয়। রাজাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা, ঐশ্বর্য, আধিপত্য ও শক্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত ও স্থিত থাকতে হয় বলে গুরুর সঙ্গে ঠিক কী ভাবে আচরণ করা উচিত সে বিষয়ে তারা অবহিত নন। সন্তদের আবির্ভাব, কথাবার্তা ও ব্যবহার হতে তাঁদের অনুভূতির মানের কিছু লক্ষণ প্রকাশ পায়।

প্রথম সন্ত শান্ত ও মৌন ছিলেন। তিনি এত উচ্চবোধে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, বাক্যালাপের প্রয়োজন তাঁর কাছে নগণ্য। তাঁর শিক্ষা মৌনতার মাধ্যমে পরমতত্ত্বের শিক্ষা। সুতরাং পরমসত্য বাক্যমনাতীত বলে তিনি পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কাজেই মৌনতার মাধ্যমেই তাঁর ভাষা উত্তম যোগ্য অধিকারী ছাড়া অপরের পক্ষে বোধগম্য নয়।

দ্বিতীয় সাধুমহারাজ এমন অনুভূতির স্তরে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন যে, শিষ্য তাঁর কাছে তদ্‌গত হয়ে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করলে তবেই তিনি তাকে গ্রহণ করবেন, নতুবা অন্য কোনও শর্তে শিষ্যকে গ্রহণ করবেন না বা দীক্ষাও দেবেন না। তিনি দু-একটি কথা বলেছেন বটে মন্ত্রীদের জ্ঞাপনার্থে, কিন্তু রাজদরবারে রাজার কাছে যেতে তিনি রাজি হননি।

তৃতীয় সন্তমহারাজ মন্ত্রীদের কথায় রাজদরবারে যাননি সত্য, তবে তিনি বলেছিলেন যে, শিষ্য পরিপূর্ণ ও ঐকান্তিক ভাবে বিনা শর্তে ঈশ্বরের ধ্যানে আত্মনিয়োগ করার জন্য তৈরি থাকলে তবেই তিনি দীক্ষা দেবেন। এই রকম যোগ্যতার অধিকারী তিনি। তিনি অন্য কারওকে দীক্ষা দেবেন না। তিনিও কিছু কথা বলেছিলেন মন্ত্রীদের অবগতির জন্য।

চতুর্থ সন্তমহারাজও পূর্ণ আত্মসমর্পণের দাবি করেছিলেন। তিনি এমনভাবে অধ্যাত্মজীবন ও ধর্মজীবন যাপনের কঠোর বিধানের কথা বলেছিলেন যে, মন্ত্রিগণ

রাজার পক্ষে তা মানা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে তাঁর কাছ থেকেও চলে আসেন। কারণ তীব্র অভিমান যার আছে তার পক্ষে এই চতুর্থ গুরুর শিষ্য হওয়া সম্ভব নয়। এই চতুর্থ সন্তগুরুর মধ্যে জীবনের আধ্যাত্মিক ও জাগতিক উভয় ভাববোধেরই সমন্বয় ছিল। পূর্ণ অনুভবসিদ্ধ গুরুর মধ্যে এই বিশিষ্ট লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। তিনি জাগতিক কর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকেও সর্বদা নির্লিপ্ত থাকতে পারেন। তার জন্য যে শিক্ষা দরকার তা তিনি সম্যক্‌রূপে জানতেন। তবে জীবনের প্রথম থেকেই তিনি স্বভাবের বা অন্তরের প্রস্তুতির উপরেই অধিক গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন মনে করতেন। রাজার সেই প্রয়োজনের অভাব আছে জেনে তিনি তাকে দীক্ষা দিতে রাজি হননি।

পঞ্চম গুরু সর্বত্যাগী ফকির জগতের সমগ্র বিষয় হতেই মুক্ত এবং পূর্ণ আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত। অখণ্ড সমবোধে বা আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত এই ফকির গুরু 'আমি আমার', 'তুমি তোমার', বিষয়-বিষয়ী, দ্রষ্টা-দৃশ্য প্রভৃতি দ্বৈতভাববোধ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। তিনি অদ্বয়বোধের সঙ্গে পূর্ণ ভাবে একীভূত হয়ে গিয়েছিলেন বলে অদ্বয়জ্ঞানের অগ্নিতে তাঁর সর্ব অজ্ঞান বিদূরিত হয়েছিল! সেই ফকির গুরু বুঝেছিলেন যে, অভিমানী ও গর্বিত রাজা সর্বত্যাগী হতে পারবেন না এবং সর্ব উপাধি ও দ্বৈতভাব হতে মুক্ত হতে পারবেন না। রাজা তার সংস্কারজাত স্বভাবে ঐশ্বর্য, শক্তি ও ভোগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তার ফলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভ্রান্তি, ভীতি প্রভৃতি অন্তর্মলে তার চিত্ত পূর্ণ ছিল, যা পরমতত্ত্ব ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মোপলব্ধির অন্তরায়। তা সত্ত্বেও তিনি রাজার কাছে গিয়েছিলেন এবং তার শিক্ষার নিমিত্ত কয়েকটি সার কথা বলেছিলেন। তার ফলে রাজার যথেষ্ট উপকার হয়েছিল।

কিন্তু ষষ্ঠ সন্তগুরু ছিলেন রাজাকে দীক্ষা দেবার ব্যাপারে পূর্ব থেকেই সুনির্দিষ্ট। রাজা ফকির সন্তের সঙ্গ করার পূর্বে দুই সন্তের উপদেশ মন্ত্রীর মুখে শোনার ফলে যেটুকু সত্ত্বগুণের আভাস পেয়েছিলেন ফকির সন্তের সঙ্গে সংযোগকালে তা তিনি স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োগ করেছিলেন, যদিও তার মর্ম ও অন্তর্নিহিত তত্ত্ব তার পুরোপুরি জানা ছিল না। ষষ্ঠ সন্তগুরুকে রাজা যথার্থ ভাবেই বরণ করেছিলেন অন্তরের ভাব দিয়েই, যা মন্ত্রীদের মুখে শোনা কথার ফলশ্রুতি, তা পূর্ব পূর্ব সন্তদের স্বল্পকালের সঙ্গ হতেই সঞ্জাত হয়েছিল। তার ফলেই রাজা ষষ্ঠ সন্তের কাছে পরিপূর্ণ ভাবে বিনা শর্তে আত্মদান করতে আর দ্বিধা করেননি।

ষষ্ঠ সন্তগুরু রাজাকে দীক্ষা দিয়ে তার যথার্থ শিক্ষার ব্যবস্থাও নিজেই করে দিয়েছিলেন। তার পরে তার যোগ্যতার মান পূর্ণ করার জন্য তাকে বিশেষ ভাবে উপদেশ ও নির্দেশ দিয়ে তিনি রাজার কাছ থেকে বিদায় নেন। যাবার আগে তিনি রাজাকে বলে দিয়ে যান—আমি তোমার মধ্যেই সতত বর্তমান আছি। তুমি আমার নির্দেশ অনুসারে সাধনভজনের মাত্রা বাড়িয়ে তা পূর্ণ করবে এবং আমার নামে রাজকার্য পরিচালনা করবে। উভয় সাধনার মধ্যেই আমি স্বয়ং উপস্থিত থেকে তোমার পরমসিদ্ধি লাভের যোগ্যতা তৈরি করে দেব। আমার নির্দেশ ও অনুশাসন মেনে চললে অচিরেই তোমার আত্মসিদ্ধি ও পূর্ণতা লাভ হবে। তার আগে আবার আমি আসব। তখন আমার প্রত্যক্ষ দেখা পাবে।

সেই করুণাঘন গুরুর দীক্ষা ও শিক্ষা লাভ করে রাজা অল্পকালের মধ্যেই অধ্যাত্মসম্পদের অধিকারী হয়ে, জাগতিক রাজা তো ছিলেনই, এবার অন্তর্জগতের রাজাও হলেন। সচ্চিদানন্দবোধে পরমানন্দে তিনি পঁচিশ বছর রাজত্ব করলেন। তারপর রাজত্বকালে ছাব্বিশ বছর পড়তেই হঠাৎ একদিন দীক্ষাদাতা সদ্‌গুরু এসে উপস্থিত হলেন। রাজা সিংহাসন থেকে উঠে গুরুকে প্রণাম করে তাঁকে সিংহাসনে বসালেন এবং নিজে তাঁর চরণতলে উপবেশন করলেন। গুরু প্রীত হয়ে বললেন—এবার তোমার সময় হয়েছে, এখন আমার সঙ্গে চল। রাজা মহানন্দে গুরুকে প্রণাম করে বিনা দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে সমগ্র রাজত্ব, পরিবারবর্গ, ঐশ্বর্য, সম্পত্তি, নাম, যশ, খ্যাতি ও প্রতিপত্তি সব কিছু পিছনে ফেলে গুরুকে অনুসরণ করে চললেন।

গুরু তাকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি তীর্থ ভ্রমণ করলেন। তারপর তাঁর ধামে রাজাকে নিয়ে গিয়ে বললেন—আমার এখন শরীর ছাড়ার সময় হয়েছে। আমি এই জড়দেহ ত্যাগ করে তোমার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত থাকব। আমার এই পীঠস্থানে গুরুরূপে তুমিই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অযোগ্য শিষ্যের যোগ্যতা বাড়িয়ে তাঁকে পূর্ণ স্বানুভবসিদ্ধ করার জন্য মুক্তি ও অমৃতত্বে প্রাতিষ্ঠিত করে গুরুপদে বসিয়ে সদ্‌গুরু তাঁর লীলা সংবরণ করলেন।

রাজা এখন সত্যিই মহারাজা। তিনি সদ্‌গুরু মহারাজা হলেন। অন্যান্য সন্ত-মহারাজগণের সঙ্গে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভাবে যোগাযোগ হলেও তাঁরা তার উপযুক্ত যোগ্য গুরু ছিলেন না। আবার রাজাও তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট ও যোগ্য অধিকারী শিষ্য ছিলেন না। কারণ সেই সন্তদের কাছ থেকে তাঁদেব পর্যায়ের উন্নত দীক্ষা গ্রহণ করার যোগ্যতা রাজার ছিল না।

যিনি রাজার উপযুক্ত গুরু তাঁর সঙ্গে যথার্থ সময়ে অযোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও যোগ্য সম্বন্ধ হয় নিয়তির বিধানে এবং সেই যোগাযোগের ফলে গুরু-শিষ্যের মধ্যে যে সম্বন্ধ তৈরি হয় তার পরিণামে পার্থিব রাজা সদ্‌গুরুর কৃপায় অধ্যাত্মরাজ্যের অধিপতি হলেন। অর্থাৎ তিনি ছিলেন সাধারণ রাজা এবং এবার গুরুর কৃপায় তিনি হলেন মহারাজা। সদ্‌গুরু তার অন্তরে প্রবেশপূর্বক তাঁকে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত করে মহারাজা বানিয়ে দিলেন, অর্থাৎ তার মধ্যে তিনি স্বয়ং স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে আপনাকে আপনি প্রকাশ করলেন। প্রথমে গুরুকে শিষ্য আত্মদান করেছিল সদ্‌গুরুর কৃপাবলে এবং আপন সুসংস্কারের ফলে। এবার সদ্‌গুরু সর্বতোভাবে শিষ্যের সাধনা ও ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে আপনাকে দান করলেন শিষ্যের হৃদয়ে, যার ফলে শিষ্য হয়ে গেল সদ্‌গুরু স্বয়ং।

সদ্‌গুরু এ ভাবেই তাঁর নিত্যলীলা সাধন করেন সর্বকালে। তার সূচনাতে হয় যোগ্যতম গুরুর সঙ্গে যোগ্যতম শিষ্যের মণিকাঞ্চনযোগ। এই মণিকাঞ্চনযোগের তাৎপর্য হল, শিষ্যের ব্যষ্টি জীবননাট্যের অবসানকল্পে সদ্‌গুরুর চরণে বিনা শর্তে পূর্ণ আত্মাহুতি, আত্মসমর্পণ ও আত্মদান। অপরপক্ষে সদ্‌গুরু শিষ্যকে আপনবোধে পূর্ণবোধে গ্রহণ করে আত্মসাৎ করে নেন। নিজেকে পূর্ণরূপে তখন শিষ্যের হৃদয়ে করেন পূর্ণ সমর্পণ,

পূর্ণাহুতি ও বিনা শর্তে আত্মদান। উভয় দানই হল দিব্য মহাহোম বা যজ্ঞ যাতে গুরু-শিষ্য নিত্য অদ্বয় পরমতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত ও এই সত্যে হয় সর্বতোভাবে প্রকাশমান বা পূর্ণসিদ্ধ। তার ফলে সদ্‌গুরুর মহিমা চিরন্তন 'All Divine for All Time, as It Is' থেকে যায়।

এখন গল্পের অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ অংশের অন্তর্নিহিত বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা এবং বিশদ ভাবে তার মর্মার্থ স্বানুভূতির জ্যোতিতে ব্যক্ত করার প্রয়োজন আছে। গল্প প্রসঙ্গে উল্লিখিত তাৎপর্যের লক্ষ্যার্থকে আরও সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণ করে তার ভাব ও বোধার্থ প্রকাশ করা হয়েছে বিশেষ ভাবে তার মর্ম অনুধাবন করার জন্য।

পঞ্চম সন্ত ফকির সর্বত্যাগী অবধূত সম্প্রদায়ের। তাঁর কাছে মন্ত্রীরা আবেদন-নিবেদন করাতে তিনি রাজ্যে এলেন এবং রাজার সঙ্গে কথাবার্তাও বললেন। কিন্তু তিনি তাঁর সর্বত্যাগভিত্তিক অনুভূতির দৃষ্টিতে বুঝতে পারলেন যে, রাজার পক্ষে এই রাজত্ব ও ভোগসুখ ত্যাগ করে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করা সম্ভব হবে না। তবে রাজার চিত্তের মল অপসারণের জন্য তিনি যে বিশেষ কয়েকটি ত্যাগভিত্তিক উপদেশ দিলেন তা শুনে রাজা চিন্তিত হয়ে সিংহাসন ছেড়ে ভাবতে বসলেন। সন্ত ফকির রাজার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে কিছুক্ষণ পরে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে নিজের আস্তানায় চলে গেলেন।

রাজা ও মন্ত্রীরা সকলেই শাস্ত্রজ্ঞ এবং সৎ ছিলেন। কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ সম্বন্ধে তাদের কোনও বাস্তব অভিজ্ঞতা বা পরোক্ষ জ্ঞান ছিল না। কাজেই রাজপ্রাসাদে পঞ্চম ফকির সন্তের সঙ্গে অল্পকালের জন্য সাক্ষাৎ ও যোগাযোগ হওয়া এবং তাঁর মুখ থেকে কিছু উপদেশ শোনার ফলে রাজা ও মন্ত্রীদের মধ্যে তার প্রভাব পড়েছিল। শাস্ত্রে আছে—"ক্ষণমাত্র সন্তসঙ্গ দীর্ঘকাল রাজ্যসুখ ভোগ অপেক্ষা শতগুণে শ্রেয়।" এই ছোট কথাটির সারমর্ম সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হল—"গুরু মিলে লাখ লাখ, শিষ্য মিলে এক।" এরও তাৎপর্য খুব জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ। আবার সহজ, সরল ও জটিল উভয় দিক থেকেই বলা যায়—'শিষ্য মিলে লাখ লাখ, গুরু মিলে এক।' এক গুরুই হলেন পূর্ণ সদ্‌গুরু, আত্মজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞ গুরু। তিনি অজ্ঞ শিষ্যের অজ্ঞান ও শঙ্কা দূর করে দিতে পারেন যদি শিষ্য সর্বান্তঃকরণে শরণাগত হয়, নতুবা নয়। পূর্বের বাণী—"গুরু মিলে লাখ লাখ, শিষ্য মিলে এক"—এর তাৎপর্য হল বহু স্তরের গুরু আছেন এবং বহু স্তরের শিষ্য আছে। কিন্তু উপযুক্ত যোগ্য উত্তম অধিকারী অতি বিরল। এইরূপ উত্তম ও উপযুক্ত যোগ্য অধিকারী শিষ্য সর্বস্তরের গুরুর জ্ঞানের সারমর্ম আত্মসাৎ করে নিতে পারে। তা দুর্লভ হলেও অসম্ভব নয়। শাস্ত্রে এই রকম উপমা বিরল নয়। সব রকম উপমাই শাস্ত্রে পাওয়া যায়, তবে শ্রেষ্ঠতম উপমাগুলি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে তাদের জীবনালোচনা ও অনুশীলন সব সময়ই ফলপ্রদ হয়, অন্যদের বেলায় তদ্রূপ নয়।

আলোচ্য গল্পটির ষষ্ঠ সন্তগুরুই রাজার অযোগ্যতার পরিচয় অবগত হয়েও তাকে দীক্ষা দিতে রাজি হলেন। যদিও রাজা ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ষষ্ঠ সন্তগুরুকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করতে আর পূর্বের মতো ভুল (পূর্বের সন্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে যে রকম ভুল করেছিলেন অজ্ঞতাবশত) করেননি। তা সম্ভব হয়েছে পঞ্চম সন্তের

স্বল্পকালীন সৎসঙ্গ ও তাঁর সামান্য উপদেশের ফলে। রাজা এই নিয়ে বহু চিন্তা করে পরে বুঝেছিলেন যে, যথার্থ শ্রদ্ধা না-দেখাতে পারলে গুরু তাঁকে দীক্ষা দেবেন না। আর তিনিও গুরুর সাহায্য ব্যতীত যথার্থ ধর্মজ্ঞান, সত্যজ্ঞান, বিবেকজ্ঞান ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হতে পারবেন না। এই ষষ্ঠ গুরুর সঙ্গে রাজার যে যোগাযোগ তা পূর্ব হতেই নির্দিষ্ট ছিল এবং তা প্রমাণিত হল গুরু ও শিষ্যের আচরণের বা ব্যবহারের লক্ষণ থেকে।

রাজা গুরুর মধ্যে এমন আকর্ষণীয় বস্তুর সন্ধান পেলেন যা জগতে ইতিপূর্বে তিনি কোথাও পাননি। রাজৈশ্বর্য ভোগেও তিনি তা পাননি। এই যে অন্তর আকর্ষণের প্রভাব এটা সদ্‌গুরুদের মধ্যে পূর্ণ ভাবেই থাকে। ষষ্ঠ সন্তগুরু পরমেষ্ঠিগুরুর স্তরের, অর্থাৎ সমগ্র বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যজ্ঞানে বা অদ্বয়জ্ঞানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আপনার অন্তরে এবং সর্বভূতে ব্রহ্মাত্মদর্শন তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল। তা নিত্য অদ্বৈতবোধের লক্ষণ। এই বোধে প্রতিষ্ঠিত যিনি, তাঁর কাছে জিজ্ঞাসু সাধক রাজার যোগ্যতা ও অযোগ্যতার প্রশ্ন অবান্তর। কারণ তাঁর আত্মা ও রাজার আত্মা আত্মদৃষ্টিতে অভিন্ন। তিনি অদ্বয়বোধে প্রতিষ্ঠিত। সেই দৃষ্টিতেই তিনি রাজাকে সচেতন করে প্রবোধিত করেন এবং তাঁর আত্মবোধের স্মৃতির অন্তরায়কে বিদূরিত করে দিয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন বিজ্ঞানসম্মত সাধনার মাধ্যমে। তিন ঘণ্টা থেকে আরম্ভ করে আত্মবোধের বিচার ও ধ্যান চব্বিশ ঘণ্টা পূর্ণ করার নির্দেশ দিয়ে শিষ্যের অনুভূতির অন্তরায়গুলি যত দিন না বিদূরিত হয় অর্থাৎ দ্বৈতবোধের প্রভাব শঙ্কা-সংশয়াদি সমূলে নিরসন না-হয় ততদিন তিনি রাজপ্রাসাদেই ছিলেন। প্রতিদিন রাজাকে সৎসঙ্গের মাধ্যমে তিনি অনুপ্রাণিত করেছেন।

গুরুর সান্নিধ্যে এসে রাজা তাঁর যোগ্যতা বাড়াবার সুযোগ পেয়েছেন। অতি দুর্লভ হল মহাপুরুষের নিত্যসঙ্গ। রাজা সেই সঙ্গ পেয়েছেন তাঁর জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে এবং ঈশ্বরাত্মার কৃপাবলে। তা প্রমাণিত হয় রাজার গুরুবরণের ব্যাকুলতা দেখে।

তিনি বিচারপূর্বক গুরুবরণের সময় বুঝতে পেরে সেই অনুযায়ী মন্ত্রীদের আদেশ করেছিলেন সদ্‌গুরু সন্ধানের জন্য। গল্পের প্রথমে ইঙ্গিত থাকা সত্ত্বেও তার মর্মার্থ তখন আবৃত ছিল। সব শেষে তা ঘটনাপরম্পরায় যথাকালে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। গুরু আত্মজ্ঞানের দীক্ষা দিয়ে শিষ্যকে আত্মজ্ঞান লাভ করার বিজ্ঞান বা কৌশল শিখিয়ে শিষ্যের আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাস দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দিয়ে সেখান থেকে সরে গেলেন। তা শিষ্যকে কেবলমাত্র পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই। সূক্ষ্ম ভাবে এই সব আলোচনা না-করলে এর অন্তর্নিহিত রহস্যগুলি সাধারণের কাছে কখনও বোধগম্য হবে না।

পঁচিশ বছর পরে গুরু বুঝতে পারলেন যে, শিষ্য সর্ববিধ দ্বৈতভাব ও বিকারের প্রভাবমুক্ত হয়ে অজ্ঞানের ঊর্ধ্বে অদ্বয়বোধে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এবং রাজর্ষি স্তরে উপনীত হয়ে সাম্রাজ্য পরিচালনা করছেন। এইবার দীক্ষার শেষ অধ্যায়টি বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সম্পন্ন করবেন বলে ছাব্বিশ বছরের মাঝামাঝি সময়ে তিনি শিষ্যের কাছে রাজদরবারে উপস্থিত হলেন। এই পঁচিশ বছরে রাজা পঞ্চবিংশতিতত্ত্ব

সম্যক্‌রূপে অবগত হয়ে তার মর্মার্থের সঙ্গে আপনাকে পরিপূর্ণ ভাবে অভিন্নরূপে হৃদয়ঙ্গম করে তত্ত্বসিদ্ধ এবং তত্ত্বজ্ঞ হয়েছেন। তার জীবত্বের অবসান হয়েছে। তিনি জীবন্মুক্তি বা অমৃতত্ব লাভ করেছেন এবং ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়েছেন।

এইরূপ অবস্থায় সদ্‌গুরুর আগমন হয়। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন। মন্ত্রীরা সকলে আপন আপন কার্যে রত ছিলেন। সভাসদ্‌বর্গরা নিজ নিজ কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এমন সময় সদ্‌গুরু রাজার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ামাত্র সকলেই রাজার সঙ্গে সঙ্গে আসন হতে উত্থিত হলেন। রাজা সর্বাগ্রে গুরুপদে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করেন। তারপর গুরুবন্দনা করে গুরুকে আপন সিংহাসনে বসালেন এবং তাঁর পদতলে যোগ্য শিষ্য সেবকের মতো করজোড়ে উপবেশন করলেন। রাজার মন্ত্রীবর্গ এবং রাজপ্রাসাদের সর্ব অনুচরবর্গ এবং অন্তরাল থেকে পরিবারের অন্যান্য সবাই রাজার কণ্ঠের সঙ্গে সুর মিলিয়ে গুরুস্তব করলেন। এই ভাবে সমগ্র রাজসভা, পাত্রমিত্র, পরিষদবর্গ, অতিথি পরিজন সবাই স্ব স্ব স্থান থেকেই গুরুকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে আনন্দিত হল। গুরু অতি প্রীত হয়ে সকলের জন্যই মঙ্গলবাণী, শুভ ও কল্যাণ আশীর্বাণী উচ্চারণ করলেন উদাত্ত কণ্ঠে।

তারপর শেষ অধ্যায়ে রাজপ্রাসাদে গুরু কালবিলম্ব না-করে রাজাকে বললেন—শুভলগন সমাগত। তোমার দীক্ষার অন্ত্যভাগ গ্রহণ করার শুভলগন এসেছে, তাই তোমাকে আমি নিতে এসেছি। তুমি এখনই সর্বসমক্ষে তোমার অনুভূতির দৃষ্টিতে সকলকে আত্মবোধে গ্রহণ করে সর্বলৌকিক সম্বন্ধ পরিহারপূর্বক আমাকে অনুসরণ কর।

অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে, রাজা প্রফুল্ল বদনে সদানন্দ ও প্রসন্ন চিত্তে যে-ভাবে প্রতিদিন রাজকার্য পরিচালনা করতেন এবং রাজসভায় উপস্থিত সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্বক সমবোধের ব্যবহার দ্বারা সকলকে আত্মানন্দ দান করতেন, আজও সে-ভাবেই সবার সঙ্গে সমব্যবহারের আচরণ করলেন এবং বিনা দ্বিধায় সর্বস্ব পরিত্যাগ করে গুরুর সঙ্গে রাজপ্রাসাদ থেকে চলে গেলেন। তাঁর গুরুর সঙ্গে রাজ্যত্যাগকালে রাজসভার কেউই বিচলিত ও বিব্রত হলেন না, দুঃখীও হলেন না, শোকগ্রস্ত বা মোহগ্রস্ত হলেন না। অন্দরমহলে পরিবারবর্গও ঠিক একই ভাবে প্রস্তুত ছিলেন। তারাও আনন্দের সঙ্গে শোক ও মোহ রহিত হয়ে রাজার সর্বত্যাগপূর্বক গুরুর সঙ্গে গমন স্বাভাবিক ভাবে মেনে নিলেন। এই আচরণকে অভিনব বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমজ্ঞান, আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞানের কী অপূর্ব মহিমা! এর কোনও তুলনা নেই।

রাজাকে নিয়ে গুরু তাঁর স্বধামে বা স্বস্থানে গমন করলেন, সেখানে লগন বুঝে শুভক্ষণে গুরু তাঁর শিষ্যকে গুরুর আসনে বসিয়ে বললেন—তুমি ছিলে সংসারের লৌকিক রাজা, এখন হলে সমগ্র বিশ্বের ও সৃষ্টির অধীশ্বর আত্মসম্রাট রাজাধিরাজ। তুমি অধ্যাত্মরাজ্যের মহারাজ। একদিন আমার প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি পূর্ণ চিত্তে নিজেকে আত্মদান করেছিলে আপনবোধে, আপনজ্ঞানে, সমজ্ঞানে বা অদ্বয়জ্ঞানে। পঁচিশ বছর সেই ভাববোধে সচেতন ভাবে নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত থেকে নিরন্তর আমার স্মৃতি বহন করে আমার সঙ্গে অভিন্ন ভাববোধে নিজেকে

অনুভব করে আমার কাছে তুমি যে আনুগত্য, ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও প্রেমের পরীক্ষা দিয়েছ তাতে আমি পরিপূর্ণ ভাবে প্রীত এবং ধন্য।

এখন আমার অনুভূতির পূর্ণতার অবশিষ্টাংশের একমাত্র যোগ্য অধিকারী তুমিই স্বয়ং। এইবার আমার জীবন সংবরণের শুভলগন এসেছে। আমি আপনাকে আপনবোধের পূর্ণতা দিয়ে তোমার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হচ্ছি। তোমার মধ্যে মিশে আমি এক হয়ে থাকব নিত্য একস্বরূপে। এতদিন 'তোমার আমি' ছিলাম, আজ হতে 'আমার তুমি' হয়ে গেলে এবং এই দুই ভাবের মহাসঙ্গমে রতিসন্ধিযোগে 'তুমি আমি' আবার 'আমি তুমি' যে পরম অদ্বয়তত্ত্ব পরব্রহ্ম পরমাত্মস্বরূপ, যা অনন্য অদ্বয় অখণ্ড ভূমা পূর্ণ স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব 'অ-ভেদাভেদতত্ত্ব', তা-ই হল পূর্ণ স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত। ধন্য তুমি, ধন্য আমি, ধন্য আমি, ধন্য তুমি; তুমি কৃতকৃতার্থ, আমি কৃতকৃতার্থ। জীবনে সর্বস্বার্থশূন্য এই পরমার্থতত্ত্ব সর্ব অধ্যাত্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়, সর্ববোধের পরম অধিষ্ঠান পূর্ণতম প্রিয়তমোত্তম।

সদ্‌গুরুর দেহ শিষ্যের দেহে মিশে একাকার হয়ে গেল। শিষ্য সদ্‌গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত হলেন। এই হল পরমার্থতত্ত্বের লৌকিক দৃষ্টিতে পূর্ণসিদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তির নিদর্শন।

আলোচ্য কাহিনিটির মধ্যে অধ্যাত্মজগতের সর্বোত্তম শিক্ষা, অধ্যাত্মবিদ্যার সর্বোত্তম লক্ষণ, জীবন্ত উদাহরণ স্বয়ংপ্রমাণ ও স্বয়ংসিদ্ধ যে-ভাবে হয় তার পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ই ব্যক্ত হয়েছে।

(*স্বজ্ঞানুগ্রহসুধা* ২য় খণ্ড হতে গৃহীত)

৩০১

কোনও এক সময় একটি লোক ভাবল যে, সে পোশাক তৈরি করার দোকান খুলবে। তার কাছে অর্থ এবং ইচ্ছা দু'টিই ছিল। তাই সে একটি সেলাই মেশিন, কিছু কাপড় ও দর্জির দোকানের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসপত্র কিনে ফেলল। দোকানের সামনে একটি বড় সাইনবোর্ড লাগিয়ে সে ব্যবসা শুরু করে দিল।

প্রথম যে খরিদ্দার এল সে একটি প্যান্ট তৈরি করতে দিল। এক সপ্তাহের মধ্যে প্যান্ট তৈরি হয়ে যাবে—এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে সে চলে গেল। খরিদ্দারটি চলে যেতেই দোকানি কাপড়টি কাটতে বসল কারণ সে জানত যে, প্যান্ট তৈরি করতে গেলে কাপড় কাটতে হয়। কিন্তু যখন সে কাটা টুকরোগুলি একসঙ্গে নিয়ে সেলাই করতে গেল তখন ভয় পেল। কারণ কাপড়টি সঠিক ভাবে না-কাটার দরুন কাটা টুকরোগুলি সে কিছুতেই মেলাতে পারছিল না। লোকটি বহু চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই পারল না। শেষ পর্যন্ত সে নিরস্ত হল। তার কাছে আর কোনও কাপড়ও ছিল না এবং সময়ও ছিল না, তাই সেই খরিদ্দার যখন ফরমাশ অনুযায়ী প্যান্ট নিতে এল তখন সে তাকে নানা অজুহাত দেখিয়ে একজন অভিজ্ঞ দর্জির কাছে পাঠিয়ে দিল।

সে তখন নিজের ও পরিবারবর্গের কাছে স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, শুধুমাত্র মেশিন, কাপড় এবং আকাঙ্ক্ষা থাকলেই হয় না, কারণ এ সমস্ত থাকা সত্ত্বেও সে

প্যান্টটি তৈরি করতে পারেনি। দর্জি পরে বুঝতে পারল যে, সে সেলাইশিল্পের বিজ্ঞান সম্বন্ধে পুরোপুরি অজ্ঞ। তখন সে কিছুদিনের জন্য দোকান বন্ধ রাখল এবং একজন দক্ষ দর্জির খোঁজ করতে লাগল, যিনি তাকে সেলাইয়ের বিজ্ঞান শেখাতে পারেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পরে সে একজন দক্ষ দর্জির খোঁজ পেল। তিনি তাকে সেলাই শেখাতে রাজি হলেন। সেই দর্জি তখন নিজের অযোগ্যতার কথা ভেবে পারিশ্রমিক না-নিয়ে কাজ করতে সম্মত হল। তিনি দর্জিকে প্রথমে তার কর্মপদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে বললেন, তারপর সেই কর্মপদ্ধতির কারণ মনোযোগ সহকারে শুনতে বললেন। তারপর অর্জিত অভিজ্ঞতার উপর মনন করতে বললেন, যা এই নবলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োগের আগেই সম্পন্ন করতে হবে। শিক্ষক বললেন যে, যখন এই কাজের ধাপগুলিকে সে ঠিক ভাবে অনুসবণ করতে পারবে তখনই সে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জনের জন্য ঐকান্তিক ভাবে অনুশীলন শুরু করবে। সেই শিক্ষানবিশ দোকানটি পুনরায় চালু করবার জন্য এবং খরিদ্দারদের সন্তুষ্ট করতে এত উদ্‌গ্রীব ছিল যে, সে শিক্ষকের উপদেশ নির্ভুল ভাবে পালন করল। শিক্ষানবিশির মেয়াদকাল সমাপ্ত হলে দোকানটি নূতন করে খোলার জন্য সে যথেষ্ট দক্ষতা অর্জন করল। এখন সে সহজেই নক্সাগুলি করতে পারে এবং এটাও বুঝতে পারল যে, কয়েকবছর অনুশীলন করলে সে খরিদ্দারদের চাহিদা অনুযায়ী যে কোনও সূক্ষ্ম নক্সা সহজেই তৈরি করে দিতে সক্ষম হবে। পরবর্তীকালে যখনই কেউ তার কাছে পরামর্শ চাইত সে বলত, একজন প্রকৃত গুরুর কাছে শিক্ষা লাভ করতে পারলেই পূর্ণ ফল লাভ করা যায়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পটি শেষ করে বললেন—অনেকেই 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছে এই ধারণা নিয়ে এসেছিল যে, শুধুমাত্র ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে মূল পদ্ধতিগুলি জেনে নিলে তারা নিজেরাই নিজেদের আত্মজ্ঞানী করে তুলতে পারবে। অবশ্য পরে কেউ কেউ জানিয়েছিল যে, তারা খুব একটা উন্নতি করতে পারেনি। এই থেকে বোঝা যায় যে, শুধুমাত্র একজন পূর্ণ স্বানুভবসিদ্ধ গুরুই একজন ভক্তকে বা শিষ্যকে প্রত্যক্ষ ভাবে অদ্বয়জ্ঞানের আলো দিতে পারেন।

(জুলাই, ১৯৮৩-১৯৮৪)

৩০২

গুরুর প্রতি বিশ্বাসের ফলে কী হয় সেই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক চোর একদিন একটি বড় বাড়িতে চুরি করতে ঢুকেছিল। সে যখন চুরি করে পালাচ্ছিল তখন পাহারাদার তার উপস্থিতি টের পেয়ে যায় এবং সাহায্যের জন্য চিৎকার শুরু করে। চোরটি ধূর্ত এবং উপস্থিতবুদ্ধিসম্পন্ন ছিল। সে তৎক্ষণাৎ ঐ দ্রব্যসামগ্রী এবং নিজের পরিধেয় বস্ত্রগুলি মাটির তলায় পুঁতে ফেলল। তারপর সারা শরীরে মাটি মেখে উলঙ্গ অবস্থায় একটি গাছের তলায় বসে পড়ল—যেন সে একজন ধ্যানমগ্ন যোগীপুরুষ!

পাহারাদারটি চোরটিকে খুঁজতে খুঁজতে সাধুবেশী চোরটি যেই গাছের তলায় বসেছিল সেখানে চলে এল, কিন্তু তাকে চিনতে পারল না। সে ভাবল, কোনও সাধু হয়ত গাছের নিচে বসে ধ্যান করছেন। কোনও সন্দেহ না-করে পাহারাদার ঐ ছদ্মবেশী চোরটিকে জিজ্ঞাসা করল, সে কোনও ব্যক্তিকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখেছে কি না। চোর পূর্ববৎ চোখ বন্ধ করে বসে রইল এবং কোনও উত্তর দিল না। পাহারাদার সাধুবেশী চোরটির দিকে তাকিয়ে আবার চোরের খোঁজে চলে গেল। কারওকে খুঁজে না-পেয়ে রক্ষীটি বাড়ির মালিককে জানাল যে, একজন সাধু ছাড়া বাগানে আর কেউ নেই। চোরটি এতই ধূর্ত ছিল যে, রক্ষী কিছুই বুঝতে পারল না।

বাগানে একজন সাধু বসে আছেন, এই সংবাদ পেয়ে বাড়ির লোকেরা তাকে দেখতে এল, এমনকী অনেকে সাষ্টাঙ্গে তাকে প্রণামও জানাল। সবাই তার কাছে তত্ত্বকথা শুনতে চাইল। কিন্তু চোরটি ধরা পড়ার ভয়ে মৌন হয়ে রইল। এই বাড়ির কর্ত্রী খুবই ধর্মপরায়ণা ছিলেন। তিনি সাধুটিকে প্রসন্ন করতে চাইলেন। সেই জন্য সাধুবেশী চোরটির আহারের ব্যবস্থা করলেন। বাইরের চেহারা দেখে বিচার করা ছাড়া তিনি অন্য কোনও উপায় জানতেন না। প্রথমে চোরটি বিবেকদংশনের ভয়ে কিছু খেতে চাইল না। পরে লোভের বশবর্তী হয়ে এবং গৃহকর্ত্রীর জোরাজুরিতে সে খাবার গ্রহণ করল। তা সত্ত্বেও চোরটি নিজের প্রকৃত স্বভাব যাতে প্রকাশ হয়ে না-পড়ে সেই জন্য খুব সতর্ক ছিল। এই ভাবে সাধকের আচার-আচরণ সম্বন্ধে সাধারণ লোকেদের যেরূপ ধারণা থাকে সেই ধারণা চোরটি বজায় রাখতে সমর্থ হল।

অন্য লোকেরাও তারপর নানা রকম খাদ্যদ্রব্য নিয়ে এল এবং ছদ্মবেশী চোর যতটা সম্ভব সে সব গ্রহণ করল। বাকি খাদ্যদ্রব্য একটি পুঁটলিতে বেঁধে দেওয়া হল। চোরটি যখন চলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত তখন গৃহকর্ত্রী তাকে ঐ পুঁটলিটি নিয়ে দরিদ্র মানুষজনের মধ্যে বিলি করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। অনেক পীড়াপীড়ির পরে সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল, কারণ তখনও সে কথা বলতে সাহস পাচ্ছিল না। সমাগত লোকেদের আশীর্বাদ করে সে বিদায় নিল এবং যেতে যেতে ভাবতে লাগল যে, সাধুর ছদ্মবেশ ধারণ করেই যদি এত কিছু পাওয়া যায় তাহলে একজন সত্যিকারের সাধু হলে কত কিই না পাওয়া যেতে পারে!

সে পুঁটলিটি নিয়ে বাইরে যেতেই একটি লোক ছুটে এল এবং সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানাল। এই আকস্মিক বাধায় চোরটি প্রথমে বিরক্ত হলেও যখন সে বুঝতে পারল যে, লোকটি তাকে তীর্থযাত্রায় সঙ্গী হতে বলছে তখন সে চিন্তান্বিত হওয়ার ভান করল, যদিও সে সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলল যে, সে এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাবে। সে এই প্রস্তাবে রাজি হল, কারণ বিনা খরচে তাহলে সারা দেশ ভ্রমণ করা যাবে।

ভক্তটি ঐ সাধুরূপী চোরটির শিষ্যত্ব গ্রহণ করল এবং সাধুটি তার সঙ্গে যেতে রাজি হওয়ায় সে খুব খুশি হল। যত দিন যেতে লাগল শিষ্যটি সাধুর প্রতি আরও বেশি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পড়ল এবং তাকে গুরুদেব বলে সম্বোধন করল।

কিছুদিন একসঙ্গে ভ্রমণ করার পর একদিন তারা একটি নদীর ধারে এল। সেখানে নদী পারাপার করার জন্য কোনও নৌকা ছিল না। ভক্তটি খুব বিচলিত হল। তাদের

পরবর্তী গন্তব্যস্থলে একটি বড় ধর্মীয় উৎসব হবে, কিন্তু সেখানে যেতে হলে নদী পার হতে হবে। ভক্তটি কিছুক্ষণ চিন্তা করে সাধুকে বলল—আপনি তো জানেন ঐ উৎসবে সময়ে পৌঁছানো কত প্রয়োজন, সুতরাং আমরা যাতে জলের উপর দিয়ে হেঁটে যেতে সমর্থ হই তার জন্য আপনি আপনার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগ করুন।

তারপর সাধুর উত্তরের অপেক্ষা না-করে ভক্তটি 'প্রেমের ঠাকুর, প্রেমের ঠাকুর, গুরুদেব, গুরুদেব' উচ্চারণ করতে করতে জলে নেমে পড়ল। ভক্তটির মন ভক্তি ও প্রেমে পূর্ণ ছিল এবং গুরুর অলৌকিক ক্ষমতায় তার কোনও সন্দেহ ছিল না।

জলের উপর দিয়ে ঐ ভাবে হেঁটে নদী অতিক্রম করে অপর পারে পৌঁছে ভক্ত গুরুকে চলে আসতে অনুরোধ করল। ভক্তটিকে ঐ ভাবে হেঁটে যেতে দেখে চোরটি খুব বিস্মিত হয়েছিল। সে ভাবল, ভক্তটি যদি গুরুর নাম জপ করে নদী পার হতে পারে তবে সেও পারবে। এই ভেবে সেও গুরুর নাম উচ্চারণ করতে করতে জলে নেমে পড়ল। কিন্তু কয়েক পা এগিয়েই নদীর খাড়া ঢাল বেয়ে যেতে গিয়ে নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে লাগল। ভক্তটি তখন তাকে উদ্ধার করে ডাঙায় নিয়ে এসে বলল—আমি ভেবেছিলাম আপনার স্থূল শরীরের জন্য আপনি জলে হাঁটতে পারছিলেন না। এই সরল স্বীকারোক্তি বুঝিয়ে দেয় যে, গুরুর অলৌকিক শক্তির প্রতি ভক্তটির এক মুহূর্তের জন্যও সন্দেহ জাগেনি। সাধুরূপী চোরটি তখন উপলব্ধি করল, তার স্বার্থপরতাই এই অক্ষমতার জন্য দায়ী এবং একমাত্র বিশ্বাসই অলৌকিক কাণ্ড ঘটাতে পারে। এই ঘটনার পরে সে বিশ্বাসের গুরুত্ব ও মর্ম বুঝতে পারল।

চোর ঠিক করল সে সত্যিকারের সাধু হবার জন্য যা যা করা দরকার তা-ই সে করবে। সেই জন্য ভক্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে একজন সদ্‌গুরুর খোঁজে সে বেরিয়ে পড়ল যাঁর নির্দেশ মেনে আধ্যাত্মিক জীবনযাপন করে সে পরমজ্ঞানের অধিকারী হতে পারবে।

(জুলাই ১৯৮৩-১৯৮৪)

৩০৩

সৎপ্রসঙ্গকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আজ একটি গল্প বললেন।

যে-সকল ভেড়া পাহাড়ে চরে বেড়ায় তারা পাহাড়ি ঝরনার জল খেতে যায়। সেখানে আবার অন্য বন্য হিংস্র জন্তুজানোয়ারও জল খেতে যায়। একদিন একদল ভেড়া পাহাড়ি ঝরনার জল খেয়ে কাছাকাছি চরে বেড়াচ্ছিল। সেই সময় একটি সিংহী সেই ঝরনায় জল খেতে আসে। সেই সিংহীর গর্ভে বাচ্চা ছিল। দু-একদিনের মধ্যেই হয়ত বাচ্চা প্রসব করত, এমন অবস্থায় সে সেখানে জল খেতে আসে। কাছাকাছি ভেড়ার দল চরে বেড়াচ্ছে দেখে সে স্বভাববশত খাবার লোভে লাফ দিয়ে একটি ভেড়াকে ধরতে গিয়ে পাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি বাচ্চা প্রসব করে সিংহীটি মরে যায়। সিংহীর বাচ্চাটি ভেড়ার দলের সঙ্গে মিশে যায়। সিংহীর বাচ্চাটি ভেড়ার বাচ্চাদের সঙ্গে তাদের মায়ের দুধ খেয়ে বড় হতে থাকে এবং

ধীরে ধীরে মাঠে ঘাস খেতে শেখে। এই ভাবে সে ভেড়ার দলেই বড় হতে লাগল। ভেড়াদের সমানই সিংহ শাবকটি বড় হয়ে উঠছে। একদিন পাহাড়ে চরে বেড়াবার সময় অন্য একটি সিংহ দূর থেকে ভেড়ার দলে এক সিংহ শাবককে ভেড়াদের সঙ্গে ঘাস খেতে দেখে অবাক হয়ে ভাবল, আমাদের যারা খাদ্য তাদের দলে আমাদের জাতের একটি সিংহ কী করে মিশে গিয়েছে এবং ঘাস খাচ্ছে! তাকে যে-ভাবেই হোক আমাদের দলে নিয়ে আসতে হবে। সিংহটি তাকে তাকে থাকে ও সুযোগ খোঁজে, কিন্তু ভেড়ার দল তা বুঝতে পেরে পালিয়ে যায়, সেই সঙ্গে সিংহ শাবকটিও দৌড়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিন চেষ্টা করার পর সেই সিংহ একদিন সিংহ শাবকটিকে ধরে ঝরনার পারে নিয়ে আসে। সিংহ শাবকটি ভয়ে জড়সড় হয়ে কাঁপতে থাকে। সিংহটি গর্জন করে সেই সিংহ শাবককে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, সে সিংহ, ভেড়া নয়। এ রকম ভাবে কিছুক্ষণ চেষ্টা করার পর সিংহ শাবকটি তার সত্য পরিচয় জানতে পারে। তখন সিংহ সেই সিংহ শাবককে হাড্ডিসহ কাঁচা মাংস খেতে দেয়, কিন্তু অনভ্যাসে সে তা খেতে পারছিল না। সে অনায়াসে ঘাস খায়। সিংহ সেই সিংহ শাবককে ধরে জঙ্গলে নিয়ে যায়। অন্যান্য সিংহ শাবকদের সঙ্গে কয়েকদিন থেকে সে ধীরে ধীরে কাঁচা মাংস খেতে শেখে এবং বড় সিংহদের মতো হুংকার দিতে শেখে। তখন সে আর ঘাস খায় না, অন্য জন্তু মেরে খেতে শিখেছে। সে তখন তার স্বধর্ম ফিরে পেয়েছে। এতকাল সে ভেড়ার দলে থেকে ভেড়ার ধর্ম প্রাপ্ত হয়েছিল। এখন ভেড়ার ধর্ম ভুলে সে নিজ ধর্মে ফিরে এল। সিংহটি তাকে উদ্ধার করল ও তার স্বধর্ম ফিরিয়ে আনল।

গল্পটি শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা আত্মস্বরূপ ভুলে জীবধর্ম নিয়ে সংসারে চলে। জীবধর্মের লক্ষণ হল জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি, সুখ, দুঃখ ভোগ করা। জগৎ জুড়ে সংসারী জীবের এই একই ধর্ম। আত্মার স্বভাব ভুলে জীবভাবে চলে জীব তার মুক্তস্বরূপের কথা জানতেও পারে না ও শুনলে মানতেও পারে না। সে আত্মজ্ঞানীদের কাছ থেকে বহু দূরে সরে থাকে। সে দিব্য মুক্ত অমৃত আত্মা অপেক্ষা সংসারে ভোগী জীবনই পছন্দ করে বেশি। সে জানে না তার মধ্যে অমৃতময় দিব্য আত্মা অবস্থান করছে। আত্মজ্ঞপুরুষ আপন অমৃতময় দিব্য মুক্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি সংসারবদ্ধ জীবকে আত্মবোধে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করার জন্য আত্মবোধের স্বরূপকে তার কাছে ব্যক্ত করেন। আপন মুক্তস্বরূপ আত্মার মহিমা শুনে যারা আত্মবোধের জিজ্ঞাসা নিয়ে এগিয়ে আসে, আত্মজ্ঞগুরু তাদের আত্মবোধে প্রবোধিত করার জন্য আত্মবোধের বিজ্ঞান শিক্ষা দেন। আত্মজ্ঞগুরুর সঙ্গে থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে আত্মজিজ্ঞাসু আত্মানুশীলন করতে করতে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আত্মগুরুর নির্দেশ অনুসারে অপরকেও আত্মবোধে প্রবোধিত করার কাজে ব্রতী হন। অনাত্মাপ্রিয় বিষয়ভোগী সংসারী জীব দুঃখকষ্টপূর্ণ জন্ম-মৃত্যুর সংসারে ঘুরে বেড়ায়। স্বকল্পিত অনাত্মাপ্রীতিবশত অজ্ঞান, মোহের প্রভাবে বদ্ধ জীব দুঃখকষ্ট ভোগ করতে করতে যখন শ্রান্তক্লান্ত হয়ে অসহায়বোধে দুঃখমুক্তির উপায় খোঁজে, তখন সে আত্মজ্ঞগুরুর সন্ধান করে। আত্মজ্ঞগুরুই হলেন

সদ্‌গুরু। সদ্‌গুরুর সন্ধান সে প্রথমে পায় না, অন্যান্য গুরুদের সাহায্যে সে অজ্ঞানমুক্ত হবার চেষ্টা করে। তার অন্তরের ব্যাকুলতার মান তীব্র হলে সদ্‌গুরুর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়। তাঁর কৃপায় আত্মবোধের সাধনায় সে মনোনিবেশ করে এবং স্বকীয় চেষ্টায় ও গুরুকৃপায় যোগ্যতা লাভ করে যথাকালে আত্মবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

গল্পটির মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল, সংসারী জীবমাত্রই আত্মবিস্মৃত দলভ্রষ্ট সিংহশাবক আর সদ্‌গুরু হলেন সিংহ স্বয়ং। তাঁর কৃপাতেই জীব তার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মস্বরূপ ফিরে পায়।

(এপ্রিল, ১৯৮৪)

৩০৪

মহৎ চিন্তা কখনও অশুভ বা মন্দ পরিণাম আনতে পারে না। এটা বোঝাবার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন। তিনি সবাইকে গল্পটি মন দিয়ে শুনতে বললেন এবং বারবার গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি চিন্তা করতে বললেন। গল্পটির নাম— 'নেকড়ে-বালক'।

এক নিঃসন্তান প্রৌঢ় দম্পতি অনেকদিন ধরেই অন্তরে একটি সন্তানের কামনা লালন করছিল। ইচ্ছাপূরণের আশায় তারা এক সাধুর কাছে গিয়ে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করল। সাধু তাদের অনুরোধ ও যুক্তি শুনে ধ্যানে বসলেন। কিছুক্ষণ ধ্যান করার পর প্রকৃতিস্থ হলে তিনি দম্পতিকে বললেন যে, কোনও সন্তান ছাড়াই তাদের জীবনে বেঁচে থাকতে হবে—এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা। দম্পতি এই কথায় সন্তুষ্ট হল না। তারা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তাদের সন্তানকামনা এত তীব্র ছিল যে, সাধকের কাছে তারা বর প্রার্থনা করল।

দম্পতিব আন্তরিক ও বিনীত প্রার্থনায় সাধক অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তাঁর মনে করুণা ও দয়ার উদ্রেক হল। তিনি তখন তাদের আশীর্বাদ করলেন। বনে তারা ফিরে গিয়ে সংযম ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে নিয়মিত একনিষ্ঠ ভক্তি সহকারে পরমাত্মার ধ্যানাভ্যাস করে শুধু ফল খেয়ে জীবনধারণ করতে বললেন এবং একটি নির্দিষ্ট নদীর জলে স্নান কবার আদেশ দিলেন। তিনি আরও বললেন যে, সন্তান পেতে হলে পাঁচ বছর তাদের এই ভাবে জীবনযাপন করতে হবে। সাধক তাদের সতর্ক করে দিয়ে আরও বললেন যে, এই সন্তান আনন্দ দেবার বদলে দুঃখই দেবে বেশি। দম্পতি ভাবল, তারা যে কোনও পরিণামের জন্যই প্রস্তুত হয়ে থাকতে পারবে। তারপর সাধুর আশীর্বাদ পেয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তারা চলে গেল।

দম্পতি আন্তরিক ভাবেই মহাত্মাজির নির্দেশ অনুযায়ী চলতে লাগল। পঞ্চম বৎসর অতিক্রান্ত হলে তারা একটি বিকৃত ও কুৎসিত চেহারার পুত্রসন্তান লাভ করল। তাতে তাদের মনে কোনও বিকার হল না, বরং তারা সেই সন্তান লাভ করে আনন্দই প্রকাশ করল।

বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির মধ্যে নানা রকম বদভ্যাস গড়ে উঠতে লাগল এবং মা-বাবার কাছে বিরক্তিকর ও দুর্বিষহ হয়ে উঠল।

একদিন বালকটির পিতা তার বন্য আচরণে বিরক্ত হয়ে উঠল এবং তাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসার কথা চিন্তা করে স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করল। পিতার ইচ্ছা বালকটিকে হত্যা না-করে বনে রেখে আসা, যাতে তারা দু'জনে সুখশান্তিতে জীবন অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু তার স্ত্রী এই প্রস্তাবে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলল যে, বালকটি তাদের নিজেদের সন্তান এবং কিছুতেই সে তাকে পরিত্যাগ করতে পারবে না। কিছুদিন পর বালকটির মাও তার আচরণ আর সহ্য করতে পারল না এবং স্বামীর প্রস্তাবে সম্মত হল। এমনকী স্বাভাবিক মাতৃস্নেহও বালকের এই পরিণতি রোধ করতে পারল না। তখন তারা বালকটিকে গভীর জঙ্গলে রেখে আসার সিদ্ধান্ত নিল এবং কয়েকদিন বাদে ছেলেটিকে নিয়ে গিয়ে বনে ছেড়ে এল। সেখানে একটি অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। একটি স্ত্রী-নেকড়ে এগিয়ে এল এবং ছেলেটিকে মুখে করে বাসায় নিয়ে গেল— খেয়ে ফেলল না। নেকড়ের বাসায় এসেই ছেলেটি মা-নেকড়ের শাবকগুলির সঙ্গে খেলতে আরম্ভ করল—সে যেন তাদেরই একজন।

কিছুদিন শাবকগুলির সঙ্গে থেকে বালকটি নেকড়ের মতোই গর্জন করতে শিখল, টাটকা কাঁচা মাংস খেতে শিখল এবং শাবকগুলির সঙ্গে খেলতে লাগল। বিকলাঙ্গ হওয়া সত্ত্বেও সে খেলাধুলা ও শিকারে পটু হয়ে উঠল এবং মানবসন্তান হয়েও নেকড়ের মতোই আচরণ করতে লাগল। একদিন এক ব্যাধ এই অদ্ভুত বালকটিকে দেখতে পেল। সে অবাক হয়ে গেল এই ভেবে যে, বিকলাঙ্গ মানবশিশুটি নেকড়ের দলে কী করে গেল! সে নেকড়ে-বালকটিকে ধরার চেষ্টা করাতে বালকটি দ্রুত পালিয়ে গেল। তখন ব্যাধ একটি ফাঁদ তৈরি করল। বেশ কিছুদিন বালকটি ফাঁদ এড়াতে সক্ষম হল, কিন্তু একদিন অন্যমনস্ক হয়ে ফাঁদে ধরা পড়ল। ব্যাধ তখন বালকটিকে খাঁচায় বন্ধ করে নিকটবর্তী একটি শহরে নিয়ে এল এবং সাধারণের জন্য উন্মুক্ত স্থানে খাঁচাটি রাখল। জনসাধারণ ভীত চিত্তে নেকড়ে-বালকটিকে দেখতে লাগল এবং তাকে দেখে কিছুটা রোমাঞ্চ অনুভব করল।

বালকটিকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যাধ তাকে মনুষ্যোপযোগী খাদ্য যা ব্যাধ নিজে খায় তাই খাওয়াবার চেষ্টা করল। কিন্তু বালক সেই খাবার প্রত্যাখ্যান করল। ব্যাধের শিকার করে আনা তাজা কাঁচা মাংসই সে কেবল মুখে তুলত। তারপর ব্যাধ তার আচারব্যবহার পাল্টাতে চাইল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ব্যর্থ হল। বালকটি বনে যে রকম বুনো ছিল সে রকমই রয়ে গেল, কোনও রকম পরিবর্তন হল না।

তারপর কিছুদিন বাদে একটি ঘটনা ঘটল—নেকড়ে-বালকটির মা একদিন একটি বিশেষ কাজে শহরে এল। খাঁচাটি শহরের মধ্যস্থলে রাখা ছিল এবং বালকটির মা তাকে না-দেখে থাকতে পারল না। তাকে দেখেই চিনতে পারল যে, এ-ই তার সন্তান যাকে সে বনে রেখে এসেছিল। নিজের সন্তানকে ঐ অবস্থায় দেখে সে খুব দুঃখ পেল এবং অনুতাপে তার হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে গেল। তখন সে অনুভব করল যে, অভীষ্টপূরণের আশায় ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়া কোনও মতেই উচিত নয়। ভাগ্য অপ্রসন্ন থাকলে বুঝতে হবে তারও একটি কারণ আছে। মহাত্মাজির সাবধানবাণী তার মনে

পড়ল এবং বুঝতে পারল যে, সাধারণ মানুষ এ সব কিছুই জানে না—দিব্য পরিকল্পনার সামান্য অংশই মানুষ বুঝতে পারে, সম্পূর্ণ ভাবে কখনওই বুঝতে পারে না। বিষণ্ণ চিত্তে বালকটির মা কারও সঙ্গে কোনও কথা না-বলে তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান ত্যাগ করল, এমনকী ছেলেটির সঙ্গেও দেখা করল না। গভীর শোকে, দুঃখে সে অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং বহুদিনযাবৎ শয্যাশায়ী হয়ে রইল।

এই ভাবে দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হতে লাগল এবং মানুষও খাঁচার নেকড়ে-বালকটিকে দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেল। একদিন দিনের অন্তিম লগ্নে একটি শিশুকে নিয়ে তাব মা বাজারে এসেছিল। শিশুটির মা রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে দোকান থেকে জিনিসপত্র কিনছিল। এই সময় শিশুটি খাঁচার কাছে যায় কৌতুহলবশত। ছেলেটি অবাক হয়ে দেখছিল। তখন কাছে বিশেষ লোকজন কেউ ছিল না। খাঁচার ভিতরে নেকড়ে-বালকটি সুযোগ বুঝে শিশুটিকে ধরে টেনে খাঁচার ভিতরে নিতে না-পারলেও তাকে কামড়িয়ে খেতে আরম্ভ করল তার বন্য স্বভাববশত। শিশুটির আর্তনাদে তার মা খাঁচার দিকে ছুটে এল। এই দৃশ্য দেখে ভয়ে সে চিৎকার করে জ্ঞান হারায়। আশেপাশের লোকজন সবাই ঘটনাগুলি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল, কিন্তু তারা কোনও প্রতিকার করতে পারল না। তারা খুব ভয় পেয়ে গেল এবং এ রকম ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না-ঘটে এই ভেবে তারা ঠিক করল যে, নেকড়ে-বালকটিকে বনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করবে।

নেকড়ে-বালকটিকে শহর থেকে অনেক দূরে একটি জঙ্গলে নিয়ে আসা হল। এই বনে একজন উচ্চ স্তরের মহাত্মা বাস করতেন। তিনি লোকগুলির উদ্দেশ্য বুঝতে পারলেন। তখন তিনি তাদের অনুরোধ করলেন নেকড়ে-বালকটিকে তাঁর কাছে রেখে যেতে এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, নেকড়ে-বালকটি আর কখনও শহরে গিয়ে কারও অনিষ্ট করবে না। এই মহাত্মা অধ্যাত্মসাধনায় পূর্বে উল্লিখিত সাধকের চেয়ে এক ধাপ উপরে ছিলেন। শহরের লোকেরা মহাত্মাকে খুব শ্রদ্ধা করত এবং তাঁর অনুরোধে তারা রাজি হয়ে গেল।

কিন্তু নেকড়ে-বালকটিকে মানুষ তৈরি করা মহাত্মার পক্ষেও সম্ভব হল না। তিনি বুঝতে পারলেন এর পিছনে কোনও গভীর রহস্য আছে। তখন ধ্যানের দ্বারা এবং নিজের আধ্যাত্মিক শক্তির বলে জানতে পারলেন যে, এই বালক এক দম্পতির নিম্ন মনের ইচ্ছার ফসল এবং এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে একজন যোগীপুরুষের দুর্বলতা, যিনি এই দম্পতির প্রার্থনায় সংযম রাখতে না-পেরে তাদের সন্তান লাভের বর দিয়েছিলেন।

তখন মহাত্মা ধ্যানের মাধ্যমে সাধুটির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন এবং বালকের প্রতি তাঁর দায়িত্বের কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—যা তাঁর অর্জিত আধ্যাত্মিক শক্তির অপব্যবহারের ফলস্বরূপ। কিন্তু সাধুটির মনে সংশয় থাকায় তিনি এই ব্যাপারে কিছু করতে রাজি হলেন না।

অবশেষে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দেশ পাবার জন্য সাধু ধ্যানে বসলেন। ঈশ্বর তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হয়ে বললেন—একজন মানুষ করুণা ও ভালবাসার বশবর্তী হয়ে

অন্যকে সাহায্য করার কথা ভাবতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না সে পরমাত্মার সঙ্গে পূর্ণ ভাবে যুক্ত হতে পারে ততক্ষণ সে প্রতিক্রিয়াশীল ফলাফলের হাত থেকে মুক্ত হতে পারে না। ঈশ্বর তাঁকে আরও বললেন—শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক শক্তি অর্জন করাই মানুষের জীবনের লক্ষ্য নয়, অদ্বয়জ্ঞান লাভ করে পরমাত্মার সঙ্গে অভেদে মিলিত হওয়াই জীবনের চরম লক্ষ্য। তাহলেই বিরুদ্ধ শক্তিগুলি দিব্যশক্তির প্রভাবে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। কারণ ঈশ্বরই সর্বকারণের আধার।

তখন সাধু বিরুদ্ধ শক্তির অবসানের জন্য ঈশ্বরের কাছে বিনীত ভাবে প্রার্থনা জানালেন। ঈশ্বর তাঁকে মহাত্মার কাছে গিয়ে জ্ঞান লাভ করতে বললেন। সাধু মহাত্মা তাঁকে এক-এর বিজ্ঞান শুনিয়ে বললেন যে, পরম এক-কে অনুভব করতে পারলেই প্রতিক্রিয়ার দোষগুলি থাকবে না।

তারপর সাধক গভীর ধ্যানে ডুবে গেলেন। তিনি সমাধির চরম স্তরে পৌঁছে পরমাত্মার সঙ্গে একীভূত হয়ে গেলেন। এই ভাবেই তিনি নিজের দোষগুলিকে শুদ্ধ করলেন এবং Light of Oneness ও 'All Divine for All Time, as It Is'-এর জ্ঞান দ্বারা পশুসুলভ আচার-আচরণ দূর করলেন।

সাধু মহাত্মার কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে, এক-এর বিজ্ঞান একজন যথার্থ অনুভবসিদ্ধ গুরুর কাছ থেকেই লাভ করতে হয়, তাহলেই পরমাত্মাব সঙ্গে অভেদে মিশে যাওয়া সম্ভব হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও বললেন—পরমাত্মা সর্ববস্তুকেই আত্মগত করে নেন। এটাই Perfection of perfection, Realization of realization। মানুষকে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হবে, এটাই জীবনের প্রথম ও মুখ্য উদ্দেশ্য। যদি তা অনুসরণ না-করা যায় তাহলে অপ্রধান বা গৌণ উদ্দেশ্যগুলি মুখ্য হয়ে উঠবে এবং প্রধান উদ্দেশ্য গৌণ ও আবৃত হয়ে যাবে। অন্য সাধকরা এক-এর বিজ্ঞান দিতে পারেন না। তাঁরা বড়জোর আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের ভূমিকাটুকু বলতে পারেন, কিন্তু Light of Oneness-এর জ্ঞান দিতে পারেন না। এই গল্পটি থেকে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তা হল, অদ্বয়জ্ঞান ব্যতিরেকে সমস্ত জ্ঞান অপূর্ণ, অসিদ্ধ, বিকারী ও পরিণামী। অদ্বয়জ্ঞানে সব রকম বিকারের অবসান হয়। প্রথম সাধুটি অদ্বয়জ্ঞানের অভাবে দ্বৈতজ্ঞানের সিদ্ধি দ্বারা দম্পতিকে যে আশীর্বাদ করেছিলেন তার ফল বিকারী ও পরিণামী। তা দুঃখ ও অশান্তির কারণই হয়েছে। অজ্ঞানের ফল সব সময় দুঃখময় ও অশান্তিময় হয়। দ্বিতীয় মহাত্মা অদ্বয়জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে দুঃখপ্রদ দ্বৈতজ্ঞানের পরিণাম অবগত হয়ে প্রথম সাধুকে ছেলেটির দায়িত্ব নিতে বলেছিলেন এবং তাঁকে সেই বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছিলেন। প্রথম সাধুটি ধ্যানযোগে ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে দ্বিতীয় মহাত্মার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাঁর নির্দেশে বা উপদেশে অদ্বয়জ্ঞানের রহস্য অবগত হয়ে তার দ্বারা তিনি এই অজ্ঞানমূলক দুঃখপ্রদ অশুভ পরিণামের সমাধান করতে সমর্থ হন। দ্বৈতসিদ্ধির বিকার ও পরিণাম থাকেই। তা-ই জীবনে দুঃখকষ্টের কারণ হয়। অদ্বৈতসিদ্ধি দ্বৈতসিদ্ধির বিকার ও পরিণামকে শোধন করে নেয়। অদ্বৈতবোধের সাধনা উত্তম অধিকারী ছাড়া অপরের পক্ষে সম্ভব নয়। একবোধে বা সমবোধে

প্রতিষ্ঠিত আত্মজ্ঞপুরুষ অতীব দুর্লভ। এই সাধনা দুঃসাধ্য হলেও অসম্ভব নয়। দ্বৈতবোধের সংসারজীবন সমস্যায় ভরা। তার মূল কারণ হল ভোগেচ্ছা কাম। অবিদ্যা-অজ্ঞানের পূর্ণ অবসান ও সর্বসমস্যার পূর্ণ সমাধান হল অদ্বয় আত্মজ্ঞান। আত্মবোধকে জীবনের লক্ষ্য রেখে আপনবোধে সব 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই হল তার সহজ সাধন ও উপায়।

২৮। ১১। ৮৪

৩০৫

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর সৎপ্রসঙ্গ আলোচনাকালে বললেন—যদি তোমরা 'এর' (নিজের দিকে ইঙ্গিত করে) কথার সারমর্ম বুঝতে চেষ্টা কর এবং মনে রাখতে পার তাহলে তা-ই তোমাদের পাকাআমিকে বা ঈশ্বরকে জানতে সাহায্য করবে। কিন্তু তোমাদের তা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে। চঞ্চল মন যেন একটি খেলার বল যা অসতর্কতাবশত হাত থেকে পড়ে যায়, তারপর সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়তে পড়তে নিচে অদৃশ্য হয়ে যায়। ঠিক এই ভাবে মুহূর্তের ভুলেও মন যদি লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয় তাহলে ক্রমাগত নিচের দিকে চলে যাবে এবং শেষে অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবে যাবে। বেশির ভাগ মানুষই রাজনীতি, ধনসম্পদ, ইন্দ্রিয়জ আমোদ-আহ্লাদ ইত্যাদির মধ্যে মত্ত থাকে। কিন্তু সত্যিই তারা কী পায়? কিছুই না। এই সব অনিত্য ও জাগতিক বস্তুর পিছনে ছুটোছুটি করে ক্ষণিকের সুখই পাওয়া যায় এবং পরিণামে দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হয়। এরাই আমিরূপ বলটি হারিয়ে ফেলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে ফেলে সত্য, জ্ঞান, সুখ-শান্তি যা ঐ বলের মধ্যেই নিহিত থাকে।

এক আলোকগৃহের রক্ষক অনেকদিন যাবৎ তার দায়িত্ব পালন করত। প্রত্যেকে তার কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা পোষণ করত এবং মনে করত, এ-রকম একজন সতর্ক রক্ষক পাওয়া তো আশীর্বাদ! সে এই কাজের জন্য পুরোপুরি যোগ্য ছিল এবং তার এই সতর্ক প্রহরার উপর অনেকগুলি জীবন নির্ভর করত।

একদিন সে ঘুমিয়ে পড়ল এবং ঘুম ভাঙতেই তার ভয় হল এই ভেবে যে, তার এই কর্তব্যে অবহেলা ও সজাগ না-থাকা নিশ্চয়ই জানাজানি হয়ে গিয়েছে! কিন্তু সে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল তখন কেউই তার এই কর্তব্যচ্যুতি লক্ষ্য করেনি এবং তাতে কারও কোনও ক্ষতিও হয়নি। যাই হোক, কিছুদিন পরে আবার সে ঘুমিয়ে পড়ল। সে ভাবল, আগেরবার তো কেউই তার এই অসতর্কতা লক্ষ্য করেনি তাহলে একটু ঘুমিয়ে নিলে ক্ষতি কি! এই রকম ভাবে কুযুক্তি প্রয়োগ করে সে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল এবং এই ভাবেই ধীরে ধীরে যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়া অভ্যাসে পরিণত করে ফেলল। সে উপলব্ধি করার চেষ্টা করল না যে, একবার একটি অভ্যাস গড়ে উঠলে (বিশেষ করে মন্দ অভ্যাস) দক্ষতা হারিয়ে যায়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রত্যেককেই নিখুঁত হতে হবে, অন্তত তাকে চেষ্টা করতে হবে, কারণ পূর্ণতাই মানুষকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের পথে নিয়ে যেতে পারে। আত্মা স্বয়ংপূর্ণ।

এই অলোকগৃহের রক্ষক কাজটি করতে সক্ষম, এ কথা আর বলা যাবে না, কারণ সে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ার নূতন অভ্যাসটিকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

এই ভাবেই মানুষ সত্যভ্রষ্ট হয় এবং আত্মবোধের অন্তরায় সৃষ্টি করে। সত্যভাববোধের উপরে আত্মবোধ প্রতিষ্ঠিত। আত্মবোধের অভাবে মানুষ দুঃখকষ্ট ভোগ করে।

২৬। ১২। ৮৪

৩০৬

প্রত্যেক মানুষেরই নিজ কাজ সাধ্য মতো সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করার চেষ্টা করা উচিত। এই ভাবটির উপরে জোর দিতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরেকটি গল্প বললেন।

একজন প্রহরী একটি গৃহস্থবাড়িতে রাত জেগে পাহারা দেওয়ার জন্য মোটা টাকা মাসোহারা পেত। একদিন সকালে সে গৃহকর্তাকে একটি নির্দিষ্ট স্থানে যেতে বারণ করল, কারণ সে স্বপ্ন দেখেছে যে, ঐ স্থানে একটি দুর্ঘটনা ঘটবে। প্রহরীর অনুরোধে গৃহকর্তা সেই স্থানে গেলেন না এবং পরদিন সকালে প্রহরীটিকে তার সাবধানবাণীর জন্য পুরস্কৃত করলেন, কিন্তু গৃহকর্ত্রী তৎক্ষণাৎ তাকে বরখাস্ত করলেন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটু থেমে উপস্থিত ভক্তদের জিজ্ঞাসা করলেন, কেন গৃহকর্ত্রী প্রহরীকে আর কাজে বহাল রাখলেন না। সবাই চুপ করে রইল। তখন তিনি বললেন—গৃহকর্তা প্রহরীকে পুরস্কৃত করেছিলেন, কারণ সে বিপদের পূর্বাভাস দিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। কিন্তু গৃহকর্ত্রী তাকে বিদায় দিয়েছিলেন তার কর্তব্যে অবহেলার দরুন—যখন তার জেগে থাকার কথা তখন সে ঘুমিয়েছিল এবং ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল। গল্পটি থেকে এটাও বোঝা যায়, মহিলারা বিশেষত পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় জীবনের অন্দরমহলের নানা ব্যাপারে বেশি ব্যাপৃত থাকে এবং পুরুষেরা থাকে বাইরের অনুষঙ্গ নিয়ে। মন-বুদ্ধি ব্যর্থ হলে জীবনীশক্তি সুষ্ঠু ভাবে ক্রিয়া করতে পারে না।

২৬। ১২। ৮৪

৩০৭

একদিন ফার্ন রোডে সান্ধ্য ভাষণের সময় হঠাৎ বাইরে প্রকৃতি অশান্ত হয়ে উঠল এবং ধুলোর ঝড় বইতে লাগল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগ লক্ষ্য করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভক্তদের উদ্দেশে একটি গল্প বললেন।

একটি জনগোষ্ঠীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল। তার ফলে কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ সীমিত থাকায় বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তারা বিভক্ত হতে বাধ্য হল। অনেকগুলি উপদল গঠিত হল এবং প্রত্যেকটি উপদলই নিজ নিজ বাসস্থানের খোঁজে বেরিয়ে পড়ল।

এদের মধ্যে একটি দল লটবহরসমেত হাঁটতে হাঁটতে একদিন এক সুবিশাল মালভূমিতে এসে পৌঁছাল। জায়গাটি তাদের কাছে বাসের উপযোগী বলে মনে হল। তারা আলোচনা করে ঠিক করল যে, সেখানেই সকলে বসবাস করবে। তখন জল ও জ্বালানি কাঠের খোঁজে কয়েকজন গেল এবং অন্য কোনও গোষ্ঠীর সীমানার মধ্যে

যাতে ঢুকে না-পড়ে তা সুনিশ্চিত করতেও লোক পাঠানো হল। ইতিমধ্যে সেখানে তাঁবু খাটিয়ে রান্নার আয়োজন করা হল এবং যারা জল ও জ্বালানি কাঠের সন্ধানে গিয়েছিল তারা ফিরে আসতে সিদ্ধান্ত নিল যে, সেই রাতে সবাই মিলে তারা সেখানেই থেকে যাবে।

রাতে প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। তাদের খাটানো তাঁবু রক্ষা করতে গিয়ে ঐ লোকগুলি প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হল। এই রকম ঝড় কয়েকদিন পর পর হল। এই অসুবিধায় পড়ে তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল যে, এই প্রচণ্ড ঝড়ের মধ্যে মালভূমিতে বসবাস করা অসম্ভব ব্যাপার। তারা অবশ্য ঠিকই বলেছিল, কারণ এত ঘন ঘন ঝড় আসছিল যে, তাদের সংগ্রাম করে টিকে থাকার শক্তি আর ছিল না। তখন তারা ঐ স্থান ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিল।

তারপর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তারা সেখান থেকে প্রস্থান করল। কিন্তু পথে মাঝেমধ্যেই তারা এখানে-ওখানে থেমে পড়তে বাধ্য হচ্ছিল, কারণ এই ঝড়-ঝঞ্ঝাবহুল আবহাওয়া যেন তাদের পদে পদে অনুসরণ করছিল। যাই হোক, কিছুদিন পরে তারা গুহাবিশিষ্ট একটি মনোরম জায়গায় এসে উপস্থিত হল। ঐ স্থান বসবাসের উপযোগী এবং প্রচুর গাছ ও ফলে ভরা ছিল। কাছেই একটি ছোট নদীও ছিল। তাদের কাছে জায়গাটি যেন স্বর্গ বলে মনে হল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, এখানেই থাকবে এবং এমন একটি স্থান পেয়ে ঈশ্বরের কাছে বারবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। সেখানে তারা সুখেশান্তিতে মিলেমিশে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিরাপদে বাস করতে লাগল। এই ক্ষুদ্র দলটি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি লাভ করল এবং একটি সুশৃঙ্খল সমাজে পরিণত হল। কিন্তু এদেরও সংখ্যা বৃদ্ধি পেল এবং এত বেশি বৃদ্ধি পেল যে, শান্তি বজায় রাখার জন্য তারা বিভক্ত হবার সিদ্ধান্ত নিল। প্রত্যেকটি দলই এই ভাবে নূতন নূতন বাসস্থান তৈরি করল, বৃদ্ধি পেল এবং বিভক্ত হল। কিন্তু প্রথম দলটি যে রকম স্বর্গের মতো বাসস্থান খুঁজে পেয়েছিল সেই রকম স্থান অন্য কোনও দলই খুঁজে পেল না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রত্যেক সত্যান্বেষী সাধককেই কিছুদিন ঝড়-ঝঞ্ঝাপূর্ণ অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু এই দুর্যোগ আসলে প্রাণকে নির্দেশ করে যা (জীবনীশক্তি) সাধককে হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে নিয়ে যায় যেখানে দিব্যভাবগুলি বিরাজ করে। যেহেতু প্রত্যেকের হৃদয়কেন্দ্রে পরমাত্মার বাস, সেই জন্য সাধক যখন কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত হন তখন তিনি অভীষ্ট লাভ করেন। তখন তাঁর পক্ষে ঝড়-ঝঞ্ঝা এড়ানো সহজ হয়।

১৫ । ৪ । ৮৫

৩০৮

ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার মাধ্যমে সৃজনীশক্তি অর্জন করেছিলেন। এই শক্তি তিনি একটি নূতন ব্রহ্মাণ্ড গড়তে কাজে লাগালেন—যা কি না আমাদের পরিচিত জগৎ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। বিশ্বামিত্রের এই কর্মকাণ্ড তিন প্রধান দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু,

মহেশ্বর) নীরবে লক্ষ্য করলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁরা উদ্বিগ্ন এবং বিব্রত বোধ করলেন, কারণ তাঁরা অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন যে, এর ফলে ভবিষ্যতে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হবে। আলোচনা করে তাঁরা ঠিক করলেন বিশ্বামিত্রের কাছে গিয়ে জানতে চাইবেন এই সৃষ্টির পিছনে তাঁর কী অভিপ্রায়। তাঁরা বিশ্বামিত্রকে জানালেন যে, শুধুমাত্র সৃজনের ক্ষমতা থাকাই যথেষ্ট নয়, যা সৃষ্টি করা হয় তা রক্ষা করার সামর্থ্য থাকা চাই এবং সময় হলে ধ্বংসও করতে হয় সমতা বজায় রাখার জন্য। ব্রহ্মা আরও বললেন যে, বিষ্ণু (ঈশ্বরের ধারক ও বাহক রূপ) এবং শিব (ঈশ্বরের ধ্বংস ও রূপান্তরের ক্ষমতার রূপ) উভয়েই শুধুমাত্র বর্তমান কল্পের জন্য এবং তাঁরা ব্রহ্মার সৃষ্টির ভারপ্রাপ্ত।

ব্রহ্মার কথা বুঝতে বিশ্বামিত্রের বিশেষ বিলম্ব হল না এবং তিনি বুঝতে পারলেন যে, এই শক্তি লাভ করতে হলে অনেক তপস্যা করতে হবে। তিনি জানতেন তপস্যার মাধ্যমে এই শক্তি অর্জন করা প্রচুর সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এই তপস্যা করার সময় নূতন বিশ্বে অনেক সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই বিশ্বামিত্র কী ভাবে অগ্রসর হওয়া যায় সেই প্রসঙ্গে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হলেন এবং তাঁরা সবাই একসঙ্গে ধ্যানে বসলেন যাতে পূর্ণ সচেতন ভাবে এই আলোচনা করা যায়।

ভগবান বিষ্ণু একটি যুক্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য সমাধান দিলেন। তাঁর শর্ত ছিল, বিশ্বামিত্র সমগ্র সৃষ্টির ভার তাঁদের হাতে ছেড়ে দেবেন আর নূতন কিছু তিনি সৃষ্টি করবেন না এবং কোনও ভাবেই নূতন ও পুরানো বিশ্বের রক্ষার কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। ভগবান বিষ্ণু বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট বিশ্ব সম্বন্ধে তাঁর নিজের উপলব্ধির কথা জানালেন এবং অঙ্গীকার করলেন যে, নূতন বিশ্বকে তিনি পরমযত্নে পালন করবেন যাতে পুরানো বিশ্ব নূতন বিশ্বের নিয়মগুলিকেই অনুসরণ করে এবং কোনও পার্থক্য ও বৈপরীত্য না-রেখে দু'টি বিশ্বই পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। ঋষি সানন্দে তিন দেবতার প্রাজ্ঞ সমাধান স্বীকার করলেন, কারণ এই সমাধান দেওয়া মনুষ্যবুদ্ধির পক্ষে সহজ ছিল না। তারপর থেকে দু'টি বিশ্বকে একটিতে পরিণত করে ভগবান বিষ্ণুই পালন করতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্রের সৃষ্ট এই বিশ্ব ভগবান বিষ্ণুর অকুণ্ঠ প্রশংসা ও স্বীকৃতি পেল। তাই তাঁকে ঐশ্বরিক সত্তার সর্বজনীন প্রকাশ ও প্রতিভূ রূপে গণ্য করা হল। তাঁর স্বানুভবসিদ্ধ গায়ত্রীমন্ত্র সৃষ্টির প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ মন্ত্র 'ওম্'-এর সঙ্গে তুলনীয় বলে স্বীকার করে নেওয়া হল। এই দিব্য মন্ত্র 'ওম্' হল পরমাত্মার নামরূপ। 'ওম্' তিনটি বর্ণের সমাহার অ-উ-ম, যা ঈশ্বরীয় সত্তার মূর্তপ্রকাশ—একই সঙ্গে পরিব্যাপ্ত, তুরীয় এবং তুরীয়াতীত। এই মন্ত্র তিন দেবতার সত্তার প্রতীক—'অ' ব্রহ্মাকে নির্দেশ করে, 'উ' বিষ্ণুকে, 'ম' শিবকে এবং অ-উ-ম একত্রে পরমাত্মাকে নির্দেশ করে। অন্য ভাবে বলতে গেলে 'অ' হল স্থূল জগৎ, 'উ' সূক্ষ্ম জগৎ, 'ম' কারণ জগৎ এবং একত্রে তুরীয় পরমাত্মা। আপাতদৃষ্টিতে এই তিনটি তত্ত্ব পৃথক হলেও তারা একই

সত্তার অংশ, কারণ দিব্যানুভূতিতে প্রকাশ যা-ই হোক না কেন, অন্তরে-বাইরে তা এক ঈশ্বরীয় সত্তাই। তাই এই তত্ত্বগুলির কোনওটিই পরস্পরবিরোধী নয় এবং তা সব বিতর্ক ও সন্দেহের ঊর্ধ্বে।

অধ্যাত্মবিজ্ঞানের বিশ্বজনীন বাহক ঋষি বিশ্বামিত্র সৃষ্ট গায়ত্রীমন্ত্র 'ওম্' মন্ত্রের মতোই সমগ্র সৃষ্টির সৌন্দর্যময় এবং তাত্ত্বিক স্ফুরণে দিব্যসত্তাকেই বহন করে। এই সৃষ্টিতে অসংখ্য বিশ্ব আছে, প্রত্যেকটি বিশ্বে চৌদ্দটি জগৎ আছে যেগুলি একটির উপরে আরেকটি অবস্থিত। যে শক্তি সৃষ্টির সমগ্র সত্তাকে প্রকাশ এবং নিয়ন্ত্রণ করে তা হল চিৎশক্তি বা বিশুদ্ধ চৈতন্যশক্তি, যা ঈশ্বরীয় তত্ত্ব এবং দিব্যপদ্ধতি। তা চেতন এবং জড়; নৈর্ব্যক্তিক এবং ব্যক্তিক, পরম এবং আপেক্ষিক, সমষ্টি এবং ব্যষ্টি, এক এবং বহু, ভেদ এবং অভেদ, স্থিতি এবং গতি উভয়ই। It is also the instrumental and elemental cause along with the aiding cause as well as the totality of effects without exception. একই সঙ্গে চিরলীলাময়, নাটকীয় ও যুক্তিগ্রাহ্য। তা ইতি-নেতি, ধ্বন্যাত্মক-ঋণ্যাত্মক, অজ্ঞান-জ্ঞান (জ্ঞানাভাস)-বিজ্ঞান-প্রজ্ঞান, জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, প্রকাশ-অপ্রকাশ, কর্তা-কর্ম—সবই চিৎশক্তির লীলায়িত প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য, যাকে পরাশক্তি ও অপরাশক্তিও বলা হয় এবং চেতন ও অচেতন শক্তিও বলা হয়। এই হল ভগবতী, মহাদেবী বা সচ্চিদানন্দময়ী মা। সচ্চিদানন্দময়ী মায়ের দেবীমূর্তি বিশ্বজনীন দেবতা ও পরমপুরুষের সগুণ বর্ণনা। এই চিদানন্দময়ী মা-ই জগৎকে নানা গুণে গুণান্বিত করেছেন এবং তিনিই সত্য, জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম ও শান্তি স্বরূপ। এই জগতের প্রতিটি ব্যক্তিসত্তাই চিদানন্দময়ী মায়ের সন্তান। এখানে 'সন্তান' অর্থে এক পরম ঈশ্বরীয় সত্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশকে বা অভিব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে। যখন কোনও ব্যক্তিসত্তা চিদানন্দময়ী মায়ের লীলাখেলায় অংশগ্রহণ করে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, তখন সে চিদানন্দময়ী মায়ের কোলে আশ্রয় নেয়। শর্তহীন ভাবে সে যখন নিজেকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে, জীবনের সর্বকর্মে তাঁর উপর নির্ভর করে, তখন চিদানন্দময়ী মা তার ভার বহন করেন, রক্ষা করেন এবং পরিশেষে তাকে নিজের মধ্যে একীভূত করে নেন। অন্তরাত্মা ও গায়ত্রীমন্ত্রের তত্ত্ববোধ সেই সাধকের অন্তরেই জেগে ওঠে যে নিষ্ঠা সহকারে শুদ্ধ মনে তা জপ করে। গায়ত্রীমন্ত্র এবং চিদানন্দময়ী মা বস্তুত এক অভিন্ন সত্তা। সুতরাং চিদানন্দময়ী মায়ের সাথে অভেদে মিলিত হওয়ার অর্থ হল পরিপূর্ণরূপে দিব্যভাবে বিভোর হয়ে যাওয়া। পরম মুক্তি, অমৃতত্ব, আনন্দ, শান্তি ও প্রেম আসে জীবনে অধ্যাত্ম ভাবের স্ফুরণ হলে। পূর্ণতা, সত্য, মুক্তি, অমৃতত্ব, একতা, সমতা—এই শব্দগুলির অর্থ অভিন্ন এবং একক সত্তাকেই বোঝায়। এর যে কোনও একটি শব্দ অন্য শব্দগুলিকেও নির্দেশ করে। পরমাত্মা বা চিদানন্দময়ী মা এক অভিন্ন সত্তা, যা স্বানুভবসিদ্ধ মহাপুরুষগণ বলে থাকেন। সেই জন্য প্রত্যেক স্বানুভবসিদ্ধ মহাত্মাই বলেন—মানবজীবনের একমাত্র কর্তব্য হল পরম এক-কে জানা, এ ছাড়া অন্য সব কিছুই গৌণ এবং তা-ই জীবনের Alpha and Omega।

সংসারী মানুষের কাছে সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালন করাটাই আসল, ঈশ্বর হল গৌণ—এই দৃষ্টিভঙ্গিই তাদের দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা ভোগের কারণ। জীবনচক্রের পাঁকে

এই ভাবে তারা বদ্ধ থাকে। অন্য দিকে সাধকদের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাচরণ তাঁদের পরম লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যায় এবং পরিশেষে এক-এর জ্ঞান লাভ করেন, যা সমস্ত দ্বৈত বা আপেক্ষিক জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। তা-ই হল ঈশ্বরীয় তত্ত্ব ও দিব্যজীবনের সর্বোচ্চ গুণ। কারণ ঈশ্বরই জীবন এবং জীবনই ঈশ্বর। এই নিত্য পূর্ণ অদ্বয় সত্তাই হল অস্তিত্বের কারণ। যখন অসতর্কতাবশত বা আত্মজ্ঞানের অভাবে কেউ এই সত্য ভুলে যায়, তখন বিবেকবিচারের অভাবে আত্মা-অনাত্মা এবং সত্য-অসত্যের মধ্যে বিচারবোধ হারিয়ে ফেলে।

আধ্যাত্মিক জগতের প্রত্যেক পর্যায়ে সদ্‌গুরুর দিব্য পথনির্দেশের প্রয়োজন হয়। সদ্‌গুরু শিষ্যের সমস্ত অজ্ঞানতা, দ্বৈতবোধ ও জীবনের ভ্রান্ত ধারণাগুলিকে দূর (শোধন করে) করে তাকে সর্বতোভাবে যোগ্য অধিকারী করে তোলেন। The master can initiate an aspirant according to his constitutional nature and previous impressions predominating in his life. তিনি শিষ্যকে দিব্য মন্ত্রের সাহায্যে দীক্ষা দেন যা বীজমন্ত্রেব অনুরূপ হতে পারে আবার নাও হতে পারে—যা সুপ্ত ঐশ্বরিক শক্তি। মন্ত্র ছাড়াও ঈশ্বরের বিভিন্ন নামগুলিও পরম শক্তিশালী, কারণ সেগুলি এক সত্তারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ। এই মন্ত্রগুলি সবচেয়ে বেশি ফলপ্রদ হয় তখনই, যখন সদ্‌গুরুর কাছ থেকে তা পাওয়া যায় এবং পূর্ণ বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তা অভ্যাস করা যায়। একমাত্র সদ্‌গুরুর দিব্যানুভূতির পূর্ণ শক্তি এই বীজমন্ত্রেই রয়েছে এবং এর যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই সাধক ঈশ্বরানুভূতি বা আত্মানুভূতি লাভ করতে পারে। এই অভ্যাস যান্ত্রিক হলে হবে না বরং পূর্ণ সচেতন ভাবে আত্মবোধে তা অভ্যাস করা প্রয়োজন। বীজমন্ত্রের উচ্চারণ অর্থ গুরুর আত্মায় স্থিত হওয়া অর্থাৎ গুরুবোধে বিচরণ করা এবং এর ফলে গুরু যে-ভাবে স্বানুভবসিদ্ধ হন সে-ভাবেই শিষ্যেরও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ হয়। সচেতন ভাবে মন্ত্রগুলি অভ্যাস করলে সাধক মন্ত্রের সত্তাস্বরূপ আত্মজ্ঞানে পৌঁছতে পারে। তা সম্ভব হয় হৃদয়ে চৈতন্যময় স্পন্দনরূপে গুরুর সর্বময় উপস্থিতির জন্যই। এই ভাবে সাধক প্রেম ও ভক্তিতে পূর্ণ হয়ে যায় এবং মন্ত্রের সত্তাস্বরূপ যা ঈশ্বরেরই নামান্তর, তাঁর প্রতি মনোনিবেশ করতে পারে। এই ভাবেই ভক্ত সদ্‌গুরুর কৃপায় এবং ঈশ্বরের করুণায় পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

২০। ৫। ৮৫

৩০৯

মন হল মহাকাল। তার বক্ষে প্রতি মুহূর্তে কত সৃষ্টি ওঠে, ভাসে, আবার লয় হয়। তাদের মধ্যে কত স্থূল, সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মতম প্রকাশ। তার অন্ত করার সাধ্য সৃষ্ট জগতের মধ্যে কারও নেই!

একবার স্রষ্টা ব্রহ্মার কাছে পাতা বিষ্ণু সমগ্র সৃষ্ট জগতের একটি হিসাব দেখতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মা তাঁর সমগ্র সৃষ্টির হিসাব দিলেন বিষ্ণুকে। বিষ্ণু সেই হিসাব দেখে বললেন—ব্রহ্মা, এ তো ঠিক হয়নি। অনেক কিছু বাদ পড়েছে। তোমার সৃষ্টির খবর তুমিই সব দিতে পারলে না।

ব্রহ্মা—আমার সাধ্য মতো আমি সবই দিয়েছি প্রভু।

বিষ্ণু—না, তুমি ঠিক হিসাব দিতে পারনি। আমি ঘুরতে ঘুরতে যে অনন্ত সৃষ্টি দেখেছি, তার কোনও বর্ণনা তোমার হিসাবে দাওনি।

ব্রহ্মা—প্রভু, এ কী কথা! আমার সৃষ্টির মধ্যে এমন অনেক সৃষ্টি আপনি ঘুরে দেখে এসেছেন যা আমি এই হিসাবের মধ্যে দিইনি! এ রকম ভুল তো আমার হয় না। তবে জানি না এবং বুঝতেও পারছি না।

বিষ্ণু—ব্রহ্মা, আমি তো মিথ্যা বলতে পারি না। চল, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।

ব্রহ্মাকে সাথে নিয়ে বিষ্ণু যেখানে যা যা দেখেছেন তা তাঁকে দেখালেন। সে সব দেখে ব্রহ্মা বললেন—এ সব সৃষ্টি আমার নয়। আমি এ সব সৃষ্টি করিনি। আমার সৃষ্টির সীমার মধ্যে এগুলি পড়ে না। বিষ্ণু শুনে বললেন—তাহলে আমি কার সৃষ্টির মধ্যে এসে পড়েছি? অন্য ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে এসে অনধিকারচর্চা করেছি!

ব্রহ্মার মতো বিষ্ণুও ঘাবড়িয়ে গেলেন। তখন তিনি ধ্যানের মাধ্যমে এর সত্যরূপ দর্শন করলেন। তা জানতে তাঁর বহু সহস্র যুগ লেগেছিল। তা বর্তমান যুগের হিসাব নয়। ধ্যানের গভীরে তিনি জানলেন যে, অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে তিনি আরেকজন বিষ্ণুর রাজ্যে আরেকজন ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে গিয়ে পড়েছিলেন। এই বিষ্ণু তখন অবাক হয়ে ভাবলেন, তাহলে আমি ছাড়া আরও অনেক বিষ্ণু আছেন!

স্বর্গে এই নিয়ে এক বিরাট সভার আয়োজন করা হল। সেই সভায় সমগ্র সৃষ্টির অধিকর্তাদের নিমন্ত্রণ করা হল এমনভাবে যাতে কেউ বাদ না-পড়ে। এই জগতের তিন প্রধান দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সবার আগে সেই সভায় এসে দেখলেন তাঁদের মতো অগণিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর দলে দলে আসছেন ও আপন আপন স্থান (আসন) দখল করে বসছেন। তখন এই জগতের ব্রহ্মা ও বিষ্ণু (যাদের কথা আগে বলা হয়েছে) দেখলেন সংখ্যাতীত সৃষ্টির অধিদেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর অগণিত। সেই সব দেখে এই জগতের ব্রহ্মা বিষ্ণুকে বললেন—প্রভু, এবার আমায় ছুটি দিন। আপনারা তো ধ্যানমগ্ন থেকে আনন্দে কাটান। আমি আমার সৃষ্টির মধ্যে মগ্ন থাকি। আর আমি পারছি না। কিছুদিন বিশ্রাম করব। আমি ভাবতেও পারছি না যে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর যখন আছেন তখন কত সৃষ্টি, কত জগৎ আছে এবং সে সব কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত! আমাদের সৃষ্ট জগৎ নিয়েই আমরা ব্যতিব্যস্ত, সব কিছু সামলাতে পারছি না।

এই পর্যন্ত বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি মন্তব্য প্রকাশ করলেন যা বিজ্ঞানজগতে বিজ্ঞানীদের বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করবে, অধ্যাত্মজগতের কাল নিরূপণের এবং সৃষ্টি বিষয়ে বিজ্ঞানের অভাবনীয় জ্ঞাতব্য সম্বন্ধে। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আজ আমি তোমাদের সামনে এমন একটি হিসাবের নজির উপস্থিত করছি যা অঙ্কশাস্ত্রের হিসাবের লক্ষ কোটি ভাগের এক ভাগেও আসবে না।

ব্রহ্মাকে শিব বললেন—তুমি ধ্যানে এর হদিশ করতে পার? ব্রহ্মা বললেন—কোটি ব্রহ্মা এলেও পারবে না। এই অনন্ত মহাকালের বক্ষে, ব্রহ্মের বক্ষে বা চিদাকাশের বক্ষে যে অনন্ত সৃষ্টি হয়ে চলেছে তার হিসাব দিতে পারে এরকম কোনও

স্রষ্টা বা দেবতা জগতে আসেননি এবং আসা সম্ভবপরও নয়। তখন প্রথম ব্রহ্মাকে বিষ্ণু বললেন—ব্রহ্মা, চল এবার আমরা সবাই বিদায় নিই। অনেক ব্রহ্মা, বিষ্ণু আছেন, তাঁরা সভার কাজ চালিয়ে নেবেন। তোমার ও আমার মতো এ রকম দু-একজন বাদ পড়লে কিছু এসে যাবে না। তখন এ জগতের ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর সেই সভা থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁরা পরস্পরকে বললেন—আমাদের কাজ শেষ। এস, এবার আমরা তিনজনে সমবেত হয়ে বসে সেই অখণ্ড ভূমাস্বরূপের (Original Form) ধ্যান করি যাতে তার সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে পারি। সৃষ্টি আর যেথা নেই, সেথা আছে অখণ্ড ভূমা পরমসত্তা। তখন তাঁরা তিনজনে ধ্যানে বসলেন।

এই গেল একটুখানি ইঙ্গিত, সৃষ্টি জগতে আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি তা সম্ভব হয়েছে ঋষিদের অবদানে। ধন্য এই দেশ যে দেশে ঋষিদের আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা প্রকৃতির তাড়নে এবং অন্তরের পীড়নে জর্জরিত হয়ে বহু জিজ্ঞাসা ও অজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই করে এই সৃষ্টি জগতের সূক্ষ্ম রহস্য ও তার দিব্য অমৃত মহিমা জানতে পেরেছেন। অন্তর্জগতের বেদন যেখানে হয় বা অনুভূতি যেখানে জাগে সেখানকার খবর জানবার জন্য নানা ভাবে চেষ্টা ও সাধনা করেছেন তাঁরা। ধ্যানের গভীরে পেয়েছেন তাঁদের সর্ব জিজ্ঞাসার সাড়া ও উত্তর। পরমতত্ত্বের সঙ্গে হয়েছে তাঁদের তাদাত্ম্যানুভূতি—হয়েছেন তাঁরা অমৃতত্ব, মুক্তি ও শান্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

বহির্জগতে প্রকৃতির মধ্যে যে বস্তুর সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন তা-ই হল ইন্দ্রিয়ের রাজ্য এবং তা হল আমাদের জাগ্রৎ অবস্থা। ইন্দ্রিয়ের রাজ্যে মন না-আসলে আমরা বহিঃপ্রকৃতির বিষয়ে কিছুই জানতে পারি না। বহির্জগতের বিষয় জানবার জন্য আমাদের প্রয়োজন হয় পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও মন। এগুলিকে সচেতন রাখার জন্য প্রয়োজন হয় প্রাণের। এই ক'টির সমব্যবহারে হয় বহির্জগতের অন্তর্গত স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণের সন্ধান, গবেষণা ও বিশ্লেষণ। কিন্তু এর সীমা ইন্দ্রিয়ের রাজ্য পর্যন্ত। তারপর সব এত সূক্ষ্ম হয়ে যায় যে, মন আর মাপতে পারে না। এখানে এসেই আমাদের দর্শন ও বিজ্ঞান স্তব্ধ, স্তম্ভিত, মূঢ়বৎ ও শান্ত হয়ে যায়। তখন ঋষিদের জিজ্ঞাসা চলেছে অন্তর্জগতে—এরপর কী আছে? সেখানে কী করে যাওয়া যায়? ইত্যাদি। বাইরে তার সন্ধান তাঁরা পাননি। তাই বলে বাইরে সব ফুরিয়ে যায়নি। কিন্তু সেই শক্তি মনের বা ইন্দ্রিয়ের আর নেই। মন সেই শক্তি লাভের জন্য অন্তরে আবার ডুব দিয়ে শক্তি অর্জনের চেষ্টা করেছে। তার দ্বারা প্রাকৃত শক্তির নূতন নূতন রহস্য জানতে পেরেছে। অবশ্য সবটা পারেনি। অন্তর থেকে তখন নির্দেশ এসেছে যে, বাইরে সদা বিকারী ও পরিণামী প্রকৃতিকে জেনে তুমি কোনও দিনও শেষ করতে পারবে না। এবার তুমি অন্তররাজ্যে প্রবেশ কর। তখন তাঁদের অন্তরবেদন, অন্তরধ্যান আরম্ভ হয়েছে।

ঋষিরা ধ্যানের বিজ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন অন্তরে। তাঁরা বহিঃপ্রকৃতির বর্ণনাও প্রচুর দিয়ে গিয়েছেন। তাঁদের গবেষণা বিশ্লেষণের যা ইতিহাস আছে তা পাঠ করে বর্তমান যুগের মনীষীরা বিস্মিত হয়ে যান এই ভেবে যে, কী করে তাঁরা এগুলি

আবিষ্কার করেছিলেন! তাঁরাও সঠিক পদ্ধতি ধরেই জেনেছিলেন এবং তার সন্ধানও তাঁরা দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি। কারণ এক জায়গায় এসে থেমে যেতেই হবে। আমাদের ইন্দ্রিয়-মন সেখানে প্রবেশ করতে পারবে না। তখন মনকে যদি নূতন ছাঁচে তৈরি করতে হয় তাহলে বাইরের জগতের প্রভাব মুক্ত করে অন্তর্জগতে বা ধ্যানের জগতে নিয়ে যেতে হবে। সেখানে ধ্যান ও বিচারের মাধ্যমে সমস্ত বিশ্লেষণ নূতন করে পাবে। তখন মিলবে চেতনরাজ্যের সন্ধান।

বাইরে প্রকৃতির রাজ্যে চেতনরাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাইরে যা-কিছু জানা যায় সবই জড়। অন্তরে মেলে চেতনের রাজ্য—সেখানে চৈতন্যের স্তরের পরে আরও অন্যান্য স্তরের পরিচয় পাওয়া যায়। তখন একটি বিশেষ জ্ঞান বা অনুভূতি প্রকাশ পায়। তার মাধ্যমে একটি হিসাব পাওয়া যায়। এই ভাবে ভিতরের জড়ভূমি (রাজ্য) ছাড়িয়ে জ্ঞানভূমির (রাজ্যের) খবর জানা যায়। ঋষিগণ এর বর্ণনা বা হিসাব দিয়ে গিয়েছেন। বর্তমান যুগ তার থেকে অনেক দূরে। কারণ বর্তমান যুগ ঋষিদের বিজ্ঞান গ্রহণ করেনি। ঋষিরা এই বিজ্ঞানকে ব্যবহার করার জন্য যে বিদ্যার প্রয়োজন মনে করেছিলেন সেই বিদ্যাকে তাঁরা নানা ভঙ্গিমায় সংগ্রহ করেছিলেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের বিশ্লেষণ আত্মধ্যান এবং আত্মবিচারের দ্বারা সংগ্রহ করেছিলেন।এই অনুভূতির বিজ্ঞানের নামই হল বিদ্যা। ঋষিগণ এই বিদ্যাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন।

বিদ্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বিষয়বস্তুকে তাঁর স্বানুভূতির আলোতে সুবোধ্য করে সবার কাছে ব্যক্ত করলেন বর্তমানের বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে—আজকে বাণীবন্দনার দিন।ঋষিদের একটি বিরাট আবিষ্কার আজকের এই দিনটি। তাঁরা অনন্ত মহাকালের মধ্যে অনন্ত ক্ষণকে ধরে রাখার যে অপূর্ব কতগুলি বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন তার মধ্যে অন্যতম হল আজকের এই শ্রীপঞ্চমীর দিনটি। প্রকৃতপক্ষে পূর্বে এই দিনটি ছিল ষষ্ঠী তিথি, অর্থাৎ ষষ্ঠী তিথিতে প্রাণের পূজা।

শ্রীপঞ্চমীর পরিবর্তে ছিল শ্রীষষ্ঠী বা প্রাণের পূজা। তা-ই ক্রমে রূপ নেয় পঞ্চতন্ত্রের পূজাতে। পঞ্চতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চভূতের সঙ্গে যুক্ত আমাদের প্রাণ ও মন। এই সন্ধিক্ষণে এসে ঋষিগণ আবিষ্কার করলেন শ্রীপঞ্চমীর তাৎপর্য।

শ্রী হল ষষ্ঠী। প্রাণ এবং পঞ্চমী হল প্রাণের পঞ্চ বিভাগ যার সঙ্গে যুক্ত মন। প্রাণ অবিদ্যার পর্যায়ভুক্ত এবং মন হল বিদ্যার পর্যায়ভুক্ত। বিদ্যার দ্বারা অবিদ্যা নিয়ন্ত্রিত হয়। অবিদ্যার বিজ্ঞান ও বিদ্যার বিজ্ঞান যুগপৎ সাধন করে ঋষিগণ তার তাৎপর্য জেনেছিলেন।

এই বিদ্যা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে খেলে। এক ভাগ হল জগৎ সৃষ্টিকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ জড়জগতের যত রকম বিশ্লেষণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যা এবং বিদ্যার যে অংশ দ্বারা জগদাতীত নিজের স্বরূপ অর্থাৎ কে এই আমি, কী এই আমি—এটা জানা যায় যার মাধ্যমে তার নাম পরাবিদ্যা। তা-ই হল এক-এর বিজ্ঞান, উপনিষদবিদ্যা, বেদের জ্ঞানকাণ্ড। ঋষিরা বিচার করে জাগতিক ব্যাপার সাধনের জন্য আবিষ্কার করলেন অপরাবিদ্যার। এর দ্বারা মানুষ প্রকৃতিরাজ্যের অন্তর্গত তত্ত্বাদি জানতে পারবে ও ভোগ

করতে পারবে। এই জগতে দেহ কী করে তৈরি হয়? কী করে দেহ চলে? কী করে দেহের অবসান হয় এবং এই ভূতপ্রকৃতির যা-কিছু গঠন এ সবের বিজ্ঞান অপরাবিদ্যার অন্তর্গত। কিন্তু এর দ্বারা নিজেকে জানা যায় না। সেই জন্য Material Science-এর সাহায্যে Self-Knowledge লাভ করা যায় না। আবার অন্য ভাবে বলা যায়, Self-Knowledge-এর মধ্যে Material Science কিন্তু most insignificant।

আবার কিছু জ্ঞানী ব্যক্তি এই দুই বিদ্যাকে মিলিয়ে নূতন কিছু একটা দাঁড় করাতে চাইছেন। তার ফলে তারা তৈরি করেছেন আরেকটি চিদ্‌জড়গ্রন্থি, যাতে আত্মবোধের অন্তরায় সৃষ্টি হয়। বুদ্ধিবৃত্তির ত্রুটি হয় তখনই, যখন তা বাহ্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থেকে বাহ্য বিষয়সাপেক্ষ হয়ে কাজ করে। কিন্তু যখন অন্তরের গভীরে কেন্দ্র ও তুরীয় বোধের সঙ্গে যুক্ত থেকে বুদ্ধি সক্রিয় হয় তখন তা অধ্যাত্মবিজ্ঞানের প্রকাশমাধ্যম হয়। বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত মন-বুদ্ধি বিকারী ও পরিণামী। বাহ্য বস্তুর প্রভাব মলিন ও বিকৃত হয়। মন-বুদ্ধি জড় বস্তুর সেবায় রত থেকে তার ধর্ম ও গুণ প্রাপ্ত হয় বলে জড়তার প্রভাব তাতে প্রাধান্য পায়। মন ও বুদ্ধির নিজস্ব চেতনা নেই, তাতে আত্মচৈতন্যের প্রতিফলন হয়। প্রতিফলিত আত্মজ্যোতির প্রভায় মন ও বুদ্ধি চেতনাভাস পায়। সেই জন্য তাদের চিদাভাস বলা হয়। তাই মন ও বুদ্ধি অনাত্মার পর্যায়ে পড়ে। যদিও চিৎশক্তির আভাস তাতে সক্রিয় তবুও তারা জড় বস্তুর আংশিক প্রকাশে সমর্থ হলেও আত্মবোধের বা তত্ত্বস্বরূপের সন্ধান পায় না। আত্মজ্ঞানে দেহের গঠন, পোষণ ও বেদন—এই তিনটি ভাবের একান্ত অভাব। আত্মজ্ঞানে যখন কেউ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তাঁর দেহের বা জগতের কথা মনে থাকে না। সেই অনুভূতিতে প্রতিষ্ঠিত হবার পরে যদি কেউ জগৎ বোধে ফিরে আসে তাহলেও তাঁর উপরে জগতের প্রভাব পড়ে না। এঁদেরই বলা হয় মুক্তপুরুষ। এঁরা পৃথিবীতে বিচরণ করেন স্বাধীন ভাবে। এঁদের কোনও জাত, আশ্রম ও নিয়ম নেই। শাস্ত্রের কোনও নিয়মের অধীনে তাঁরা চলেন না। তাঁরা মুক্ত ও স্বতন্ত্র পুরুষ। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যখন প্রাকৃত বুদ্ধি বা দেহাত্মবুদ্ধি নিয়ে এঁদের বিচার করে তখন ঠকে। তাতে অবশ্য এঁদের কিছু এসে যায় না। যেমন ঊর্ধ্বে সূর্যের দিকে যদি আমরা থুথু নিক্ষেপ করি তা আমাদেরই গায়ে এসে পড়বে, সূর্যের কিছু এসে যাবে না। আত্মজ্ঞপুরুষেরা সব সময় অনাসক্ত। প্রকৃতির মধ্যে বাস করেও তাঁরা কখনও প্রকৃতির অধীন নন। তাঁরা হলেন ঋষি। তাঁরা স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় জগতের খবর জানেন। মানুষের কাছে যখন বিদ্যার খবর পৌঁছে দেন তখন মানুষ যদি তা গ্রহণ না-কবে তাহলে তাঁরা দুঃখিত হন না। তাঁদের সুখ-দুঃখ বোধ নেই। তাঁদের ভেদ-অভেদ, আপন-পর জ্ঞান নেই এবং জন্ম-মৃত্যু বোধ নেই। তাঁরা অমর। তাই বলা হয় যে, প্রাকৃত বুদ্ধি দিয়ে তাঁদের বিচার করা চলে না বা মান নির্ণয় করা যায় না।

বিদ্যার অধিকারী হলেই মানুষ নিজেকে জানতে চেষ্টা করে। নিজেকে জানতে গিয়ে সে ভেদজ্ঞান বা প্রাকৃতজ্ঞান ধীরে ধীরে সরাতে চেষ্টা করে। 'আমি' যখন নিজের মুক্তি চাইবে তখন আত্মা-অনাত্মার বিচার করবেই। তখন বন্ধনের সঙ্গে নিশ্চয় জট পাকিয়ে থাকবে না।

জগতে যারা জাগতিক বিজ্ঞান (Material Science) নিয়ে ব্যস্ত আছে তারা আত্মবিজ্ঞান চর্চা না-করলে নিজের ও জগতের সত্য পরিচয় যথার্থ ভাবে কোনও দিন জানতে পারবে না। আত্মবিজ্ঞান হল স্বতন্ত্র বিজ্ঞান। যেমন কেউ ইতিহাস পড়ে শুধু ইতিহাসই জানতে পারে, অঙ্কশাস্ত্র সম্বন্ধে জানতে পারে না। কিন্তু সে আবার অঙ্ক জানার পরে ইতিহাস চর্চা করতে পারে।

জাগতিক বিজ্ঞান আমরা স্কুল-কলেজে চর্চা করি। স্কুল-কলেজের বিদ্যার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত হল অবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। অবিদ্যা বিদ্যারই একটি অংশ। যেমন একজন মানুষের সম্মুখভাগ ও পশ্চাদ্ভাগ অভিন্ন। সেইরূপ অভিন্ন এক Divine Power-এর এক দিকে বিদ্যা এবং অপর দিকে অবিদ্যা। বিদ্যার দিকে শুধু একত্বের বিদ্যা, সমত্বের ও পূর্ণত্বের সমাধান এবং অবিদ্যার দিকে বৈচিত্র্য বা multiplicity, diversity and duality। কাজেই যেখানে দ্বন্দ্ব, শঙ্কা, সংশয়, ভ্রান্তি, ভীতি আছে সেখানে এক-এর অভাব বুঝতে হবে। আবার এক-এর মধ্যে কিন্তু এগুলি নেই। এই এক অর্থে নিত্য পূর্ণ ভূমা এক-কে নির্দেশ করা হয়।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় এই এক-এর বিজ্ঞান (Science of Oneness) শিক্ষা দেবার কোনও ব্যবস্থা নেই। ঋষিদের সেই আশ্রমও নেই বা তাঁদের সেই সম্প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গিও এ যুগের মানুষের নেই। এ যুগের মানুষরা মানে না, সমালোচনা করে। এ যুগের সংকীর্ণ বর্ণাশ্রম ধর্ম হল অবিদ্যাভিত্তিক, বিদ্যাভিত্তিক নয়। বর্তমানে কদাচিৎ দু-একজন অতিমানব আবির্ভূত হয়ে সেই বিজ্ঞান প্রকাশ করার প্রয়াস করছেন। কিন্তু উপযুক্ত ধারক, বাহক ও পরিবেষকের অভাবে তা ব্যাপক ভাবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। যথার্থ শিক্ষা ও অনুশীলনের অভাবে তা অতি দুর্বোধ্য মনে হয়। এই বিজ্ঞানকে লোকসমাজে পৌঁছে দেবার উপযুক্ত অধিকারী দরকার। কারণ সবারই দোষদৃষ্টি, ভেদ-জ্ঞান বা পার্থিববোধ রয়েছে। অতএব এই বিজ্ঞানের অধিকারী তারাই যাদের ভিতরে দ্বৈতের বা অবিদ্যার প্রভাব নেই। তাদের কাছে নিজবোধ বা এক-এর বোধ অর্থাৎ সমবোধ বা আপনবোধ স্বতঃস্ফূর্ত। আপনবোধ হল অদ্বৈতবোধ। অদ্বৈতবোধে সে কাকে নিয়ে দ্বন্দ্ব করবে? কার দোষ দেখবে? যে গানগুলি তোমরা এতক্ষণ গাইলে তার মধ্যে সেই পরম এক-এর কথা নিহিত আছে। বলা হয়েছে, এই এক-এর মধ্যে ডুব দিয়ে এক-এর কথা যদি সারাজীবন বলে বগল বাজিয়ে চলে যাও তাহলে তোমরাও ভেদজ্ঞানের ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারবে এবং কোনও একজনকে অন্তত এই সুরে ও ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য সাহায্য করতে পারবে। এর নামই হল আত্মসমর্পণ, অধ্যাত্মসাধন ও গুরুভজন। গুরুভজনের যথার্থ তাৎপর্য ভজনগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে বলা আছে। মন দিয়ে সেগুলি গ্রহণ করবে, ভাববে, তাহলেই সেই বোধ জাগবে। নতুবা অবিদ্যার প্রভাব অর্থাৎ অভিমান-অহংকারের বিকার থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

সেইজন্য বলা হয়েছিল দেবতার পূজা সহজ। বহু দেবতা আছেন যাঁরা অলক্ষ্যে আমাদের মঙ্গল কল্যাণ করেন এবং জগতে এই সৃষ্টি পোষণে সাহায্য করেন। কিন্তু আত্মার বিজ্ঞান একটিই। সেখানে বহু দেবতা নেই। একজনই মাত্র দেবতা আছেন।

তিনি কারও দোষও দেখেন না, কারও গুণও দেখেন না। তিনি সর্ব অবস্থায় সমান। তাঁরই গান তোমাদের সামনে দেওয়া হয়েছে। তোমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সেই বিজ্ঞান। তোমরা স্বরূপত তা-ই। ভুলে যেও না। এমন এক বিজ্ঞান তোমাদের কাছে বলা হয়েছে যেই বিজ্ঞানের অধিকারী কখনও ভেদজ্ঞানের অধিকারী হতে পারে না। আমার আত্মা বা তোমাদের আত্মা বা সবার আত্মা কোনও দিন ভিন্ন হতে পারে না। যেমন পৃথিবীতে অনেক ঘর আছে, কিন্তু কোনও ঘরের আকাশের সঙ্গে কোনও ঘরের আকাশের ভেদ নেই, সেই রকম আমার এই দেহ খাঁচাটি যত ক্ষীণই হোক একটি robust health-এর তুলনায় উভয়ের আত্মা কিন্তু একই থাকবে, অবয়ব যা-ই হোক।

সেইজন্য আমার দু'টি ঘর। একটি ঘরে তাঁর বৈচিত্র্যের বাহার এবং অপর ঘরে নিত্য একা। কাজেই সেই নিত্য এক-এর বিজ্ঞান পরিপূর্ণ ভাবে দিয়েছি তোমাদের সকলকে কোনও প্রকার প্রত্যাশা না-রেখে, জাতি-বর্ণ-লিঙ্গের কোনও রকম বিচার ও হিসাব না-করে। স্বানুভবসিদ্ধ আপনবোধের বিজ্ঞান আপনাকে কেন্দ্র করে আপনার জন্য আপনি করেন বিতরণ। এর স্বাতন্ত্র্যতা ও মৌলিকতা আপনবোধেই তোমরা রক্ষা করবে।

সেই বিজ্ঞান যখন বলা হয়েছে তখন কোনও রকম হিসাব কষে বলা হয়নি যে, কে নিতে পারবে কি পারবে না বা কে কোন আশ্রমের বা কোন ধর্মাবলম্বী—এ সব কিছুই বিচার করা হয়নি। শুধু এক—এক-এর মধ্যে এক। সেই পরম এক-এর বিজ্ঞানকে বা এক-এর অনুভূতিকে আপনবোধে বরণ করে নেওয়া হল সাধনা। যেখানে দুই নেই সেখানে 'এ' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) কার দোষ ধরবে? কেউ এর ক্ষতিও করতে পারবে না, উপকারও করতে পারবে না। এই বিজ্ঞান আপনিই 'এর' মধ্যে নেমে এসেছে।

সেইজন্য বারবার বলা হয় 'এই আমি' কারও গুরুও নয় বা কারও শিষ্যও নয়। কথাটি শুনে অনেক ধার্মিক বা গতানুগতিক ধর্মনেতা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, মন্তব্যও প্রকাশ করেছেন। তাঁদের বলা হয়েছে 'এ' যে কোন পদ্ধতিতে সাধন করেছে সে খবর কেবল 'এ' নিজেই জানে, আর কেউ জানে না। কারণ 'এর' ভিতরের আত্মা তো তোমাদের ভিতরে আলাদা করে বাস করবে না। তাহলে আমার ভিতরের আত্মার খবর আমি জানি না আরেকজন জানবে? তা কোনও দিন হতে পারে না। আর 'এর' সাধনপদ্ধতিতে আপনিই তা 'এর' ভিতরে নেমে এসেছিল, যার জন্য কোনও গতানুগতিক সাধনা 'এ' করেনি। তাহলে আর তোমাদের কাছে এক-এর বিজ্ঞান বলতে পারতাম না, হয়ত গতানুগতিক বিজ্ঞানই বলতাম। গতানুগতিক সব কিছু সামনে রেখেছি এক-এর আলোতে—কারওকে বাদ দিইনি এবং ছোটও করিনি। 'এর' স্বরূপের যে সত্য পরিচয় তোমাদেরও সেই একই পরিচয়। পূজার ঘর, শোবার ঘর, বসবার ঘর আর গোয়াল ঘরের মধ্যে এক অখণ্ড আকাশই বিদ্যমান। ঘরের দেওয়াল দিয়ে আকাশ যেমন বিভক্ত হয় না, সেইরূপ দেহপোশাকের দ্বারা অখণ্ড এক আত্মাকে বা আমিকে ভাগ করা যায় না। এই আমি-র সত্যস্বরূপ হল অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দ।

আজকের এই যে বাণীবন্দনা—তা কার বাণী? ঋষিরা ঋষিদের বাণীকে বন্দনা করেছেন। যে ঋষির কাছে তাঁরা শুনেছিলেন অমৃতত্ব প্রসঙ্গে, সেই ঋষির কথাই তাঁরা বলেছেন যে, আমরা পূর্ববর্তী ঋষিদের কাছে এই ভাবে সত্যের কথা শুনেছি এবং ভবিষ্যতে পরবর্তী জিজ্ঞাসুদের কাছে সেই কথাই বলেছি। তখন ছিল শ্রুতির যুগ। বর্তমান যুগ অর্থাৎ কলি যুগ হল লিখনের যুগ। এখন আমরা সেই ভাষায় কথা বলি না। 'গুরুমারা বিদ্যা' আমরা শিখে ফেলেছি। সেই জন্য আত্মগুরুর কথা তোমাদের কাছে রাখা হয়েছে। লোকগুরুর প্রসঙ্গও বাদ দেওয়া হয়নি। পিতামাতার কথা থেকে আরম্ভ করে জগদ্‌গুরু পর্যন্ত সবাইকে বন্দনা করা হয়েছে। তাতে কী হবে? নিজের মধ্যে কোনও দোষ থাকবে না। আমি তো চার দিকে গুরুকে দেখছি, বন্দনা করছি, আর তো কেউ নেই। আত্মবিজ্ঞান প্রকাশের এ আরেক নূতন ভঙ্গিমা (application)।

মাটির বা পাথরের কোনও দেবতাকে আসনে বসিয়ে পূজা করতে তোমাদের বলা হয়নি। জ্ঞানস্বরূপকে বা প্রেমস্বরূপকে পূজা করতে বলা হয়েছে। যদি সত্যি সত্যি একজন জীবন্ত মানুষকে আত্মজ্ঞানে/ব্রহ্মজ্ঞানে পূজা করতে পার তাহলে মন্দিরে গিয়ে জড় প্রতিমাকে পূজা না-করলেও কোনও ক্ষতি হবে না। কারণ জীবন্ত মানুষ, যার মধ্যে চৈতন্য পরিপূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হতে পারে তার পূজার দ্বারা চৈতন্যেরই পূজা হবে এবং তার ফলস্বরূপ অন্তরে চৈতন্যেরই প্রকাশবিকাশ বা স্ফূর্তি হবে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার পূজাতে চিদাত্মার জ্ঞান জেগে ওঠে।

প্রাকৃত বুদ্ধি বিকারের ঘরে পড়ে। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার কোনও বিকার হয় না বা ভাগের ঘরে পড়ে না। কে ভাগ করবে? চৈতন্যই একমাত্র চৈতন্যকে জানে। জড় চৈতন্যকে জানে না। কাজেই চৈতন্যই চৈতন্যকে জানে ও প্রকাশ করে। চৈতন্যের বা আত্মার কখনও অভাব হয় না। চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অভাব হলে তোমরা কেউ বাঁচতে পারতে না। তোমাদের আত্মা সর্বদাই বর্তমান। আত্মাই প্রকাশ করে আত্মার স্বরূপকে। কিন্তু বুদ্ধিদোষে জীবরূপী তোমরা তা অবগত নও। আত্মা কারও অধীনতা স্বীকার করতে কখনওই পারে না। আত্মস্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপূর্ণ। এই আত্মার মহিমাই তোমাদের কাছে বলা হয়েছে। এই আত্মাই ব্রহ্ম। ঋষিরা এই আত্মার সন্ধান পেয়ে সবাইকে আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করে আত্মার জয়গান গেয়ে গিয়েছেন।

এ যুগের মানুষ আত্মাকে ছেড়ে কতগুলি Demi God, Semi God নিয়ে মাতামাতি করছে আর পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব, ভেদাভেদ করছে—ভালবাসার কথা ছেড়েই দেওয়া গেল। কাটাকাটি, হানাহানি এই হল বর্তমান যুগের রূপ। জগতের সঙ্গে আত্মার ভেদ কোনও দিনই ছিল না। যা-কিছু প্রকাশ হয় তা চৈতন্যের বক্ষে চৈতন্যের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। তোমরা ইন্দ্রিয়-মন দিয়ে পরস্পরের দোষ দেখতে অভ্যস্ত। তা ইন্দ্রিয়-মনের ত্রুটি। এই ত্রুটি শোধন করার জন্য আত্মজ্ঞপুরুষ বলেন—তুমি ইন্দ্রিয়ের দিকে অত মন দিও না। এবার তুমি আমার একটি কথা শোন। তুমি যে-ই হও তুমি তোমার ঐ ইন্দ্রিয়ের ভাবগুলিকে ছেড়ে চুপচাপ শান্ত হয়ে বস। তোমার নিজের স্বরূপকে অখণ্ডবোধের আমিরূপে একটু ভাব। একটু ভাব যে, আমার জন্ম, মৃত্যু ও ক্ষয় নেই,

আমি সেই অনন্ত অখণ্ড এক আত্মা। আমার দুই নেই। এই যে অমর বাণী এই হল গুরুবাণী, এই বাণীকে বন্দনা করতে তাঁরা শিখিয়েছিলেন। এর নামই সরস্বতীবন্দনা। নূতন করে তা আবার পরিবেষণের প্রয়োজন আছে বলেই আত্মার আমি তা স্বানুভূতির ভাষায় বলে যাচ্ছেন। এই বাণীকে ছেড়ে তোমরা আর কার বন্দনা করবে?

যদি worship করতেই হয়, তবে worship কর জ্ঞানদেবতার, অজ্ঞানের পূজা কোর না। কোন জ্ঞানের পূজা করবে? যে জ্ঞান সব কিছুকে প্রকাশ করে দেয়। অর্থাৎ worthy of worship বলে জগতে যদি কিছু থাকে তবে তা হল wisdom—be a true lover of wisdom। এই হল স্বানুভূতির বিজ্ঞান। তা বিশেষ ভাবে মনে রেখ।

মনে রেখ, মানুষের মাধ্যমে হয় আত্মার আমি-র প্রকাশ এবং আত্মার আমি তা অনুভব করে অখণ্ড আমিবোধে। এই অখণ্ড আমিবোধই হল স্বানুভূতি। সেই জন্য মানুষরূপে যে জন্ম, তা হল মহৎ জন্ম। পশুজগতে এই মনুষ্য দেহ লাভের জন্য বহু রকম ভাবে চেষ্টা চলে। মনুষ্য দেহ লাভ করা কঠিন। মানুষ সেই বোধ হারিয়ে ফেলে—তাই জীবনকে নষ্ট করে না-জেনে। তাই গুরু শুনিয়ে দেন যে, এই একটি দেহ পেয়েছ। এর দ্বারা আগে সেই জ্ঞান লাভ কর, নইলে ঠকে যাবে। অন্য বিষয় নিয়ে চিন্তা কোর না, তুমি আগে নিজের স্বরূপকে জেনে নাও।

আমরা এই ছোট খাঁচার মধ্যে থেকে তার সেবা করছি এবং মনে করছি এটাই আমাদের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। আমার আবার কর্তব্য কী? বন্ধন কী? আত্মার বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে না। নিজেকে নিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য এই ভাবনা ভাব। মুক্তির আনন্দে মুক্তির বাণী তোমাদের কাছে রাখা হয়েছে। তোমরা সেই আনন্দে অবগাহন করে দেখ, সত্যি সত্যি মুক্তি কাকে বলে! একটি পাখি খাঁচা ছাড়া হয়ে গেলে কী আনন্দ পায় তা সবাই জানে। স্কুল ছুটির পর ছেলেমেয়েদের অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীদের যে কী আনন্দ হয়, ঐ সময় দাঁড়িয়ে যদি কেউ দেখে তবে সে মুক্তির কী আনন্দ তা স্বচক্ষে দেখে জানতে পারবে। তখন তারা একেবারে বাঁধন ছাড়া, কোনও নিয়ম নেই, তাদের কেউ বাঁধতে পারে না কোনও নিয়মের মধ্যে। প্রাণ খুলে তারা আনন্দ করে। ঠিক এই ভাবে তোমরাও স্বরূপের আনন্দে ডুবে যাও।

এই হল স্বানুভূতির বিজ্ঞান এবং তার তাৎপর্য ও ঘোষণা। সেই ঘোষণা আত্মার জন্য আত্মারই ঘোষণা। আমি তারই মূর্ত রূপ।

তোমরা যাঁকে বাবাঠাকুর বল তিনি পরমাত্মার আমি-র সঙ্গে সমবোধে, ঐক্যবোধে, তাদাত্ম্যবোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে অখণ্ড বোধস্বরূপ পরমাত্মার আমি-র অনুভূতিতে তথা স্বানুভূতির বিজ্ঞানে সিদ্ধ হয়ে স্বানুভূতির ভাষায় আত্মার বিজ্ঞান বা শুদ্ধ পূর্ণ আমি-র বিজ্ঞানকে এক-এর বিজ্ঞানের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন এতকাল। জীবের আমিকে মুক্ত করার জন্য অর্থাৎ দেহাত্মবুদ্ধি ও সসীম অহংকার-অভিমান থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য অখণ্ড ভূমা আমি-র বোধকে স্বানুভূতির ভাষায় প্রকাশ করেছেন।

এটাই শুধু 'এ' বলেছে। 'এ' অন্য কোনও শিক্ষাদীক্ষার খবর জানে না। কার জন্য শিক্ষাদীক্ষা? আত্মার কোনও শিক্ষাদীক্ষার প্রয়োজন হয় না। আর নিজের আত্মাকে বাদ

দিলে তো 'এ' একটা জড়ভূত, কোনও মূল্য নেই। আর তোমাদের মন যদি চিরকাল জড়ভূতের চর্চা করে তাহলে জীব হয়েই থাকবে। কালচক্রের মধ্যে কেবল দেহ হতে দেহান্তরে এবং রূপ হতে রূপান্তরে ঘুরে বেড়াতে হবে। 'এ' কিন্তু সেই চক্রকে ভেঙে দেবার বিজ্ঞান তোমাদের সামনে রেখেছে। যতদিন তা পাইনি ততদিন কারওকে কিছু বলা হয়নি। যখন সেই বিজ্ঞান সম্পূর্ণ সিদ্ধ হয়েছে, তখন থেকেই ঘর ছাড়া হয়েছি। অখণ্ড মুক্ত পূর্ণ আমি আত্মার বিজ্ঞানকে স্বানুভূতির বিজ্ঞান নামে সবার কাছে অর্থাৎ আত্মারই কাছে ব্যক্ত করেছে আত্মলীলারূপে। নিম্নে সেই formula-গুলি ব্যক্ত করা হল—

(1) 'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness'.

(2) 'All Divine for All Time, as It Is'.

(3) 'All acceptance and all embrace as the means for realization of the supreme Divine Self–Absolute I'.

(4) 'Missionless Mission'.

(5) 'Science of Oneness, Oneness of Knowledge/Knowledge of Oneness'.

'এ' ধর্ম ছেড়েছে ধর্মসাধনা শেষ করে। কর্ম ছেড়েছে কর্মসাধনা শেষ করে। সিদ্ধি ছেড়েছে পরমসিদ্ধি লাভ করে। কেন না এগুলি 'এর' প্রয়োজন নেই। তবে তোমরা যে কথাগুলি শুনছ 'এর' কাছে তা হল অনন্ত বেদ। এই শরীর নষ্ট হয়ে যেতে পারে, কিন্তু সেই বেদ ভিতর থেকে উদ্গীত হতে থাকবে। এখানে কোনও দেবতা ও মতপথের বাধা বা গণ্ডি নেই—আছে শুধু স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত অখণ্ড এক বোধসত্তা। সেই অখণ্ড কিন্তু সবসময় পূর্ণ ও প্রশান্ত। তার অভাব, কামনা বা চাহিদা এবং প্রয়োজনও নেই। সেই আমি নিত্যবর্তমান। ভজনগুলির মধ্যে বহু জায়গায় সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে।

জগতে আর কোনও কিছুর প্রয়োজন 'এর' নেই। মুক্তিরও 'এর' কোনও প্রয়োজন নেই এবং ঈশ্বরেরও কোনও প্রয়োজন নেই। কারণ ঈশ্বর তো কোনও সময়ের জন্য 'একে' বাদ দিয়ে থাকতে পারবেন না। আর 'এও' তো ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে থাকতে পারবে না। কিন্তু তাই বলে কি লোকের সামনে demonstration দিয়ে বলব যে, দেখ আমি ঈশ্বর। একে কিন্তু ঈশ্বর বলে না। সেই ঈশ্বর কখনও এই রকম হতে পারে না—কারওকে বড় বা ছোট করে। সেই জন্য 'সর্বসম' কথাটি সব গানে বিশেষ ভাবে রাখা হয়েছে।

সমত্বই হল ঈশ্বর। সম+তত্ত্ব হল সমত্ব। অসমান হলে ঈশ্বর হয় না। ঈশ্বর অসমান বা partial হতে পারেন না। যারা পক্ষপাতের বিজ্ঞান দেন তারা ঈশ্বর-আত্মার বা সমত্বের বিজ্ঞান দিতে পারেন না। তারা দেবতার বিজ্ঞান দিতে পারে। সেখানে 'এর' কিছু বলার নেই। আত্মস্বরূপকে দেখা, ভাবা ও জানাই হল 'এর' প্রয়োজন—আর কেউ আছে কি নেই তা 'এর' কাছে অত গুরুত্বপূর্ণ নয়। কারণ আমি অতিরিক্ত আর কিছু নেই সত্য, আমি ছাড়া আমি হতেই পারে না। আমি আমাকে জানবই।

আমার নিজের স্বরূপকে না-দেখে অন্যের স্বরূপকে দেখে কী হবে? আমাকে না-জেনে বা বাদ দিয়ে যে অগণিত প্রাকৃত সম্পদ ও শক্তি রয়েছে জগৎ জুড়ে তা দেখে কী হবে? কিন্তু যেই মুহূর্তে নিজেকে দেখা হয়ে গেল তখন আর কিছু দেখার বাকি থাকল না।

আমাকে আমি কি করে দেখতে পাব? যখন জগতে দ্বিতীয় কারওকে দেখার প্রয়োজন থাকবে না তখনই আমি নিজেকে দেখতে পাব। আর নিজেকে দেখার অর্থ নিজেকে ভাগ করে বা আলাদা করে দ্রষ্টা হয়ে দেখা নয়। যখন আর কেউ থাকবে না তখন একমাত্র আমি-ই থাকব। এই হল তোমাদের বাবাঠাকুরের স্বানুভূতির ভাষায় আত্মদর্শন বা ভূমা আমি-র দর্শন। এখানে যেন কেউ ভুল মনে না-করে। আমি যেমন অন্য বস্তু দেখছি সেই ভাবে নিত্য আমাকে দেখব—একে আত্মদর্শন বলা হয়নি। আত্মার মধ্যে কোনও রূপ নেই, ভাগাভাগি নেই, কোনও আলোও নেই, অন্ধকারও নেই, আছে অখণ্ড সমতা। তাহলে অন্য কেউ যখন থাকছে না তখন ভূমা অখণ্ড পূর্ণ আমিকে দেখছি। এর নামই ব্রহ্মদর্শন/আত্মদর্শন।

আত্মদর্শনে subject-object থাকে না। এটা খুব important factor। যারা মনে করে যে, বস্তুজগতের দর্শনের মতো, জ্যোতি দর্শনের মতো আত্মাকে দেখবে একটি বিরাট জ্যোতিরূপে তাহলে বুঝতে হবে তখনও প্রাকৃত দর্শন চলছে। অর্থাৎ তখনও তারা অবিদ্যার ঘরে, বিদ্যার ঘরে আসেনি—যেখানে সূর্য, চন্দ্র, অগ্নি, বিদ্যুৎ, মন প্রবেশ করতে পারে না সেখানে কে, কাকে, কী দিয়ে দেখবে?

এই বিজ্ঞানটি সবার আগে মানুষের কাছে ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। তাহলে মানুষ অন্তত বিভ্রান্ত হয়ে এত কষ্ট পেত না। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার ধর্মজগতেও এই বিদ্যার চর্চা করছে খুব কম লোক। এই কথা শুনলে লোকে বলে—ঐ তো অদ্বৈতের কথাই আপনি বলছেন। দ্বৈত-অদ্বৈত 'এ' জানে না। কাকে অদ্বৈত বলবে? নিজের স্বরূপ কি অদ্বৈত না দ্বৈত? এর কোনওটিই নয়।

তোমরা অন্তত লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি জগৎবাসীর মধ্যে নিশ্চয় ভাগ্যবান। কারণ তোমরা বিজ্ঞানের বিজ্ঞান শুনবার এবং যাঁর ভিতরে এই বিজ্ঞান নেমে এসেছে তাঁর সঙ্গ করবার সুযোগ পেয়েছ। তোমাদের কাছে এটাই বলার আছে যে, বিরাট এই অনুভূতির পূর্ণ অধিকারী হয়ে মানুষের কাছে তা ছড়িয়ে দাও। এই হল তোমাদের জীবনের তাৎপর্য এবং একমাত্র লক্ষ্য, আর সব গৌণ। এই দায়িত্ব যে নিতে পারবে না সে হল স্বার্থপর ও অহংকারী। তার জন্য অবিদ্যার ঘর। বিদ্যার সন্ধান সে পাবে না। তার জীবত্ব চলতেই থাকবে—অহংকারেই জাত হবে, অহংকারেই বাস করবে এবং অহংকারেই মরবে। সে কখনও তার পূর্ণ দিব্য অমৃতস্বরূপ আত্মতত্ত্বের সঙ্গে একীভূত হতে পারবে না।

'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) ভিত্তিটা শুধু জেনে রেখ যে, 'এর' আমিকে বাদ দিয়ে একটি ধুলোবালিও নেই। সব কিছুর মধ্যে আমি-ই রয়েছে, দ্বিতীয় কেউ নেই। কারণ আত্মা কখনও বিভক্ত হতে পারে না। অবিভক্ত আত্মাতে মন-ইন্দ্রিয় দিয়ে ভেদ কল্পনা করা যায়, কিন্তু তাঁ কখনও বিভক্ত হয় না। আকাশকে নানা ভাবে কল্পনা করতে

পার, কিন্তু আকাশ আকাশই থেকে যায়। কল্পনা করে করে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। সেই মনকে বিদ্যার ঘরেই রাখ। সে বিদ্যার বা এক-এর সেবাই করুক, যে এক সব কিছুকে জুড়ে বসে আছে। যদি কোথাও কুৎসিত কিছু থাকে তা আত্মারই প্রতিরূপ। আত্মা আমি অতিরিক্ত নয়। তাহলে দেখবে কুৎসিত তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। তা না-হলে কুৎসিত তোমাকে ছোবল মারবে। আমি যদি তা-ই হই তাহলে আমাকে আর কে মারে? আমাকে তো আর আমি মারতে পারব না। যেমন আগুন আগুনকে পোড়ায় না কিন্তু আর সবকে পোড়ায়। তোমরা সেই জ্ঞানাগ্নি হয়ে যাও—যে জ্ঞানাগ্নি নিজেকে পোড়ায় না। সেই জ্ঞানাগ্নি সব সময় এক বা সমান থাকে। জ্ঞানাগ্নি তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে। 'এ' আবোল-তাবোল কিছু দেয়নি, কারণ সেই অখণ্ড আবোল-তাবোল দিতে পারে না।

'এ' মা বলতে সেই অখণ্ড পূর্ণ ব্রহ্মকেই নির্দেশ করেছে। লৌকিক ভাষায় বা তন্ত্রের ভাষায় যাঁকে মা বলে তাঁর কথা 'এ' বলেনি—অজ্ঞানকে, দ্বৈতকে বা বৈচিত্র্যকে বলা হয়নি। পূর্ণ আনন্দ, প্রেম ও সত্যকে মা বলা হয়েছে। সেই মা, আত্মা, ব্রহ্ম ও আমি অভেদতত্ত্ব। এই অভেদতত্ত্বই হল ভূমা আত্মা, ভূমা আমি। ভূমা আমি-র মধ্যে ভূমা আমি ছাড়া আর কিছু থাকা সম্ভব নয়। সেই ভূমা আমি কেবলমাত্র ভূমা আমি-র কথাই বলতে পারে, অন্য কথা অবান্তর। সেই ভূমা আমি কেবলমাত্র নিজেকেই বা আমিকেই দেখে ও জানে। আমি ছিল, আছে ও থাকবে। এই আমি হল সচ্চিদানন্দসত্তা। সে-ই হল ঈশ্বর। যদিও বর্তমান যুগের মানুষের কাছে এটা একটা বিরাট ধাক্কা দেবে। কেউ সহজে নেবে না। না-ই বা নিল। আগে তো আমার মন নিক, যার জন্য কোনও জিজ্ঞাসা নিয়ে 'এ' কোনও সাধুর কাছে কখনও যায়নি। সবাই কেবল 'একে' দীক্ষিত করার জন্য চেষ্টা করেছিল। এমন একজনও সাধুর দর্শন 'এ' পায়নি যে 'একে' আগে দীক্ষার কথা বলেননি। কিন্তু কারও কাছে 'এ' দীক্ষা নিতে পারেনি, কারণ conventional দীক্ষা কখনওই 'এর' প্রয়োজন ছিল না। 'এর' তো মুক্তির প্রয়োজন নেই। তোমরা যাকে মুক্তি বলছ, সেই কল্পনার মুক্তি 'এর' চাই না। যা নিত্যকালের মুক্তি তা ছিল, আছে এবং থাকবে। 'এ' সেই মুক্তি হারায়নি। তোমরা যে মুক্তির কথা বলছ তা 'এ' কল্পনাও করে না। যে মুক্তি একজন আরেকজনকে দেয় বা বন্টন করে তা আবার হারিয়ে যায়। 'এ' সেই মুক্তি চায়নি।

'এ' নিজেকেই জগৎরূপে দেখছে। 'এ' দীক্ষা নিতেও পারবে না এবং দিতেও পারবে না—তোমরা অসন্তুষ্টই হও আর যা-ই হও। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ত তখন রাত জেগে 'এ' নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছে—আমার ভিতরে এই যে আমি, তুমিই জেগে থাক। তোমাকেই শুধু 'এ' মানে। কারণ তুমি যদি না-থাক তাহলে কী দিয়ে জানব? জানবার অবলম্বন কোথায়? তুমি ঘুমিয়ে থেক না। তুমি ঘুমিয়ে পড়লে তো 'এ' অজ্ঞানের মধ্যে ডুবে যাবে। তাকে 'এ' জাগিয়ে রেখেছে। একসময় সেতারটা বুকের ওপর নিয়ে রাত জাগবার চেষ্টা করেছি। তারপর এই জ্ঞানবিচার চলেছে যে, এর মূল কোথায়? কে এই আমি? কতবার জন্মেছি? 'এর' সঙ্গে প্রকৃতির মধ্যে কার

কী সম্বন্ধ? এই যে লক্ষ লক্ষ বার জন্মেছি সেই মা-বাবারা এখন কোথায়? কোথায় আমার সন্তানাদিরা? খুঁজে বার করতেই হবে এর মূল! এমনি ছেড়ে দিইনি। কিন্তু সেই বিজ্ঞান অবগত হওয়ার জন্য 'এ' স্বতন্ত্র ভঙ্গিমায় চেষ্টা করেছে, কারওকে জিজ্ঞাসা করে বা অনুকরণ করে নয়।

অনেক পরে একটি দৈববাণী শুনেছিলাম যে, এই যে যোগ এটা আমাদের প্রচলিত যোগ নয়। যাই হোক, 'এ' কোনওদিন নিজেকে বহুত্বের অধীন মানতে পারেনি, দুঃখকষ্টের অধীন মানতে পারেনি। দুঃখকষ্ট 'একে' ছেড়ে দিয়েছে। সেগুলি এখন 'এর' কাছে ভৃত্যের মতো। জরা-ব্যাধি প্রত্যেকের থাকে, 'এর'-ও আছে। নেই, এই কথা 'এ' কোনওদিন বলবে না। তবে ব্যাধিগুলিকে শত্রুর মতো দেখি না বা কোনও সময়ের জন্য কারওকে আর প্রতিপক্ষ মনে করি না। যদিও অপরের সঙ্গে মনের কর্মের অমিল হতে পারে, অপরে 'এর' কথা নাও শুনতে পারে, 'এর' কথার বিকৃত রূপ করতে পারে, তবু জানি আছি একমাত্র একা আমি। কারণ 'আমি জানি' এবং 'আমি জানি না' এই দুই মিলিয়ে আমি। এই আমি সবার ভিতরে বসে আছে এবং সবার আমি এই আমি-র ভিতরে। কেউ পৃথক হয়ে থাকতে পারবে না।

আমি আত্মাশূন্য নই, তোমরাও কেউ নও। এক আত্মার মধ্যে দুই রকম হতে পারে না, প্রকৃতির বা অবিদ্যার মধ্যে হতে পারে। অবিদ্যার কথা তো অনেক বলেছ। এবার না-হয় তোমরা বিদ্যার চর্চাই কর। জীবন তো অল্প সময় নিয়ে আসে। অনেকখানি সময় গিয়েছে অবিদ্যার ঘরে। এবার বিদ্যার ঘরে কিছু চর্চা কর। বিদ্যার ঘরে ফিরে এস। অর্থাৎ আমাকে নিয়ে আমি-র আমিবোধে তোমাদের আমিকে ডুবিয়ে দাও। রাঙিয়ে দাও তোমাদের আমিকে অখণ্ড ভূমা আমি-র বোধে। আমার শূন্য আমিকে 'আমিবোধে' জান, মান এবং চল। তোমাদের আমি 'আমারবোধের' সঙ্গে যুক্ত। সেই জন্য তোমাদের কাঁচাআমি অহংকার-অভিমান অর্থাৎ অবিদ্যার ব্যবহার বিদ্যাকে ছেড়ে অর্থাৎ এক-এর জ্ঞানকে ছেড়ে বহুর জ্ঞানকে নিয়ে মেতে আছে। বহুর জ্ঞানই হল সংসার। সংসারে তোমাদের আমি নিজের সত্য পূর্ণ দিব্য অমৃতস্বরূপ অর্থাৎ অখণ্ড ভূমা আমিকে ভুলে আছে। এই ভুলের ঘরে যতদিন থাকবে, ততদিনই অহংকার-অভিমান থাকবে। এই অহংকার মানেই 'আমি আমার' এবং 'আমার আমি'। তা ছেড়ে যায়, ভেঙে যায়, পালায় এবং নির্মূল হয় অখণ্ড ভূমা আমিকে আশ্রয় করলে।

মনে রেখ অখণ্ড ভূমা আমি-র সত্য পরিচয়টি। তাহলে তোমাদের সসীম আমি-র অহংকার ঘুচে যাবে ভূমা 'আমিবোধের' সাগরে। তখন ভূমা 'আমিবোধের' জ্যোতিতে, ভূমা আমি-র দর্শনে আপনাকে ধন্য পূর্ণ দিব্য অমৃত জেনে কৃতকৃত্য হবে।

সব সময় মনে রেখ, রসগোল্লার মধ্যে রস যেমন তার অণু-পরমাণুর মধ্যে মিশে থাকে, সেই রকম প্রিয়তম অখণ্ড আত্মাও সমগ্র বৈচিত্র্যময় জগৎকে বরণ করে নিয়ে আছে। কিন্তু বুদ্ধিদোষে এই বোধ তোমাদের মধ্যে আবৃত হয়ে আছে। আপনবোধের ব্যবহার দ্বারা এই দোষ সরে যায় এবং আত্মবোধ স্বয়ংপ্রকাশ হয়। তাকে প্রকাশ করছে আপনবোধে এবং তুমিও সেই অখণ্ড আমিরূপ রসসাগরে আমি-র রসে সিঞ্চিত হয়ে

আছ। কিন্তু সেই বিষয়ে তুমি অবহিত নও। সেই সম্বন্ধে সচেতন করার জন্যই 'আমিবোধে', আপনবোধে তোমাদের প্রবুদ্ধ করা হচ্ছে। 'এ' একেবারে সর্বান্তঃকরণে তোমাদের কাছে সেই কথাই বলছে। তা-ই সর্বতত্ত্বসার। আত্মাশূন্য তোমরা কেউ নও, কোনওদিন হওনি এবং হতেও পারবে না।

এই আত্মাই তোমাদের ঈশ্বর—সকলের সত্য পরিচয়, যা তোমরা ভুলে গিয়েছ। কিন্তু দিনে অল্প সময়ের জন্য হলেও মনে করবে যে, আমি আমাকে ভুলে গিয়েছিলাম, সেই জন্য দেহধারণ করতে হয়েছে। আর আমি দেহধারণ করব না। কারণ এবার আমি আত্মার আমি-র কৃপায় আত্মস্বরূপ মনে করতে পেরেছি এবং তাঁর কৃপায় তাঁর মধ্যে থাকার সত্য বিজ্ঞান লাভ করেছি। শুনেছি আমি পূর্ণ—আমার কোনও অপূর্ণতা, অভাব, ত্রুটি ও অজ্ঞান নেই। কে আমাকে কী দিয়ে বাঁধবে? আমার কষ্ট নেই। দেহের কষ্টও নেই। দেহ তো পোশাকের মতো দুই দিন পর ফেলে দেব। এত ভয়ের কী আছে? কাকে ভয় করব? এমন কেউ নেই যে কি না আমাকে অতিক্রম করতে পারে। আমি অজেয়।

তোমাদের মধ্যে যে আমি নিত্যবর্তমান, এগুলি তাঁরই কথা। মনে কোর না যে, এই ক'টা কথা দিয়ে তোমাদের ভুলিয়ে রাখছি। 'এ' তোমাদের ভুলটা ভাঙিয়ে দিচ্ছে। দিনকয়েক এই ভাবে একটু ভেবে দেখ! দেখবে কোথা থেকে শক্তি আসে, কোথা থেকে আনন্দ নেমে আসে নিজের ভিতরে, নিজেই অবাক হয়ে যাবে। অজ্ঞান দূর করার এই মহৌষধ তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে। অজ্ঞান তোমাদের সামনে আসতে পারবে না এবং বাঁধতেও পারবে না। অনুভূতিকে কেড়ে নিয়ে খুশি মতো ছাঁচ দিয়ে ব্যবহার করতে পারবে না। নিজের স্বরূপকে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ভাবতে লজ্জাবোধ কোর না, কোনও মতবাদের দোহাই দিও না। কেউ যদি তোমাকে বারণ করে তবুও না। কারণ নিজের মুক্তস্বরূপকে স্মরণ করতে গেলে নানা বাধা আসতে পারে। যারা conventional পথে সাধনা করেছে তারা এগুলি মানে না। তারা দ্বৈতবাদের বিজ্ঞান নিয়ে চর্চা করছে। সেগুলি তোমাদের আর প্রয়োজন নেই। দ্বৈতবাদের বিজ্ঞান নিয়ে শান্তি পাবে না। সেখানে এমন কোনও আলো কেউ ধরিয়ে দেয়নি যে আলো নিয়ে অন্ধকাবের মধ্যে তোমরা চলতে পার। কিন্তু এই বিজ্ঞান ধরিয়ে দিচ্ছে তোমাদের সত্য পরিচয় যে, তুমি অজর অমর। তোমাকে মারতে পারে এমন কেউ নেই। মরবে এই দেহটি, মরবে অহংকার। আমি দেহ নই, দেহ আমার নয়। আমি দেহ ও অহংকারকে যা দিয়ে দেখি তাই হল দ্রষ্টা আমি। তা-ই সাক্ষিরূপে নিত্যবর্তমান। এই সাক্ষীকে নষ্ট করতে পারে এমন কেউ নেই। সাক্ষ্য নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু সাক্ষী নষ্ট হয় না।

'এর' অখণ্ড ভূম। আমি-র প্রত্যেকটি কথা মনে রেখ। এটা তোমাদেরই সত্য পরিচয়—বোধের বোধ। তোমাদের কাছে তা ফিরিয়ে দেওয়া হল। এটা 'এর' কাছে যে কত বড় প্রিয় বস্তু সে আর বলার নয়। তোমাদের কাছেও সর্বোত্তম প্রিয় বস্তু এটাই। ভুলে গিয়েছ, তাই মনে করছ অজ্ঞানের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছ। মনে করলেই তোমরা তোমাদের পূর্ণস্বরূপের পরিচয়টি পাবে। কে এই আমি? আমি জীবও নই,

দেবতাও নই। আমি জড় বস্তু নই। আমি সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ—যার জন্ম, মৃত্যু, ক্ষয়, বৃদ্ধি নেই। তার প্রতিদ্বন্দ্বী, অজ্ঞান, ভ্রান্তি, ভীতি নেই। এর চাইতে আনন্দ আর কী হতে পারে? অনেক কিছু তোমাদের করা সম্ভব হয়নি। যদি তোমরা নিজেরা ঠিক থাক তাহলে সবই সম্ভব হবে। জেনে রেখ জন্মটি মৃত্যুর জন্য নয়, মৃত্যুকে অতিক্রম করার জন্য। দুঃখ ভোগ করার জন্য নয়, তা অতিক্রম করার জন্য, অজ্ঞানকে নাশ করার জন্য, অজ্ঞানকে অতিক্রম করে জ্ঞানস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য।

জন্মের কারণ 'এ' আবিষ্কার করেছে। যাঁরা বলেন দুঃখ ভোগ করার জন্য বা সংস্কার নাশের জন্য জন্ম 'এ' তাঁদের সঙ্গে পিরিতও করেনি বা তাঁদের বিরুদ্ধেও যায়নি। কিন্তু এ সব ছাড়াও জীবনের আর কোনও লক্ষ্য আছে কি না তা 'এ' অনুসন্ধান করেছিল। সেই অনুসন্ধান করে তার পূর্ণ সমাধান 'এ' যে-ভাবে পেয়েছে তা-ই তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে। এটা কারও একচেটিয়া বা ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। অর্থাৎ ব্যক্তিগত ভাবে এটা কারও নয়, তা অখণ্ড ভূমা আমি-র।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি সসীম বলে সে সব পেতে চায়। 'পাওয়ার বেলায় আপন বলে, কিন্তু দেওয়ার বেলায় করে ছল/তার থেকে এক আনা দিতে গেলে করে ফুটানি/সে সদাই অভিমানী/তার অভিমানের বড় বালাই/অভিমানের কারণ জানা নেই/সসীমবোধে অজ্ঞানে বাস করে তাই/সেই সসীমবোধে জীবের আমি, অহংকারের আমি চায় সব, কিন্তু পায় না সব/নিজেই হয়ে যায় শব/সে দেয় অল্প, পায়ও অল্প/যদি সে তার সব কিছু দেয় তবে সে সব আপন করে পায়।' যেমন জলসাগরে জলের বুদ্‌বুদ্ পৃথক থেকে সসীম, কিন্তু আপনাকে চিরকাল পৃথক রাখতে পারে না। সে ভয়ে মরে। আপনাকে হারালে অর্থাৎ অখণ্ড সাগরবক্ষে আপনাকে দিয়ে দিলে সাগর হয়ে যায়। কিন্তু এটা সে বোঝে না, বুঝিয়ে দিলেও বুঝতে পারে না। তোমাদের আমি-র ঠিক সেই অবস্থা। এই আমি দল বাঁধে, দল ভাঙে, দল গড়ে নিজের স্বার্থপূরণের জন্য। সে পৃথক থাকতে পারে না, চায়ও না। ভেদজ্ঞান তার স্বভাব। সেই জন্য পৃথক আমি দল বেঁধে বাস করতে চায়। 'এ' এই দল ছাড়া। দলের সঙ্গে 'এ' যুক্ত নয়, দলও 'এর' সঙ্গে যুক্ত নয়। 'এ' মুক্ত চিরকাল। এই আমি-র সঙ্গে যে যুক্ত থাকে সেও মুক্ত হয়ে যায়। এই আমি-র কোনও চাওয়া-পাওয়া নেই। কিছু না-চাওয়াই হল সর্বোত্তম চাওয়া এবং কিছু না-পাওয়াই হল সর্বোত্তম পাওয়া। এই হল অখণ্ড ভূমা আমি-র স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর স্বতন্ত্র মৌলিক ব্যবহার।

এই কথাগুলি লক্ষ লক্ষ লোকের উপর গুরুগিরি করার জন্য বলা হয়নি। তোমার আপনস্বরূপের পরিচয়টি যদি তোমার হাতে কেউ তুলে দেয় তবে সে তোমার পরম আপনজনই। এই আপনবোধ দিয়েই হয় শুধু এব বন্দনা, সাধনা এবং বরণ করে নেওয়া। একে বরণ করে নেওয়াই হল পূজা। প্রচলিত লৌকিক পূজা, আচার সব dead হয়ে গিয়েছে। তাতে কোনও দেবতা সাড়া দেন না বা সাহায্য করার জন্য নেমে আসেন না। তোমাদেরই হয় হয়রানি। গতানুগতিক পূজার পর তোমরা শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে পড়। শ্রান্ত ক্লান্ত হয়ে অর্থক্ষয়, দেহের শক্তি ক্ষয় ও সময় নষ্ট হয় এবং শেষ পর্যন্ত হতাশা ঘিরে ধরে। তখন কোনও দেবতা এসে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন না যে—বাবা,

আমি তোর পাশে আছি। 'এ' এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে রাজি নয়। ওটা আছে থাক—সমাজের একটি discipline। কিন্তু আসল পূজা হল নিজের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া।

ভক্তদের প্রসাদ দিতে বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর উঠবার উপক্রম করতেই সুবীর কর পুরকায়স্থ ***শ্রীসানাই*** পত্রিকা রাখা থালাটার দিকে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল—আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আমরা এতদিনযাবৎ যা শুনেছি তা পত্রিকা আকারে বার করার চেষ্টা করছি। ডঃ শ্যামাদাস চ্যাটার্জী আগ্রহভরে হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি কি একটি পেতে পারি? উত্তরে সুবীর জানাল—এখন সবাইকে দিতে একটু অসুবিধা আছে: আমি আপনাকে নিজে গিয়ে দিয়ে আসব।

এরপর শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—তবে কাজ যখন তোমরা আরম্ভ করেছ খেয়াল রেখ এর মধ্যে কোনও ত্রুটি যেন কখনও না-থাকে। অফুরন্ত দেখেছ, শুনেছ। সেগুলিকে সাজিয়েগুছিয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে, অহংকার-অভিমান যাতে কখনও না-আসে, সেই ভাবে লোকের কাছে পরিবেষণ কোর। কারণ তা না-হলে নিজেই ঠকবে। আনাড়ি লোকের হাতে দাঁড়ি কাটতে গিয়ে যেমন নিজের গাল কেটে ফেলে, সেই রকম নিজেরা নিজেদের এই জিনিস আনাড়ির মতো পরিবেষণ করতে গেলে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতবিক্ষত করবে।

তোমাদের অনুভূতির পূর্ণতার জন্য বলছি শোন—সব সময় জানবে তোমার চাইতে ছোট কেউ নেই, সবাই সমান। তোমার চাইতে বড় কেউ থাকলে থাকতে পারে, কিন্তু তোমার চেয়ে ছোট কেউ নেই।

অখণ্ডবোধে প্রতিষ্ঠিত এই আমি কারওকে অবজ্ঞা করতে পারবে না, কোনও সময়ের জন্য নয়। স্বানুভবসিদ্ধ এই এক-এর বিজ্ঞান যা 'এ' নিজ অন্তরে খুঁজে পেয়েছে, তা জীবনের সর্ববিষয়ের সমাধান পূর্ণ ভাবে করে দিতে পারে। মানুষের যত রকম সমস্যা সবই তার নিজের সৃষ্টি, কিন্তু সেগুলির সমাধান তাদের জানা নেই। কাজেই তোমরা যত পার এই এক-এর বিজ্ঞান মানুষের কাছে তুলে ধর, যেমন ভাবে 'এ' তোমাদের কাছে তুলে ধরেছে। এই এক-এর বিজ্ঞান কিন্তু গতানুগতিক নয়, শাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কোনও প্রসঙ্গের দ্বারাও সীমিত নয়। তার সঙ্গে নিজের ভাব ও ব্যক্তিগত বিষয়ের অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের মিশ্রণ কোর না। এমনকী অন্যের কোনও কথা, সাধু মহাত্মার কথা এবং শাস্ত্রের কোনও কথা তার সঙ্গে যুক্ত করে নিজের খুশি মতো ব্যবহার কোর না। যেমন ভাবে 'এর' মুখ শুনেছ এবং 'এর' আচরণের মাধ্যমে যা দেখেছ তা স্মরণ করে ব্যবহার করার চেষ্টা কর এবং আচরণে তা যাতে ফুটে ওঠে সেদিকে খেয়াল রাখ, নতুবা ব্যবহারে ব্যতিক্রম হবে। ব্যবহারদোষে নিজেরও ক্ষতি হবে এবং অপরেরও ক্ষতি হবে। সব কিছুই সচেতন ভাবে করার চেষ্টা করবে, তাহলে আর ভুল হবে না। জেনে রেখ দু-তিনটি জিনিসই তোমাদের সামনে পরীক্ষা—তা হল তোমরা যা বলবে তা-ই করবে এবং ভাববে। ভাবনা, কর্ম (ব্যবহার) ও বাক্য—এই তিনের মধ্যে যেন অমিল না-থাকে। এটাই তোমাদের কাছে পরীক্ষা।

সংক্ষেপে তোমাদের কাছে বলা হল। এগুলি যথার্থ ভাবে 'মেনে, মানিয়ে চললে' তোমরা এক-এর বিজ্ঞানের অধিকারী হবে এবং জগতের কাছে বরেণ্য হবে। লক্ষ লক্ষ লোক তোমাদের কাছে এই বিজ্ঞান পেয়ে উপকৃত হবে। জীবন্ত দেবতা রয়েছে মানুষের মধ্যে, মন্দিরে নেই। মন্দির থেকে দেবতা পালিয়ে গিয়েছেন। এখন এ কথা বলতে গেলে 'একে' তো অলক্ষ্যে মেরেই ফেলবে। যারা মন্দিরে বিশ্বাসী তারা বলবে—দেখ এ ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলছে!

জীবন্ত দেবতাকে মানুষ বঞ্চনা করে। তারা প্রসাদটুকুও পায় না। অনেকেই লক্ষ কোটি টাকা দিয়ে মন্দির তৈরি করছে আর বহু অর্থ ব্যয় করে বিগ্রহ তৈরি হয়ে আসছে মন্দিরে। তার প্রয়োজনীয়তা 'এ' অস্বীকার করছে না। তার থেকে বেশি প্রয়োজন হল living God-কে serve করা।

যাঁরা মনীষী তাঁরা কি করতেন জান? ঊষাবন্দনার আগে আত্মদেবতার কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলতেন—আমার দ্বারা যেন কোনও হেয় কাজ না-হয়। আমি যেন কারও দুঃখকষ্টের কারণ না-হই। আমি যেন কারও হৃদয়ে কোনও রকম বেদনা না-দিই। এই বিষয়ে পূর্ণ সচেতন হয়ে প্রার্থনা করে তবে ঘুম থেকে উঠে তাঁরা কাজ আরম্ভ করতেন।

তোমরাও ঠিক সেই ভাবে নিজেকে তৈরি করে নাও। কারণ যে কোনও একজনকে অবজ্ঞা করার অর্থ কিন্তু জেনে রেখ সেইখানে তোমার আত্মা ক্ষতবিক্ষত হল। তোমাকে যদি কেউ এসে খণ্ডবিখণ্ড করে আত্মবোধে, তা হল 'আমাকে আমি আদর করছি', 'আমাকে আমি বরণ করছি'—দ্বিতীয় কেউ নেই। আত্মজ্ঞানিগণ আত্মবিদ্যা এই ভাবে শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। বহু ঋষির ইতিহাস আছে এই রকম যে, যখন তাঁকে বিপক্ষেরা আঘাত হেনেছে তখন ঠিক এই ভাবে তাঁরা বলেছেন—গুরু তুমি আত্মা, তুমি এই বেশে আমার কাছে এসেছ। তুমি ছাড়া তো আর কেউ আসতে পারে না। তুমি বহুরূপ ধারণ করতে পার। সুতরাং তোমার প্রয়োজনে যদি আমার দেহটা লাগে. আমি দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি আমার এই দেহকে নিয়ে নাও। তারপর সমাধিস্থ হয়ে পড়েছেন। ঘটনা এমনভাবে ঘটে গিয়েছে যে, সেখানে আত্মজ্ঞপুরুষ সেই ঋষির দেহকে পরিপূর্ণ সুস্থ করে তাঁর সামনে এসে বলেছেন—তুমি সত্য, তুমি পূর্ণ। যে-ভাবে তুমি সেই এক-কে বা সমানকে বরণ করে নিতে পেরেছ—এটাই তোমার শেষ পরীক্ষা (Test)।

সহজেই এক-এর জ্ঞান হয় না, অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। সেই পরীক্ষাগুলিতে তো সব কিছুকে আপনবোধে বরণ করে পাশ করতে হবে। কারণ যখন তুমি তোমার স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে তখন এগুলি তোমার কাছে স্বপ্ন মনে হবে।

একজন অবধূতের সঙ্গে 'এর' দেখা হয়েছিল। অবধূত হলেন তাঁরাই, যাঁরা সর্বত্যাগী। তিনি এসে মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন—তুমি কি অবধূত? তিনি এরকম অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন—তুমি কি যোগী? তাঁকে বলা হল—জানি না তো। আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কি জ্ঞানী? বলা হল—

জানি না। তিনি আবার বললেন—তুমি কি সংসারী? তাকে বলা হল—জানি না। তখন তিনি বললেন—তাহলে তুমি জান কী? চুপ করে রইলাম। তিনি খুব শক্তিমান পুরুষ ছিলেন। অনেকক্ষণ পর 'একে' একহাতে তুলে ধরে বললেন—তোমাকে যদি এই পাহাড় থেকে গঙ্গায় ফেলে দিই? তখনও চুপ করে রইলাম। তারপর তিনি বললেন—তোমার ভয় করছে না? শেষে হেসে 'এর' গলা জড়িয়ে ধরে বললেন—এত সহজে তুমি পাশ করে গেলে কী করে? আমি অবধূত। আমাকেও বহু পরীক্ষা দিতে হয়েছে—একজন গুরুর কাছে নয়, বহু গুরুর কাছে। আমাকে গুরু বলে দিয়েছিলেন যে, একজনকে পাবি তাকে একেবারে ভাল করে পরীক্ষা করে নিবি। তাই তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম। তুমি এই বিজ্ঞান পেলে কোথায়? তাকে বলা হল—তা তো জানি না।

১৩। ২। ৮৬

৩১০

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি ঘটনা উল্লেখ করলেন।

কলকাতার বাইরে এক আশ্রম। আশ্রমে সেদিন উৎসব—সাধুসন্তদের ভাণ্ডারা দেওয়া হবে। সকাল থেকেই লোকজনের আসা-যাওয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সামনের আঙিনায় অতিথি অভ্যাগত ও সাধুসন্তদের বসবার জায়গা করা হয়েছে। অনেক সাধুসন্ত অতিথিদের মধ্যে 'এও' (নিজেকে নির্দেশ করে) সেখানে উপস্থিত ছিল। আশ্রমের পরিবেশ যেন উৎসবের আনন্দে ঝলমল করছে।

এমন পরিবেশের মধ্যে এক মাঝবয়সি লোক এসে 'একে' প্রণাম করল। সেই লোকটিকে কেউই বিশেষ লক্ষ্য করেনি। লোকটির পরনে আধময়লা ছেঁড়া কাপড়, খালি গা—দেখে মনে হয় গাঁয়ের খেটে খাওয়া অগণিত গরিব জনমজুরের একজন। সে হাত জোড় করে কাতর স্বরে অতি দীন ভাবে বলল—বাবাঠাকুর, আমার বড় ইচ্ছে এই কাজের দিনে আমি কিছু দিই, কিন্তু আমার যে কিছুই নেই।

তাকে বলা হল—তোর যখন কিছুই নেই তখন তুই নিজেকে দিয়ে দে।

দুঃস্থ লোকটি তখন কান্নায় ভেঙে পড়ল। সে কাপড়ের খুঁট থেকে একটি পয়সা বার করে বলল—চার দিন খেটে আমি এই পয়সা কামিয়েছি, আর তো আমার কিছু নেই।

লোকটিকে বলা হল—ঐ পয়সাটাই দে, এখানে রাখ।

লোকটি কাঁদতে কাঁদতে পয়সাটা বার করে নির্দিষ্ট জায়গায় রাখল। লোকটির কান্না আর থামে না, মাটিতে বসে পড়ল। চোখ দিয়ে তার জল গড়িয়ে পড়ছিল।

কাছ দিয়েই আশ্রমের এক কাজের লোক যাচ্ছিল। সেই লোকটিকে ডেকে বলা হল—শোন, এই পয়সাটা দিয়ে তুই নুন কিনে নিয়ে আয় তো।

কাজের লোকটি বিস্মিত হয়ে নুন আনতে চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে কাগজের মোড়কে এক মুঠো নুন নিয়ে কাজের লোকটি ফিরল। তাকে বলা হল—যা এবার রান্নাঘর থেকে ঠাকুরমশাইকে (পাঁচক) নুনের বাটিটা আনতে বল।

রান্নার লোকটি নুনের বাটি নিয়ে আসতে মোড়ক থেকে এক পয়সার নুনটুকু সেই বাটিতে নুনের সাথে ভাল ভাবে মিশিয়ে দেওয়া হল। রান্নার লোকটিকে বলা হল—আজ এই নুন দিয়ে রান্না হবে। রান্নার লোকটি মাথা নেড়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

লোকটির কান্না তখন থেমেছে। সে অবাক হয়ে বসে বসে সব লক্ষ্য করছে। সেই লোকটিকে তখন বলা হল—দেখলি তো আজ তোর দেওয়া নুন সকলে ভাগ করে খাবে।

আনন্দে লোকটি কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখের জল মুছে 'একে' প্রণাম জানিয়ে বলল—বাবাঠাকুর, আমি তো বিশেষ কিছুই করতে পারলাম না। সামনের ঐ রাস্তাটুকু ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে দিই?

তাকে সামনের রাস্তাটুকু ঝাঁট দিতে দেওয়া হল। লোকটি খুশি মনে গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

অতিথি অভ্যাগত, সাধুসন্ত সকলেরই দৃষ্টি তার দিকে ছিল। সবাই ঘটনাটির শেষটুকু দেখে আশ্চর্য হল! লোকটির মনোবাঞ্ছা যে পূরণ হতে পারে তা কেউ ভাবতেই পারেনি। সকলের 'ধন্য, ধন্য' জয়ধ্বনিতে সেদিনের আসর মুখরিত হয়ে উঠল।

ঘটনাটির অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—যে বস্তুটি সবার মধ্যে মিশে সবার প্রয়োজনে লাগে তার মধ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব, মহিমা, গুণ ও শক্তি প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করা যায়। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে মূলত কোনও ভেদ বা পার্থক্য নেই, যদিও পার্থিব দৃষ্টিতে মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনাসিদ্ধির উদ্দেশ্যবশত চলতে গিয়ে সর্বত্র সম্প্রসারিত নিত্যপূর্ণ এক দিব্য সত্তা ও শক্তির মধ্যে ভেদ বা পার্থক্য দেখে এবং সেই মতো সব কিছু গ্রহণ ও ব্যবহার করে। ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য মানুষ অদ্বৈতের মধ্যে দ্বৈত দেখে, অভেদের মধ্যে ভেদ দেখে এবং অখণ্ডকে খণ্ড করে ব্যবহার করে ও জানে। তার ফলে পরস্পরের মধ্যে যে নিত্য অভিন্ন একটি দিব্য সুন্দর প্রীতির সম্পর্ক আছে তা সহজে বুঝতে পারে না। মহাত্মা মহাপুরুষগণ এই বৈচিত্র্যের মধ্যে, নানাত্ব-বহুত্বের মধ্যে সেই নিত্য শাশ্বত অচ্যুত প্রশান্ত অমৃত অদ্বয়সত্তাকে আপনসত্তার সঙ্গে অভিন্নবোধে অনুভব করেন বলে সে-ভাবেই তাঁরা সব কিছু ব্যবহার করেন ও অপরকে বলেন। তাঁদের ব্যবহারের মধ্যে আপনবোধের বা সমবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

(শ্রীসানাই, জন্মাষ্টমী সংখ্যা, ১৯৮৭)

৩১১

মাটি আমাদের গর্ভধারিণী মায়ের মতো ধারণ, পোষণ ও পালন করে। কিন্তু মাটির এই জগদ্ধাত্রীরূপ সম্বন্ধে সচেতনতার অভাবে মাটিকে মায়ের মতো ব্যবহার করা, ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করার প্রচলন এ যুগে লুপ্ত প্রায়।

মাটি থেকে আরম্ভ করে আকাশ পর্যন্ত যা-কিছু আছে তাকে মা বা গুরু বলে মেনে নিতে হয়। যিনি আমাদের ধারণ করে রেখেছেন সেই জগদ্ধাত্রী মাতার কথা কেউ

স্মরণ করে না, তাঁকে একবার প্রণামও জানায় না। পৃথিবী হল বসুন্ধরা বা মা। মায়ের বক্ষে সব সৃষ্টি বিধৃত আছে। অতি ক্ষুদ্র প্রকাশ থেকে আরম্ভ করে বৃহৎ প্রকাশ পর্যন্ত সব কিছুকে এই মাটিই ধারণ ও পালন করে। এর যে কতখানি অবদান সে কথা ভেবে কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা প্রকাশ করা দূরের কথা, কেউ একবারও এই মাটির দিকে ফিরেও তাকায় না। একটি হল 'ই'-কার (মাটি) এবং আরেকটি হল 'ঈ'-কার (মাটী), গৌরবার্থে 'ঈ'-কার ব্যবহৃত হয়েছে।

এই মাটির কাছ থেকে শিখতে হবে সর্বংসহা কৌশলটি। মাটি কত অত্যাচার নীরবে সহ্য করে প্রাণধারণের সব কিছু সরবরাহ (supply) করে চলেছে। যাঁরা দেশকে ভালবেসেছেন, দেশের মাটির জন্য তাঁরা মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করেছেন। প্রকৃত দেশপ্রেমিক হলেন মুক্তপুরুষ। সাধনভজন করে যাঁরা মুক্তি লাভ করেছেন তাঁদের সঙ্গে প্রকৃত দেশপ্রেমিকদের কোনও পার্থক্য নেই।

যারা মাটিকে ভালবাসে তারা মাটির যথার্থ পরিচয় ও স্বরূপ জানে। ঋষিরা তা উপলব্ধি করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ভূমিষ্ঠ প্রণাম শিখিয়েছিলেন। মাটির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার জন্য মাটিকে প্রণাম জানাতে হয়। এখন অকৃতজ্ঞতাবশত ভূমিষ্ঠ প্রণাম উঠে যাচ্ছে। শুধু ভূমিষ্ঠ প্রণাম নয়, পরস্পর পরস্পরের প্রতি যে হাত জোড় করে সৌজন্যমূলক নমস্কার জানাবার রীতি ছিল তাও এখন লুপ্ত প্রায়। নমস্কারের মাধ্যমে প্রকাশের মধ্যে তাঁর অস্তিসত্তাকে মেনে নেবার কৌশল ছিল।

যারা মাটিকে ভালবাসে তাদের কাছে মায়ের পরিচয়—আত্মতত্ত্ব কী ভাবে খুলে যায় সেই প্রসঙ্গে একটি গল্প বললেন শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর।

এক সাধু ঘুরতে ঘুরতে একটি ক্ষেতের কাছে গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। সেই ক্ষেতে প্রতিদিন ভোরবেলা এক চাষি হাল, গরু নিয়ে চাষ করতে আসত। সাধু লক্ষ্য করলেন যে, চাষি প্রতিদিন কাজ আরম্ভ করার আগে 'মিয়া' বলে এক চিৎকার দেয় ও মাটিকে একবার স্পর্শ করে। আবার আকাশের দিকে একবার হাত জোড় করে নমস্কার জানায়। তারপর সে কাজ আরম্ভ করে। সাধু প্রতিদিন এই দৃশ্য দেখেন, কিন্তু এর রহস্য বুঝতে পারেন না।

একদিন চাষিকে সাধু জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি প্রতিদিন এ রকম চিৎকার কর কেন? চাষি বলল—তুমি যা কর, আমিও তা-ই করি। সাধু অবাক হয়ে বললেন—আমি যা করি, তুমিও তা-ই কর? আমি বুঝতে পারছি না, তুমি কী কর? সাধু ভাবছে, চাষি তো সাধনভজন করে না, তাহলে আমি যা করি সেও তা-ই করে! চাষি তাঁকে বলল—হ্যাঁ, তুমি যা কর আমিও তাই করি। তাঁদের চরণবন্দনা করে আমি কাজ আরম্ভ করি। যাঁরা আমার ক্ষেতের ফসল ফলাবার জন্য সাহায্য করেন তাঁদের আমি প্রণাম জানাব না?

প্রসঙ্গকে আরও সুবোধ্য করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও সহজ করে বললেন—নিচে মাটি আর উপরে আকাশ, এই দু'য়ের মাঝখানেই তো ভগবানের যত প্রকাশ। এই কথা বলে তিনি আবার গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন—সাধু চাষির কথা শুনে

ভাল ভাবে বুঝতে পারলেন না, চিন্তা করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে আরেক সাধুর সঙ্গে দেখা হওয়াতে চাষির ঘটনাটা সব বললেন। দ্বিতীয় সাধু শুনে বললেন—তুমি তাও বুঝলে না! তোমাকে এত পরিষ্কার করে সে তত্ত্ব বুঝিয়ে দিল। এই মাটি থেকে আকাশ অর্থাৎ স্থূল থেকে আরম্ভ করে সূক্ষ্ম পর্যন্ত সমস্ত স্তরগুলি এর মধ্যেই আছে। সবগুলি স্তরের সঙ্গে সে পরিচিত হয়ে গিয়েছে। পার তো চাষির সঙ্গ কিছুদিন কর। তুমি তো আসল লোকের দেখা পেয়েছ।

তাঁর কথা মতো প্রথম সাধু ফিরে গেলেন চাষির কাছে। এর আগেও তিনি চাষির বাড়ি গিয়েছিলেন। কিন্তু জাত্যাভিমানের সংস্কারবশত তিনি কিছু গ্রহণ করতে পারেননি। এবারে ফিরে এসে তিনি চাষির কাছে সব তত্ত্ব শুনতে চাইলেন। চাষি যা জানত তা নিজের ভাষায় বলতে লাগল। শুধু বিশ্বাসের জোরে চাষি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেছে। সাধু এই সব তত্ত্ব শুনে আবার বেরিয়ে পড়লেন। তিনি সাধনভজন করে পাঁচ বছর পর আবার সেই চাষির কাছে ফিরে এলেন। তিনি সাধনার ফলে যে অনুভূতি লাভ করলেন, সেই অনুভূতির সঙ্গে চাষির অনুভূতির সাদৃশ্য দেখে, চাষিই যে তার চরম জ্ঞানদাতা গুরু, তা অনুভব করতে পারলেন এবং কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তার চরণধূলি মাথায় তুলে নিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—চাষি কেবল স্থূল জমি চাষ করেনি, সাধুর জীবনজমিতে সে চাষ করে দিল। স্থূল জমি চাষের ফলে যে ফসল ফলে, তার দ্বারা স্থূল দেহ পুষ্ট হয়। আর মানবজীবন চাষ করলে তার থেকে যে ফসল উৎপন্ন হয় তাতে জীবন্মুক্তি লাভ হয়।

(শ্রীসানাই, জন্মাষ্টমী সংখ্যা, ১৯৮৭)

ষষ্ঠ অধ্যায়

৩১২

জনৈক ভক্ত প্রায়ই সংসারের দুঃখ, অশান্তি, ঝামেলা ইত্যাদির কথা ভেবে হিমালয়ে নির্জনে বাস করার ইচ্ছা প্রকাশ করত। তার এই সংসারত্যাগের কথা শুনে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

একজন লোক সাধনভজন করে। সে ঠিক করল সংসারে আর থাকবে না, সংসারের মায়া কাটিয়ে চলে যাবে। তার পরিবার অনেক বোঝাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সে কিছুই বুঝতে চায় না। সে বেরিয়ে পড়বেই। তার পরিবার বলল—তাহলে একটি গল্প শোন। এক বাঁদর ও বাঁদরি বাস করত এক গাছের উপরে। সেখানে একটি নদী ছিল। একদিন সেই গাছের নিচে দু'জন সাধু চলার পথে বিশ্রাম করতে বসে নিজেদের মধ্যে বলা'বলি করছিল যে, অমুক নদীতে একবার ডুব দিলে নরকলেবর লাভ করা যায়। তাই শুনে বাঁদর বাঁদরিকে বলল—চল আমরা ঐ নদীতে ডুব দিয়ে মানুষ জন্ম লাভ করি, তাহলে বাঁদরজীবনের ঝামেলাগুলি আর থাকবে না।

স্ত্রী বাঁদরির বানরজীবন ছেড়ে নরজীবন লাভের ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু পুরুষ বাঁদরের নরজীবন লাভের খুব ইচ্ছা ছিল। তারা পরস্পরের মধ্যে এই নিয়ে বহু আলোচনা করল। শেষে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুরুষ বাঁদরের মতো স্ত্রী বাঁদরি জলে ডুব দিল। ডুব দেবার পরে তারা নরকলেবর লাভ করল বটে, কিন্তু বস্ত্রের অভাবে লোকসমাজে প্রবেশ করতে পারল না, আহার সংগ্রহও করতে পারল না। শেষ পর্যন্ত আরও ঝামেলায় পড়ল। তারা মানুষ্যসমাজে আরও বেশি অশান্তি ও ঝামেলার মধ্যে পড়ে ঠিক করল আরেকটি ডুব দিয়ে দেবজীবন লাভ করবে। ডুব দেবার পর দেবজীবন লাভ করল বটে, কিন্তু এখানে এসে চতুর্গুণ ঝামেলা ও অশান্তি পোহাতে হল। এখান থেকে রেহাই পাবার জন্য আবার যখন ডুব দিয়ে উঠল, তখন ঈশ্বরীয় জীবনের পরিবর্তে inferior class-এর বাঁদরে রূপান্তরিত হল।

গল্পটি শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এ সব হল যথার্থ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ব্যবহার সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানের অভাব। কেবলমাত্র শ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ হলেই হয় না। ব্যবহারজ্ঞানের অভাবে সুফল লাভ করা যায় না এবং তা স্থায়ী হয় না। তাই দেখ বাঁদর দম্পতির কী পরিণাম শেষ পর্যন্ত হল! সুতরাং মানুষ বর্তমানকে যে-ভাবে পেয়েছে সে-ভাবেই সে তার সদ্‌ব্যবহার করলে শুভ ফল লাভ করবে।

(শ্রীসানাই, রাসপূর্ণিমা সংখ্যা, ১৯৮৭)

৩১৩

একদিন ভজনকারীদের উদ্দেশে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বলেছিলেন—নাম প্রত্যেকের মধ্যে হয়ে চলেছে। এটা অন্তঃপ্রাণের স্বভাব। কেউ জোর করে নাম করতে পারে না। শ্রীনাম কৃপা করে নেমে এলে তবেই নাম হয়, নতুবা নয়। নাম করার আরেকটি নিয়ম হল, নাম শেষ হবার পর অন্তত পাঁচ মিনিট সেই জায়গায় চুপ করে বসে থাকতে হয়। খেয়ে উঠে ছুটলে যেমন পেটে ব্যথা করে, তেমনই নাম করার সঙ্গে সঙ্গে উঠে রওনা দিলে নামের সুফল পাওয়া যায় না। যাঁকে আহ্বান করা হয়েছে, তাঁকে বসবার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সময় দিতে হয। তাহলে মন স্থির হয় এবং তাঁর ভাবনাই কেবল অন্তরে ফুটে ওঠে। ভাবনা দিয়েই নামের সঙ্গে বা নামীর সঙ্গে ভাব ও মিলন হয়। নামের বিজ্ঞান না-জেনে রাতদিন নাম করে গলা ফাটালেও কোনও উপকার পাওয়া যায় না। এই কারণেই মানুষ এত নাম করেও ফল পাচ্ছে না এবং নামের উপর বিরক্ত হয়ে বলে—দূর, নাম করে কোনও কাজ হয় না!

শ্রীক্ষেত্রে, গম্ভীরায় সর্বক্ষণ হরি নাম হয়। সেখানে চুপচাপ বসে থাকলে শান্তি পাওয়া যায়। দক্ষিণেশ্বরে চুপচাপ বসে থাকলে মন আপনিই শান্ত হয়ে যায়। সেখানে শ্রীনাম ও নামীর অভেদ বিজ্ঞান সদা জাগ্রত বলে, যারা শরণাগত চিত্তে সেখানে নামে রত হয়, তারা প্রত্যক্ষ ফল পায়। কারও কারও মধ্যে আবার ভাবসমাধির কিছু লক্ষণও প্রকাশ হতে দেখা যায়।

শ্রীনাম প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তানসেনের গুরু হরিদাসস্বামীর গল্প বললেন।

একবার তানসেনকে সম্রাট আকবর বলেছিলেন—আপনিই যদি এত ভাল গান করেন তাহলে আপনার গুরু কত বড় গায়ক ও কত বড় গুণী। তাঁর গান একদিন শুনব। তানসেন বললেন—মহারাজ, গুরুর গান শুনতে হলে বৃন্দাবনে যেতে হবে। বৃন্দাবনে আকবর গেলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন রাধাগোবিন্দের বিগ্রহের সামনে হরিদাসস্বামী গান গাইছেন এবং বিগ্রহের চোখ দিয়ে জল পড়ছে।

আকবর পরে এই প্রসঙ্গে তানসেনকে বলেছিলেন—জগতে তাহলে এমন সুরও আছে যা দিয়ে পাষাণকেও গলিয়ে দেওয়া যায়! উত্তরে তানসেন বলেছিলেন—সুরের প্রকাশ নির্ভর করে শ্রোতার উপর। আমার গান শোনেন দিল্লির সম্রাট, আর গুরুর গান শোনেন জগতের সম্রাট বা জগদীশ্বর।

সম্রাট আকবর হরিদাসস্বামীকে কিছু দিতে চাইলে তিনি বললেন—তুমি আমাকে কী দেবে? তুমি তো নিজেই প্রভুর কাছে ভিখারি। আমার গাওয়া সুরের অভাবকে কি পূরণ করে দিতে পার? মনের ভাঙা সিঁড়িগুলি কি জোড়া লাগিয়ে দিতে পার? তা একমাত্র করুণাময় ঈশ্বরই পারেন। মানুষের কী সাধ্য আছে? মানুষ ঈশ্বরকে না-মেনে নিজে প্রাধান্য পেতে চায়। আবার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সে ঈশ্বরের কাছেই ভিক্ষা চায়। এটা তার অজ্ঞতা ও সসীমতার পরিচয়মাত্র। ঈশ্বরের শরণাগত হওয়াই হল জীবের পক্ষে সর্বোত্তম মঙ্গল ও কল্যাণ।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কলি যুগে মানুষের অন্নগতপ্রাণ। জীবনরক্ষার জন্য অর্থ উপার্জন, নিরাপদ বাসস্থান, প্রয়োজনীয় শিক্ষা, রোগের চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা ও সংস্থান করতেই তার জীবনীশক্তি শেষ হয়ে যায়।

পরিবারের সবার অন্নবস্ত্রের সংস্থান করা, সন্তানদের সুশিক্ষা ও সুচিকিৎসার ব্যবস্থা সম্বন্ধে বর্তমানের মানুষ যে কতটা বিব্রত, অসহায় ও অসমর্থ তা বলাই বাহুল্য। কাজেই ধর্ম লাভের জন্য, সত্যানুভূতি ও ঈশ্বর লাভের জন্য, আত্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি শান্তি লাভের চেষ্টা ও সাধনা সাধারণ মানুষের পক্ষে যে সম্ভব নয়, তা কোনও মতেই অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু জীবনলক্ষ্যে পৌঁছোবার আর কোনও উপায় বর্তমানে নেই। সেইজন্য সকলের পক্ষে সহজ অথচ ফলপ্রদ ধর্মশিক্ষা ও অধ্যাত্মসাধনা সম্বন্ধে অনুভবসিদ্ধ মহাজনগণ বর্তমানের উপযোগী যে বিজ্ঞানসম্মত ধর্মের অনুশাসন নির্দেশ করেছেন তা সর্বতোভাবেই যুগোপযোগী।

(শ্রীসানাই, রাসপূর্ণিমা সংখ্যা, ১৯৮৭)

৩১৪

শ্রীনাম হল অমৃতধারা যা দিয়ে সব কিছুকে সমানে আনা যায়। রোগ উপশমে শ্রীনামের প্রভাব খুবই কার্যকরী; এ বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণ তাঁদের গবেষণায় এক নূতন আলোকপাত করতে সমর্থ হবেন। শ্রীনামের মূলে যে আদি স্পন্দন তা দেবদেবী প্রভৃতি সমগ্র প্রকাশশক্তির কেন্দ্র। প্রহ্লাদকে তার পিতা হিরণ্যকশিপু প্রাকৃত শক্তির দ্বারা নাশ করতে পারেনি, তার কারণ প্রহ্লাদ মূল সত্তার স্পন্দনের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছিল। সেই স্পন্দন সমগ্র স্থূল রূপের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। প্রহ্লাদ কোনও কঠোর সাধনা করেনি। সে কেবল বিষ্ণুর নাম স্মরণ করেছিল ঐকান্তিক ভাবে। তার এই ঐকান্তিকতা এত তীব্র ছিল যে, তার মধ্যে প্রাকৃত গুণের ভেদ, দ্বন্দ্ব ও প্রভাব সবই নিস্তেজ ও নিষ্ফল হয়েছিল।

শ্রীনামের মহিমা প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক ভক্ত গ্রামে গ্রামে ঘুরে খুব ভগবৎ নামগান করতেন। তার গলাটা খুব একটা মধুর ছিল না, কিন্তু খুব দরদী ও মর্মস্পর্শী ছিল।

একবার এক গ্রামের হরিসভায় সে নামগান করছিল, এমন সময় তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হল। ঝড়ে সামিয়ানা ভেঙে পড়ল এবং লোকজন সব পালিয়ে গেল। ঘণ্টা দুই পরে ঝড়বৃষ্টি থেমে যেতে সবাই এসে দেখল নামের জায়গাটুকু যথারীতি একই ভাবে আছে, ঝড়ের তাণ্ডবে কোনও ক্ষতি হয়নি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এত দেখাবার পরেও আর কী দিয়ে মানুষের মনকে আকর্ষণ করা যায়? বিভূতি দিয়ে? বিভূতি অর্জনের জন্য যোগ ও ক্রিয়াকলাপ প্রয়োজন। কিন্তু এ যুগের মানুষ কঠোর সাধনা করতে পারবে না। এই কারণেই কলি যুগের জন্য শ্রীনামসাধনের কথাই বার বার বলা হয়। অন্যান্য সাধনপদ্ধতির জন্য বিশেষ বিশেষ যোগ্যতার প্রয়োজন, কিন্তু নামসাধনা সবার পক্ষেই সম্ভব। তার

জন্য বিশেষ যোগ্যতা, নিয়মনিষ্ঠা, সময় প্রভৃতির কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। হেলায় অবহেলায় নাম করতে করতে নামের অভ্যাস হয়ে যায়। একবার নামের অভ্যাস হয়ে গেলে নাম আর ছাড়ে না। তখন নামই তাকে ধরে নেয়। নামকারী সাধকের জন্য কোনও কঠোর নিয়মাদিরও দরকার হয় না। নাম করতে করতে তার মধ্যে নামের শক্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে। শ্রীনাম স্বয়ংপূর্ণ স্বতন্ত্র। শ্রীনামের এমনই মহিমা যে, তা সামান্য অভ্যাসের পরিণামে অভ্যাসকারীর মধ্যে জেগে ওঠে এবং তার ঐশ্বর্য-মাধুর্যাদির মহিমা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অন্যান্য সাধনপদ্ধতির মাধ্যমে যা ব্যক্ত বা প্রকাশ হওয়া কঠিন ও সময়সাপেক্ষ, নামসাধকের কাছে সহজেই তা ব্যক্ত হয়। শ্রীনাম স্বয়ং অবতার। সাধনার মাধ্যমে তিনি আত্মপ্রকাশ করে নামকারী ও শ্রোতাদের কৃপাবর্ষণ করেন। নামকারীর হৃদয়ে নামী স্বয়ং অবতীর্ণ হয়ে তাকে তো ধন্য করেনই, নামের আসরে শ্রোতাদেরও তিনি নামরসে মাতিয়ে তোলেন। নামের রস একবার যে আস্বাদন করেছে সে আর নাম ছাড়তে পারে না। নামকারী, নাম ও নামী অভিন্ন এক তত্ত্ব। এই সত্য নামের আসরে নামসাধকের অন্তরে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ পায়। নামভজন দ্বারা নামীর সঙ্গে নামকারীর হয় প্রথম সাক্ষাৎকার। তার পরে নামকারীর মধ্যে তাঁর দিব্য মহিমা সব প্রকাশ হয়ে পড়ে।

নাম অভ্যাস করতে করতে নামকারীর ইন্দ্রিয়-মনাদি শুদ্ধ হয়। তখন নাম সহজেই তার স্বরূপ প্রকাশ করে। একবার নাম অন্তরে প্রবেশ করলে সব কিছু দখল করে নেয়, অন্তরকে নামময় করে দেয়। নামের প্রভাবে চিত্তে দিব্যভাবের প্রকাশাদিতে জীবন হয় ধন্য ও পূর্ণ।

(শ্রীসানাই, শ্রীপঞ্চমী সংখ্যা, ১৯৮৯)

৩১৫

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি তাৎপর্যপূর্ণ গল্প বললেন।

এটা প্রায় ১৯৪০ সালের ঘটনা। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে। শহরে বাড়িঘর ছেড়ে সব পালাচ্ছে। তখন বালিগঞ্জে গোলপার্কের কাছে এক বিরাট বড়লোকের বাড়ি ছিল। তার তেলের ব্যবসা ছিল। তেলে ভেজাল দিয়ে যুদ্ধের সময় তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। সে তার বাড়িটিও খুব সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন। রাস্তাঘাটে তাকে দেখলে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করত তার কুকীর্তির জন্য। যাই হোক, সেই ভদ্রলোক একদিন মারা গেলেন। ধীরে ধীরে লোকেরা তার কথা ভুলেও গেল।

তারপর বেশ কয়েকবছর কেটে গেল। প্রায় পনেরো/ষোলো বছর পরের একটি ঘটনা বলছি শোন। একদিন দেখলাম ঐ বাড়ির সামনে হইচই হচ্ছে। হইচই শুনে সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লাম। দেখলাম এক ভিখারি—শীর্ণকায় একটি ছেলে ভিক্ষা চাইছে। ভিখারি বলছে যে, সে তিন দিন কিছু খায়নি। কিন্তু বাড়ি থেকে তো ভিক্ষা দিলই না উপরন্তু দোতলার বারান্দা থেকে বর্তমান যে মালিক, সে দারোয়ানকে বলছে—ওকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দাও। আর তার নাতি দোতলার বারান্দা

থেকে লাঠি নিয়ে দারোয়ানকে বলছে—মারো না ওটাকে, মেরে তাড়িয়ে দাও না। দারোয়ান সঙ্গে সঙ্গে গলা ধাক্কা দিয়ে ভিখারিকে বার করে দিল।

ভিখারি ছেলেটি তখন মাটিতে পড়ে যায়। দারোয়ানকে তখন বলা হল—তুমি একজন বুড়ো মানুষ। আর এ একটি অল্প বয়সের ছেলে, খেতে পায় না। তুমি খাবার তো দিলেই না আর গলা ধাক্কা দিলে, তোমার মনে একটুও লাগল না।

সেই ভিখারি ছেলেটিকে তখন তোলা হল। আশেপাশে লোক জমে গিয়েছে। অনেকে তো মজাও দেখে, তারা দেখছে কাণ্ড।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—হঠাৎ 'এর' সামনে এক দৃশ্য ভেসে উঠল—একেবারে T.V.-র দৃশ্যের মতো পরিষ্কার। সামনে এখন যেমন দেখছি এর চাইতেও পরিষ্কার ভাবে দেখলাম। এই ভিখারি ছেলেটিই হল বাড়ির আদি মালিক—অর্থাৎ যে এই বাড়ি বানিয়ে গিয়েছে। আজকে সে ভিখারি হয়ে নিজের বাড়িতে এসে ভিক্ষা চাইছে। আর এই বুড়ো দারোয়ান যাকে সে-ই appoint করেছিল, তার হাতেই তাকে গলা ধাক্কা খেতে হল। তার নিজের পুত্র উপর থেকে order দিচ্ছে মেরে তাড়িয়ে দিতে আর নাতিও তাকে সমর্থন করছে। কর্মের ফল কী ভাবে ঘুরে আসে! তখন মনের ভিতরে ধাক্কা দিল—হায় রে কর্ম কোথা থেকে কোথায় নামিয়েছে! নিজের পুত্র, দারোয়ান যাকে সে নিজে চাকরি দিয়েছে তারাই তাকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দিচ্ছে। 'আমার' বললে তো মার খেতেই হবে। 'আমার' শব্দের এক বিশেষ অর্থ হল আরও মারো, আরও মারো। কিন্তু মার খেয়ে মরব কেন আমরা? 'আমারকে' 'তোমার' করতে হবে। তবে এই শিক্ষা একদিনে হবে না। এই যে বর্তমান যুগের মানুষ—এরা মনুষ্যজীবন পেয়েছে অনেক কম। এদের refinement হতে অনেক সময় লাগবে। বিজ্ঞানদৃষ্টিতে ধরা পড়ে জীবনমানের সত্য তাৎপর্য, তারও formula আছে। সংক্ষেপে তা হল—(১) এরা human form পেয়েছে বটে, কিন্তু with sub-human nature, অতীত অতীত জন্মের অশুদ্ধ পশুভাব নিয়ে এসেছে; (২) তারপর পাবে human form with human nature। এই human nature লাভ করবে শিক্ষা ও সাধনার মাধ্যমে; (৩) তার পরে human form with super-human nature; (৪) তারপর human form with divine nature এবং (৫) সব শেষে human form with super-divine nature। তাহলে এতগুলি stage এদের এখনও বাকি আছে। আমাদের অতীত অতীত জন্মে সত্য যুগের লোকেরা ছিলেন more than cent percent সত্ত্বগুণী।

Super-divine না-হলে তো সেই 'All Divine for All Time, as It Is' হবে না অর্থাৎ "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "আত্মৈব সর্বমিদং" ইত্যাদি বেদান্তের মহাবাক্য সিদ্ধ হবে না। বহুবোধে যারা বাস করে তারা পশুবোধে অর্থাৎ অবিদ্যা-অজ্ঞানের মধ্যে বাস করে। দ্বৈতবোধে যারা বাস করে তারাও জীবভাবের মিশ্রিত জীবন কল্পিত দেবাভাসে বাস করে। দ্বৈতবোধে বহু জন্ম অতিবাহিত হলে দেবভাবের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ ও পরিচয় ঘটে। দেবভাব সর্বোত্তম তত্ত্ব নয়। তা পরিণামী ও অনিত্য। অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠার অর্থ হল ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে প্রতিষ্ঠা। তা-ই হল বেদান্তের প্রতিপাদ্য বিষয়।

ব্রহ্মজ্ঞান/ আত্মজ্ঞান বিষয়জ্ঞান বা জাগতিক জ্ঞানের মতো সসীম, পরিণামী, মিশ্রিত ও বিকারী নয়। ব্রহ্মাত্মজ্ঞান ব্যতীত আর সব জ্ঞানই হল পরোক্ষ, মিশ্রিত ও দ্বৈত। কেবল অদ্বৈতবোধই হল ব্রহ্মাত্মবোধ। তা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত শাশ্বত অচ্যুত। তা-ই হল অমৃতত্ব পরমার্থসত্য। পরব্রহ্ম পরমাত্মার নামান্তর হল পুরুষোত্তম ভগবান। অনুভবসিদ্ধ আচার্যের মাধ্যমেই এই সবের মর্ম জানা যায়। নতুবা শাস্ত্র পড়ে বা অনধিকারীর কাছে শ্রবণ করে এর মর্ম অনুভব করা যায় না। সেইজন্যই তা formula দিয়ে স্বানুভূতিব আলোকে ব্যক্ত করা হল।

পুরুষোত্তমে পৌঁছে জীবাত্মা পরমাত্মাতে মিলিত হবে। আবার পরমাত্মাই জীবরূপে নেমে আসেন লীলামানসে! একেই "লীলাবাদ" বলে। লীলাবাদী দ্বৈতবাদী, জগদ্বিশ্বাসী, কিন্তু অদ্বৈতবাদী হলেন ব্রহ্মাত্মতত্ত্ববাদী। তত্ত্ববোধে জগৎ সিদ্ধ নয়। তা অতি দুর্বোধ্য বলেই formula দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

(শ্রীসানাই, জন্মাষ্টমী সংখ্যা, ১৯৯০)

৩১৬

মনকে উল্টো করলে হয় নম। তার মানে ন মম। এই নাও মা, নাও মাধব, নাও মহেশ, নাও মহৎ। এ ভাবেও নম-র অর্থ হয়। এটাই নম। ন মম, অর্থাৎ কিছুই আমার নয়, কিন্তু তুমি আছ। আর তো কিছুর প্রয়োজন নেই। তোমার সংসার, আমার নয়। তাহলে আমার লাভও নেই, ক্ষতিও নেই। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প শোন।

এক ধার্মিক রাজা ছিলেন। রাজার মন্ত্রীও খুব ধার্মিক ছিলেন। রাজার পরিবারের সকলেই খুব ধার্মিক ছিল। রাজা সর্বদা প্রজাদের কল্যাণচিন্তা করতেন।

রাজা মন্ত্রীকে একদিন বললেন—মন্ত্রী একটি মেলার আয়োজন কর এবং সেখানে সব রকম শ্রেষ্ঠ বা ভাল ভাল জিনিস দিয়ে ভর্তি করে দাও। যারা মেলা দেখতে আসবে তারা যে জিনিসটা পছন্দ করবে তা হাত দিয়ে ধরলেই তার হয়ে যাবে। তাকে সেই বস্তুর জন্য কোনও মূল্য দিতে হবে না।

কী সুন্দর ব্যবস্থা! মন্ত্রীর তো খুব আনন্দ হয়েছে। তিনি খুব সুন্দর আয়োজন করেছেন। রাজ্যের সব সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের তিনি মেলার volunteer বানিয়েছেন। সংসারের সব ভাল ভাল ও প্রয়োজনীয় জিনিস দিয়ে তিনি ভর্তি করে দিয়েছেন। রাজা সেখানে লিখে রেখে দিয়েছেন—একটির বেশি দু'টি জিনিস স্পর্শ করা চলবে না। যে বস্তু তোমার পছন্দ হবে সেই বস্তুটি হাত দিয়ে ধরলেই তুমি তা নিয়ে যেতে পারবে। এর জন্য তোমায় কোনও দাম দিতে হবে না।

মেলায় সবরকম মানুষ আসে-যায়। সাধুসন্তরাও সেখানে আসে ও দেখে যায় এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় বস্তু তাঁরা ধরে নিয়ে যায়। যাঁর কম্বল দরকার তিনি কম্বল নেন, যাঁর লোটা দরকার তিনি লোটা নেন, আবার কেউ চিমটা নেন। গৃহস্থ মানুষের যা প্রয়োজন তারা সেই জিনিসই নিয়ে যায়। Volunteer-রা আবার সেই জিনিস এনে শূন্যস্থান পূরণ করে দেয়।

মেলায় একদিন এক পাগল আসে। সে ঘুরে ফিরে সবকিছু দেখে আর হাসে, কিন্তু কিছুই বলে না। তাকে দেখে কর্মচারীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছিল—এ কী রকম বাবা! সব সাধুরা তাঁদের প্রয়োজন মতো নিচ্ছে, কিন্তু এ তো কিছুই নিচ্ছে না। পাগল মাঝে মাঝে মেলায় আসে এবং দেখে, কিন্তু কারও সঙ্গেই বিশেষ কথা বলে না। মাঝে মাঝে মন্ত্রী দেখাশোনা করতে আসেন। মন্ত্রীর ছেলেও আসে। রাজা, রানিমা ও রাজকুমারও সেখানে আসেন।

একদিন পাগল আবার মেলায় এল। মেলায় পূর্বের মতো ঘুরে ঘুরে সব দেখছিল। মেলায় এক জায়গায় ভিড় দেখে পাগল উঁকি মারল। মেলায় লোকজনদের মুখে সে শুনতে পেল যে, তারা বলাবলি করছে—আরে, রাজাকে দেখেছিস! ঐ যে রাজা, ঐ যে মন্ত্রী। পাগল তাদের কথা চুপ করে শুনছিল। সে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ রাজাকে ছুঁয়ে দিল।

পাগল রাজাকে ছুঁয়ে বলল—এখন তুমি আমার।

পাগল অন্য কোনও বস্তু নিল না। রাজাকে পাগল আরও বলল—তুমি আমার হলে, এখন সব জিনিস আমার।

পাগলের কাণ্ড দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। রাজাও তখন অবাক হয়ে ভাবলেন, আরে, এটা তো আমি কখনও ভাবিনি!

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই যে রাজা, তিনিই হলেন পরমাত্মা। আব মন্ত্রীরা হলেন দেবতা। সাধুসন্তরা হলেন মুক্তপুরুষ। গৃহস্থ মানুষেরা হল সংসারী জীব। মেলা হল জগৎসংসার। জীবের চাওয়া-পাওয়া কোনওদিনই শেষ হয় না। জীব বলে—আরও চাই, আরও চাই। Desire is never satisfied. It never knows to be satisfied. এই চাওয়াকে সাত্ত্বিক করে ঘুরিয়ে দেন গুরু। গুরু বলেন—তুই চাইবি? আচ্ছা ঠিক আছে, শুধু চেয়ে থাক। আর তোকে কিছু করতে হবে না, বাকিটা আমি সব করে দেব।

কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্ব গুরুর। আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। আমি কিছুই করছি না—গুরু করছেন, মা করছেন। "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।" আত্মা অকর্তা অভোক্তা অজ্ঞাতা কেবল সাক্ষিচেতা। অকর্তা অভোক্তা সাক্ষিবোধে জীব মুক্ত হয়ে যায়, শিব হয়ে যায়। পরমাত্মার সংসারে আত্মবিস্মৃত জীব হল সংসারী। স্রষ্টা বিধাতার সৃষ্ট বস্তু জীব ভোগ করে। তার এই ভোগই হল তার জন্ম-মৃত্যু-দুঃখকষ্টের কারণ। জীব ভোগ করে হয় বদ্ধ এবং ত্যাগ করে হয় মুক্ত।

(*শ্রীসানাই*, শ্রীপঞ্চমী সংখ্যা, ১৯৯১)

৩১৭

বিদেশিনি এক যুবতী মহিলা নিজের দেশেই চার্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একদিন রাতে স্বপ্নে একজন spiritual man-কে দেখতে পেলেন। স্বপ্নে দেখা সেই পুরুষ কিন্তু তাদের দেশের ধর্মপুরুষদের মতো নন। তিনি মহিলাকে স্বপ্নে কতগুলি কথা বলেছিলেন। তারপর মহিলা তাঁর খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। সম্ভাব্য সব দেশে ঘুরতে

ঘুরতে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। সেই সময় প্রয়াগে কুম্ভমেলা হচ্ছিল, মহিলাটি কুম্ভমেলায় যান। সেখানে ঘুরতে ঘুরতে স্বপ্নে দেখা সাধুর সঙ্গে তার যোগাযোগ হয়। মহিলাটি তখন তাঁকে বললেন যে, তিনি তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিয়েছিলেন এবং এই এই কথা বলেছিলেন। সাধু বললেন—হ্যাঁ, আমি আরও অনেক কথা বলেছিলাম। তুমি ভুলে গিয়েছ। মহিলা তখন convinced হয়ে সাধুর কাছে তার করণীয় বিষয় জানতে চাইলে তিনি বললেন—আমার এখানে তো তুমি থাকতে পারবে না। আমার এক শিষ্য আছে, তুমি তার সঙ্গে দেখা কর। সে-ই তোমাকে সবরকম সাহায্য করবে। সেই সাধুজির লোকালয়ে থাকা অপছন্দ ছিল। তিনি দুর্গন্ধময় এক জায়গায় থাকতেন। সেখানে অন্য কেউ যেতেই পারত না। যে শিষ্যটির কথা তিনি বলেছিলেন সে ছিল খুব qualified, একজন scholar—double M.A.। হঠাৎ তার তীর্থদর্শনের ইচ্ছা হওয়াতে বেরিয়ে পড়ে এবং সেই সাধুজির সঙ্গে দেখা হয়। সাধু তাকে বলেছিলেন—ঘরসংসার করবে না গতজন্মের অসমাপ্ত কাজ করবে ঠিক কর। আমি তো পূর্বজন্ম দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি। সেদিন রাতে যুবকটি হঠাৎ তার পূর্বজন্মের সব স্মৃতি ফিরে পায় এবং গতজন্মের সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করে উতলা হয়ে পড়ে। পরে সাধুজির কাছে যাওযাতে তিনি বললেন—স্থির করে নাও, পরে দেখা করবে। বাড়ি গিয়ে যুবকটি এই সব কথা যখন বাড়ির সবাইকে বলল, তারা এ সব bogus বলে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেয়।

যুবকটি কিন্তু convinced ছিল। সে একদিন রাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে সেই সাধুজির কাছে গেল। সাধুজি তাকে বলেছিলেন—তোমাকে তো আমি কাছে রাখতে পারব না, তবে তোমার পূর্বজন্মের অসমাপ্ত সাধনার পরিণতির পথে সাহায্য করতে পারি। প্রথমেই তুমি তো এই নূতন জীবনের কৃচ্ছ্রতা সহ্য করতে পারবে না। প্রথমে প্রতিদিন দুপুরে তিনটে রুটি ও রাতে তিনটে রুটি কিছু দিয়ে খাবে এবং সেটা তোমাকে রোজগার করে নিতে হবে। রেল স্টেশনে মুটের কাজ করে এই রোজগার করবে। গুরুর আদেশ অনুযায়ী তা-ই করতে শুরু করল যুবকটি। এই ভাবে সাধনভজন করে কালে সে সিদ্ধির পথে এগিয়ে গেল। এদিকে সেই বিদেশিনি যুবতী সেই শিষ্যটির কাছে এলেন। শিষ্যটি তাকে সাধনায় সাহায্য করতে গিয়ে বলল যে, সে তাকে কাছে বাখতে পারবে না। সে বিদেশিনিকে আরও বলল যে, হৃষীকেশের কাছে গঙ্গার ধারে একটি গুম্ফা আছে, তিনি যেন সেখানে গিয়ে সাধনভজন করেন। গঙ্গার জলই তিনি ব্যবহার করতে পারবেন আর খাবারের জন্য গাছের ফল পাবেন, তাতেই তার চলবে।

মহিলা প্রথমে বিদেশে গিয়ে সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে সর্বত্যাগিনী হয়ে ফিরে এলেন। ফিরে এসে পাতলা একটি শাড়ি পরলেন, পরে সেটাও ছেড়ে পাতলা একটি গাউন সম্বল করে সাধনায় রত হলেন। প্রথমে যুবতী নারী দেখে দুর্বৃত্তরা অন্য ভাবে তাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু গুরুকৃপায় কিছু করতে পারেনি। পরে অবশ্য তাকে আর বিরক্ত করেনি। ধীরে ধীরে তিনি সেই বস্ত্রখণ্ডও পরিত্যাগ করে ফেললেন। তিনি সাধনার অনেক উচ্চ স্তরে পৌঁছোলেন।

একদিন গুরু তাকে দেখা দিয়ে বললেন যে, তাঁর দেহত্যাগের সময় এসেছে, সেই শিষ্যটিই এবার থেকে তার সবরকম দেখাশোনা করবে। তিনি আরও বললেন—মনে রেখ, ওর মধ্যে থেকে আমিই তোমাকে দেখব। সেই শিষ্যটি এরপর থেকে সেই মহিলার guide হল। মহিলাটি ক্রমশ সাধনায় এত উন্নতি লাভ করল যে, যে কোনও রূপ ধরে, যে কোনও জায়গায়, যে কোনও সময়ে যাওয়া তাঁর কাছে কোনও ব্যাপারই ছিল না। এর পরে তিনি হিমালয়ে অনেক উঁচুতে চলে গেলেন। এখনও তিনি সেখানেই আছেন—তাঁর চেহারাটি ছোটখাট একটি কিশোরীর মতো হয়ে গিয়েছে।

(শ্রীসানাই, রাসপূর্ণিমা সংখ্যা, ১৯৯১)

৩১৮

সদ্যবিবাহিত দম্পতি honeymoon-এ গিয়েছে নূতন জায়গায়, উঠেছে এক হোটেলে। তারা পথে বেরিয়ে দেখতে পেল নোংরা ভিখারির মতো একজন তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছেন। ওরা তাকে ignore করে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই তিনি তাদের ইশারা করে কাছে ডাকলেন এবং কায়দা করে দু'জনকেই স্পর্শ করলেন। অমনি তাদের পূর্বজন্মের স্মৃতি ফিরে এল। দু'জনেই দেখতে পেল তারা একই গুরুর শিষ্য-শিষ্যা ছিল, সাধনা ছিল অর্ধসমাপ্ত, অসফল হয়ে আছে এখনও। দর্শনমাত্র তাদের চেতনা ফিরে এল। কী করা যায়—এরপর থেকে শুরু হল এই চিন্তা। আর জ্ঞান ফিরে পেয়েই তারা সেই লোকটিকে খুঁজতে গেল, কিন্তু তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। কাছাকাছি আশ্রম ইত্যাদি সব খোঁজ করে জানতে পারল, এ রকম কারওকে এ তল্লাটে দেখা যায়নি।

মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে দু-চারদিন কাটিয়ে তারা ফিরে যাবে ঠিক করল। Honeymoon উঠল মাথায়। দিনরাত পূর্বজন্ম আর লোকটি সম্বন্ধে আলোচনা চলতে লাগল। যে দিন ফিরে যাবে সেই দিনই লোকটির সঙ্গে আবার তাদের দেখা হল। তিনি তাদের বললেন—ফিরে যাচ্ছ, যাও। কিন্তু সাধনভজন নিয়ে থাকতে হবে। তারা বলল—আপনাকে ছাড়া কী করে হবে, আপনি আমাদের চিনলেনই বা কী করে! তিনি বললেন—আমি তো সবসময়ই সঙ্গে সঙ্গে আছি। তারা বলল—কই, এতদিন তো দেখতে পাইনি। তিনি হেসে বললেন—একরূপে তো থাকি না। তোমাদের hotel-এ যে boy, আমি তো সেই রূপেই ছিলাম। তারা খুব অবাক হয়ে বলল—আমরা ফিরে গিয়ে কী করব বলে দিন। তিনি বললেন—যাও, গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

ফিরে এসে সেদিন রাতে তারা শোবার ব্যবস্থা করছিল, bedroom-এ হঠাৎ তিনি কয়েকমিনিটের জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন—স্বামী-স্ত্রীরূপে আর থাকা চলবে না, ভাই-বোনরূপে থাকতে হবে। আমি দু'জনের মধ্যেই আছি, একজন অন্যায় করলে অন্যজনের মাধ্যমে আমি শাস্তি দেব। কাজেই সাবধান! যেহেতু আমি দু'জনের মধ্যেই আছি—একজন অন্যজনের সাধনে সহায়ক হবে। এ ভাবেই চলুক।

এই ভাবে চলতে চলতে তারা দু'জনেই সাধনায় অনেক উন্নতি করল। ক্রমে সংসারবাস তাদের কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। গৃহত্যাগ করে দু'জনেই বেরিয়ে পড়ল।

তারা প্রথমে উত্তর কাশী গেল। তারপর সেখান থেকে গঙ্গোত্রী। এখানে এসে দু'জনে দুই দিকে চলে গেল। বারো বছর পরে আবার দু'জনের দেখা হল মানসসরোবরে। দু'জনেরই অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সাধনায় দু'জনেরই অনেক উন্নতি হয়েছে। একজন ডেরা নিয়েছেন উত্তর পূর্ব সীমান্তে, অন্যজন উত্তর পশ্চিম সীমান্তে—হিমালয়ের দুই মাথায়। সম্প্রতি একজন দেহরক্ষা করেছেন।

জনৈক ভক্ত শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরকে প্রশ্ন করল—এঁরা লোকালয়ে আসছেন না কেন? উত্তরে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কেন না এটা তাঁদের কাজ নয়। সবাই সব কাজের জন্য নয়। সূর্যের কাজ বায়ু করতে পারে না বা বায়ুর কাজ অন্য কেউ করতে পারে না, এমনি আর কী! এইরকম সাধু লক্ষ কোটিতে একজন হন, আবার তাঁদের মধ্যে দু-একজন লোকশিক্ষার জন্য সমতলে নেমে আসেন, তাও আদেশ আছে বলেই।

(শ্রীসানাই, রাসপূর্ণিমা সংখ্যা, ১৯৯১)

৩১৯

সদ্‌গুরু তাঁর ভক্তদের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ দেখতে পান। সাধনপথে চলার জন্য যার যে রকম প্রয়োজন, তাকে সেই রকমই নির্দেশ দেন। ত্রিকালজ্ঞ না-হয়েও অর্থাৎ আত্মজ্ঞান লাভ না-করেও আজকাল অনেকেই গুরু সেজে বসে। তাতেও আবার অনেক বিপদ।

একবার এক ভদ্রলোক সারাজীবন দুষ্কর্ম করে তার পাপ স্খলনের জন্য এক মহাত্মার কাছে এলেন। সেই মহাত্মাও সাধু সেজে ব্যবসা করছিল। তার তখনও আত্মজ্ঞান লাভ হয়নি। কিন্তু নানা উপদেশ সহকারে তিনি আগন্তুককে আত্মজ্ঞানের কথা বলছিলেন। এমন সময় এক পাগল সেখানে এসে সেই বেশধারী সাধুকে বলল—ভিতরের জ্বালা সারাবার আর ওষুধ পাওনি? গুরুগিরি করছ? তোমার গুরু কি তোমাকে কিছুই শেখাননি? তোমার তো আত্মজ্ঞান হয়নি। তুমি তো শিষ্যের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ কিছুই জান না। এ সব জানা না-থাকলে যে আত্মজ্ঞানের কথা বলা যায় না, তা জান না?

কথাগুলি শুনে ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি গুরুকে বললেন—পাগলের কথা শুনবেন না, আপনি বলুন। কিন্তু বেশধারী সাধুর তখন টনক নড়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ শিষ্যকে বিদায় দিয়ে আত্মজ্ঞান লাভ করার জন্য গুরু খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ একুশ বছর হিমালয়ে মৌন হয়ে ঘুরতে লাগলেন। অবশেষে একদিন তিনি গুরুর দর্শন পেলেন। গুরু তাকে নির্দেশ দিলেন কোনও একটি বিশেষ স্থানে বসে আত্মবিচার শুরু করতে। সেখান থেকে তার ওঠা চলবে না। তার আহারের ব্যবস্থা তিনিই করবেন—এ কথাও তিনি বললেন। গুরু সাত দিনে এক দিন পরিমিত পরিমাণে তার জন্য আহার পাঠাতে লাগলেন। যে আহার গ্রহণ করলে দেহ বাঁচে, কিন্তু প্রস্রাব পায়খানা হয় না। এমনভাবে চলতে চলতে শিষ্য একদিন শূন্য-অশূন্যের ঊর্ধ্বে চলে গেলেন—যেখানে মন পৌঁছায় না। গুরুও সেখানেই বাস করেন। সেখানেই গুরু ও শিষ্যের মিলন হল অর্থাৎ তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করলেন।

Self-Realization হলে মনের constitution dissolve হয়ে যায়। মন আর মন থাকে না, অ-মন হয়ে যায়। No mind and hence no creation. When you reach your true nature in the Absolute there is no tying and dieing—সেখানে বন্ধনও নেই, মৃত্যুও নেই।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আরও বললেন—তাহলে গুরুকৃপাই হল আত্মজ্ঞান লাভের একমাত্র উপায়। এই গুরুকৃপা পেয়েও তা অনেকে অবহেলায় হারায়। এটা একটা crime। মাতাপিতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া যেমন crime, similar crime is committed when coming in contact with a perfect realizer one leads an ordinary life। ভোগের মধ্যে লিপ্ত থেকে কামনাবাসনা দ্বারা তাড়িত হয়ে সদ্‌গুরুর সঙ্গ করা ঠিক নয়। Self cannot be subordinate to anybody. It is above Prakriti, above Swabhava. এটা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বসংবেদ্য স্বয়ংপ্রকাশ। It is neither an object nor subject, but It is the essence of both. It is not sound, smell, colour or touch. Self সম্পর্কে কোনও উক্তিই করা যায় না। Self-এর কোনও বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। Self-এর peculiar nature একমাত্র একজন perfect realizer-ই জানেন। Self ধরা দিয়েও অধরা। Knowledge is the salient part of Self । প্রকৃতি বা মায়া Self-এর বা ব্রহ্মের বক্ষে বিরাজ করে। Self কিন্তু unaffected থাকে, তাতে Self-এর কিছু এসে যায় না। Self নির্বিকার নিরাকার। Self is eternal and ever transcendental Consciousness। স্ববোধের অধীন হল স্বভাব, স্বভাবের অধীন হল প্রকৃতি, প্রকৃতির অধীন হল এই নাম-রূপ-ভাবের জগৎ। অনন্ত কোটি জীবের মধ্যে তিনি এককরূপে Universal, বহুর মধ্যে একরূপে তিনিই বিজ্ঞানময় ঈশ্বর, তুরীয়তে তিনিই প্রজ্ঞানঘন ভগবান। এ সবই formula-তে বাঁধা। Perfect realizer-এর কোনও formula লাগে না, কোনও support লাগে না। Supportlessness-ই realizer-এর বৈশিষ্ট্য। যিনি জানেন যে, তিনি কিছুই জানেন না, তিনিই সর্বোত্তম জ্ঞানী।

২৭। ৫। ৯২

৩২০

সদ্‌গুরু হলেন বাক্‌ব্রহ্ম, তিনিই আবার নামব্রহ্ম, ভাবব্রহ্ম, বোধব্রহ্ম। গুরু তাঁর জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দিয়ে জ্ঞানচক্ষু বা বোধনয়ন খুলে না-দিলে কোনও দিনই বোধস্বরূপের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায় না। জগৎসংসারে মানুষ বুদ্ধি দিয়ে যেটুকু জানে তা চিদাভাসমাত্র। ছায়াকে দিয়ে তো আর কায়াকে ধরা যাবে না। ভাবের permutation and combination-এ মায়াকেও মন সেজে খেলা দেখাতে হচ্ছে। মায়ার খেলাও তো চিৎস্বরূপের কাছ থেকে ধার করা, চিদাভাসের খেলা, তা তো কখনওই নিত্যসত্য হতে পারে না। জগৎলীলায় জগৎ থেকে ঈশ্বর পর্যন্ত সবই বিকারী। Individual থেকে Universal-এ যাওয়া হল দ্বৈততত্ত্ব, আর Universal থেকে Transcendental-এ

যাওয়া হল নির্গুণ অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠা ও আত্মজ্ঞান লাভ। তার জন্য চাই গুরুকৃপা। তাই গুরুর কথা না-শুনে বা তাঁর বারণ না-মেনে এক পাও এগোতে পারবে না। জোর করে অহংকারে এগোতে গেলে নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা ও প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়াই করতে হয়। তার ফলে নিজের পুঁজিও শেষ হয়ে যায়। মানুষ অনেক সময় তাও বোঝে না। এটাই সংসারের ধর্ম। সংসারজীবনে মানুষকে যে পরিমাণ সংগ্রাম করতে হয় বিরুদ্ধ অবস্থার সঙ্গে জীবনভর তার সিকিভাগ পরিশ্রমও লাগে না আত্মজ্ঞান লাভের জন্য। এটা সর্বকালে সবার জন্যই অভিনব বার্তা, পরম আশার কথা।

এই প্রসঙ্গকে সুবোধ্য করার জন্য শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর হিতোপদেশের "পুনর্মূষিকোভব" গল্পটি উল্লেখ করলেন।

একবার একজন মুনি গাছতলায় ধ্যান করছিলেন। সেই সময় কাকের মুখ থেকে একটি ছোট ইঁদুর ছানা তাঁর কোলের উপরে এসে পড়ে। মুনি যত্ন সহকারে সেই ইঁদুর ছানাটির প্রাণ বাঁচিয়ে তাকে আশ্রমেই পালন করতে থাকেন। ইঁদুরটি একটু বড় হতে আশ্রমে একটি বিড়ালের আবির্ভাব হয়। বিড়ালের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য মুনি ইঁদুরটিকে বিড়াল করে দিলেন। আশ্রমে বিড়াল দেখে একটি কুকুর তাকে আক্রমণ করে। মুনি কুকুরের হাত থেকে ইঁদুরটিকে বাঁচাবার জন্য তাকে কুকুর করে দিলেন। তারপর একদিন একটি নেকড়ে কুকুরটিকে তাড়া করল। নেকড়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য কুকুররূপী ইঁদুরকে তিনি নেকড়ে করে দিলেন। নেকড়ে হয়ে ইঁদুরটি আশ্রমেই ঘোরে। সবাই তাকে দেখে বলে—মুনির দয়ায় ইঁদুর কেমন নেকড়ে হয়ে গিয়েছে! তার এ সব কথা ভাল লাগে না। একদিন সে মুনিকে শেষ করে ফেলবে ভেবে তাঁকেই আক্রমণ করে বসে। মুনি তখন ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে আবার ইঁদুরে পরিণত করে দিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য প্রসঙ্গে বললেন—মুনির কৃপায় সামান্য এক ইঁদুর কী ভাবে বাঘের রূপ প্রাপ্ত হল এবং অকৃতজ্ঞতার জন্য পুনরায় ইঁদুরে পরিণত হল তা-ই গল্পটির বিষয়বস্তু। কিন্তু তার অন্তর্নিহিত রহস্যটি হল—মহতের কৃপা অনেকেই লাভ করতে পারে, কিন্তু তার প্রতিদানে কৃতজ্ঞতাবোধ না-জাগলে সেই কৃপার ফল ধরে রাখা যায় না। জীবনযুদ্ধে মহতের মাধ্যমেই ঈশ্বরের কৃপা জগতে জীবের কাছে আসে। তা ধরে রাখার জন্য জীবের কৃতজ্ঞতাবোধ সম্যক্‌রূপে জাগ্রত থাকা দরকার, নতুবা কৃপার যথার্থ ফলের অধিকারী হওয়া যায় না। সেইজন্য জীবনযুদ্ধে পূর্ণ ভাবে জয়ী হওয়া যায় না, অর্থাৎ সংসারবন্ধন হতে মুক্তি, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান, অমৃতত্ব ও শান্তি লাভ হয় না। ঈশ্বরাত্মজ্ঞান লাভের জন্য ঈশ্বরের কৃপা, করুণা ও স্বকীয় প্রচেষ্টা উভয়ই সমান ভাবে প্রয়োজন। স্বকীয় প্রচেষ্টা বা পুরুষকার ছাড়া ঈশ্বরের কৃপা লাভ হয় না। আবার ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া পুরুষকারও পূর্ণ ভাবে সক্রিয় হতে পারে না। ঈশ্বর গুরুরূপে আবির্ভূত হয়ে এর সমাধান সুষ্ঠু ভাবে প্রদান করেন। সদ্‌গুরুর মহিমার তুলনা নেই। জগতের মঙ্গল কল্যাণ সাধন এবং সংসাররূপ মোহ-অন্ধকারে নিমগ্ন জীবের উদ্ধারের জন্য তাঁকে আপামর সকলেরই প্রয়োজন।

২৭। ৫। ৯২

৩২১

অবলম্বনসাপেক্ষ জীবনে অবলম্বনশূন্য হওয়াই হল আত্মবিজ্ঞানের তাৎপর্য।

মনুষ্যজন্ম অন্ন দিয়ে শুরু ও ব্রহ্মাতে শেষ। অন্নচিন্তা ভয়ংকর। অন্নচিন্তায় মগ্ন হলে আর ব্রহ্মচিন্তা আসে না। অন্নচিন্তায় থেকে ব্রহ্মচিন্তা করা বিলাসিতা, এ সব বিলাসিতায় কোনও কাজ হবে না। 'এর' (নিজেকে ইঙ্গিত করে) ভিতর দিয়ে বিশুদ্ধ চৈতন্যধারা সবসময় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এই প্রসঙ্গে কারওকে বলা যায় না এবং বাইরে থেকে তা কারও বোঝার ক্ষমতাও নেই। সেই চৈতন্য স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ বলে তাতে তত্ত্বত সকলেরই সমান অধিকার। শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের এই দেহধারণ, তাঁর গতাগতি, প্রকাশ মহিমা কেউ জানে না, জানতেও পারবে না। It is a news to the world of Religion. এটা তাঁর অহংকারের কথা নয়, তাঁর Realization-এর কথা। He has nothing to attain and nothing remains unattainable. I live in Me alone, not in duality, space, time and causation. I am the Self. I live in the Self, by the Self, for the Self and in nothing else. কাজেই 'এর' অনুগ্রহ যারা বিকৃত করবে তারা ব্রহ্মহত্যা ও স্ত্রীহত্যার পাপের ভাগী হবে। তিনি তাই গুরুবাণীর মাধ্যমে বার বার সাবধান করে দিয়েছেন—দেবতারা, এমনকী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর রুষ্ট হলে গুরু রক্ষা করতে পারেন, কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে কেউ রক্ষা করতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

একবার এক গরিব পরিবারকে এক অনুভবসিদ্ধ সদ্‌গুরু অদ্বয়মন্ত্রে দীক্ষা দেন। দারিদ্রে তারা ক্লিষ্ট, কিন্তু গুরুভক্তি ও গুরুপ্রীতি তাদের অটুট। তাদের একমাত্র সন্তানও খাদ্যাভাবে জীর্ণশীর্ণ। একদিন শিশুটির মায়ের খুব অসুখ করল—কলেরা হল। সে তো বুঝতে পারছে যে, তার মরণকাল আসন্ন। সে তার স্বামীকে ডেকে বলল—ঘরে তো আর কিছু নেই, শুধু একটু বার্লি জ্বাল দেওয়া আছে, বাচ্চাটিকে দিয়ে তুমি খেও। স্বামী তো বার্লি দিতে গিয়ে অর্ধেকটা ফেলেই দিল। যতটুকু ছিল তা-ই শিশুটিকে খাইয়ে দিল। তারপর স্ত্রীর কাছে এসে বসল।

স্ত্রী বলল—আমার অন্তিমকাল এসে গিয়েছে। আমি গুরুর নাম জপ করছি, তুমিও কর। দু'জনেই নাম জপছে। তার জীবাত্মাকে নেবার জন্য দ্বারে যমদূত দাঁড়িয়ে আছে। সে ভিতরে আসতে সাহস পাচ্ছে না, কারণ সদ্‌গুরু তাঁর ভক্তকে আগলে রেখেছে। এমন সময় স্ত্রী দেখল গুরু তার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। সে স্বামীকে বলল—আমি তো উঠতে পারছি না, তুমি গুরুকে আসন দাও বসতে।

স্বামী কিন্তু গুরুকে দেখতে পাচ্ছে না। সে ভাবল, স্ত্রী বোধহয় রোগের ঘোরে ভুল বকছে। তখনও স্ত্রী বলে চলেছে—তুমি গুরুকে প্রণাম কর। গুরু যমদূতকে ভাগিয়ে দিলেন। যমদূত অনন্যোপায় হয়ে আরও পাঁচজন সহকর্মীকে নিয়ে এল জীবাধার থেকে জীবাত্মাকে নিয়ে যেতে—কারণ স্ত্রীলোকটির আয়ু শেষ হয়ে এসেছে। কিন্তু তারাও গুরুর কাছে ঘেঁষতে পারছে না, দূরে দাঁড়িয়ে হম্বিতম্বি করছে। গুরু তাদেরও তাড়িয়ে

দিলেন। স্বামী এ সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। তাই স্ত্রীর মুখে ঘটনার বিবরণ শুনেও বিশ্বাস করতে পারছে না।

সব বুঝতে পেরে স্ত্রী তার স্বামীকে বলল—তুমি আমার হাত ধরে জপ কর। স্বামী স্ত্রীর কথা মতো জপ করতে করতে আবছা আবছা সবই দেখতে পেল। যমদূতরা দেখল ভাল বিপদ, তারা ছুটল যমরাজের কাছে। তারা যমরাজকে তাদের কর্তব্য পালনের অসুবিধার কথা বিস্তৃত ভাবে জানাল। সব শুনে যমরাজ ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। ব্রহ্মা সব শুনে ছুটলেন বিষ্ণুর কাছে। উভয়ে গেলেন দেবাদিদেব শঙ্করের কাছে। তাঁরা স্তবস্তুতি ও প্রার্থনা করে শঙ্করের ধ্যান ভাঙালেন। তাঁকে জানালেন সৃষ্টির এই মহাবিপদের কথা অর্থাৎ মৃত্যুর নিয়ম লঙ্ঘনের কথা।

শিব সব শুনে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হতে চাইলেন। অগ্নি, বরুণ ও বৃহস্পতিও তাঁদের সঙ্গে এলেন। সবাইকে দেখে গুরু তাঁর গুরুকে স্মরণ করে সবাইকে বন্দনা করলেন। তখন বিষ্ণু গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, কেন তিনি যমদূতকে এই স্ত্রীলোকটির আত্মাকে নিয়ে যেতে দিচ্ছেন না। উত্তরে গুরু জানালেন—এই স্ত্রীলোকটি সদ্‌গুরুর আশ্রিতা, আমার ভক্তশিষ্যা। একে নিয়ে যাবার অনুমতি তো গুরুরূপী আমার কাছে এরা চায়নি। এ কথা শুনে শঙ্কর রুষ্ট হয়ে বললেন—কেন গুরুর অনুমতি ছাড়া তাঁর শিষ্যাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে? শঙ্কর তখন যমদূতদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে বললেন—তোমরা অনধিকারচর্চা করছ। যমরাজ তখন শিবকে শান্ত ও তুষ্ট করার জন্য অনেক স্তবস্তুতি করে স্বীকার করলেন যে, তাঁর ভুল হয়েছে। কারণ গুরুবাদে আছে গুরুর আশ্রিতকে গুরুর অনুমতি ছাড়া নেওয়া যায় না। শিব তখন সেই গুরুকে অনুরোধ করে বললেন, জগৎসংসার যাতে ধ্বংস না-হয় তার জন্য তাঁকে সহযোগিতা করতে হবে। গুরু বললেন যে, তাঁর আশ্রিতা সন্তানকে ত্যাগ করলে তা গুরুবিরুদ্ধ ধর্ম হবে—গুরুর আচরণে দোষ হবে, তাতে সংসারের আরও অকল্যাণ হবে। গুরুর কথায় সকলেই প্রীত হলেন এবং নিজেদের পুণ্যফল দ্বারা এই গুরুভক্তের জীবনের আয়ু বাড়িয়ে দিয়ে গুরুনিষ্ঠার ফলস্বরূপ সেই ব্রাহ্মণ পরিবারে সচ্ছলতা ও দীর্ঘকাল সুষ্ঠু ভাবে ধর্মপথে জীবনযাপন করে অন্তে গুরুর সঙ্গে মিশে যাবার আশীর্বাদ দিয়ে দেবতারা অন্তর্ধান হলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সদ্‌গুরুর কৃপায় কী ভাবে অসাধ্যসাধন হয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মেলে এই আখ্যানে। গুরু যেখানে রুখে দাঁড়ান সেখানে কারও কিছু বলার থাকে না। এর পরে দেবলোকে গিয়ে দেবলোক ও নরলোকের নূতন manifestation তৈরি হল। গুরুভক্ত, দেবভক্ত, আত্মযাজী, যোগসিদ্ধ, যোগসাধক, শরণাগত, আত্মানুসন্ধানরত, ইষ্টপ্রীতি ও গুরুপ্রীতি নিমিত্ত কার্যে রত—এইরূপ বারোটি ক্ষেত্রে যমরাজ গুরুর আজ্ঞা ছাড়া তাঁর আশ্রিতকে পৃথিবী থেকে নিয়ে যেতে পারবে না।

৩। ৬। ৯২

৩২২

প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা বলা হচ্ছে। তখন এখনকার মতো sanitary system গ্রামে ঘরে ছিল না। বেশির ভাগই ছিল খাটাপায়খানা এবং এক বিশেষ শ্রেণীর মানুষ—তাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা মাথায় করে মাটির ভাঁড়ে ময়লা নিয়ে গিয়ে কোনও গর্তে ফেলত। পরে সেই গর্তকে মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেওয়া হত। যে মলকে সবাই এত অশুদ্ধ ও ঘৃণ্য মনে করে, সেই মল তারা নির্দ্বিধায় মাথায় বহন করে নিয়ে যেত হাসিমুখেই। তাদের কাজ শুরু হত সূর্য ওঠার আগেই। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মাথা থেকে ভাঁড় নামিয়ে ঘাসে হাত মুছে সূর্যকে, আকাশকে ও মাটিকে প্রণাম করত। তারা নিজেদের নাম রাখত দেবদেবীদের নামে যাতে নাম ধরে পরস্পরকে ডাকার মাধ্যমে নাম করা হয়। তারা জন্মের সময় কাঁদত আর মৃত্যু হলে ঢাকঢোল বাজিয়ে উল্লাস করে মৃতদেহ দাহ করত—যেন এই হীন জন্ম থেকে রেহাই পেয়েছে, তাই আনন্দ। আমাদের পদে পদে bacteria attack-এর ভয় অথচ ওরা কত free, কোনও চিন্তা নেই, কত শান্তিতে থাকে ওরা।

এই সব জমাদারনিদের কথা বলতে বলতে একটি living ঘটনার কথা মনে এল, ঘটনাটি মন দিয়ে শোন।

সীতারামদাসবাবা ওঙ্কারনাথের ভক্তসংখ্যা ছিল প্রচুর। তাদের মধ্যে উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত, জ্ঞানীগুণী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সবাই ছিল। তিনি মাইকে দীক্ষা দিয়ে দিতেন। পরে হয়ত আর শিষ্যকে চিনতেও পারতেন না। একবার সীতারামদাসবাবার শিষ্যভক্ত 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছে এসে দুঃখ করে বলেছিলেন—আমার বড় দুঃখ আমার গুরু আমাকে চেনেনই না। আমার আর উদ্ধারের পথ নেই। তাকে বলা হয়েছিল—নিজেকে অত ছোট মনে করো না, তুমি নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে। ভগবান তো স্বয়ং তুমি নিজে।

সীতারামবাবার চারজন ভক্ত খুব বন্ধু ছিল। তারা সবাই খুব উচ্চশিক্ষিত। তাদের মধ্যে দু'জন বিলাতফেরত। তারা Retirement-এর পর দীক্ষা নিয়েছে শান্তির আশায়। সীতারামবাবার দীক্ষার ব্যাপারে কোনও কড়াকড়ি নেই, কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার পরে পরবর্তী জীবনে খুব restriction ছিল। যেমন মাছ, মাংস খাওয়া চলবে না, এমনকী বাড়িতেও আনা চলবে না। এতে অনেক পরিবারে চরম অশান্তি হয়েছে, পরিণামে suicide-এর ঘটনাও ঘটেছে।

সেই চার বন্ধু রোজ সকালে একসঙ্গে morning walk করত। একটি চৌরাস্তার মোড়ে একজন অন্য বন্ধুদের জন্য অপেক্ষা করত। চারজন একসঙ্গে হলে খানিকটা হেঁটে গল্পগুজব করে তারপর বাড়ি ফিরত। অপেক্ষা করতেই হয়ত এক একদিন পুরো সময়টা চলে যেত, morning walk আর হত না। আলাপ আলোচনার মধ্যে সমালোচনা পরচর্চাই হত বেশি। এই চারজনের মধ্যে আবার একজন সীতারামবাবার এক মহিলা ভক্তসাধিকার কাছে প্রতিদিন যেত। সাধিকা ছিলেন শান্ত, ধীর, স্থির।

সবাই তাকে মুক্তি মা বলে জানত। ভদ্রলোক রোজ তাঁর জন্য মালা নিয়ে যেত। মাও তাকেই মালা পরিয়ে দিতেন। আর তিনজনের সঙ্গে মায়ের পরিচয় ছিল না।

বিলাতফেরত বন্ধু দু'জনের একজন একদিন খুব সকালে সবার আগে এসে দেখে একটি জমাদারনি মাথায় ময়লার টিন নিয়ে চলেছে। মেয়েটি দেখতে বেশ ভাল, সুন্দর স্বাস্থ্য। লোকটি ভাবতে লাগল, এমন সুন্দর মেয়ে এই নোংরা কাজ করে কী করে! তারপর দেখল মেয়েটি মাঠের ধারে ময়লার ভাঁড়টি নামিয়ে ঘাসে হাত মুছে উদীয়মান সূর্যকে প্রণাম করল। ভদ্রলোক একটু অবাক হয়ে মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল যে, সে কী করছে? মেয়েটি তখন আকাশকে প্রণাম করে দু'হাত মাটিতে ঠেকিয়ে পৃথিবীকে প্রণাম করল। তারপর মেয়েটি তাকে বলল—কেন বাবু, যিনি জগতের কর্তা তাঁকে প্রণাম করলাম। ভদ্রলোক আবার বললেন—তুমি কি তাঁকে দেখেছ? মেয়েটি বলল—তাঁকে দেখবার তো দরকার নেই। তিনি আমাদের পাঠিয়েছেন, আমাদের কাজ আমরা করব। আর তাঁর কাজ তিনিই বিচার করবেন। তাঁর তিনটি আসন। সূর্যরূপে তিনি জগৎকে বাঁচিয়ে রাখছেন, আকাশরূপে তিনি অনন্ত। মৃত্যুর পর সবাইকে কোলে নেবেন। আর পৃথিবীরূপে, মাটিরূপে তিনি মাতা—সবাইকে ধারণ করে আছেন। সূর্য হলেন গুরু, আকাশ পিতা আর পৃথিবী মাতা।

কথাগুলি বলেই জমাদারনি তার কাজে চলে গেল। ভদ্রলোকের মনে হল, কই আমার তো এমন বিশ্বাস নেই! আমি তো এ ভাবে প্রণাম করি না! সে বন্ধুদের এই মেথরানির কথা বলল। পরদিন তারা সবাই সেই জমাদারনির অপেক্ষায় বসে রইল অনেকক্ষণ, কিন্তু তার দেখা পাওয়া গেল না। দেখা গেল সেই কাজ করছে একটি মেথর। তাকে মেথরানির কথা জিজ্ঞাসা করায় সে জানাল যে, সে তল্লাটে কোনও মেথরানিই কাজ করে না। সবাই এখানে ছেলে। ঘুম থেকে উঠে এসেছেন বলে হয়ত তাদের ভুল হয়েছে। বন্ধুরা একটু রেগে গেলেও কিছু করার ছিল না।

সেদিন সবাই মিলে মুক্তি মায়ের কাছে গেল। সবাই মালা নিয়ে গেল। মুক্তি মাকে দেখে সেই ভদ্রলোক তো অবাক, মায়ের মুখ অবিকল সেই মেথরানির মতো। মা একটু হেঁসে তাকেও একটি মালা দিলেন। সে কারওকে কিছু না-বলে বাড়ি ফিরে গেল। ঘটনার কথা সে কিছুতেই ভুলতে পারছে না। সারাদিন শুধু ভাবছে, এটা কী করে সম্ভব! পরের দিন সে আবার গেল মায়ের কাছে। কিন্তু আর সেই মুখ দেখলেন না। তার মনে নিরন্তর প্রশ্ন উঠতে লাগল, মা কী করে রূপ পাল্টে ফেলেন? কিন্তু এই বিষয়ে সে কারওকেই কিছু মুখ ফুটে বলল না।

তিন মাস পরের কথা—ভদ্রলোক আর কোনও দিন সেই জমাদারনিকে দেখেনি। ভদ্রলোক একদিন শুনল যে, মুক্তি মা খুব অসুস্থ। সে মাকে দেখতে গেল। সেদিন সেখানে গিয়ে আবার দেখল সেই জমাদারনি শুয়ে আছে। মা ভদ্রলোককে কাছে ডেকে বললেন—আজ আমার যাওয়ার সময় হয়েছে। তোমার অন্তরে গুরুর প্রতি বিশ্বাস অটুট হয়নি। তোমার অহংকার বিশ্বাসভঙ্গ করছে। আমি তোমার গুরুর শক্তিস্বরূপ। আমি বলছি আত্মবিশ্বাস, ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরবিশ্বাস ছাড়া কোনও কিছু দিয়েই

জীবনের আশা মিটবে না। আমি আশীর্বাদ করছি তোমার অন্তরে ভক্তি জাগবে। কয়েকদিনের মধ্যে তোমার স্ত্রীর কঠিন ব্যাধি হবে, সাবধান থেক। মালা নিয়ে যাও। এর কয়েকঘণ্টা পরে মুক্তি মা দেহরক্ষা করেন।

পরে তিনি বন্ধুদের সব ঘটনার কথা বলেন। সীতারামদাসবাবা এই ঘটনা শুনে সমাধিস্থ হয়ে যান এবং তাকে বলেন—আমি তোকে কৃপা করতে পারিনি, কিন্তু জগজ্জননী মা তোকে উদ্ধার করে গিয়েছেন। আমার বিচারে তুই অপরাধী আর তাঁর বিচারে তোর কোনও অপরাধ নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অন্তরের ভাব অনুসারে মাঝে মাঝে এমন দর্শন সম্ভব। তবে এই দর্শনই সব নয়। "নিরাকারস্য সাকাররূপকল্পনাম্ কেবলম্ সাধকানাম্ উপাসনার্থং বিশ্বাস কারণম্।" সাধক যারা তারা নিরাকার রূপ কল্পনা করে সাধনা করতে পারে না। কিন্তু উপাসকদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য এই রকম দুর্লভ দর্শন হয়। যার দর্শন হয়েছে বা যার দর্শন হয়নি—realization-এর জন্য sense of separateness, sense of otherness and the sense of individualness অবশ্যই পরিত্যাজ্য। এই তিনটি দ্বৈতভাবের পোষক, কিন্তু অদ্বৈতভাবের প্রতিবন্ধক।

জন্ম জন্মান্তরের সংস্কারই মানুষকে বেঁধে রাখে। মনে রেখ, এই যে তোমরা 'এখানে' (ফার্ন রোডের সৎসঙ্গে) এসে শুনবার সুযোগ পেয়েছ তা তোমাদের সংস্কারকে কাটাবার জন্য। এখানে কোনও miracle দেখানো হয় না, কোনও হিং টিং ছট্-এর কারবার নেই। এখানে শুধু নিজেকে তৈরি করার কথা বলা হয়। তুমি যা ছিলে অর্থাৎ তোমার স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার কথাই বলা হয়। কোনও মতপথের নির্দেশ নয়, শুধু আত্মার কথাই বলা হয়। আত্মা হল Knowledge Itself—জ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। সেখানে আর দ্বিতীয় কিছু নেই। তুমি শুদ্ধ ছিলে, শুদ্ধ থাকবে। শুধু কল্পনা করে দেহাত্মবুদ্ধি, জগদ্বুদ্ধি তোমাকে অশুদ্ধ করে রেখেছে। দেহাত্মবুদ্ধি, জগদ্বুদ্ধি ছাড়লেই সচ্চিদানন্দসাগরে, সচ্চিদানন্দস্বরূপে, আত্মসাগরে বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। তখনই হবে total culmination of life in emancipation।

২৯। ৭। ৯২

৩২৩

মহাপুরুষদের সংস্পর্শে এলে হাজার হাজার বছরের সংস্কার অল্প সময়ের মধ্যে নাশ হয়ে যায়।

একবার এক সাধক ভগবানের দর্শন পাবার ইচ্ছায় বহু সাধনভজন করল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও সে ভগবানকে দেখতে পেল না। ভগবানের দর্শন না-পেয়ে সে খুব নিরাশ হয়ে গেল। এদিকে ভগবান লাভের আশায় সে সংসার ছেড়ে এসেছে, সুতরাং এতদিন পরে সংসারেই বা কী করে ফিরে যাবে। একূল-ওকূল দু'কূলই তো তার গেল, কাজেই সে খুব মুষড়ে পড়ল।

এমন সময় এক মহাত্মার সঙ্গে তার দেখা হল। মহাত্মা সাধকের মুখে তার দুঃখের কথা শুনে সহানুভূতি প্রকাশ করে বললেন—তুমি নিরাশ হয়ো না, তোমার যখন এত

তীব্র ইচ্ছা তখন তোমার সাধ পূর্ণ হবেই। তুমি আমার সঙ্গে এস এই পাহাড়ের উপরে আমার গুহায়। এখানে আমি বাস করি।

সাধক বলল—আমি এত দুর্বল হয়ে পড়েছি যে, পাহাড়ের উপরে আর উঠতে পারছি না।

তখন মহাত্মা তাকে কাঁধে করে আস্তে আস্তে পাহাড়ের উপরে উঠলেন এবং কয়েকদিন তাকে নিজের কাছেই রেখে দিলেন। কিছুদিন পরে সাধকের শরীর একটু সুস্থ হলে মহাত্মা তাকে বললেন—তুমি ভগবানকে দেখতে চেয়েও দেখতে পেলে না, এ কী রকম! তা কখনও হয়? তুমি ভগবানকে কি চেন? ভগবান কী রকম তা জানা না-থাকলে কী করে ভগবানকে চিনতে পারবে? ভগবানের পরিচয় আগে গুরুমুখে শুনে নিতে হয়, তার পরে তো তাঁকে চিনতে পারবে। এই বলে মহাত্মা সেই সাধককে ভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগলেন। তিনি ভগবানের সগুণ ও নির্গুণ মহিমা উভয়ই বিশদ ভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তার পরে তাকে বললেন—এবার দেখ তো ভগবান কোথায় নেই। তোমার সম্মুখে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, অধঃ-উর্ধ্বে যা-কিছু দেখছ সবই তো ভগবানের প্রকাশ, তাঁরই মহিমা। বৈচিত্র্যময় এ জগতে যা-কিছু তুমি দেখছ সব কিছুর মধ্যেই ভগবান নিত্য আছেন, শুধু তা-ই নয়, স্বয়ং ভগবানই এই রূপে তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ভগবান ছাড়া আর কিছু কোথাও নেই এবং থাকতেও পারে না। সর্ব রূপে-নামে-ভাবে-বোধে এক ভগবানই আছেন। অতি কুৎসিত, ভয়ংকর ও ভীতিজনক রূপেও তোমার সম্মুখে যদি কেউ উপস্থিত হয়, তাকেও ভগবান বলে মেনে নিতে হবে। কারণ ভগবান ছাড়া দ্বিতীয় কেউ তোমার সম্মুখে থাকতেই পারে না। এই ভাবে সর্ববস্তুর মধ্যে ভগবানকে বা ভগবতী মাতাকে গ্রহণ করে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র অভ্যাস করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভগবৎ উপলব্ধি হয়।

(শ্রীসানাই, জন্মাষ্টমী সংখ্যা, ১৯৯২)

৩২৪

মানুষের আসল স্বরূপ প্রকৃতি দ্বারা বদ্ধ নয়, যদিও মানুষ ভাবে যে, তারা বদ্ধ। আত্মস্বরূপ is beyond Prakriti । জ্ঞানসূর্য এত প্রখর যে, প্রকৃতির গুণ তাকে বদ্ধ করতে পারে না। ভোগ্য বস্তু তার কাছে object of enjoyment নয়। Knowledge of Oneness যিনি লাভ করেছেন জীবধর্ম পালন করা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। Ordinary people-এর কাছে যা impossible বলে মনে হয়, এঁদের কাছে তা-ই possible। সত্যিকারের ঋষিকে বা জ্ঞানীকে যারা meet করেনি, তারা এঁদের সম্বন্ধে জানতেও পারবে না। সংসারের যত দুঃখকষ্ট, লাভ-লোকসান, জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, জরা-ব্যাধি or any happenings সবই এঁদের কাছে সমান বা equal—কোনও ভেদ

থাকতে পারে না। Philosophy-র উপরে যে philosophy তা তাঁরাই জানতে পারেন, আর কারও পক্ষে তা জানা সম্ভব নয়।

অধ্যাত্মসাধনার কতগুলি fundamental points কারও জানা না-থাকলে সে যোগ্য অধিকারীরূপে বিবেচিত হতে পারে না।

প্রসঙ্গের ভিত্তিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

বিশ্বামিত্র প্রথমে ছিলেন রাজা। তিনি পরে তপস্যা করে মুনি হন। তিনি মহাঋষি বশিষ্ঠের মতো ব্রহ্মজ্ঞ হবার জন্য তপস্যা শুরু করেন। স্বর্গের দেবতারা সেইজন্য বিচলিত হয়ে পড়েন। দেবতারা উর্বশী মেনকাকে তাঁর ধ্যানভঙ্গ করার জন্য পাঠালেন। মেনকা সফল হলেন। বিশ্বামিত্রের দীর্ঘদিনের তপস্যার ফল degraded হয়ে গেল। মায়ার ছলনার উপরে তিনি উঠতে পারলেন না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর মোহভঙ্গ হল। কারণ বশিষ্ঠের মতো ব্রহ্মজ্ঞ ছিলেন তাঁর আদর্শ। তিনি দ্বিতীয়বার তপস্যায় বসলেন। এবার দেবরাজ ইন্দ্র উর্বশী রম্ভাকে তাঁর তপস্যা ভঙ্গ করার জন্য পাঠালেন। রম্ভা তার সমস্ত ছলাকলা উজাড় করেও বিশ্বামিত্রের তপস্যা ভঙ্গ করতে ব্যর্থ হয়ে তার অন্তিম অস্ত্র হিসাবে যৌনমূর্তি ধারণ করল। বিশ্বামিত্র তার স্পর্ধার উত্তরে রক্তচক্ষু হয়ে তাকে জানালেন যে, সে যদি এখনই সরে না-যায় তবে তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবেন। রম্ভা বিশ্বামিত্রের কাছে পরাস্ত হয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে গেল। সে স্বর্গে গিয়ে ইন্দ্রকে সবিস্তারে সব জানাল। ইন্দ্র ব্যর্থ হলেন, কিন্তু বিশ্বামিত্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন। প্রথমেই বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠকে নাশ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু পরে তাঁর ভুল ভাঙে ও বশিষ্ঠদেবের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বশিষ্ঠদেবের মতো ব্রহ্মজ্ঞপুরুষ ছিলেন বিশ্বামিত্রের গুরু ও আদর্শ। তাঁর কৃপাতেই বিশ্বামিত্র ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। সংসারী মানুষের এ সবের প্রয়োজন নেই, এ সব নিয়ে মাথাব্যথাও নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ধর্মজগতের বিজ্ঞান যে কত fallacy-তে ভরা তা একমাত্র একজন true বৈদান্তিক ছাড়া আর কেউ জানতে পারে না। তোমরা সারাবছর ধরে নানা দেবদেবীর পূজা করছ, তবু তোমাদের দুর্গতির অন্ত নেই। আর একজন বৈদান্তিক এক ছাড়া দুই জানেন না। এক অদ্বয় ব্রহ্ম ছাড়া আর কারওকেই জানেন না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্"-কে মানেন বলেই দুঃখকষ্ট তাঁদের স্পর্শ করতে পারে না। সাধারণ মানুষ দুঃখ-কষ্ট, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার মধ্যেই লটরপটর করে বাঁচতে জানে। এ সব থেকে মুক্তি পাবার পথও খোঁজে না। কদাচিৎ দু-একজনের মনে দুঃখের অন্তকে জানবার জন্য ব্যাকুলতা জাগে। আর তখনই দুঃখের পরপারে কী আছে তা জানবার ও শুনবার ইচ্ছায় তারা মুক্তপুরুষের কাছে আসে। যিনি সত্যিই মুক্তপুরুষ তিনি কোনও miracle দেখান না। তাঁর কাছে সবচেয়ে বড় miracle হল—পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বয়ং নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত হয়েও আবার জীবরূপ ধারণ করেছেন। প্রকৃতির ব্যাপার সবটাই miracle, কারণ প্রকৃতিতে যা ঘটছে সত্যের দৃষ্টিতে তার কোনওটিই সত্য নয়। আমরা আমাদের যত উপাধি বা relation নিয়েই খুশি। আমরা মা-বাবা, ভাই-বোন, খ্যাতি, যশ, অর্থ এ সব ভুলে বা বাদ দিয়ে এক পরমাত্মা পরমেশ্বরের কথা

শুনতেই চাই না। মানা তো পরের কথা। যখন আবার বিড়ম্বনা আসে তখন মন্দিরে, মসজিদে ছুটি, ঢেলা মানত করি, কখনও বা জপতপও করি বিশেষ কোনও ইচ্ছা বা অভিলাষ পূর্ণ করবার আশায়। তাতে ব্যক্তিগত ইচ্ছাপূরণই লক্ষ্য, পূর্ণতা পাবার কোনও ব্যাকুলতা সেখানে নেই। এদের অন্তরে ভোগের সাধ. বাইরে সাধুর সাজ। এ হল বিরাট ফাঁকি। এই ফাঁকি থেকে রেহাই দিতে পারেন একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞ/আত্মজ্ঞপুরুষ। এই বলা হয়েছে—"নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি তম্ এতৎ মাবদেৎ।" অর্থাৎ একমাত্র যোগ্য অধিকারীর জন্যই এই বিজ্ঞান। যে কখনও তপস্যা করে না, যে ভক্ত নয়, যে গুরুবাণী শ্রবণে অনিচ্ছুক, যে গুরু, শাস্ত্র, দেবতা ও মুক্তপুরুষের বিরোধী,তাকে কখনওই আত্মজ্ঞানের বিজ্ঞান দেওয়া যাবে না। M.A. পড়তে গেলে যেমন B.A. পাশ করতে হয় এবং যোগ্যতা থাকা একান্ত দরকার, তেমনই মুক্তিতত্ত্ব ও আত্মতত্ত্ব যোগ্য অধিকারীর জন্যই সংরক্ষিত।

২। ৯। ৯২

৩২৫

ভগবানের নিজের জ্যোতিস্বরূপ হল তাঁর ভক্ত। পরমদেবের সঙ্গে যুক্ত থাকলে মনকে সহজে দেখতে পাওয়া যায় না। রাধারানিমাকে সেইজন্য সহজে কেউ দেখতে পায় না। এগুলি খুবই গভীরের বিষয়। এই প্রসঙ্গে পুরাণে আছে ভগবানের সঙ্গে দেবর্ষি নারদের সাক্ষাৎকারের একটি কাহিনি।

দেবর্ষি নারদ একবার নারায়ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠে। তাঁর সঙ্গে মা লক্ষ্মীর কথোপকথন খুব তাৎপর্যপূর্ণ। নারায়ণের দর্শন না-পেয়ে নারদ মা লক্ষ্মীর কাছে তাঁর সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন। মা লক্ষ্মী বললেন—তিনি এখন একান্তে আমার সতীনের সঙ্গ করছেন। সুতরাং এখন তাঁর সঙ্গে কারও দেখা হওয়া সম্ভব নয়। এমনকী আমিও সেখানে যেতে পারব না। মা লক্ষ্মীর কথা শুনে নারদ খুব বিস্মিত হলেন এই ভেবে যে, মা লক্ষ্মী ছাড়া আরও একজন মা আছেন, যাঁর সঙ্গে ভগবান শ্রীহরির নিবিড় প্রেমের সম্বন্ধ আছে। তাঁকে তো কেউ দেখতে পায় না। তাঁকে দেখার তীব্র ইচ্ছা জাগল নারদের মনে। নারদ প্রভুর সঙ্গে দেখা না-করে যাবেন না, এই ঠিক করে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

উপরোক্ত প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এগুলি ইঙ্গিত। এর মাধ্যমে যে কাকে নির্দেশ করা হয়েছে তা না-জানলে মানুষ বিকৃত অর্থ করবে। মনের যে অংশ বাইরে আসে না, তার সঙ্গে বোধসত্তার যে সম্বন্ধ তাকেই ভগবানের গোপন প্রেমরূপে নির্দেশ করা হয়েছে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর নারদ দেখল তাঁর প্রভু নারায়ণ পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। তাঁর চোখ-মুখের অবস্থা একেবারে অন্যরকম। তখন তিনি ভাবে বিভোর। তাঁর ঐ রকম ভাব দেখে নারদ ভাবল, যিনি সমস্ত ভাবের ঘনীভূত মূর্তি তিনি তো সবসময় ভাবে বিভোর থাকবেনই।

প্রভু নারায়ণ নারদকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন—বল নারদ তোমার খবর কী? নারদ বলল—প্রভু, আমার একটি প্রার্থনা আছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন—বল তোমার কী প্রার্থনা পূরণ করতে হবে? নারদ বলল—মা লক্ষ্মী ছাড়া আমার না কি আরও একটি মা আছেন, তাঁকে আপনি কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন? আমি তো তাঁকে কোনও দিন দেখতে পেলাম না। তাঁর দর্শন চাই। প্রভু চুপ করে রইলেন। কোনও উত্তর দিলেন না। তিনি জানেন নারদ তাঁকে দেখবার জন্য উপযুক্ত নন। নারদ ছাড়লেন না। তিনি আগেই প্রভুর কাছে তাঁর প্রার্থনা পূরণের কথা আদায় করে নিয়েছিলেন। তাই তিনি নারায়ণকে বললেন—প্রভু, তোমাকে ছাড়ব না। তুমি কথা দিয়েছ আমার প্রার্থনা পূরণ করবে। যদি না-কর তাহলে জগতে প্রচার হবে যে, তুমি তোমার কথা রাখনি। আমি কি এতই অধম যে, তাঁর দর্শন পাব না? তুমি কি সেই ব্যবস্থা করে দিতে পার না? তাহলে ভগবানকে ভজন করে ভক্তের কী লাভ?

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রভু বললেন—কথা যখন দেওয়া হয়েছে, তোমাদের মতো ভক্তরা তাঁর দর্শন পাবে। দ্বাপরের শেষে কলির সন্ধিক্ষণে আমি নরলীলা করব ব্রজধামে, সেখানে তাঁকে তোমরা দেখতে পাবে। সব পার্ষদ তখন সঙ্গে থাকবে।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—অতীতে যে-সকল মুনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তাঁরাই দ্বাপরে গোপীবেশে এসেছিলেন। আবার যে ভবিষ্যতে এঁরা আসবেন সেই ইঙ্গিতও দিলেন।

শুদ্ধ মন যাঁর তিনিই হলেন মুনি। শুদ্ধ মনের উর্ধ্বে যে মন তা হল মধুমতী। তাকে ভগবান ছাড়া যেমন কেউ দেখতে পায় না, সে রকম ভগবানকেও সে ছাড়া আর কেউ দেখতে পায় না। অর্থাৎ ভগবান কেবল শুদ্ধ মনের গোচর।

ভাগবতে চারটি মনের তত্ত্ব রূপকের ভাষায় বলা আছে, যথা—(১) চন্দ্রাবতী বা বহির্মন; (২) বৃন্দাদূতী বা অন্তর্মন; (৩) শ্রীমতি বা কেন্দ্রের মন, কেন্দ্রের বাইরে থেকে তাকে দেখা যায় না। তাই রাধারানিকে বা শ্রীমতিকে কেউ দেখতে পায় না এবং (৪) মধুমতী।

চন্দ্রাবতী হল বহির্মন—এই মনের সঙ্গে সবসময় নাম-রূপের সম্বন্ধ থাকে। বৃন্দাদূতী, যা সূক্ষ্ম বলে মনেরও পশ্চাতে থাকে। এর কাজ হল বস্তুর নাম-রূপ অর্থাৎ তার স্বরূপ নির্ণয় করা ও তার সঙ্গে যুক্ত থেকে তার সেবা করা। এটাই জানাজানি অর্থাৎ বস্তুর নাম-রূপের জ্ঞানরূপে বাইরে প্রকাশ পায়।

শ্রীমতী বা রাধারানি হলেন সমস্ত প্রাণধারার উল্টো গতি, কেন্দ্রাভিমুখী গতি এবং কেন্দ্রবোধসত্তার সঙ্গে হয় তার নিত্য মতি, গতি, রতি ও স্থিতি। তা ইন্দ্রিয়-মনের অধীন নয় বলে ইন্দ্রিয়-মন দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। ধ্যানের গভীরে সমাধির পরিপক্ক অবস্থায় কেবল এর যথার্থ অনুভূতি সিদ্ধ হয়। সেইজন্য রাধারানি প্রাকৃত বুদ্ধির অতীত—অতিপ্রাকৃত দিব্যভাববোধের ঘনীভূত বিগ্রহ। তা প্রেমভক্তির রসঘন মূর্তি। রাধারানি মায়ের কৃপা ছাড়া তাঁর দর্শন মেলে না। তবে রাধারানি মায়ের দর্শনই

শেষ নয়। সেখান থেকেই সত্য দিব্য দর্শন আরম্ভ হয়। দর্শন পাওয়া হল সাধনার প্রথম প্রস্তুতি। দর্শনের পর তাঁর সঙ্গে কথা হওয়া চাই। এগুলি কল্পনা বা বুজরুকি নয়।

মধুমতী—কেন্দ্রবোধসত্তা হল সর্বভূতাত্মা বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর আকর্ষণে প্রাণধারা রাধারূপে তাঁর সঙ্গে নিত্যযোগে স্থিত। সেইজন্য রাধাকৃষ্ণ নিত্য যুগলতত্ত্ব। তাতে 'আধা রাধা, আধা কৃষ্ণ'। তা-ই হল পূর্ণ ভগবৎ তত্ত্বের রসঘন বিগ্রহ। তার সম্যক্ অনুভূতির ধারক, বাহক খুব দুর্লভ। পরমজ্ঞানী যাঁরা, তাঁরাই এই তত্ত্বের সাধন করেন ও সেই ভাববোধের সম্যক্ অধিকারী হতে পারেন নিরলস সাধনার মাধ্যমে। তা একান্ত প্রেমভক্তির উৎকর্ষের মাধ্যমেই অনুভবসিদ্ধ হয়। এই মুখ্য প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠাই হলেন মধুমতী অর্থাৎ বিশুদ্ধ প্রেমতত্ত্ব ও তার অন্তর্নিহিত প্রেমানন্দস্বরূপ।

রাধারানি হলেন হ্লাদিনী শক্তি আর মধুমতী হলেন প্রীতিশক্তির পরাকাষ্ঠা— অখণ্ড বিশুদ্ধ প্রেমস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ, পরামুক্তি, পরাশান্তির ঘনীভূত রূপ। এর সঙ্গে তাদাত্ম্য লাভ কেবলমাত্র ভগবৎ কৃপা, অনুগ্রহ তথা অনুকম্পার মাধ্যমেই সুসিদ্ধ হয়। তা একমাত্র সর্বোত্তম ভাগবতের পক্ষেই সম্ভব। উত্তম ভাগবৎ আত্মজ্ঞানের অধিকারী হলে আত্মপ্রেমের পরাকাষ্ঠারূপে পরমাত্মদেবতার সেবায় নিয়ত রত হয় আত্মবোধের গভীরে। এইরূপ উত্তম অধিকারীর মধ্যে পরমাত্মদেবতার সঙ্গে অভিন্ন তাদাত্ম্যানুভূতি স্বানুভূতিরূপে প্রকাশ পায়। এই স্বানুভূতি হল সমগ্র আধ্যাত্মিক অনুভূতির সার। এরই অপর নাম তত্ত্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠা, ব্রহ্মাত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠা। তা 'নিত্যাদ্বৈত অ-ভেদাভেদ' বোধ দ্বারা স্বানুভূতির ভাষায় কেবল ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ তা মানবীয় ভাববোধের দ্বারা কখনওই অনুভবগম্য হয় না। তা সর্বতোভাবে বাক্যমনাতীত, অচিন্ত্য অতর্কমূর্তি।

যারা আধ্যাত্মিক পথে এসেছে, তাদের আগ্রহ যেন উত্তরোত্তর বাড়ে। একটা দিন চলে গেল, কই আমি তো তাঁর দর্শন পেলাম না! আমি কি তাঁর দর্শন পাব না!— এই রকম ব্যাকুলতা থাকা চাই। তাঁর কাছেই তখন জানতে হয়—হয়ত আমার কোনও ত্রুটি হয়েছে, তাই দর্শন পাচ্ছি না। তুমি বলে দাও কী করলে তোমার দর্শন পাব।

তোমাদের (উপস্থিত ভক্তবৃন্দের উদ্দেশে) নামভজনের পরেই মন ছুটে যায় বাইরে। কিন্তু ভজনের পরে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে থাকতে হয়। এই ভাবে অভ্যাস করতে করতেই তাঁর দর্শন পাবে। কোনও দিন হয়ত ঝলকে একটি মূর্তির দর্শন পাবে, কোনও দিন জ্যোতি, কোনও দিন হয়ত তাঁর লীলার বিশেষ কোনও অংশ দর্শন করবে। পরে একেবারে সামনাসামনি দর্শন হয়। তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারবে, একেবারে জীবন্ত দেখা যায়। কথা বলতে বলতে আবার তিনি তোমার মধ্যে মিশে যাবেন। এই ভাবে ভগবানের সঙ্গে ভক্তের সম্বন্ধ গড়ে ওঠে। কিন্তু মনে রেখ, তা প্রাকৃত দর্শন নয়, শুদ্ধ ভাববোধের স্তরের দিব্যদর্শন। তা কেবল তাঁর কৃপাতেই সম্ভব। ভগবৎ তত্ত্ব শ্রবণের মতো এত সুন্দর শোনার বিষয় আর কিছু নেই। শ্রবণ হল অমৃতস্বরূপ। হৃদয় হল তাঁর পূর্ণ লীলানিকেতন। যখন ভক্তের সঙ্গে ইষ্টের মিলন হয়, তখন তাঁর সঙ্গে আপনজনের মতোই ব্যবহার হয়। যেন তেন প্রকারেণ এটা যেন এই

জীবনেই হয়—এই দৃঢ়তা থাকা চাই। প্রতিদিন যেন তাঁর সঙ্গে মিলনের জন্য ব্যাকুলতা বাড়ে, তবেই মনুষ্যজন্ম সার্থক হবে।

ঈশ্বরদর্শনের অনেক স্তর আছে। উঠতে-বসতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে তা প্রত্যেক জীবনেই সম্ভব হতে পারে। চাওয়া অনুযায়ী মনের ভাব তৈরি হয়। আবার ভাব অনুযায়ী হয় বোধের প্রকাশবিকাশ। শুদ্ধ ভাবে হয় শুদ্ধবোধের প্রকাশ এবং শুদ্ধবোধে হয় ঈশ্বর-আত্মার সঙ্গে অখণ্ড সহবাস অর্থাৎ সমবোধে প্রতিষ্ঠা।

(শ্রীসানাই, শ্রীপঞ্চমী সংখ্যা, ১৯৯৩)

৩২৬

বিকারী চিত্ত কামনায় পূর্ণ। আবার কামনাপূরণের জন্য মানুষ কত কী না করে! "ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি।" মনের সংকল্প সাধনের জন্য কত বটতলা, শীতলাতলায় মাথা খুটছ, মানত করছ। এ সবই অজ্ঞানপ্রসূত ধর্মের লক্ষণ। ভোগৈশ্বর্য লাভের চেষ্টা থাকলেই মানুষ আত্মবিস্মৃত হয়। আর আত্মবিস্মৃত হলেই আসে দুঃখভোগ। প্রত্যেককেই স্বকৃত কর্মের দুঃখভোগ করতে হয়। কেউ তা share করে না, এমনকী নিজের স্ত্রী, ভাই, বোন, মা, বাবা কেউ নয়। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হলেন দস্যু রত্নাকর। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন।

ডাকাতি করতে গিয়ে রত্নাকর সাধু, মহাত্মাদেরও ছাড়তেন না। একবার তিনি ব্রহ্মা ও নারদকে বেঁধে রেখেছিলেন। তাঁরা বললেন—আমাদের বেঁধে রাখার জন্য যে পাপ করছ তার ফল কিন্তু তোমাকেই ভোগ করতে হবে। কেউ তার ভাগ নেবে না।

রত্নাকর চিন্তিত হয়ে গৃহে এসে তার পিতাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর কুকর্মের ফল তিনি নেবেন কি না। তাঁর পিতা বললেন—আমি নিজে কোনও দিন কুকর্ম করিনি, সৎ পথেই তোমাকে মানুষ করেছি, আমি কেন তোমার কুকর্মের ফল ভোগ করব? রত্নাকরের মাও বললেন—সৎ পথে থেকে সুন্দর ভাবে তোমাকে মানুষ করেছি। তোমার কুকর্মের ফল ভোগ তো আমি করতে পারব না। স্ত্রীও একই কথা বলায় রত্নাকর স্তম্ভিত হয়ে ফিরে এলেন নারদের কাছে এবং পাপমুক্তির উপায় জানতে চাইলেন।

বাঁধন খুলে দিতে নারদ ও ব্রহ্মা তাঁকে জীবন্মুক্তির বিজ্ঞান বলতে গিয়ে দেখলেন রত্নাকরের জিহ্বা পাপবদ্ধ হয়ে আড়ষ্ট হয়ে আছে। পবিত্রতম মন্ত্র রাম নাম উচ্চারণ করতে পারছেন না। জিহ্বার জড়তার জন্য রাম না বলে বলছে আম। কিন্তু নারদ ও ব্রহ্মা মহাপাপী রত্নাকরকে উদ্ধারের জন্যই এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে রাম মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারলেন না তাঁর অযোগ্যতার জন্য।

সেই সময় কাছ দিয়েই একটি মৃতদেহ নিয়ে কয়েকজন যাচ্ছিল। ব্রহ্মা ও নারদ এই দৃশ্য দেখে পরস্পর একটু ভেবে রত্নাকরকে জিজ্ঞাসা করলেন—ওরা কী নিয়ে যাচ্ছে? রত্নাকর বললেন—মরা। নারদ ও ব্রহ্মা তখন হেসে বললেন—তুমি 'মরা, মরা' জপ কর। তাতেই তোমার পাপ দূর হবে এবং মুক্ত হবে। এই বলে হৃষ্ট চিত্তে তাঁরা বিদায় নিলেন।

রত্নাকর ঐ অবস্থায় ওখানে (বনে) বসেই মরা মন্ত্র জপতে লাগলেন। বহু হাজার বছর এই জপ-তপস্যায় কাটিয়ে তাঁর দেহবোধ ও পারিপার্শ্বিক বোধ চলে যায়। প্রকৃতির বিপর্যয়ে বহু যুগ কেটে যায়। তাঁর তপস্যারত দেহের উপর বল্মিকের (উই) স্তুপ তৈরি হয়। তার প্রাণশক্তি মজ্জাগত হয়ে জীবিত থাকে তপস্যার গভীরে। যে মরা নাম মৃত্যুকে নির্দেশ করে তা পুনঃপুনঃ উচ্চারিত হলে রাম মন্ত্র হয়ে যায়। এই রাম মন্ত্রে সিদ্ধ হয়ে রত্নাকর পরবর্তীকালে বাল্মীকি নামে পরিচিত হন। বাল্মীকি রামের জন্মের আগেই রামায়ণ রচনা করেছিলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন— রত্নাকরের বাল্মীকিতে পরিণত হবার মূলে কী আছে? তা হল এক মুহূর্তের যথার্থ সৎসঙ্গের ফল। আর তোমরা দীর্ঘকাল ধরে সৎসঙ্গ করছ অথচ তোমাদের অন্তরের ভোগবাসনা, স্বার্থবুদ্ধি ও কামনাপূরণের আশা যাচ্ছে না। এত শুনেও মনকে বশে আনতে পারছ না।

'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) যখন কিছু বলে তখন তা 'light of Oneness' থেকেই ব্যাখ্যা করে। কোনও বিলাসিতা নয়, প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব বা বাহবা পাবার জন্য নয়, শুধু তোমাদের জন্য, যাতে তোমরা আত্মতত্ত্বের বা অমৃততত্ত্বের সন্ধান পাও। কিন্তু এত পেয়েও যদি ব্যবহার করতে না-পার তবে পাবার কী মূল্য রইল? ব্যবহার ঠিক ঠিক বা যথাযথ হওয়া চাই। ক্রিয়াবিশেষ দিয়ে নির্বিশেষকে পাওয়া যায় না। কর্ম, জ্ঞান নয় জ্ঞানাভাস। জ্ঞানাভাস দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না। একমাত্র আত্মজ্ঞানের শিক্ষা দ্বারাই কামনাবাসনা, ভোগ থেকে নিবৃত্ত হওয়া যায়। আবার ভোগবাসনা থেকে নিবৃত্ত না-হলে আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। একবার আত্মজ্ঞানের অধিকারী হলে বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেও অজ্ঞান, মোহ ও আসক্তির পাশ বা প্রভাব হতে মুক্ত থাকা যায়। একবোধে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-ই আত্মজ্ঞানের শিক্ষা; ক্রিয়াবিশেষের দরকার হয় ভোগ চরিতার্থ করার জন্য।

"ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে।।"

ভোগৈশ্বর্যের সঙ্গে যারা যুক্ত তারা বিভ্রান্ত। বিভ্রান্ত চিত্তে সত্যবোধের সঙ্গে একাত্ম হওয়া যায় না। কারণ চঞ্চল বিষয়াসক্ত বুদ্ধি কখনওই একাগ্র হতে পারে না। আবার চিত্ত একাগ্র না-হলে ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব হয় না। জ্ঞান বিনা মুক্তি হয় না। এই জ্ঞান পোশাকি ধর্মের জ্ঞান নয়, আত্মজ্ঞান। আত্মজ্ঞানে encourage বা discourage করা হয় না। এখানে part বা খণ্ড নিয়ে কোনও কিছুই বলা হয় না। অখণ্ড দিয়ে অখণ্ড ভূমাকে জানা ও মানাই হল 'Science of Oneness'। তা-ই এখানে বিশেষ ভাবে ব্যক্ত করা হয়। এই 'Science of Oneness'-এর বিজ্ঞান সর্বযুগেই দেওয়া হয়েছে। কথা একই, ভাষা ভিন্ন।

৯। ৩। ৯৪

৩২৭

ধর্মজগতের মূল কথাই হল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। বর্তমান যুগে মানুষের শ্রদ্ধা, বিশ্বাস তো নে-ই, আছে শুধু অধিকারের দাপট।

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

দেবতা ও অসুরদের মধ্যে ছিল নিত্য অধিকারের লড়াই। লড়াই করে করে ক্লান্ত হয়ে একবার দেবতাদের রাজা ইন্দ্র ও অসুরদের রাজা বিরোচন ব্রহ্মার কাছে এলেন। ব্রহ্মা উভয়কেই পরামর্শ দিলেন অমরত্ব লাভের সাধনা করতে। উভয়ে শত্রু হলেও অসময়ে কিন্তু একসঙ্গে সাধনা করতে লাগলেন। পঁচিশ বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল। তাঁরা এলেন ব্রহ্মার কাছে অমৃতত্বের অনুশাসনের জন্য। ব্রহ্মা তাঁদের হ্রদের জলে নিজেদের চেহারা দেখতে বললেন। তারপর তিনি তাঁদের বললেন—যা দেখবে তা-ই সত্যের পরিচয়। তাঁরা দেখলেন তাঁদের চেহারা কত বদলে গিয়েছে, চুল-দাড়ি বড় হয়ে গিয়েছে। বিরোচন ফিরে গেলেন। তিনি ভাবলেন, দেহবুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়সুখই হল আসল সত্য। ইন্দ্র কিন্তু তা গ্রহণ করতে পারলেন না। তিনি প্রশ্ন নিয়ে ব্রহ্মার কাছে ফিরে এলেন। ইন্দ্র বললেন—দেহ তো পরিণামী ও বিকারশীল। এটা তো সত্য অমৃত হতে পারে না। তাঁর কথা শুনে ব্রহ্মা প্রীত হয়ে বললেন—তা ঠিক। তুমি আরও পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করে তপস্যা কর, আমি তোমাকে অনুশাসন দেব।

পঁচিশ বছর পর আবার ইন্দ্র এসে ব্রহ্মাকে তাঁর সত্য অনুশাসনের কথা স্মরণ করালেন। উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—দেহের অধিষ্ঠান প্রাণই সত্য। প্রাণই দেহকে চালায়।

ব্রহ্মার কথা শুনে প্রীত হয়ে ইন্দ্র ভাবতে ভাবতে স্বর্গরাজ্যের পথে চললেন। তার মনে হঠাৎ শঙ্কা জাগল, প্রাণেরও তো বিকার হয়, নইলে জীব মরে কেন? তিনি ফিরে এসে আবার ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করলেন—প্রভু, প্রাণেরও তো বিকার হয়, প্রাণ তো অমৃত হতে পারে না।

তাঁর কথা শুনে ব্রহ্মা প্রীত হয়ে বললেন—তুমি যথার্থ বুঝেছ। তবে প্রাণের সত্য অবগতির জন্য তুমি আরও পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য সহকারে তপস্যা কর। তখন তোমাকে অমৃতত্বের পরিচয় বিশদভাবে বলব।

পঁচিশ বছর তপস্যা করার পর ইন্দ্র আবার এসে ব্রহ্মার কাছে অমৃতত্বের অনুশাসন প্রার্থনা করলেন। উত্তরে ব্রহ্মা বললেন—প্রাণের পরিচয় জানা যায় যার দ্বারা তা-ই সত্য।

ইন্দ্র খুশি হয়ে ভাবতে ভাবতে স্বর্গরাজ্যে ফিরে চললেন। ইন্দ্র দীর্ঘকাল আপন রাজ্য ছাড়া। তাঁর অনুপস্থিতিতে দেবতাদের যে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন। কিন্তু তিনি তাঁদের কথা দিয়ে এসেছেন, অমৃতের সন্ধানে যাচ্ছেন, অমৃতের সন্ধান পেলেই ফিরবেন। কাজেই এই সময় দেবতারা যেন সাবধানে থাকেন। স্বকার্যসাধনে যেন তাঁদের ত্রুটি না-হয়। ব্রহ্মার উত্তরের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি চলেছেন। কিছু দূর যেতেই তাঁর মনে শঙ্কা জাগল, প্রাণকে আমরা মন

দিয়েই ভাবি ও জানি। সুতরাং মনই অমৃত। কিন্তু মনের তো ভ্রান্তি, ভীতি ও পরিণাম আছে, কাজেই মন তো অমৃত হতে পারে না।

ইন্দ্র আবার ফিরে গেলেন ব্রহ্মার কাছে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে। ইন্দ্রকে দেখে ব্রহ্মা খুশি হলেন এই ভেবে যে, ইন্দ্রের মনে যথার্থ জিজ্ঞাসা জেগেছে। ইন্দ্র বললেন—প্রভু, আপনি যে মনের কথা বললেন তাও তো বিকারী, পরিণামী ও ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ। তা তো সত্য অমৃত হতে পারে না।

ব্রহ্মা সব শুনে বললেন—তুমি যথার্থ বুঝেছ। তবে মনের ঊর্ধ্বে যে সত্য তা জানবার জন্য তোমাকে এখানে আরও পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য সহকারে তপস্যা করতে হবে। ব্রহ্মার কথা মতো আরও পঁচিশ বছর তপস্যার পর ইন্দ্র আবার ফিরে এলেন ব্রহ্মার কাছে সত্য ও অমৃতত্বের প্রার্থনা নিয়ে।

ব্রহ্মা বললেন—মনকে অবগত হওয়া যায় যার দ্বারা সেই বুদ্ধিবিজ্ঞানই হল সত্য। অবশ্য বুদ্ধিবিজ্ঞানের আরেক নাম হল সত্ত্ব।

ইন্দ্র এই নব পর্যায়ের সত্যের পরিচয় শুনে প্রীত মনে ব্রহ্মাকে প্রণাম করে স্বর্গের পথে ভাবতে ভাবতে রওনা হলেন। কিছু দূর গিয়ে তাঁর মনে শঙ্কা হল এই ভেবে যে, বুদ্ধিও তো বিকৃত, ভ্রান্ত, অসহায় এবং শোক-মোহে বিহ্বল ও বিমোহিত। সুতরাং বুদ্ধি কখনও সত্য অমৃতত্ব হতে পারে না। সত্য অমৃতত্ব অন্য কিছু হবে, যা তাঁর জানা হয়নি। তিনি তা জানবার জন্য আবার ব্রহ্মার কাছে ফিরে এলেন। অধিক শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তি সহকারে তিনি ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তাঁকে প্রশ্ন করলেন—প্রভু, বুদ্ধিও তো বিকারী, পরিণামী ও দুঃখের কারণ এবং মৃত্যুর অধীন। তা তো সত্য অমৃত হতে পারে না। আপনি কৃপা করে এই সম্বন্ধে আমাকে যথার্থ অনুশাসন দিন।

সত্য অমৃতত্বকে অবগত হওয়ার জন্য ইন্দ্রের আগ্রহ ও ব্যাকুলতা দেখে ব্রহ্মা অত্যন্ত প্রীত হলেন। তিনি ইন্দ্রকে আরও এক বছর ব্রহ্মচর্য সহকারে তপস্যা করতে বললেন। তখনই তিনি ইন্দ্রকে সত্য ও অমৃতত্বের যথার্থ জ্ঞান ও পরিচয় প্রদান করবেন বলে জানালেন।

ব্রহ্মার কথা মতো ইন্দ্র এক বছর তপস্যা করে তাঁর কাছে সত্য ও অমৃতত্বের অনুশাসন প্রার্থনা করলেন। ব্রহ্মা দেখলেন সত্যের সন্ধান ও অমৃতত্বের অবগতির জন্য তীব্র ব্যাকুলতা ও আগ্রহ যথার্থ ভাবে তৈরি করতে যে যোগ্যতার দরকার তা ইন্দ্র বা বিরোচন কারওরই ছিল না। বিরোচন তো প্রথম পঁচিশ বছর তপস্যান্তে দেহাত্মবুদ্ধির পরিচয় ব্রহ্মার মুখে অবগত হয়ে তা-ই সত্য অমৃত জ্ঞান ভেবে স্বরাজ্যে ফিরে গিয়েছেন। তিনি তার সাঙ্গপাঙ্গদের দেহের চর্চা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। এটাই অসুরবৃত্তি। তা জ্ঞানতত্ত্বের সর্বনিম্ন আভাসমাত্র। এই জ্ঞান নিয়েই অসুররা জীবনযাপন করে। ফলে তারা সত্য অমৃতত্বের সন্ধান পায়নি এবং অমর হতে পারেনি, মৃত্যুকে জয় করতে পারেনি। সুতরাং আত্মতত্ত্ব তারা অবগত নয়। অপরপক্ষে ইন্দ্র ব্রহ্মার প্রথমবারের প্রশ্নের উত্তর বিচারপূর্বক যথার্থ নয় বুঝে দ্বিতীয়বার তাঁর কাছে ফিরে আসেন এবং তাঁর কথা মতো আরও পঁচিশ বছর তপস্যা করে প্রাণতত্ত্বের পরিচয়

পান। প্রাণও যে সত্য অমৃত নয় তা বিচারপূর্বক অবগত হয়ে তৃতীয়বার জিজ্ঞাসা নিয়ে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হন। ব্রহ্মার নির্দেশ মতো আরও পঁচিশ বছর তপস্যা করে ব্রহ্মার কাছে পান মনোস্তত্ত্বের পরিচয়। তাও বিচারপূর্বক সত্য অমৃতত্ব নয় জেনে চতুর্থবার প্রশ্ন নিয়ে ব্রহ্মার কাছে আসেন। ব্রহ্মার নির্দেশ মতো আরও পঁচিশ বছর ব্রহ্মচর্য সহকারে তপস্যা করে বুদ্ধিতত্ত্ব ও বুদ্ধিবিজ্ঞানের পরিচয় জানতে পারেন। তাও বিচারপূর্বক যথার্থ সত্য ও অমৃতত্ব নয় জেনে তিনি ব্রহ্মার কাছে আবার ব্যাকুলতা, আগ্রহ ও অধিক শ্রদ্ধা সহকারে সত্য ও অমৃতত্বের জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হন।

সত্য ও অমৃতত্বের তপস্যায় ইন্দ্রের যোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে শেষ পর্যায়ে এসেছে। বুদ্ধিতত্ত্ব ও বুদ্ধিবিজ্ঞানের রহস্য বা তাৎপর্য অবগত হতে পারলেই সত্য ও অমৃতত্বের পরিচয় তিনি পাবেন। তাই আরও এক বছর তপস্যান্তে ব্রহ্মার কাছে সত্য ও অমৃতত্বের যথার্থ অনুশাসন প্রার্থনা করে ইন্দ্র ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করেছেন। তাঁর তপস্যায় পিতামহ ব্রহ্মা প্রসন্ন হয়ে তাঁকে বললেন—তুমি সত্য ও অমৃতত্ব জানার যথার্থ যোগ্য অধিকারী। বুদ্ধিতত্ত্ব অবগতির মাধ্যমে সত্যকে জানার পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ। এবার তোমাকে বুদ্ধির অতীত পরমতত্ত্ব পরমসত্যের যথার্থ পরিচয় ব্যক্ত করছি। শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বুদ্ধির অধিষ্ঠান হল পরমবোধিস্বরূপ প্রজ্ঞান। এই প্রজ্ঞানই হল প্রকৃষ্ট জ্ঞান বা জ্ঞানস্বরূপ সত্যস্বরূপ অখণ্ড ভূমা। এই ভূমাই হল অত্যন্ত সুখস্বরূপ শান্তিস্বরূপ অমৃতত্ব। তা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অজর অমর অপাপবিদ্ধ নির্বিকার নিরাভাস নিষ্ক্রিয় নিষ্কল নির্মল নিরবলম্ব। তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ স্বয়ংপ্রমাণ সচ্চিদানন্দঘন সমরসসার। তা 'নিত্যাদ্বৈত অ-ভেদাভেদ তত্ত্ব' শাশ্বত অচ্যুত। একেই জ্ঞানিগণ পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান বলে উপলব্ধি করেন। তাঁদের পরম নির্দেশ ও অনুশাসন হল—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম", "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম","অয়ং আত্মা পরব্রহ্ম", "তত্ত্বমসি", "সোঽহম্", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "অখণ্ড একরস বস্তু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্", "বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ স্বয়ংপ্রভ দ্বৈতবর্জিতোঽহম্"।

পিতামহ ব্রহ্মার কৃপায় পরম অমৃতত্ব অবগত হওয়ার যোগ্যতা লাভ করে দেবরাজ ইন্দ্র পরিশেষে ব্রহ্মার মুখে পরমসত্য ও অমৃতত্বের চরম অনুশাসন শ্রবণ করে তদ্‌বোধে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজেকে ধন্য ও কৃতকৃত্য জেনে পরমানন্দে ব্রহ্মাকে বন্দনা করে স্বর্গরাজ্যে ফিরে গেলেন।

আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ কথা হল—অমৃতত্ব হল পরমতত্ত্ব পরমসত্য। তা সর্বজীবের হৃদয়ে পূর্ণমাত্রায় নিহিত থাকা সত্ত্বেও জীবের কাছে বোধগম্য বা অনুভবগম্য হয় না। কারণ স্বভাবজাত দোষ ও অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়ে যায় পরমতত্ত্ব আত্মতত্ত্ব। জীব নিজের স্বভাব অনুযায়ী চলে বলে স্ববোধ-আত্মার স্মৃতি ভুলে থাকে। ঈশ্বর-আত্মা গুরুবেশে এসে তা বিশদ ভাবে স্মরণ করিয়ে দিলেই জীবের জীবত্ব নাশ হয় এবং সে শিবত্বে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বভাবের দোষ হল কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব। এই তিনটি মিলেই হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞান দ্বারাই জীবের জীবত্ব তৈরি হয় ও পরিচালিত হয়। সে তার যথার্থ যোগ্যতা হারিয়ে গুণাধীন হয়ে সসীমবোধে সংসারে চলে। এই অজ্ঞান নাশ করতে হলে তপস্যার মাধ্যমে যোগ্যতা লাভ করতে হয়। উল্লিখিত গল্পে অসুররাজ বিরোচন ও দেবরাজ ইন্দ্রের সত্য ও অমৃতত্ব লাভের যোগ্যতা ছিল না। তাঁরাও গুণাধীন ও কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। যোগ্যতা লাভের জন্যই তাঁরা পিতামহ ব্রহ্মার কাছে এসেছিলেন। ব্রহ্মা তাঁদের ব্রহ্মচর্য সহকারে পঁচিশ বছর তপস্যা করতে বললেন। তারপর জীবের দেহতত্ত্ব ও দেহবুদ্ধির জ্ঞান দিয়ে তাঁদের অনুশাসন করলেন। অজ্ঞানবশত বিরোচন প্রথম অনুশাসন অর্থাৎ দেহতত্ত্ব ও দেহজ্ঞানের কথা শুনে তৃপ্ত হয়ে চলে যায়। বিরোচনের পরবর্তী অনুশাসন এবং উত্তরোত্তর সূক্ষ্মতর জ্ঞান লাভের যোগ্যতা হয়নি বলেই সত্য অমৃতত্ব লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই অসুররা আজও আসুরিক ভাবে জীবনযাপন করে। 'অসুর' শব্দের অর্থ—"অসুষু রতঃ যঃ স অসুরঃ।" অর্থাৎ দেহবুদ্ধিকেই যথার্থ অবলম্বন করে যে চলে। 'অসু' শব্দের অর্থ দেহ। দেহচর্চা ও দৈহিকবলে বলীয়ান যারা, তারা সবাই অসুরের পর্যায়ে পড়ে। দেহবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ আত্মবুদ্ধির অধিকারী হতে পারে না। দেহবোধ হল সর্বনিম্নবোধের মান। গুণযোগে তারও আবার ক্রমিক বিভাগ হয়। অপরপক্ষে আত্মবোধ সূক্ষ্মতম অনন্ত ব্যাপ্ত পূর্ণ বোধের পরিচয়।

ইন্দ্রকে অমৃতস্বরূপ সত্য আত্মবোধের অধিকারী হওয়ার জন্য পঁচিশ বছর করে চারবার ব্রহ্মচর্য সহকারে তপস্যা করতে হয়েছে। তাতেও তাঁর চরম যোগ্যতা লাভ সম্ভব হয়নি। তাই আরও এক বছর ব্রহ্মচর্য সহকারে তপস্যা করে তবেই তিনি আত্মতত্ত্ব ও সত্য অমৃতত্বের অনুভূতি লাভ করেছেন। সবসমেত একশো এক বছর তপস্যার দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের পক্ষে আত্মতত্ত্ব লাভ করা সম্ভব হয়েছিল ব্রহ্মার মতো উত্তম গুরুর সান্নিধ্যে থেকে তাঁর নির্দেশ যথাযথ পালন করে। আর আজকাল ব্রহ্মচর্যহীন কামাহত জীব ভোগসর্বস্ব সংসারে স্বার্থসিদ্ধির ধান্দায় রত থেকে ধর্মকর্ম করে এবং গতানুগতিক লৌকিক গুরুর কাছে দীক্ষা নেয়। তাদের ব্রহ্মচর্য নেই, তপস্যাও নেই এবং যোগ্যতা বাড়াবার প্রচেষ্টাও নেই। কিন্তু সত্যধর্ম লাভের একটি গতানুগতিক সাধ আছে। তারা সাধের ধর্ম পালন করে লোকদেখানো আনুষ্ঠানিক ভাবে। মতপথের গোঁড়ামিসহ তারা ধর্মক্ষেত্র, তীর্থক্ষেত্র, আশ্রম, মঠ, মন্দির, গির্জা, মসজিদ, সাধুসন্ত, পির ও ফকিরের সঙ্গ করে গর্ব অনুভব করে এবং নিজেদের ধার্মিক বলে প্রচার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। কিন্তু স্বভাবের পরিবর্তনের কথা আদৌ তাদের খেয়াল থাকে না। যোগ্যতা বাড়াবার উপায়ও তাদের জানা নেই। তাদের সাধ্য কম, কিন্তু সাধ অধিক। তাই তারা ধর্মক্ষেত্রে স্বার্থনীতি, রাজনীতি ও কূটনীতির আশ্রয় ব্যাপক ভাবে নিয়ে নিজেদের কাজ গুছাবার চেষ্টা করে। তাদের সংযমের অভাব, ভ্রাতৃপ্রেম ও একতাব পরিবর্তে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব; অহিংসার পরিবর্তে হিংসা; সত্যের পরিবর্তে মিথ্যা; ধৈর্য, স্থৈর্য ও সহিষ্ণুতার

পরিবর্তে অধৃতি (অধৈর্য), অস্থিতি ও পরমতাসহিষ্ণুতার পরিচয় আচরণের মাধ্যমে প্রকাশ করতে দ্বিধাবোধ করে না। বর্তমানের কর্মজগৎ যেমন রাজনীতির পঙ্কিল আবর্তে উচ্ছৃঙ্খলতা, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও পীড়নের দৃষ্টান্তে ভর্তি, ধর্মক্ষেত্রেও সেইরূপ সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে মতবাদের লড়াই, পরমতাসহিষ্ণুতা, ধর্মের নামে ব্যভিচার, মিথ্যাচার, ভ্রষ্টাচার সর্বত্রই ব্যাপক ভাবে পরিলক্ষিত হয়। তবে সবাই যে একই রকম ভাব-চরিত্রের তা নয়। এদের মধ্যে অতি মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক লোক সত্যনিষ্ঠ, ধর্মনিষ্ঠ হয়ে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। তাদের সংখ্যা এতই নগণ্য যে, বর্তমানের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় তা লক্ষ্যের মধ্যেই পড়ে না।

সত্য, ব্রহ্মচর্য, তপস্যা, সেবা, দান, অহিংসা, ক্ষমা, নিষ্ঠা ও প্রেমপ্রীতির অনুশীলন ব্যতীত জীবধর্মের সম্যক্ রূপান্তর ও আত্মবোধের যথার্থ অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়। যারা নিষ্ঠা সহকারে এই দৈবী ধর্মগুণগুলি সম্যক্ ভাবে অনুশীলন করতে চেষ্টা করে তারাই যথার্থ ধার্মিক, অপরে নয়। অমৃতত্ব তথা পরমতত্ত্ব লাভের জন্য প্রথম শিক্ষার সোপানই হল ব্রহ্মচর্য ও সংযম। তার সঙ্গে বিবেকবিচার, ত্যাগ-বৈরাগ্য, দেহবুদ্ধির শুদ্ধি ও সংসারবন্ধন তথা মোহ-অজ্ঞানবন্ধন হতে মুক্তির তীব্র ব্যাকুলতা (মুমুক্ষুত্ব) যার মধ্যে তীব্র বা ব্যাপক ভাবে প্রকাশ পাবে সে-ই যোগ্য অধিকারী বা সর্বোত্তম অধিকারী হতে পারবে।

যোগ্য অধিকারীর পক্ষে পর্যায়ক্রমে দেহবুদ্ধি, প্রাণবুদ্ধি, মনোবুদ্ধি ও মহদ্বুদ্ধি অতিক্রম করা সম্ভব হয় সদ্‌গুরুর (আত্মজ্ঞগুরুর) নির্দেশ পালন করে। পরমতত্ত্ব অমৃতত্বের জ্ঞান হয়—শাস্ত্রকৃপা, গুরুকৃপা, আত্মকৃপা ও ঈশ্বরকৃপার সমন্বয়ে। ঈশ্বর-আত্মাই হলেন আসল গুরু। সদ্‌গুরু হলেন তাঁর প্রতিভূ বা প্রতিনিধি। 'গুরু বিনা নাহি মিলে জ্ঞান, নাহি মিলে ভক্তি প্রেম।' জ্ঞান-ভক্তি বিনা ঈশ্বর-আত্মার কৃপা লাভ হয় না। অন্তর্যামী আত্মার কাছ থেকে জন্ম জন্মান্তরের সুকৃতির ফলে বাহ্য গুরুর সাহায্য ব্যতীতই আত্মকৃপা লাভ হতে পারে। যদিও এইরূপ দিব্য অধিকারী দুর্লভ, কিন্তু অসম্ভব নয়। শাস্ত্রকৃপা ও জ্ঞান ব্যতীত কেবলমাত্র সদ্‌গুরু অন্তর্যামী দেবতার অহেতুক কৃপা ও অনুগ্রহ লাভে ধন্য এবং কৃতকৃত্য হয়েছে এমন উদাহরণ বিরল নয়। আবার শাস্ত্রকৃপা লাভ করেও আত্মজ্ঞান লাভ হয়নি এমন দৃষ্টান্তও বহু আছে। সদ্‌গুরুর সান্নিধ্য ও কৃপা লাভে উত্তম অধিকারীর স্বল্পকালের মধ্যেই আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মধ্যম অধিকারীর বহু তপস্যার মাধ্যমে এক জীবনেই তা সিদ্ধ হয় আর সাধারণ অধিকারীর তিন-চার জন্ম লেগে যায় সিদ্ধিলাভ করতে। আবার সাধারণের চেয়েও যারা নিকৃষ্ট তাদের সম্বন্ধে কোনও সময় নির্দেশ করা যায় না।

তীব্র ব্যাকুলতা ও অনুরাগ সহকারে যাদের চিত্তে প্রেমভক্তির সংস্কার জাগ্রত হয় তাদের সহজেই ঈশ্বরকৃপা লাভ হয়। সবই ঈশ্বর-আত্মার কৃপাসাপেক্ষ। তা জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত, কর্মী সবার পক্ষেই প্রযোজ্য। যার চিত্তে যেমন ভাব তার তেমন গতি লাভ।

আবার ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরকে একক ভাবে বা সমবেত ভাবে গুরুরূপে পেয়েও যদি অধিকারী সাধক সর্বত্যাগ না-করে তবে তার সিদ্ধি লাভের সম্ভাবনা নেই। পরমসিদ্ধি লাভের অর্থই হল পরমতত্ত্বের অনুভূতি লাভ। তা সর্বত্যাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভোগ হতে যেমন বন্ধন আসে, সেইরূপ সম্যক্ ত্যাগ হতে আসে মুক্তি, অত্যন্ত সুখ ও পরমশান্তি।

বিবেক, বৈরাগ্য (ত্যাগ) প্রভৃতির জীবন্ত আদর্শ হলেন সদ্গুরু স্বয়ং। পরমাত্মদেবতা সদ্গুরুবেশে এসে জীবকে অমৃতত্ব লাভ বা মুক্তিশান্তির বিজ্ঞান ও সিদ্ধি দিয়ে যান। সাধুসন্তের মাধ্যমেই তিনি নিজের স্বরূপকে প্রকাশ করেন। সেইজন্যই সাধুসেবার ফল ও মাহাত্ম্য অমোঘ। তা সর্ব ধর্ম-মতপথেরই বিশেষ নির্দেশ।

Sensual pleasure বা ইন্দ্রিয়সুখ হল জাগ্রদ্বুদ্ধি। স্বপ্ন হল মনোবুদ্ধি, সুষুপ্তি হল প্রাজ্ঞবুদ্ধি। সমাধিতে বুদ্ধি লয় হয়ে যায়। ঈশ্বর স্বয়ং সত্যের প্রবক্তা। মানুষ কিন্তু বাস করে মিথ্যার মধ্যে। আশ্চর্যের বিষয় হল মানুষ সত্যকে ভুলে মিথ্যাকে নিয়ে ঘর করছে। সে যখন এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে তখনই তার মধ্যে জাগবে আত্মজিজ্ঞাসা। Present consciousness is the mixed consciousness. Here man is careful about the knowledge of person, matter, action and result, but less careful about his own Real Self.

১৬। ৩। ৯৪

৩২৮

সত্যধর্ম বিলাসিতার বস্তু নয়। অজ্ঞানে হয় সংসার। অজ্ঞানের মধ্যে থেকে সংসারমুক্ত হওয়া এবং সংসারবোধে থেকে অজ্ঞানমুক্তি কখনওই সম্ভব নয়। কর্মক্ষেত্রে থেকে, অর্থের পিছনে ছুটে মুক্তি লাভ করা কঠিন। আগেকারদিনে ঋষিরা শিষ্যের প্রারব্ধ দেখে যদি বুঝতেন তাকে সংস্কারমুক্ত করা যাবে না তাহলে সরিয়ে দিতেন। অন্তরে সত্যিকারের ব্যাকুলতা না-জাগলে শিষ্য হওয়া যেত না। আর বর্তমানে এখানে তো ধর্মের দ্বার সকলের জন্যই খোলা। সবরকম বিকার নিয়েও এখানে সবাই ধর্ম করছে। এখানে ধর্মের মূল কথা হল শ্রদ্ধা। কোনও রকম কুটিলতার উপর তা নির্ভরশীল নয়। বুদ্ধিকে নত করে সদ্গুরুর শরণাগত হয়ে তাঁর পায়ে নিঃশর্তে আশ্রয় চাইলে তা পাওয়া যায়। কিন্তু বাহাদুরি বা কর্তৃত্ব দেখালে তা পাওয়া যাবে না।

সত্য যুগে স্বয়ং ব্রহ্মা supreme গুরু হয়ে তাঁর চার মানসপুত্রকে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। পরে তিনি আরও সাতজন, তারপর নয়জন, তারপর দশজন—মোট ত্রিশজন উত্তম অধিকারীকে ধর্মশিক্ষা দিয়েছিলেন।

ত্রেতা যুগে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রের মতো উত্তমোত্তম অধিকারীকে সত্যধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন। মহারাজ দশরথের রাজসভায় উদয়াস্ত অনুশাসনের মধ্যে থেকে সময় লেগেছিল ছয় মাস। সেই রাজসভায় সমুপস্থিত মুনি, ঋষি,

যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত, দেবতারা বুঝেছিলেন—সবাই সত্যধর্ম লাভের জন্য নয়, তা কেবল উত্তম অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। যদিও ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম সবার জন্য, কিন্তু সবাই ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মের জন্য নয়। Though I am for one and all, but all are not for Me.

সত্যের আসল কথা নির্দ্বিধায় বলা হলে সত্যের একটা record থাকে। পরবর্তীকালে ·সেটাই হয় মুনি, ঋষিদের base। দ্বাপরে সত্যের ব্যাখ্যা করেন ব্যাসদেব তাঁর পুত্র শুকদেবের কাছে। সত্যধর্ম ঋষিপরম্পবায় আসে। তবে অবতারপুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে এই সত্যধর্মকে যুগোপযোগী করে ব্যাখ্যা করে যান। ভগবান তাঁর প্রয়োজন অনুসারে কখনও প্রেমের, কখনও শান্তির, কখনও জ্ঞানের, কখনও বা আনন্দের অবতার হয়ে আসেন।

ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করেন। History-র date-এ এই মূল জিনিস পরিষ্কার। মহাভারত রচনার আগে ব্যাসদেব আরও উনচল্লিশবার জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সত্যের ব্যাখ্যা করতে পারেননি। ব্যাসদেব সম্পর্কে এ কথা বশিষ্ঠদেব দশরথের রাজসভায় বলেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে, এবার তিনি পরমতত্ত্ব লাভ করেছেন। সেই ব্যাসদেবই পরবর্তীকালে মহাভারত রচনা করেন।

বশিষ্ঠদেব প্রসঙ্গে বলতে গেলে বিশ্বামিত্রের কথা এসে পড়ে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

বিশ্বামিত্র ছিলেন শক্তি ও বীর্যের প্রতিভূ। তিনি তন্ত্রসিদ্ধ ছিলেন। বশিষ্ঠদেব ছিলেন জ্ঞানসিদ্ধ। শক্তিবিদ্যা ছিল বিশ্বামিত্রের করায়ত্ত। তন্ত্রই এখন সবচেয়ে বেশি প্রচলিত, প্রসিদ্ধ ও প্রভাবশালী। যোগের উপরও আছে তন্ত্রের প্রভাব। যোগে জ্ঞানের প্রভাব থাকলেও তা সবার জানা নেই। সেইজন্য রাজযোগে সবার অধিকার নেই। আবার দুর্লভ পুরুষ ছাড়া জ্ঞানযোগের সাধনা সবার পক্ষে সম্ভব নয়, সর্বযুগেই সত্যের ধারক, বাহকের সংখ্যা থাকে কম। বিশ্বামিত্রকে ব্রহ্মতত্ত্ব বোঝাতে হিমশিম খেয়েছিলেন সেই সময়ের ঋষিরা, এমনকী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরও পারেননি। মানুষের অধিকার ভগবান কাকে কী ভাবে দেন মানুষ তা জানে না। এরা source থেকে পেয়ে আবার source-এর against-এ যায়। বিশ্বামিত্রকে এ ব্যাপারে যিনি বিধান দিলেন তিনি বিশ্বামিত্রকে আরও জটিল কুটিল পথে নিয়ে গেলেন। তাঁরা জানত বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণত্ব একমাত্র বশিষ্ঠদেব ছাড়া আর কেউ দিতে পারবেন না। তাই তাঁরা পরামর্শ দিলেন বশিষ্ঠদেবকে দিয়েই বশিষ্ঠনিধন যজ্ঞ করাতে, কারণ বশিষ্ঠদেব সরে গেলে তাঁরা বিশ্বামিত্রকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নেবেন। ব্রাহ্মণ হলেন তিনিই যিনি ব্রহ্মকে জানেন। এই রকম most nasty things এখানেও হচ্ছে। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) তো TV-র ছবির মতো সব পরিষ্কার দেখতে পায়, তবু এতদিন strict হয়নি। কারণ বেশি strict হলে সব ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে।

মুনিদের কথা মতো বিশ্বামিত্র এলেন বশিষ্ঠদেবের কাছে এবং তাঁকে যজ্ঞ করতে অনুরোধ করলেন। বশিষ্ঠদেব সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন

কাজ করা একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষেই সম্ভব। 'এ' বহুবার এই ভাবে crucified হয়েছে। Crucifixion-এর সময় 'এ' কোনও দিনই ভাবেনি, এবারেও ভাববে না।

যজ্ঞ শুরু হল। যজ্ঞে আহুতি দেওয়া শুরু হল। একে একে বশিষ্ঠদেব পাঁচটি আহুতি দিলেন। ততক্ষণে বিশ্বামিত্রের মনে আলোড়ন শুরু হয়ে গিয়েছে। এ তিনি কী করছেন, নিজের স্বার্থে তিনি বশিষ্ঠদেবের মতো ঋষিকে নিধন করতে চলেছেন! নিজের false personality তাঁকে কত বড় কুকর্মের দিকে নিয়ে চলেছে। তাঁর শক্তিই তাঁর কুকীর্তিকে ধরিয়ে দিচ্ছে।

সত্যের কোনও partner নেই, It reveals Itself—motivated personal interest is going to destroy It। বিশ্বামিত্র তখন বশিষ্ঠের পা জড়িয়ে ধরলেন এবং তিনি যাতে ষষ্ঠ আহুতি না-দেন তার জন্য বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। বিশ্বামিত্র বললেন—আমি ব্রাহ্মণত্ব চাই না, আপনি যজ্ঞ শেষ করবেন না।

বিশ্বামিত্রের আকুল আবেদনে বশিষ্ঠদেব প্রীত হলেন। ষষ্ঠ আহুতি আর তাঁর দেওয়া হল না। অহংকার নিয়ে জটিল কুটিল পথে ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয় না। বিশ্বামিত্র আকুল ভাবে বশিষ্ঠদেবের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইলেন। বশিষ্ঠদেব তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন—তোমার এই surrender-এর জন্যই তুমি আজ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করলে। আমি তোমাকে ব্রাহ্মণ বলে মেনে নিলাম।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ব্রহ্মত্ব সবার মধ্যেই সুপ্ত আছে। সদ্গুরুই একমাত্র তা জাগাতে পারেন, অন্য কারও পক্ষে সম্ভব নয়। If there is any God Who can save you, He is the Guru, a perfectly realized life.

ব্রহ্মের প্রথম মূর্তি হল গুরুমূর্তি। গুরু বলতে তোমরা কোনও মূর্তির কথা ভাবলেও ব্রহ্মের কিন্তু কোনও আকার নেই। 'এ' তোমাদের দিতে পারে, কিন্তু প্রতিদানে কিছু নিতে পারে না, that is the law of Oneness। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কথা বিকৃত করলেই দূরে সরে যাবে। কারণ Oneness-এর একটাই রাস্তা—unconditional surrender। তোমরা সৎ মতলব নিয়ে এসে বদ মতলব করছ। অথচ সত্যের ঐশ্বর্য দেখলে তাঁর পায়ে লুটোপুটি খাবে। যেহেতু 'এর' শক্তিবিভূতির খেলা নেই, তাই 'এর' কাছে বাহাদুরি দেখাতে ইচ্ছে হয় তোমাদের। অথচ 'এর' মধ্যে যে একধারা, অবিমিশ্র সমবোধের ধারা বইছে, সেই ধারায় একবার মিশতে পারলে 'এর' মধ্যেই মিশে যাবে। সে চেষ্টাই তোমাদের নেই। 'এ' আর কিছু নয়, অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দঘন আত্মা।

২৩। ৩। ৯৪

৩২৯

তত্ত্বকথা শুনবার অধিকার সবার থাকে না। শাস্ত্রেও তার নির্দেশ আছে। বলা আছে, একমাত্র তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে তত্ত্বকথা বলবে। আর যারা শুনতে অনিচ্ছুক, ইন্দ্রিয় সংযম অভ্যাস করেনি, ভোগী, পরনিন্দুক, মিথ্যাবাদী এবং তপস্বী নয় তাদের

তত্ত্বকথা বলা নিষেধ। অবশ্য এখানে এ সব মান্য না-করে সবার কাছেই তত্ত্বকথা বলা হয়, কারণ কারওকেই এখানে ব্যক্তিরূপে লক্ষ্য করে তত্ত্বকথা বলা হয় না। যে কারণে সত্যের কথা বলা হয় তা হল, এখানে বক্তা ও শ্রোতা একজনই।

তথ্য ও তত্ত্ব এক কথা নয়। তত্ত্বের অংশবিশেষ হল তথ্য। তথ্যের অনুভূতি হলেও তত্ত্বের অনুভূতি হয় না। অহংকার-অভিমান যতক্ষণ আছে ততক্ষণ তত্ত্বানুভূতি হতেই পারে না। ইন্দ্রিয়, দেহ, প্রাণ, মন যখন দৃশ্যরূপে প্রতিভাত হয়, নিজেকে নিজে সাক্ষিরূপে বা সাক্ষিদ্রষ্টারূপে অনুভব করবে তখনই তোমার অন্তরে তত্ত্বস্ফূর্তি হবে। প্রত্যেকের জীবনের record রাখার ভার রয়েছে নিয়তির উপর। প্রত্যেককে তার কর্ম অনুসারে ফল দেবার অধিকার একমাত্র নিয়তিরই। নিয়তি cannot be transgressed—'নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে''—এ কথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ মহাভারতে বলেছিলেন।

সভাপর্বে একবার শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধ অনিবার্য দেখে সমঝোতা করবার জন্য কৌরবদের সভায় পাণ্ডবদের দৌত্য করতে যান। সেখানে তিনি বলেছিলেন যে, তিনি জগৎ ধ্বংস করার জন্য আসেননি, তিনি জগৎকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যই যুদ্ধের ফলাফলের কথা সবার কাছে বলছেন এবং সবাইকে যুদ্ধ হতে বিরত থাকতে অনুরোধ করছেন। তাঁকে মানা বা না-মানা তাদের বিচার। যে ধ্বংস হতে চায় তাকে ফেরানো যায় না। পুরুষকার দিয়ে চেষ্টা করা যায়, কিন্তু নিয়তির উপর কারও কোনও অধিকার নেই।

রাম অবতারেও দেখা গিয়েছে শ্রীরামচন্দ্র সংকল্প করামাত্র রাবণকে আপনবোধে আনতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি, নিয়তির হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। মহাভারতের অন্যান্য চরিত্র—শিশুপাল, জরাসন্ধ, কংস ইত্যাদিরা ছিলেন ঈশ্বরভক্ত। তারা নিজেদের দোষে অভিশপ্ত হয়ে সংসারে এসে ঈশ্বরবিরোধিতার মাধ্যমে ঈশ্বরসেবায় রত ছিলেন। শত্রু ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য স্মরণ করেই তারা শ্রীকৃষ্ণের সাথে অন্তিমকালে মিলিত হতে পেরেছিলেন। শত্রু ভাবে, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও কাম ভাবে—যে কোনও ভাবেই তাঁকে নিত্য স্মরণ, মনন করলে তাঁর সাথে মিলিত হওয়া যায়।

শিশুপাল ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পিসেমশাই দামঘোষের ছেলে। শিশুপালের জন্ম হয় চতুর্ভুজ হয়ে। দৈববাণী হয়, যার কোলে উঠলে তার দুই হাত খসে যাবে সে-ই হবে শিশুপালের মৃত্যুর কারণ। শিশুপালের জন্মের খবর পেয়ে শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম এলেন শিশুপালকে দেখতে। শ্রীকৃষ্ণের কোলে আসতেই তার দুই হাত খসে যায়। শিশুপালের মা শ্রীকৃষ্ণের কাছে কেঁদে তার সন্তানের প্রাণভিক্ষা চান। শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর পিসির কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন যে, তিনি শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করবেন, কিন্তু একশো এক অপরাধ আর ক্ষমা করবেন না। পিসি তাঁর কথা শুনে খুশি হলেন। কিন্তু দুর্বিনীত শিশুপালের একশোটি অপরাধ অল্পকালের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণসহ দেশের সকল রাজারাই উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ভীষ্ম শ্রীকৃষ্ণকে প্রধান অতিথির পদে বরণ

করলে শিশুপাল ও তার সঙ্গীসাথিরা খুবই ক্রুদ্ধ হয়। ভীষ্ম অতিথিদের পদপ্রক্ষালন করে কাজ আরম্ভ করলে শিশুপাল ভীষ্মকে নানা ভাবে অপদস্থ করে। তখন শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে সুদর্শনচক্রকে আহ্বান করেন। একশো এক অপরাধের সাথে সাথে শিশুপালের মস্তক তিনি সুদর্শনচক্র দিয়ে কেটে ফেলেন। শিশুপালের মৃত্যুর পর তার আত্মা জ্যোতিরূপে বেরিয়ে এসে শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মিশে যায়।

কংস ও শিশুপাল বধের পর জরাসন্ধ ক্ষেপে যায়, সৈন্য নিয়ে সে দ্বারকা আক্রমণ করে। শ্রীকৃষ্ণের একাদশ অক্ষৌহিনী যাদব সৈন্যের সঙ্গে না-পেরে উঠে জরাসন্ধ মায়াশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের সৈন্যদের মধ্যে অসংখ্য কৃষ্ণমূর্তি বানিয়ে দেন। সৈন্যরা তখন ফ্যাসাদে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ তখন জরাসন্ধের সৈন্যতে অনেক জরাসন্ধ বানিয়ে তাদের মারতে বলেন। জরাসন্ধ তখন নকল বাসুদেব বানিয়ে ছড়িয়ে দেন সৈন্যদের মধ্যে। এই রকম মায়ার খেলা আর কতক্ষণ চলে, যুদ্ধ বন্ধ হয়ে যায়। জরাসন্ধ তখন দ্বাবকা দখল করতে আসলে শ্রীকৃষ্ণ সমুদ্রগর্ভে নকল দ্বারকা বানিয়ে সমস্ত দ্বারকাবাসীদের সেখানে সরিয়ে নেন। জরাসন্ধ দ্বারকায় প্রবেশ করে দেখলেন যে, দ্বারকা শূন্য। সেই শূন্যপুরীতে আবার শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে আক্রমণ করে বন্দি করলেন। জরাসন্ধ পালিয়ে গিয়ে সেই যাত্রায় প্রাণরক্ষা করে। পরে শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশে ভীম জরাসন্ধকে বধ করেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানে কৃষ্ণ is not God but a miracle master—যেন পরমপ্রেমাস্পদ নন। শ্রীকৃষ্ণ সম্পর্কে এ সব তত্ত্ব অবগত না-হয়ে কিছু বললে মহাপাপ হবে। এও তাঁর এক লীলা। কেন তিনি এ সব করলেন তা যথার্থ তত্ত্বস্ফূর্তি না-হলে জানা যাবে না।

'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) কোনও creation-এর মধ্যে নেই। সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার হল প্রকৃতির এবং প্রকৃতির ঊর্ধ্বে থাকতে পারা যায় অদ্বয়জ্ঞানে। In the Knowledge of Oneness there is no game of creation, preservation and destruction. এই Science of Oneness নিয়ে challenge করলে 'এ' silence-এ চলে যাবে।

তোমাদের একটি কথা প্রায়ই বলা হয়—'এক কথা'-কে উল্টে নিলে হয় 'ক-এ থাক'। ক হল কেন্দ্র, কারণ (কারণে থাকলে কার্য ছুঁতে পারে না), কালী, পরব্রহ্ম সুখস্বরূপ পরমাত্মা। 'এর' কথা ভেঙে লক্ষ কথায় ব্যবহার করতে পার, কিন্তু তাতে তত্ত্বস্ফূর্তি হবে না। মন-বুদ্ধি গলে গেলে হয় তত্ত্বস্ফূর্তি। তখন দেহ রাখার প্রয়োজন থাকলে দেহ থাকবে, না-হলে দেহ সরে যাবে।

Finite soul Infinite ঈশ্বরকে আপন করে পেতে চায় : মানুষ নিজেকে ঈশ্বরের স্তরে না-তুলে ঈশ্বরকেই নামিয়ে আনতে চায় সসীম স্তরে। তাই গানে বলা হয়েছে—'আপনার মত চাহ সত্য না হয়ে সত্যের মতন।' Mundane স্তরে ঈশ্বরকে নামিয়ে আনলে ঈশ্বর হন বিগ্রহ। বিগ্রহের বা মূর্তির কাছে কী পাবে? ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হতে হলে physical, vital and mental শুদ্ধির প্রয়োজন। তোমরা ভেব না

তোমাদের ভক্তি 'এ' কেড়ে নিচ্ছে, ভক্তি কেড়ে নেয় জ্ঞান। তবে শুদ্ধ জ্ঞান ছাড়া ভক্তি হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণ করেছিলেন, কিন্তু কেন? এর অপব্যাখ্যা অনেকেই করবে। কিন্তু লোকে তত্ত্ব জানে না বলেই আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে না। দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন সবই আত্মার আবরণ। আমার বলতে যা-কিছু আছে, তা ছাড়তে না-পারলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। আমার বলে যা-কিছু সবই ছাড়তে হবে, তবেই চিত্তশুদ্ধি হবে। শুদ্ধ চিত্ত ভগবানের সবচেয়ে প্রিয়। ভক্তের হৃদয়ই হল ভগবানের লীলাভূমি (আশ্রম)। নির্মল শুদ্ধ চিত্তই সর্বত্যাগ করে অবধূত হয়। আর যাঁরা সর্বত্যাগী তাঁরাই ভগবানের লীলামাধ্যম। ঈশ্বরের লীলামাধ্যম হতে গেলে বস্তু-ব্যক্তি-কর্ম-কর্মফলের প্রতি কোনও রকম attachment রাখলে চলবে না। আর এর একমাত্র panacea হল the Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge।

এই জ্ঞান লোকে এখনও ঠিক ভাবে নিতে পারেনি, তবে একদিন ঠিকই নেবে। এখানে ব্রহ্মকথা কম বলে Knowledge of Oneness-এর কথাই বেশি বলা হয়। এই Oneness-এ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই দেওয়া হয়েছে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র সাধনা। তার জন্য হতে হবে একনিষ্ঠ। নিজেকে smaller than the smallest বলে ভাবতে হবে। তাতে ব্যষ্টিভাব negated হয়ে Oneness of Knowledge-এ প্রতিষ্ঠিত হবে। Knowledge par excellence হল পরমসত্য, পরমতত্ত্ব, পরমমুক্তি, পরমশান্তি অদ্বয়স্বরূপ।

এখানে যে-সব কথা বলা হয় তা একটির সঙ্গে আরেকটি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। এখানে 'মেনে, মানিয়ে চলা', 'এক কথা', 'Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge', 'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness' ইত্যাদি অনেক অভিনব formula ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, আনুগত্য না-থাকলে তোমাদের দেহ নাশ হয়ে যাবে। অকৃতজ্ঞতার ফলস্বরূপ heart attack ইত্যাদি নানা ব্যাধি হতে পারে। আবার কৃতজ্ঞতাবোধ ও শরণাগতি থাকলে মৃত্যুর দূতও তোমাদের স্পর্শ করতে পারবে না। মৃত্যু যখন আসবে তখন হাসিমুখে বলতে পারবে—নিয়ে যাও তোমার এই দেহ, আমি তো দেহ নই। তবে চিত্তশুদ্ধি না-হলে তা সম্ভব নয়। দেহের বিকারে বিব্রত হয়ো না, দেহ তো অজ্ঞানের লক্ষণ। জ্ঞানে প্রীতি হলে অজ্ঞান আপনিই সরে যাবে। দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ-মন সব তাঁকে দিয়ে বল—"শরণাগত অহম্", "ব্রহ্মদাস অহম্", "গুরুদাস অহম্"। এটাই হল শুদ্ধ দিব্যভাব, অকর্তা-অভোক্তাভাব। জ্ঞান দিয়ে কাম-কর্মকে বিনাশ করার জন্য সব কিছুকে এক-এ নিয়ে যেতে হবে। এই জ্ঞানাগ্নি তোমাদের ভক্তিকে বিনাশ করার জন্য নয়, কেবল শুদ্ধা ভক্তির পথে অন্তরায় দূর করার জন্য। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) তোমাদের ভক্তি কেড়ে নিতে আসেনি, শুদ্ধা ভক্তি লাভের জন্য ও আপনস্বরূপে প্রতিষ্ঠার আলো দিতেই এসেছে।

Chance বহু জন্মের পর একবারই মেলে এবং chance once missed, missed for long। কবে আবার এই chance পাবে কে জানে! প্রকৃতি সহায় না-হলে ভগবানও লীলা করতে পারেন না। অবতারকেও দুর্ভোগ ভুগতে হয়। প্রকৃতিমায়া সহায় ছিল না বলেই যিশুর crucifixion হয়েছিল। আবার যোগমায়া শ্রীকৃষ্ণের সহায় ছিলেন বলেই শ্রীকৃষ্ণ এত লীলা করতে পেরেছিলেন। প্রকৃতির সাহায্য পেতে শ্রীরামচন্দ্রকেও অকালবোধন করতে হয়েছিল রাবণবধের জন্য। এ সব কিন্তু কোনও imaginary speculation নয়। এই সত্য জানবে তখনই, যখন you will be identified with your own Being। নিজের অন্তর ছাড়া অন্য কোথাও তোমার প্রশ্নের উত্তর পাবে না। তোমার অন্তরেই সব থরে থরে বিন্যাস করা আছে। সৎকে নিয়ে অসৎকে ন্যাস করেই হয় অন্তরসন্ন্যাস। মন না-রাঙিয়ে শুধু বসন রাঙালেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আবার মন রঙিন হলে বসনের কোনও প্রয়োজনই থাকে না। সত্যের সঙ্গে যুক্ত থাকলে বস্ত্রের আর কোনও প্রয়োজন থাকে না। তাই তো অবধূতের কাপড় পরা বা না-পরা দুই সমান। সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে হলে অসত্যকে নিয়ে থাকলে চলবে না। সত্যই সত্যের পোশাক, যেমন মিথ্যাই মিথ্যার পোশাক।

৬। ৪। ৯৪

৩৩০

কর্মের ফল প্রত্যেক কর্তাকেই ভোগ করতে হবে। কেবলমাত্র যারা কর্তৃত্ব ও কর্মফলে উদাসীন ও অনাসক্ত তারা কর্মফলমুক্ত। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতংকর্ম শুভাশুভম্।" অবশ্য ভোগাসক্তিরহিত হয়ে কর্ম করতে পারলে কর্মফল স্পর্শ করবে না। কর্ম না-করে অলস ভাবে বসে থাকতেও পারবে না। মুক্তপুরুষ কর্ম করেও বদ্ধ হন না, আবার ভোগী কর্ম না-করেও বদ্ধ। কর্ম বন্ধনের কারণ নয়, বন্ধনের কারণ হল ভাবনাযুক্ত মন। তাই বলা হয়, যার যেরকম ভাব তার সেরকম লাভ। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে মনের বিলাসই হল জগৎ এবং জগৎকে পোষণ করে মন। মনোদয়ে জগতের উদয়, মনোলয়ে জগতের লয়। ভোগী মনকে তোয়াজ করে, ত্যাগী মনকে শাসন করেন, যোগী মনকে লয় করেন আর জ্ঞানী মনকে তুচ্ছ জ্ঞানে পরিহার করেন।

ভুল করলে ভুলের মাশুল দিতেই হবে। আগুনে হাত দিলে হাত তো পুড়বেই, তা তুমি জেনেই দাও আর না-জেনেই দাও। মনুষ্যজন্ম পেয়ে তাঁর রাতুলচরণে নিজেকে নিবেদন করতে না-পারলে যত বড় শিল্পী, সাহিত্যিক, গায়ক, লেখক, দার্শনিক হও না কেন তাতে মুক্তিলাভ হবে না। তাই গুরুপদে মন কর সমর্পণ।

"গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্ ততঃ কিম্।" পরমাত্মগুরুর চরণে মন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিবেদন করা না-হলে জীবন হবে বিকারী। যে মন্ত্রে মানুষের বিকার নাশ হয়, সেই এক-এর মন্ত্র, এক-এর বিজ্ঞানই তোমাদের দেওয়া হয়। তা-ই হল 'All Divine for All Time, as It Is'।

সকাম চিত্তে নিষ্কাম ভাববোধের কথা প্রবেশ করে না। সকাম চিত্তকে কর্মফল ভোগ করতেই হবে। ভোগ না-করলে কর্মফল নাশ হয় না। ভোগ নিবেদন করে যে এক-এর বিজ্ঞান গ্রহণ করে সে-ই পূর্ণ। গুরুপদে নিবেদিত চিত্ত, গুরুধ্যানে রত দেহ গুরুর অনুমতি ভিন্ন যমদূতও নিতে পারে না—গুরুর এমনই শক্তি।

একবার যমরাজ তাঁর দূতকে এক সাধকের দেহ আনতে পাঠালেন। দূত এসে দেখল যে, সে গুরুধ্যানে মগ্ন। গুরু তাঁর শিষ্যের দেহ নিয়ে যেতে যমদূতকে বাধা দিলেন। দূত ফিরে গিয়ে যমরাজকে সব জানায়। যমরাজ তখন নিজে এলেন সেই সাধকের দেহ নিতে। গুরু তাঁকেও বাধা দিলেন। যমরাজ তখন ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের শরণাপন্ন হলেন। তাঁরা এলেন যমরাজের কাছে তাঁর কাজে সাহায্য করতে। গুরু তাঁদেরও বাধা দিলেন। গুরু তাঁদের জানালেন, শিষ্য তাঁর আশ্রিত, কাজেই শিষ্যকে রক্ষা করার ভার তাঁর। তাঁর অনুমতি না-নিয়ে কী করে যমদূতরা তাঁর শিষ্যের দেহ নিয়ে যেতে এসেছে! ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর তখন ভুল বুঝতে পারলেন। তাঁরা গুরুতত্ত্বকে সর্বোত্তম তত্ত্ব বলে স্বীকার করলেন। তখন থেকেই ঠিক হল, ইষ্টনামে রত দেহ, সমাহিত দেহ, গুরুমূর্তি ধ্যানে রত সাধকের দেহ তাদের গুরুর অনুমতি না-নিয়ে যমদূত নিয়ে যেতে পারবে না। গুরুভক্ত, ইষ্টভক্ত, সিদ্ধপুরুষ, মহাত্মা, মহাপুরুষ, যোগী, জ্ঞানীর দেহ হতে প্রাণ নিতে হলে যমদূতকেও অনুমতি নিতে হবে। একমাত্র তাঁর অনুমতি পেলেই যমদূত তার কার্য সম্পন্ন করতে পারবে, নতুবা নয়। তা অতীব সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়। যেহেতু সেই সাধকের দেহ নেবার জন্য এত টানাটানি হয়েছিল তাই শিব তাকে শতায়ু বর দিলেন এবং ব্রহ্মা-বিষ্ণুও তাকে কৃপা করলেন। এমনকী যমরাজও তাঁর সঞ্চিত পুণ্য থেকে তাকে পুণ্য দান করলেন। গুরুশক্তির এমনই মহিমা!

৪। ৫। ৯৪

৩৩১

বৈষ্ণবধর্মে পাঁচ রকম মুক্তির উল্লেখ আছে, যথা— (১) স্বারূপ্য (২) সালোক্য (৩) সামীপ্য (৪) সার্ষ্টি ও (৫) সাযুজ্য। মুক্তি ও নির্বাণের পার্থক্য আলোচনা করা দার্শনিকদের ব্যাপার হলেও এখানে তা আলোচ্য বিষয় নয়। দর্শন বিজ্ঞানে স্বানুভূতির কথা থাকে না, মতবাদের কথা থাকে বেশি। আর এখানকার প্রতিটি কথাই হল স্বানুভূতিভিত্তিক। মতপথের ব্যাপার এখানে অবান্তর। এখানকার একটি মূল কথা হল—ঈশ্বরবোধে আত্মার সঙ্গে অভিন্নবোধ যখনই হয় তখনই হয় মুক্তি। দ্বৈতবোধে মুক্তি সম্ভব নয়।

রাজনীতি, সমাজবিজ্ঞান, ধর্মজিজ্ঞাসার মধ্যে আছে দ্বৈতভাবের প্রভাব। তাই সত্যান্বেষীদের এ সবের মধ্যে থাকা বারণ বা নিষিদ্ধ। সত্য প্রচারের বিষয় নয়। আত্মধর্ম, ব্রহ্মধর্ম প্রচারের বিষয় হতে পারে না।

আচার্য শঙ্কর অদ্বৈতধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই বাংলাদেশে একবার এসেছিলেন। সারা ভারতে উত্তরে যোশী মঠ, দক্ষিণে সিঙ্গেরী মঠ, পশ্চিমে সারদা মঠ প্রতিষ্ঠা করে

পূর্বদেশে গোবর্ধন মঠ স্থাপনের জন্য এ দেশে আসেন। পরে এই মঠ স্থাপিত হয় পুরীতে।

নবীনযুবা অনুভূতির জ্যোতিতে টগবগ করছে। তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধদের সব বড় বড় নেতাদের পরাস্ত করে সাগরদ্বীপে মঠ স্থাপনের অনুমতি নিলেন। তারপর কপিলমুনির আশ্রমে স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে এলেন। শঙ্করের শর্ত ছিল তর্কযুদ্ধে যিনি তাঁকে পরাজিত করতে পারবে তাঁর কাছেই তিনি দীক্ষা নিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করবেন। এ এক অদ্ভুত মোকাবিলা! সবাইকে পরাস্ত করে এসে তিনি ব্রহ্মানন্দকে বললেন, তিনি তাঁর সাথে কিছু শাস্ত্রালোচনা করতে চান অদ্বৈত প্রসঙ্গে। ব্রহ্মানন্দ কিন্তু শঙ্করকে গ্রাহ্যই করলেন না। তাঁব বক্তব্যে গুরুত্ব না-দিয়ে সহজ ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—অদ্বৈততত্ত্ব আবার কী জিনিস? শঙ্কর বললেন—সত্য বস্তুই হল অদ্বৈততত্ত্ব। ব্রহ্মানন্দ বললেন—তাহলে তা প্রচার করার কী আছে? শঙ্কর বললেন—এই সত্য কথাটি মানুষ মানে না, তাদের জানাবার জন্যই এই প্রয়াস। ব্রহ্মানন্দ বললেন—সূর্য যে আকাশে আছে এটা জানবার জন্য কি হ্যারিকেন নিয়ে খুঁজতে যেতে হয়? তুমি বালক তাই বোঝ না। যখন সমস্ত বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম হবে তখন বুঝবে। অদ্বৈতের আবার কী আলোচনা, যেখানে দুই নেই এক-ই আছে তা আবার কী করে প্রচার করবে?

ব্রহ্মানন্দের এ রকম ছোট ছোট প্রশ্নের উত্তর শঙ্কর দিতে পারেননি। তিনি পরে বুঝতে পারলেন যে, এমন করে তাঁর ভুল তো কেউ ধরিয়ে দেয়নি! তিনি ব্রহ্মানন্দকে বললেন—আপনার মতো অদ্বৈতবাদী যেখানে আছেন সেখানে আমার মঠ স্থাপনের কোনও প্রয়োজন নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর অদ্বৈতবাদ প্রসঙ্গে বললেন—অদ্বৈততত্ত্ব কোনও ক্রিয়াকলাপের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। Truth is truth. It does not require any support—এ কথা তিনি নিজেই প্রচার করেন। পরব্রহ্ম এক-ই ছিল, বহু হয়েছে নিজেকে নিজে আস্বাদন করবে বলে। যিনি অদ্বৈতবাদী তাঁর আর অপরের আশীর্বাদের কী প্রয়োজন! কোনও ন্যাকামি অদ্বৈতবাদে চলে না। অদ্বৈত হল 'পরমে পরম, আপনে আপন, স্বয়ং-এ স্বয়ং।' ঈশ্বরের এই স্বরূপকেই তোমরা ignore কর। তাই ঈশ্বরের মতো কেউ হতে পারে না, কেবল মিথ্যাচারী হয়, ব্যভিচারী হয়। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে মিথ্যার কোনও স্থান নেই। ভুলভ্রান্তি যা হয় তা হল অজ্ঞানমূলক। এই অজ্ঞানও ঈশ্বরের। ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে অজ্ঞানও নেই। সেই জন্য চণ্ডীতে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

"যা দেবী সর্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।"

মাকে বাদ দিয়ে মায়াও থাকতে পারে না। অর্থাৎ মাকে স্বীকার করলে মায়া থাকে না, আর মায়াকে স্বীকার করলে মাকে মানা যায় না। "গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানী।" 'মা' নাম হল মহামন্ত্র। এই মন্ত্র হল সর্বমন্ত্রসার। এই মন্ত্র উচ্চারণ করলে অন্তর থেকে বাইরে প্রণব ঝংকারে নাদ ছড়িয়ে পড়ে। 'ওঁ' মন্ত্র হল অ-উ-ম। উ-ম

হল উমা, শিবের বক্ষে অখণ্ড শক্তি। শিব হলেন অখণ্ড সত্তা। (অ) অখণ্ড সত্তার বক্ষে (উ-ম) অখণ্ড শক্তি।

মানুষমাত্রেই হল মনোবৃত্তির সমষ্টি। জীবমাত্রই হল a bundle of thoughts। আর এ সবের ঊর্ধ্বে হল আত্মা। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে যে নৈর্ব্যক্তিক আত্মা আছে, যাঁকে বলা হয় real man বা real One, that One is ever-present eternally everywhere and in everything—তিনিই হলেন পরব্রহ্ম পরমাত্মা পরমেশ্বর পরমগুরু। তাঁর কোনও আকারও নেই, বিকারও নেই। তাঁ নির্বিকার নিরাকার নিরঞ্জন।

সত্য ও মিথ্যা হল পরস্পরবিরোধী, সেই জন্য যুগপৎ থাকতে পারে না। সেইরূপ সংসার ও সমসার—এই দু'টি একসঙ্গে থাকতে পারে না। 'আমারভাব' হল অহংকার, তাতেই হয় সংসার। 'আমারভাব' সরে গেলে আর সংসার নেই। তখন আমি কার, কে আমার—সবই একাকার, তখনই হয় সমসার। এ রকম পুরুষের মধ্যেই আত্মজ্ঞান জাগ্রত হয়। আত্মজ্ঞানীর পরাবর দর্শন হয়। তাঁর হৃদয়গ্রন্থি ও সংশয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে সর্বপ্রকার প্রারব্ধ নষ্ট হয়। নাভিমূলে তমোগুণের, হৃদয়ে রজোগুণের ও আজ্ঞাচক্রে সত্ত্বগুণের গ্রন্থি খুলে গেলে জীব গুণমুক্ত হয়। গুরুই এই ভাবে ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে তাকে ঈশ্বরবোধে নিয়ে যান। ''প্রতিবোধবিদিতমতম্ অমৃতত্বম্''—প্রতিবোধে অমৃতত্ব অবগত হওয়া চাই। ''কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্ আবৃতচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।।'' কোনও কোনও ধীর ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-মন সংযমপূর্বক অন্তরে ধ্যানের গভীরে অমৃতত্বকে দর্শন করেন বা তাঁর সন্ধান পান। সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় হল চক্ষু। সর্ব ইন্দ্রিয়ের সংযম হলে মন অ-মন হয় আপন হৃদয়গুহায়। সেখানেই হয় অমৃতত্বের আস্বাদন। শাস্ত্রপাঠ, মন্ত্রের সাধন প্রভৃতি হল প্রস্তুতিমাত্র। প্রস্তুতির স্তরে অনেক রকম গোঁজামিল থেকে যায় যোগ্যতার অভাবে। যোগ্যতা বাড়াবার জন্যই দরকার হয় স্বভাবের ঘষামাজা, দোষত্রুটির শোধন। ক্রিয়াকলাপ হল discipline, order। এগুলি যুগে যুগে পাল্টায়। কাজেই এগুলি পরিবেশ ও পরিস্থিতি সাপেক্ষ। কিন্তু জ্ঞানই হল একমাত্র নিরপেক্ষ আর সবই সাপেক্ষ। একমাত্র জ্ঞান দিয়েই জানা যায় ভক্তি ও প্রেমের মর্ম। তাই তো শুদ্ধ জ্ঞান না-হলে শুদ্ধা ভক্তিও লাভ হয় না। অজ্ঞানে কামনাবাসনা নিয়ে ঈশ্বরকে ডাকা ভক্তি নয়। ভক্তি হল আত্মনিবেদন। সংসারে সবাই প্রতি পদে পদে তাদের প্রিয়জনের জন্য কাঁদে, কিন্তু ভগবানের জন্য কাঁদে আর ক'জন, অথচ তিনি আছেন প্রত্যেকেরই হৃদয়ের গভীরে।

১১। ৫। ৯৪

৩৩২

মানুষ সবসময় 'আমার আমার ভাব' নিয়েই আছে। শত দুঃখ-শোকে সিন্দুকের চাবি কিন্তু ছাড়ে না। পরমার্থের চিন্তা করার সময় কোথায় তার! কিন্তু যিনি পরমার্থ

লাভ করেছেন তাঁর আর অর্থের সাথে কোনও সম্পর্কই থাকে না, তিনি পরমার্থ নিয়েই মহানন্দে থাকেন।

কলি যুগে প্রধান ধর্মই হল সেবা। দয়া করার ক্ষমতা কারও নেই। কে কাকে দয়া করবে? যাদের কিছু নেই তাদের মাঝেই বিলিয়ে দাও তোমার যা আছে। তাতে কিছুটা সমতার সাধন হবে। কলি যুগে ধর্মসাধনের অন্যতম অঙ্গ হল দান। তুমি যে সুযোগ পেয়েছ সে সুযোগকে কৃতজ্ঞতাবোধে প্রভুর সেবায় নিয়োজিত কর। কারণ ঈশ্বর সর্ববেশে, সর্বরূপে, সর্বনামে ও সর্বভাবে বিরাজ করছেন। তুমি যা করছ তা ঠিক, আর অন্যেরা বেঠিক—এই ধারণা তোমার উন্নতির পরিপন্থী। সেইজন্য বলা হয়—

'সবাই বেঠিক আর আমিই ঠিক হল অজ্ঞান।
সবাই ঠিক আর আমিই বেঠিক হল জ্ঞান।
সবাই ঠিক আর আমিও ঠিক হল বিজ্ঞান।
সবাই বেঠিক আর আমিও 'বঠিক হল প্রজ্ঞান।'

'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছে অনেকেই প্রশ্ন করে, মনকে একাগ্র করবে কী করে? তাদের বলা হয়েছে, মন তো প্রকৃতির, তা তো অস্থির হবেই। মনের সাথে তোমার সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন কী? মনকে বশ করার জন্য যোগী হয়ে কী করবে? যাঁর মন তাঁর থাক, তোমার তার খবরে কী প্রয়োজন? তারা আবার জানতে চেয়েছে, সহজতম উপায় কী? বলা হয়েছে—তোমরা তো গুরুবরণ করেছ, তাঁর কাছে জানতে পারনি? অবশ্য পরমগুরুকে না-মানলে কিছুই জানা যাবে না। তারপর বলা হল—সব কিছুর আগে এক-কে বসিয়ে নাও। অগ্রভাগে এক থাকলেই একাগ্র হবে। Put One always in front. সত্যকে সত্য বলেই স্বীকার করতে হয়। সত্য হল সর্বাপেক্ষা সরল। অথচ এই সরল সত্যকে মন দিয়ে ব্যবহার করে মিশ্রণ করে জটিল হতে আরও জটিলতর করে তুলছে মানুষ। আর এই জটিল-কুটিলের পিছনে ছুটেই মানুষ জন্ম জন্ম মৃত্যুর চক্রে ঘুরে মরছে। মানুষ সত্যকে কল্পনা করে তার মনের মতো ব্যবহার করে। তাই মানুষের কাছে বিষ্ণু হয় বিষয়। আর সেই বিষয় ভোগ করে মানুষ বিষয়জ্বালায় মরে। আর এই বিষয় যখন বিষ্ণু হবে, বিগ্রহ যখন হবে জীবন্ত তখনই হবে ধর্ম। কল্পনা দিয়ে ধর্ম হয় না।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হল। গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের শতপুত্র হারালেন। শোকে দম্পতি মুহ্যমান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের সাথে দেখা করতে এলেন। ধৃতরাষ্ট্র চোখে দেখেন না, গান্ধারী নিজের চোখ বেঁধে রাখেন। শ্রীকৃষ্ণের আগমনে ধৃতরাষ্ট্র বললেন—জনার্দন, তুমি এলে কিন্তু আমার বুক যে পুড়ে যাচ্ছে। ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনে শ্রীকৃষ্ণ স্থির ও নিরুত্তর রইলেন। গান্ধার দেশের রাজকুমারী, গায়ে তার অসীম শক্তি, সেই গান্ধারী শ্রীকৃষ্ণের হাত চেপে ধরে করুণ ভাবে বললেন—হে জনার্দন, তুমি আমার একশত পুত্রের একজনকেও রক্ষা করতে পারলে না? তুমি না জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা। এ তুমি কী করলে?

সব শুনে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—আমার আর কী করার আছে, এ সব তোমাদেরই কর্মের ফল। তোমাদের কর্ম তোমাদেরই কাছে ফিরে এসেছে। যার যেমন কর্ম তাকে তো তা ভোগ করতেই হবে। আমাকেও আমার কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরামচন্দ্র যদিও লোকোত্তর পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁদেরও মনুষ্যদেহে ধারণ করার জন্য এখানকার কর্মের ফল ভোগ করতে হয়েছে। যাঁরা গোড়াপন্থী তাদের এ সব কথা বোঝানো যায় না।

শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে আবার বললেন—তোমার অতীত জন্মে তুমি যা যা করেছ তার যেটুকু এই জীবনে যে ধারায় এসেছে, এই জীবনেই তা তোমাকে ভোগ করতে হবে। তুমি অতীতে এক জন্মে রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলে। তখন তুমি দাম্ভিক ও অহংকারী ছিলে। তোমার পতি রাজদরবারে কাজ সেরে অন্দরমহলে এলেই তুমি তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতে। তিনি কোনও উত্তর দিতেন না। তার এই মৌনতাও তোমার সহ্য হত না। তুমি তাকে উত্যক্ত করে বলতে—তুমি কি কালা, শুনতে পাও না? একদিন তোমার পতি তোমাকে বলেছিলেন—আমি দরবারে বসে যে-ভাবে সকলের সব প্রশ্নের উত্তর দিই, তোমাকেও দরবারে বসে সে-ভাবে উত্তর দিতে হবে। দরবার কী ভাবে চালাতে হয় তোমার জানা নেই, তুমি আর কী উত্তর দেবে? তখন তুমি ক্রুদ্ধ হয়ে তোমার পতিকে অভিশাপ দিয়েছিলে যার জন্য তোমার পতি অন্ধ হয়ে যায়। সেই অন্ধ পতির সেবার জন্যই তোমার এই জন্ম।

এখন তো সবাই যেন তেন প্রকারেণ একটা বিয়ে করে ফেলতে পারলেই বাঁচে। বিয়ের আসল অর্থ কী তা কেউ জানে না, আর জানলেও তা পালন করে না। বিবাহ হল 'বি'-কে বিশেষরূপে বহন করা। 'বি' হলেন বিষ্ণু। তাঁকে বহন করতে হবে in and through all your thought process। বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ স্বামী স্ত্রীকে পার্বতী/শ্রী/লক্ষ্মীরূপে গ্রহণ করবে এবং স্ত্রী স্বামীকে শিব/বিষ্ণুরূপে গ্রহণ করবে। কিন্তু তা কেউ করে কি? তাহলে এত বিরোধ কেন? জেনো তোমাদের প্রত্যেকটি কথাই তোমাদের কাছে ফিরে আসবে। তাই বলা হয়, হরিকথা ভিন্ন অন্য কথা আলোচনা কোর না। হরিকথায় হরিকথাই আসবে। God is not stupid like human being। মানুষের পরমকল্যাণের জন্যই তিনি এই 'Science of Oneness' -এর কথা 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মাধ্যমে বলছেন। ছিন্নমস্তার রূপই হল এই 'Science of Oneness'-এর একটা দারুণ exposition। সেটাও 'এর' মাধ্যমে যথার্থ ভাবে পরিবেষিত হয়েছে এখানে। সবগুলির মৌলিকতা ও স্বকীয়তা মানতে হবে পূর্ণ ভাবে। এ কথাই সহজ ভাবে বলা হয়েছে—আমাতে শুধু আমিই আছে। এই আমি কোনও individual আমি নয়। এই আমি হল ভূমা আমি। এই কথা ভূমার গানের মধ্যে উল্লেখ করা আছে স্বকীয় ভঙ্গিমায়।

একটু থেমে তিনি আবার গল্পটি বলতে শুরু করলেন—শ্রীকৃষ্ণ গান্ধারীকে আরও বললেন—তোমাকে আঠারোটি বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তুমি তার একটিও পালন করনি। তোমারই কর্মফলে তুমি তোমার পুত্রদের হারিয়েছ।

এরপর ধৃতরাষ্ট্রকে উদ্দেশ করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন যে, তিনি তার বিগত একশত জন্ম দেখেছেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি কোনও অপরাধ করেননি। ধৃতরাষ্ট্র ছিলেন এক অসাধারণ পুরুষ। তাঁর মধ্যে কিছু দোষ থাকলেও তাঁর অনেক গুণও ছিল।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বললেন—বিগত একশত জন্মে কোনও পাপ না-করলেও একশো এক জন্মের কথা তোমার মনে নেই। তখন তুমি ছিলে এক প্রজাবৎসল ধার্মিক রাজা। প্রজারাও তোমার ন্যায়বিচারে খুশি ছিল। তোমার শুভাশুভ কল্যাণদৃষ্টিতে প্রজারা, সঙ্গীরা, রানিরা সবাই সুখী ছিল। একদিন তুমি মৃগয়া করতে গিয়ে গভীর অরণ্যে পথ হারিয়ে ফেলেছিলে। তোমার সঙ্গীসাথিদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজধানীর পথ খুঁজতে খুঁজতে আরও গভীর জঙ্গলে চলে গিয়েছিলে। আহার নেই, জল নেই, নিদ্রা নেই—এমন অবস্থায় ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে তিন দিন ঘুরে ঘুরে শেষ পর্যন্ত রাত্রে এক গাছের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলে। গাছতলায় আগুন জ্বালিয়ে বসে ভাবছিলে যে, ঈশ্বর তো কিছু দিতে পারেন। যে গাছের নিচে বসেছিলে সেই গাছে অনেক পাখির বাসা ছিল। সেই গাছে ছিল এক দয়ালু পক্ষীপরিবার—মাতা, পিতা, পুত্র ও পুত্রবধূ। পক্ষী পিতা বলল—আজ আমাদের দ্বারে একজন অভুক্ত অতিথি এসেছে। আমাদের উচিত তার জন্য কিছু করা (পাখিদের মধ্যেও সত্ত্বগুণের অংশের অধিকারী আছে)। একদিন তো আমরা মরবই, তবে আজই না কেন এই আগুনে দেহরক্ষা করি। আর এই দেহের ঝলসানো মাংসটুকু খেয়ে অতিথি তৃপ্ত হোক। পক্ষী পিতার এই কথায় উৎসাহিত হয়ে পক্ষী মাতা বলল—আমি থাকতে তুমি আত্মদান করবে কেন? পক্ষী পুত্র বলল—আমি থাকতে আমার পিতামাতা আত্মদান করবে কেন? পক্ষী পুত্রবধূ বলল—আমি থাকতে আমার স্বামী আত্মদান করবে কেন? এই ভাবে কোনও মীমাংসা হবে না দেখে পক্ষী পিতা বলল—আমি জ্যেষ্ঠ, আমার কথা সবাই শুনবে। এই বলে সে আগুনে ঝাঁপ দিল। আগুনের মধ্যে পাখিটিকে পড়তে দেখে রাজা ভাবল, বাঃ বেশ! ভগবান তাহলে আমার আহারের সংস্থান করলেন। অতীব ক্ষুধার্ত রাজার ক্ষুন্নিবৃত্তি ওইটুকু পাখির মাংসে না-হওয়ায় ভাবল, ঈশ্বর দিলেনই যদি তবে এইটুকু দিলেন কেন? এই কথা বুঝতে পেরে একে একে পক্ষী মাতা, পক্ষী পুত্র ও পক্ষী পুত্রবধূ সেই আগুনে আত্মাহুতি দিল। রাজা তাদের মাংস খেয়ে সেদিনের মতো তৃপ্ত হলেন।

আবার রাজা পরদিন তাঁর রাজ্যের পথ খুঁজতে বেরোলেন। পথ খুঁজে না-পেয়ে অবশেষে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে আবার সেই গাছের নিচে এসে আগুন জ্বালিয়ে গতরাতের মতো আহারের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাজা কিন্তু সে রাতে কিছুই পেলেন না।

তার পরের দিনও তিনি ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে আবার সেই গাছের নিচে এসে বসলেন। ক্ষুধার তাড়নায় এবার তিনি নিজেই গাছের উপরে উঠে দেখলেন সেখানে অনেক পাখির বাসা। রাজা লোভ করে সেখান থেকে দশটি পক্ষীশাবক তুলে নিয়ে এসে পুড়িয়ে খেয়ে নিলেন। এই ভাবে পরপর দশদিন রাজা প্রতিরাতে দশটি করে পক্ষীশাবক ধরে আগুনে ঝলসিয়ে খেয়ে নিলেন। এগারো দিনের দিন রাজা তাঁর

রাজ্যের পথ খুঁজে পেয়ে সেখানে ফিরে গেলেন। আর এদিকে এই দশ দিন রাজা যে একশোটি পক্ষীশাবক মেরেছিলেন, তাদের মাতাপিতার আকুল শোক ও অভিশাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেই সেই রাজা ধৃতরাষ্ট্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনিই আবার গান্ধারীর এক জন্মের পতি ছিলেন। অদ্ভুত যোগাযোগে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র তাঁদের জন্মান্তরের কর্মফল একসঙ্গে ভোগ করছেন। "অবশ্যমেব ভোক্তব্যম্ কৃতংকর্ম শুভাশুভম্।"

গল্পটি শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—নিজের কর্মের ফল নিজেকেই ভুগতে হবে। কিন্তু কর্মফল যদি তাঁর পায়ে সমর্পণ করা যায়, অর্থাৎ নিষ্কাম ভাবে কর্ম করতে পারলে আর কর্মফল স্পর্শ করে না। নিষ্কাম কর্ম হয় অকর্তা-অভোক্তাবোধে কর্ম করলে।

মানুষ মাংস খায়, কিন্তু জানে না মাংসের অর্থ কী। মাংস হল—মাং + স। অর্থাৎ আজ আমি যাকে খাচ্ছি সেও একদিন আমাকে খাবে। রসনা চরিতার্থ করে যে মাংস, সেই রসনাকেই যদি তাঁর পায়ে দিতে পার তবে উদ্ধার পেতে পার। তবে এটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। এ ছাড়া 'মাংস' শব্দের অর্থ হল রসনা। রসনাকে যে সংযত করতে পারে সে-ই একমাত্র উদ্ধার পেতে পারে। মাং শব্দ বলতে বাক্যকেও বুঝায়। সুতরাং বাক্‌সংযমপূর্বক মৌনতা পালনই হল মাংসাহারের এক বিশেষ অর্থ। প্রত্যেক শব্দের তাৎপর্য হল তার বোধার্থ। এই বোধার্থের সম্যক্ অধিকারী পুরুষ হলেন আত্মজ্ঞ/ব্রহ্মজ্ঞ স্বয়ং। তাঁর কাছে প্রতিবোধই অমৃতস্বরূপ আত্মবোধের বিভূতি। সর্বোত্তম অধিকারীর জন্যই এই প্রসঙ্গটি বলা হল। তা সাধারণ ও মধ্যম অধিকারীর কাছে কখনওই গ্রহণযোগ্য হবে না। এই রকম অনেক কথাই সংপ্রসঙ্গের সময় ব্যক্ত হয়েছে যা ধারণ, গ্রহণ ও হৃদয়ঙ্গম করা একমাত্র উত্তম অধিকারীর পক্ষেই সম্ভব। তত্ত্বের অধিকারী সংসারী মানুষ হতে পারে না। কারণ সংসারী মানুষ হল অজ্ঞানী, অভিমানী, লোভী, কামুক, নিন্দুক, বিদ্বেষী, হিংসুক ও সত্যধর্ম বিরোধী। তারা কেবল নিজেদের স্বার্থ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। তারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধার্মিকের ভানও করে। তারা তোতাপাখির মতো তত্ত্বের কথাও বলে আবার ধরাও পড়ে। আচরণের সঙ্গে তত্ত্বের মিল থাকে না, তত্ত্বের পূর্বাপর ধারণা থাকে না এবং কথার মধ্যে link-ও থাকে না। পরদোষ ও সমালোচনা ছাড়া অন্য কোনও কথা বলা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

তাই মুক্তির বিজ্ঞান হল—জ্ঞানাগ্নি দিয়ে কর্মনাশ করা। এই অগ্নিই হল জ্ঞানস্বরূপ। "অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্ বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান।।"—তুমি আমাকে মঙ্গলময় পথে, যে পথে অন্যায় নেই, নানাত্ব-বহুত্ব নেই, সেই পথে নিয়ে যাও। তুমি হলে সারাৎসার, সব কিছুর সঙ্গে জড়িত। অগ্নি যেমন দাহ্যবস্তুকে নাশ করে, জ্ঞান সেরূপ অজ্ঞানকে বিনাশ করে স্বয়ং প্রকাশমান হয়।

১১। ৫। ৯৪

৩৩৩

পূর্ণতার বিজ্ঞানে প্রাধান্য পাওয়ার ইচ্ছা বা বাহাদুরি নেই, জগৎকে শিক্ষা দেবার আগ্রহ ও ব্যাকুলতাও নেই। তোমাদের অজ্ঞানের বিজ্ঞানে তা থাকতে পারে। 'এর'

(নিজেকে নির্দেশ করে) background কোথায় তা বলে দিলেও তোমরা নিতে পারবে না। তোমরা শীতলাতলা, কালীতলা, মনসাতলা, চণ্ডীতলায় ঘুরতে পার desire fulfil করার জন্য অথচ তোমাদের বাসনা তো কোনও দিনই পূর্ণ হয়ে শেষ হবে না। এখানে তাই বাসনাপূরণের বিজ্ঞান নয়, বাসনা ত্যাগ করে পূর্ণতা লাভ করার কথাই বলা হয়। তুমি যে পূর্ণ ছিলে, পূর্ণ আছ এবং পূর্ণ থাকবে—সেই বিষয়ে সচেতন হও। তাই এখানে nothing to reject and nothing to gain but to become aware of what you are। কোনও প্রাধান্য নেই, কোনও লঘুত্ব, গুরুত্বও নেই—আছে শুধু সমত্ব ও একত্ব। এই সমত্ব, একত্বই সত্য—এ ছাড়া আর যা-কিছু তা-ই বৈচিত্র্য ও মিথ্যা। মিথ্যার সঙ্গে ঘর করে সত্যকে পাওয়া যায় না। সত্যকে পেতে হলে মিথ্যাকে ছাড়তে হবে। আবার একবার সত্যকে পেয়ে গেলে মিথ্যাকে নিয়েও থাকতে পারবে, মিথ্যা তোমার মধ্যে কোনও বিকার সৃষ্টি করতে পারবে না।'

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গান ধরলেন—

কৈলাসশিখরে সহস্রারে অভিন্ন ব্রহ্মসত্তা ব্রহ্মশক্তি
পরমাত্মা শিবপার্বতী অ-ভেদাভেদে নিত্যযোগে বিহারে।।
মণিপীঠমূলে অন্তরে মানস সরোবরে হংসবেশে দোঁহে চলে অভিসারে।
চলে ভেসে ভেসে অতি উল্লাসে রতি সুখসারে সদা কেলি করে।।
স্বরূপশক্তির কোলে প্রজ্ঞাবোধি মূলে
অজপা ছন্দে দোঁহে নাচে প্রেমানন্দে
সোঽহং সুরে দোঁহে সমতালে বন্দে স্ববোধে পরস্পরে হৃদয়পুরে।
প্রেম বিনিময়ে যায় মিলে উভয়ে স্বানুভূতির গভীরে সুধাসাগরে।।

গানটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গানটিতে নিত্য অদ্বৈতানুভূতির সার কথা সর্বস্তরে point out করা আছে। কে শিব, কে পার্বতী, কে পরমাত্মা, কে ব্রহ্মসত্তা, কে ব্রহ্মশক্তি, কোথায় মানসসরোবর, কোথায় মণিপীঠ, কে-ই বা হংস সাজে বিহার করছে? Entire অদ্বৈতবেদান্তকে সামনে রেখে একটা intellectual demonstration দেওয়া হল। এটা কোনও illustration নয়।

কৈলাসশিখর হল তোমাদের সহস্রার। সেখানে শিব-পার্বতী অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা ও ব্রহ্মশক্তি একযোগে পরমাত্মা 'অ-ভেদাভেদ'-এ অর্থাৎ নিত্য অদ্বয়তত্ত্বে বিরাজ করছেন। মানসসরোবর হল তোমাদের মণিপীঠ। সেখানে সত্তা ও শক্তি হংসবেশে কেলি করছেন। স্বরূপশক্তির মধ্যে প্রজ্ঞাবোধি, যিনি বুদ্ধির অতীত, অজপা মন্ত্রে ও ছন্দে প্রেম নিবেদন করছেন। উভয় উভয়কে বন্দনা করছেন, আপনার মাঝে পরস্পরকে অনুভব করছেন, তাই প্রেমানন্দে নৃত্য করছেন। পরস্পরের হৃদয়ের গভীরে পরস্পর পরস্পরকে আত্মদান করে মিলেমিশে এক হয়ে যান স্বানুভূতির গভীরে।

বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে এ সব বোঝা যায় না। তোমাদের বুদ্ধির মল সরাবার জন্য এত কথা বলা হয়। ***শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা***-তে বুদ্ধিযোগের কথা কেউই বুঝতে পারেনি। তাই মানুষ ধ্যান, যোগাভ্যাস, জপতপ ও পূজাপাঠ করে। এত parapher-

nalia-র scope কোথায়? আত্মগুরু খুলে না-দিলে কেউ কোনও দিনই সত্যকে জানতে পারবে না। অসহায়বোধে কোনও রকম দ্বিধা না-রেখে নিজেকে নিবেদন করলে অর্থাৎ complete self-surrender হলে তবেই গুরু গ্রহণ করেন। তখন তিনিই হাত ধরে নিয়ে যাবেন। সর্বশাস্ত্রের সার যিনি, তিনি নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন বলেই তোমরা অজস্রধারায় সেসব অফুরন্ত ভাবে পাচ্ছ। ছাত্রের তপস্যা যেমন অধ্যয়ন তেমনই তোমাদের সৎসঙ্গের তপস্যা হল লাম্পট্য না-করা, মিথ্যাকথা না-বলা, বানিয়ে না-বলা, পরনিন্দা, পরচর্চা ও পরসমালোচনা না-করা। তোমরা যেখানেই যাও না কেন, সংস্কার যাবে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে। গুরু কিন্তু সর্বাবস্থায় সর্বত্রই বিরাজ করেন।

মানুষের মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের প্রাধান্য অনুসারে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক—এই তিন রকমের লোক আছে। মানুষকে না-চিনলেও বনের পশুপাখিরা তাদের ভাল করেই চিনতে পারে। তারা সত্ত্বগুণসম্পন্ন লোকেদের কখনওই আঘাত করে না।

হিমালয়ের অনেক উঁচু এক পাহাড়ে অতীব শ্বাপদসংকুল স্থানে এক সাধিকা থাকতেন। তাঁর গুম্ফার বাইরে একটি মস্ত বড় পাথরের উপর তিনি বসে থাকতেন। নিকটস্থ ঝরনার জল ও ফলমূল খেয়েই তিনি দিন কাটাতেন। একবার কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক সেই সাধিকার দর্শনে গিয়েছিলেন। ভদ্রলোক সাধিকাকে প্রশ্ন করেছিলেন—এত শ্বাপদসংকুল স্থানে থাকতে আপনার ভয় করে না? তিনি বলেছিলেন—জায়গাটি দুর্গম বটে, তবে এখানে ভয় কাকে? ভয় তো আছে সংসারে। আমি তো সংসার ছেড়ে এসেছি। আর বনের পশু, তারা তো আমায় কিছু বলে না, চেনা হয়ে গিয়েছে। ভদ্রলোক কলকাতা ফিরে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে, এই সাধিকা হলেন কিছুদিন পূর্বে হারিয়ে যাওয়া, সংসার ছেড়ে চলে যাওয়া তারই এক আত্মীয়া।

এর কিছুদিন পব আরেক মহিলা সেই সাধিকার সঙ্গে দেখা করতে যান। তিনি সাধিকার দেহের অপূর্ব জ্যোতি দেখে মুগ্ধ ও বিস্মিত হন। এই মহিলা তাঁকে প্রশ্ন করেন—আপনি ঘর ছেড়ে এসে কার তপস্যা করছেন? কী পেয়েছেন? উত্তরে সাধিকা বলেছিলেন—আমি যাঁকে পেয়েছি তুমি তাঁকে বাড়িতে বসেই পাবে। সেই জন্য তোমাকে আর এখানে আসতে হবে না। ঘটনাচক্রে 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) ছিল সেই মহিলার বাড়িতে। মহিলা ফিরে এসে 'একে' পূজা করতে চাইল। তাকে বলা হয়েছিল—বাইরের পূজা নয়, 'একে' পূজা কর আমি-র কেন্দ্রে আপন অন্তরে মণিপীঠমূলে। 'এ' আছে সবার হৃদয়ের গভীরে। নিজের হৃদয়গুহায় প্রবেশ কর, সেখানেই পাবে 'এর' সন্ধান।

১। ৬। ৯৪

৩৩৪

গানের মর্ম মরমে অনুভব করলে তবেই হবে যথার্থ গান বা ভজন, কিন্তু গানের parody করলে ভাগাড়ে থাকতে হবে। শকুনের দৃষ্টি সবসময় থাকে ভাগাড়ের

দিকে। শকুনের তত্ত্বার্থ এখানে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে। যে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে আদম-ইভের মতো সংসারযুদ্ধে নামে তার নামই শকুন। আর সত্যজ্ঞান মানুষকে নিয়ে যায় অমৃতের দিকে।

শকুন ও জ্ঞান প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন। ঘটনাটি সত্য এবং সাম্প্রতিককালেরই।

অধিকারী পুরুষ ভিন্ন অন্য কারও শাস্ত্ররচনা করার অধিকার নেই। কিন্তু বর্তমানে নাম ও অর্থের নেশায় অনুমানের উপর ভিত্তি করে অনেকেই যোগের বই লিখছে। এটা যে অনধিকারচর্চা তা তারা বুঝেও বোঝে না। এই সব বই পড়ে কত মানুষ যে বিভ্রান্ত হয় সে হিসাব আর কে রাখে! এতে নানা প্রলোভনের কথা লেখা থাকে। "শকুনের ডিম পরপর সাত দিন খেলে আকাশে ওড়া যায়"—এমনই একটি প্রলোভনের কথা এই রকম কোনও এক বইতে লেখা ছিল। সেই বই পড়ে কী করে একটি বাচ্চা ছেলের জীবন মরণাপন্ন হয়েছিল তার একটি সত্য ঘটনা তোমাদের বলছি।

ছেলেটি ক্লাশ VI-এ পড়ে। ব্যারাকপুরে River-side Road-এর কোনও একটি অনাথআশ্রমে সে থাকে। সে ও তার এক বন্ধু এমনই একটি বই সংগ্রহ করেছিল। সেই বইয়ে ঐ প্রলোভনের কথা লেখা ছিল। এমনিতেই গঙ্গার তীরবর্তী এলাকায় গাছে প্রচুর শকুনের বাস। গঙ্গায় ভেসে আসা মরদেহ ভক্ষণের আশায় তারা ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—'এ' যখন গঙ্গার তীরে বুড়িমার বাড়িতে থেকেছে তখন দেখেছে ভাটার সময় কত dead body পারে এসে পড়ে থাকে আর শকুন সেই মাংস সংগ্রহ করে। অবশ্য একদল মানুষও জীবিকার সন্ধানে এই সব dead body-র হাড় সংগ্রহ করে। আবার একদল মৃতদেহ থেকে চর্বিও সংগ্রহ করে। তারা চর্বি supply করে Calcutta Chemical-এর মতো বড় বড় company-কে। ধরাও পড়েছে, আবার অজ্ঞাত কারণে ছাড়াও পেয়ে গিয়েছে। এ সব দেখে মনে হত energy never changes, the change is only of form। হাড় দিয়ে কত কাজ হয়। সার তৈরি হয়, আবার লবণকে সাদা করবার chemical-ও তৈরি হয় হাড়ের গুড়ো থেকে। প্রসঙ্গত অঘোরপন্থী সাধক বা তান্ত্রিক যাঁরা, তাঁরা তো সব রকম মাংস খায়। এমনকী শ্মশানে গিয়ে আধপোড়া মানুষের মাংস, তার মাথার খুলির ঘিও খায়—সাধনপথে 'নিজ হতে পৃথক কিছুই নেই'—এই জ্ঞান লাভ করার জন্য। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) খুব ছোটবেলায় খাঁ পাড়ায় চলে যেত। সেখানে গরু কুরবানি দেওয়া হত। সেখানে মরা গরু খেতে কত শকুন আসত আর 'এ' দাঁড়িয়ে শকুনদের আচারব্যবহার লক্ষ্য করত। শকুন যত উপরেই উড়ুক না কেন তার চোখ থাকে ভাগাড়ের দিকে।

প্রসঙ্গ শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ঘটনাটি আবার বললেন—সেই ছেলেটি মহাষ্টমীর দিন সকালবেলা বন্ধুকে সাথে নিয়ে গাছে উঠেছিল শকুনের ডিম সংগ্রহ

করতে। গাছে উঠতে গিয়ে হঠাৎ পিছলে একেবারে মাটিতে পড়ে পায়ের হাড় তিন টুকরো হয়ে যায়। মহারাজ (নিত্যানন্দ মহারাজ) খবর পেয়ে ছেলেটিকে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। তারপর 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছে এসে পূজার দিনে এমন বিপত্তির জন্য খুব দুঃখ প্রকাশ করছিলেন। তাঁকে বলা হয়েছিল—চিন্তা কোর না. মায়ের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে। অবশ্য তা-ই হয়েছিল। ছেলেটির operation খুব ভাল ভাবে হয়ে গেল। অল্প কিছুদিনের মধ্যে আবার সে হাঁটতে পারল। সেই ছেলেটি পরে তার ভুল স্বীকার করেছিল এবং বইটিও দেখিয়েছিল। এই সব যোগের বই পড়ে তা অনুশীলন করলে কী ভাবে বিয়োগ হয় তারই একটু নিদর্শন এই ঘটনাটি।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—স্বানুভূতির বাণী হল, বোধের দর্শনে রূপ নেই আর রূপের দর্শনে বোধ নেই। তাই এখানে রূপের দর্শনের কথা নয়, বোধের দর্শনের কথাই বার বার বলা হয় 'Science of Oneness'-এর বিজ্ঞান-মাধ্যমে। 'Oneness of Knowledge and Knowledge of Oneness'-এ কেবল Knowledge-ই হল আদি-মধ্য-অন্তে একমাত্র সত্য। এই হল স্বানুভূতির বিষয়, অনুভূতি দিয়ে বিচার করলে হজম হবে না।

কত রকম লোকই না 'এর' সঙ্গে meet করে! একবার একটি ছেলে 'এর' সাথে দেখা করেছিল। তার গান শেখার খুব ইচ্ছা। সেও কোথাও শুনেছিল কোকিলের মাংস খেলে নাকি গলা ভাল হয়। এ কথা শুনে 'এ' তো অবাক। খুব ছোটবেলা থেকেই 'এর' কোকিলের সঙ্গে যোগ ছিল। কোকিল সম্পর্কে অনেক তথ্য 'এ' সংগ্রহ করেছিল, তবে এমন তথ্য কখনও শোনেনি। ছেলেটিকে গলা ভাল করার কতগুলি নির্দেশ দেওয়া হল, তার সঙ্গে এও বলা হয়েছিল যে, খুব ভোরবেলা উঠে আকাশের দিকে মুখ করে গলা সাধবে। অনেকেই তাকে ভয় দেখিয়েছিল যে, এতে life নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু 'এর' কথা মতো সাধনা করে সে পরবর্তীকালে বড় গায়ক হয়েছিল। পরে সে 'এর' সঙ্গে দেখাও করে গিয়েছে।

মন নিয়েই সংসারীর কারবার। এই মন ভাড়া দেওয়া আছে বৈচিত্র্যের মাঝে। তাই বহির্মুখী মনকে অন্তর্মুখী করাই হল সাধনা। তারজন্য একান্ত ভাবে গুরুর সাহায্য প্রয়োজন। গুরুর কাছে আছে জ্ঞানামৃত সমরসসার, কিন্তু শিষ্যের অন্তর গরলে ভরা। মনকে গরলশূন্য করা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না। তারা গুরুকেও গরল দিতে দ্বিধা করে না। এ রকম উদাহরণের অভাব নেই। একবার একজন প্রশ্ন করেছিল—বহির্মুখী মনকে কী করে অন্তর্মুখী করব? যতই জপ-তপ-ধ্যান করি মন তো অন্তর্মুখী হয় না। তাকে বলা হয়েছিল—তুমি যে প্রশ্ন করছ সেই প্রশ্ন 'একে' কয়েকজন সাধুও করেছিলেন। আরে! ময়লা হাতে কাপড় ইস্ত্রি করলে ধোয়াকাপড়ও ময়লা হয়ে যায়। যে মন দিয়ে সাধনা করছ সেই মনই ময়লা। আগে মনকে শুদ্ধ কর গুরুসঙ্গ কর। হিং টিং ছট মন্ত্র দিয়ে সাধু হওয়া যায় না। এমন সাধু কখনও গুরু হয় না। আবার সদ্‌গুরুর প্রতি পূর্ণ আস্থা থাকা চাই। "আমার হাত ধরে তুমি নিয়ে চল সখা, আমি

যে পথ চিনি না''—এই ভাব আর ক'জনের হয়! ফুটোপাত্রে জল ঢাললে তো সবই বেরিয়ে যাবে। পূজার উপচারে ভগবানকে বাঁধতে চাইছ। তাঁর কাছে সামান্য ভোগ সাজিয়ে তার বিনিময়ে অনেক কিছু চাইছ। এত লোভ! লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু। মন নিয়েই তো মানুষকে চলতে হয়। কুকর্ম করতেও মন, সুকর্ম করতেও মন। তাই বলা হয়েছে—''মনসৈবেদমাপ্তব্যং''। ঈশ্বর কোনও লব্ধ বস্তু বা পাওয়ার বস্তু নয়। ঈশ্বরের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যেতে হবে। অর্থাৎ তোমার খণ্ড মন অখণ্ডে মিশে যাবে।

এই জটাধারী, টিকিধারীদের সঙ্গে মেশাই ভার। এখানে আসল সাধু চেনাই দায়। সন্ন্যাসীরা মস্তক মুণ্ডন করেন অর্থাৎ তাঁরাও সংস্কারমুক্ত হয়ে যান। কাজেই তাঁরাও সাধক। কিন্তু তাঁরা তো সিদ্ধ নন। তাঁরাও সিদ্ধি, মুক্তি ও শান্তি চান। সাধারণ মানুষ তাঁদেরই সিদ্ধ সাধক মনে করে। কিন্তু যিনি সত্যিই সিদ্ধ বা মহাসিদ্ধ তাঁর আর কোনও চাওয়া থাকে না।

তাই স্বানুভূতির দৃষ্টিতে বিশেষ ভাবে বলা হয়েছে—কিছু না-জানাই সর্বোত্তম জানা, কিছু না-করাই সর্বোত্তম করা, কিছু না-পাওয়াই সর্বোত্তম পাওয়া, কিছু না-চাওয়াই সর্বোত্তম চাওয়া, কিছু না-হওয়াই সর্বোত্তম হওয়া।

অন্তরের গভীরে গিয়ে 'এ' এই জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছে, তা readymade পেয়ে তোমরা নষ্ট কোর না। এ সবই তোমাদের একান্ত আপন, not for any publicity, আপন অন্তরে একাকী স্মরণ-মনন করার জন্য। 'আপনাকে আপন করতে না-পারলে আপনতার বোধ জাগে না অন্তরে।' এই আপন বলতে নিজের স্বরূপকে নির্দেশ করা হয়েছে।

২২। ৬। ৯৪

সপ্তম অধ্যায়

৩৩৫

অর্থ দিয়ে পরমার্থকে পাওয়া যায় না। পরমার্থকে পেলে আর অর্থের প্রয়োজন থাকে না। অর্থ দিয়ে অর্থই পাওয়া যায়। বিষয়জ্ঞান দিয়ে আত্মজ্ঞান পাওয়া যাবে না। আবার আত্মজ্ঞান পেলে আর বিষয়জ্ঞান থাকেই না। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছে মতপথ, ধ্যান-জ্ঞান, সাধ্য-সাধন সবই হল নিত্য পূর্ণ অনন্ত এক স্বয়ং। এই এক-এর পরিচয় অদ্বয়বোধে প্রতিষ্ঠিত স্বানুভবসিদ্ধ পুরুষের সাহায্য ও কৃপা ব্যতীত দ্বিতীয় কারও মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়। বাবাঠাকুর বলে তোমরা যাঁকে জান তিনি বাবাঠাকুর নন, বাবাঠাকুরের ছায়ামাত্র। বাবাঠাকুর হলেন সেই স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ নিত্যপূর্ণ এক। তাই 'এ' যখন নিজের মধ্যে নিজে মিশে যায় তখন আর জগৎ থাকে না, থাকে শুধু নিত্য অদ্বয় এক। সেই এক থেকে কত শাখাপ্রশাখা বেরিয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তোমরা সেই শাখাপ্রশাখা নিয়ে মাতামাতি করছ, কিন্তু এক-কে ধরতে পারছ না। পাবে কী করে? চাবি কোথায় পাবে? চাবি তো আছে 'এর' কাছে। এতগুলি বছর ধরে কত কথাই তো শুনলে, কিন্তু সার কথাটুকু তোমাদের মাথায় আছে কি? নেই। কারও মাথায় জায়গা নেই। জন্ম-জন্মান্তর কামনাবাসনার যে পুঁজি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ভিতরে, সেখানে জায়গা কোথায় আত্মবাণী, গুরুবাণী ধরে রাখার? তবে এখানে এসেছ কেন? এসেছ কি 'এর' প্রয়োজনে? কখনওই না। 'এ' আপন খেয়ালে আপনিই চলেছে এতদিন, আজও চলছে—সেই কাঁকুলিয়া থেকে আজ অবধি (ফার্ন রোডের বাড়ি)। তোমরা এসেছ দলে দলে 'এর' কাছে। 'এর' প্রয়োজনে নয়, নিজেদের প্রয়োজনে। যাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে তারা সবাই সরে পড়েছে। এখনও যারা আছে তারাও চাবি পায়নি, কিন্তু ভাবের ঘরে চুরি করে চলেছে নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে। Cash নয়, বাবার cheque নিয়ে ব্যাঙ্কে নিজের নামে চালাতে গেলে যেমন ধরা পড়ে যায়, তেমনই ভাবের ঘরে চুরি করে, এখানকার কথা নিজের নামে চালাতে গেলেও ধরা পড়ে যাবে নিজেদেরই কাছে। নিজের আত্মশক্তি কখনওই ছেড়ে দেবে না। গুরুবাণী হল আত্মশক্তি, সে পূর্ণকে ছাড়া আর কারওকেই গ্রহণ করে না।

এই প্রসঙ্গে নৌকাবিলাস উপাখ্যানের তুলনা আনা যায়—বৃন্দাবনের গোপিনীরা ক্ষরস্রোতা যমুনার ওপারে তাদের দুধ, দই, ননী, মাঠার পসরা নিয়ে যায় তা বেচে পয়সা আনবার জন্য। একদিন তারা ঘাটে এসে দেখে একটিও নৌকা নেই। একটি নৌকাতে শুধু শ্রীকৃষ্ণ শুয়ে আছেন। গোপিনীরা তাঁকে অনুরোধ করল ঘাট পার করে দেবার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ বললেন—পার করতে পারি যদি ষোলো আনা পারের কড়ি

দাও। গোপিনীরা কিছুতেই রাজি হয় না। এক আনা, দুই আনা করে বারো আনা পর্যন্ত উঠল। শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু রাজি হলেন না। তারা শ্রীমতীর জন্য তেরো আনাও দিতে চাইল। কারণ তারা জানে শ্রীমতীর কত জ্বালা, দেরি হলে আরও জ্বালা সইতে হবে। শ্রীকৃষ্ণ নাছোড়বান্দা, ষোলো আনা ছাড়া তিনি পার করবেন না। অবশেষে শ্রীমতীই একমাত্র সমস্ত পুঁজি দিতে রাজি হলেন। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র শ্রীমতীকেই পার করতে রাজি হলেন। এদিকে শ্রীমতী আবার সখীদের ছাড়া পার হবেন না। শ্রীকৃষ্ণ কী আর করবেন! এই নিয়ে নৌকাবিলাস পালা।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ঈশ্বর ষোলো আনা দক্ষিণা পেলে তবেই সংসার পার করবেন। ভক্তির ষোলো আনা হল আত্মদান, জ্ঞানের ষোলো আনা হল আত্মজ্ঞান। গুরু হলেন আত্মা স্বয়ং।

কত difficult subject কত সহজ করে, জলের মতো করে তোমাদের দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেসব গেল কোথায়? বাহাদুরি তো কম করনি, যেখানে ছিলে সেখানেই পড়ে আছ। একচুলও এগোওনি বরং পিছিয়ে রয়েছ। মানুষের পরিচয় মনুষ্যত্ব দিয়ে, পশুত্ব দিয়ে নয়। উপকার পেয়ে উপকারীর উপকার স্বীকার না-করা হল পশুত্ব। তা-ই হল অকৃতজ্ঞতার লক্ষণ। উপকারীর উপকার স্বীকার করা হল মনুষ্যত্ব, উপকার না-পেয়েও উপকার স্বীকার করা হল দেবত্ব। দেবতাকে বাদ দিয়েও সংসারে চলা যায়, কিন্তু আত্মাকে বাদ দিয়ে নয়। আত্মা কিন্তু দেবতার পূজা করে না। এই আত্মজ্ঞান লাভের জন্য বা আত্মাকে জানার জন্য দেবতার পূজা করার দরকার হয় না।

১৮। ১। ৯৫

৩৩৬

আত্মার মহিমা একমাত্র আত্মজ্ঞানী ছাড়া আর কেউ গাইতে পারে না। তোমরা সারাদিন স্বপ্নের জাল তৈরি কর। স্বস্বরূপে ফিরে যাবার কথা ভাব না। একমাত্র ব্রহ্ম-আত্মার কথাই তোমাদের তাঁর কাছে যেতে সাহায্য করবে। ব্রহ্ম-আত্মার কথার তুলনায় ঈশ্বরের কথাও নগণ্য। এক-এর জায়গায় দুই বসালেই ভুল করবে। সেই জন্য বলা হয়—

কোথায় এক কোথায় বহু খুঁজে নাহি পাই
আপনানন্দে আপনার মাঝে সদা ঘুরে বেড়াই।।
নাহি মোর আপন-পর নাহি ভেদাভেদ জীব ঈশ্বর
অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দসাগর আদি অন্ত নাই।।

ওষুধ খেলে অসুখ সারে। কিন্তু ওষুধ খাওয়ার সময় যদি তা মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তবে কি অসুখ সারবে? সেই রকম এখানকার কথা শুধু শুনলে হবে না, তা অন্তরে ধরে রাখতে হবে, আচরণে ব্যবহার করতে হবে, তা না-হলে কিছুই হবে না। তোমাদের petty pleasure-এর কথা মনে রাখতে পার, অথচ এ সব আত্মতত্ত্বের কথা তোমাদের মনে থাকে না। আসলে যারা কার্য-কারণ, বস্তু-ব্যক্তির সঙ্গে যুক্ত তাদের সত্যের কথা, আত্মার কথা শুনতে ভাল লাগে না। তারা তা শোনেও না।

আত্মার কথা একবার যদি মনে দাগ কেটে যায় তাহলে তা মনকে নাড়া দেয়। তাতেই সব কাজ হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে তোমাদের লালাবাবুর সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন। লালাবাবু এক বিশাল জমিদার ছিলেন। একদিন তিনি গ্রামের পাশে ধোপাখানার কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ তাঁর কানে এল একটি ধোপার কন্যা তার পিতাকে বলছে—''বেলা যায়, বাসনায় আগুন দিলে না এখনও।'' বাসনা হল ধোপাদের ভাটি দেবার উনুন। কিন্তু কথাটি লালাবাবুর কানে অন্য সুরে বাজল। তাঁর হঠাৎ মনে হল, সত্যিই তো বেলা চলে যাচ্ছে, আমি তো এখনও আমার কামনাবাসনায় আগুন দিলাম না! আর কতদিন এমন ভোগবাসনায় লিপ্ত হয়ে জীবন কাটাব! সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল্কি থেকে নেমে পাল্কিবাহকদের বাড়ি ফিরে যেতে বলে নিজে উল্টো পথে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে তিনি বৃন্দাবনে এসে পৌঁছোলেন। সেখানে অতি কঠোর জীবনযাপন করতে লাগলেন। তিনি মাধুকরী করে খেতেন। পরপর তিন বাড়িতে ভিক্ষা না-জুটলে সেদিন আর কিছুই খেতেন না। ক্রমে তিনি মাধুকরী করাও ছেড়ে দিলেন। অনাহারে তাঁর দেহ ও মন কাতর হয়ে পড়ে। ইষ্টদর্শন পাবার জন্য দেহ তো রাখতেই হবে। সেইজন্য বৃন্দাবনের পথে যত ঘোড়ার নাদি পড়ে থাকত তাব মধ্যে থেকে তিনি হজম না-হওয়া ছোলা বেছে ধুয়ে শুকিয়ে তা-ই খেতেন। এমনই কঠোর ছিল তাঁর সাধনা।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সাধনায় এই ধরনের কঠোরতা দেখা গিয়েছিল শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর মধ্যেও। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর থেকে প্রতিদিন একটিমাত্র চালের ভাত খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে সাধনা করেছিলেন। এ সব খবর আর ক'জন রাখে!

প্রসঙ্গ শেষ করে তিনি গল্পের শেষাংশটি বললেন—সেই লালাবাবু যত সম্পত্তির মালিক ছিলেন তা তাঁর ছেলেরা পেয়েছিল ঠিকই, তবে তিনি deed করে রেখেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পর ছেলেরা এসে তাঁর হাত-পা একত্রে বেঁধে মরা গরুর মতো বৃন্দাবনের প্রতিটি রাস্তা দিয়ে যেন টেনে নিয়ে যায়, তবেই তারা সম্পত্তি পাবে। তা-ই শেষ পর্যন্ত করা হয়েছিল।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—তোমাদের একটু শরীর খারাপ হলে বা কেউ যদি বলে রোগা হয়ে গিয়েছিস, তাহলে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের দেহখানা দেখে কষ্ট পাও আর খাওয়ার menu ও পরিমাণ বাড়িয়ে make-up দাও।

২৬। ৪। ৯৫

৩৩৭

কোনও কোনও ব্যাপারকে বা ঘটনাকে প্রবাদ বলে বর্ণনা করা হয়।

কপিলমুনি, যিনি ছিলেন আসল সাংখ্যকার, তিনি ঈশ্বরের অবতার ছিলেন। তাঁর মা ছিলেন দেবাহুতি। তিনি দেখেন তাঁর পুত্র সারাদিন জ্ঞানবিচার করে কাটায় আবার তাঁর কাছে যারা আসে তাদেরও জ্ঞানবিচারের শিক্ষা দেন। একদিন দেবাহুতি তাঁর

পুত্রকে বললেন—হ্যাঁ রে, তুই তো সবাইকে জ্ঞান দিস, তা তোর এই মূর্খ মাকে একটু জ্ঞান দিবি না? কপিলমুনি উত্তরে বললেন—তুমি একটা যুক্তিপূর্ণ কথা বলেছ বটে, তবে সে-ই কপিলের মা হতে পারে যাঁর আর জ্ঞানের দরকার হয় না। কারণ তিনি অবিদ্যা হতেই পারেন না, তাঁর অজ্ঞান থাকতেই পারে না। তা না-হলে কপিল তোমার মধ্যে এল কী করে?

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রশ্ন হয় অজ্ঞানে, উত্তর হয় জ্ঞানে। তোমরা অজ্ঞান পোষণের জন্য কত প্রযত্ন কর। তার জন্য তোমাদের অজ্ঞানজনিত কর্মের ফলভোগ করতেই হবে, দুর্ভোগ ভোগ করতেই হবে। অবশ্য তাতে জ্ঞানের কিছু এসে যায় না। অজ্ঞানের অধিষ্ঠান হল জ্ঞানস্বরূপ স্বয়ং। জ্ঞানস্বরূপই হল আমি বা ভূমা আমি। আমি অজ্ঞানের প্রকাশক। অজ্ঞান হল জ্ঞানেরই ছায়া। 'আমারভাব' হল অজ্ঞান। 'আমারযুক্ত আমি' হল মলিনসত্ত্ব জীব। আর 'আমারশূন্য আমি' হল শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আমি বা শিব। মলিন দৃঢ় অভ্যাসকে অর্থাৎ 'আমারভাবকে' নূতন অভ্যাস দিয়েই তাড়াতে হবে। নূতন অভ্যাসের কথা একমাত্র অনুভবসিদ্ধের কাছেই পাওয়া যায়। সংসারী সংসারের অভ্যাস দিয়ে সংসারযাত্রা নির্বাহ করতে পারে, কিন্তু সমসারে কোনও দিন পৌঁছোতে পারবে না। কারণ সমসারে পৌঁছোতে হলে 'আমারভাব' একেবারে ছাড়তে হবে। কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-জ্ঞাতৃত্বরহিত হয়ে সংসারে চললে অর্থাৎ অহংকার-অভিমান, রাগ, দ্বেষ, হিংসা পরিহার করে চললে তবেই গুরুকৃপা লাভ করা যায়। আত্মাই হল গুরু। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) তাই আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও দেবদেবীর প্রয়োজন নেই। 'এ' হল মূর্খ number 1। 'এ' কারওকে কিছু দিতেও আসেনি, কিছু পেতেও আসেনি। 'এর' পাবারও কিছু নেই, তাই হারাবারও কিছু নেই। 'এ' আছে আপনাতে বিভোর হয়ে। তাই গানে বলা হয়েছে—

কোথায় এক কোথায় বহু খুঁজে নাহি পাই
আপনানন্দে আপনার মাঝে সদা ঘুরে বেড়াই।।
নাহি মোর ভেদাভেদ নাহি মোর আপন-পর
নাহি মোর জীব ঈশ্বর।
কোথা আমি কোথা তুমি মনের বিকার মাত্র
কোথা আমি-আমার তুমি-তোমার
কল্পনা মনের দিবারাত্র।।
নাহি মোর দেহ মন নাহি বুদ্ধিবিজ্ঞান
বোধে বোধময় স্বরূপ নিশ্চয় সর্বাতীত অতি বিস্ময়
সত্যস্বরূপ অদ্বয় আমিতে দ্বৈত কিছু নাই।।

অদ্বয় আমি-র মধ্যে দ্বৈত কিছু নেই; এক আমি-ই আছে। এই অনুভূতি কেড়ে নেবে কে? তোমরা তো 'আমারবোধ' দিয়ে সংসারের খুঁটিতে বাঁধা। এই সংসারচক্র বা ভবচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে চাই গুরুর প্রতি আনুগত্য। আধিপত্য পাবার বাসনা, প্রতিষ্ঠা, নাম-যশের ইচ্ছা থাকলে হবে না। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে অখণ্ড

একবোধে সচেতন ভাবে 'মেনে, মানিয়ে চলা'-র বিজ্ঞান। এটাই first lesson, আবার এটাই হল last lesson। কিন্তু তোমরা নিতে পারছ না। তোমাদের অবস্থা কী রকম জান—বাজারে গিয়ে ঘুরে ঘুরে অনেক কিছু কিনতে গিয়ে বাড়ি এসে দেখ থলে খালি—ঠিক এমনই অবস্থা। প্রতি বুধবার এখানে (ফার্ন রোডের বাড়িতে) আস, ভাব অনেক কিছু ভরে নিয়ে যাবে এখান থেকে। কিন্তু বাড়ি গিয়ে দেখ তোমাদের ভাণ্ডার শূন্য, কিছুই আনতে পারনি।

ফাঁকি দিলে নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়বে, অন্য কেউ তোমার ফাঁকি ধরতে পারবে না। কারণ এই আমি-র কোনও duplicate ও assistant নেই, কোনও second entity নেই। এই আমি হল নির্বিকার নিরাকার নিরবলম্ব অসঙ্গ 'পরমে পরম, আপনে আপন, স্বয়ং-এ স্বয়ং'। এই অখণ্ড এক-কে না-মেনে, গুরুদক্ষিণা না-দিয়ে তোমরা তো কোনও দিনই পার পাবে না। তাহলে তো নিয়তির কাছে তোমাদের বিচার হবেই এবং তার ফলও তোমাদেরই ভোগ করতে হবে। নিজেদের অপরাধ, দোষত্রুটি স্বীকার করলে নিয়তি হয়ত chance দিতেও পারে, অন্যথা কোনও উপায় নেই। যেমন ধর, কোনও এক রোগীর কঠিন ব্যাধি সারাতে ডাক্তার একের পর এক ওষুধ দিয়েই যাচ্ছেন, কিন্তু কোনওটিই কোনও কাজে লাগছে না। তবুও তিনি ওষুধ দিয়েই চলেছেন যদি by chance কোনওটা লেগে যায়। আর একবার যদি কোনও ওষুধ লেগে যায় তখন অতি সাবধানে তিনি সেই ওষুধ প্রয়োগ করেন। অনেক কঠোরতা অবলম্বন করতে হয় তাকে। অধ্যাত্মপথের সাধক অর্থাৎ যিনি সংসারব্যাধি থেকে মুক্ত হতে চাইছেন, তাঁকে 'আমারবোধ' ছাড়তেই হবে। এই 'আমারবোধ' ছাড়া খুবই কঠিন। তাই প্রযত্ন করতেই হবে, কারণ তা ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

৩১। ৫। ৯৫

৩৩৮

কথা দিয়ে কথা রচনা করে যারা, তারা তো ভাবের ঘরে চুরি করে। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কথা ধার করে তার সঙ্গে নিজের কথা মিলিয়ে যারা বলে, তারা তো 'এর' মতো হতে পারবে না। কারণ 'এর' তপস্যা তো তাদের তপস্যা নয়। তপস্যার শক্তি বিনা এসব আসে না। কাজেই তাদের আচরণে সেটা প্রকাশ পায় না। আর তারা তো তাই সবরকম প্রশ্নের উত্তরও দিতে পারবে না। তখনই তারা ধরা পড়ে।

এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি সত্য ঘটনা বলি, তোমরা মন দিয়ে শোন—একজন জ্ঞানী সাধক তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা একটি diary-তে note করে রাখতেন। তাঁর কাছে যারা আসত মাঝে মাঝে তাদের তিনি সেগুলি পড়ে শোনাতেন। তাদেরই মধ্যে একজন আনুগত্য দেখিয়ে সাধকের কাছ থেকে একদিন সেই diary-টা চুরি করে নিয়ে গেল। জ্ঞানী সাধক সব বুঝলেন, কিন্তু কারওকে এই বিষয়ে কিছু বললেন না। বেশ কিছুদিন যাবার পর সেই লোকটি diary-র লেখা সামান্য অদলবদল করে

নিজের নামে ছাপিয়ে দিল। লেখা পড়ে তো বিদ্বৎসমাজের সবাই খুব খুশি। তার অপূর্ব লেখার জন্য সভা ডেকে মালা দিয়ে তাকে সম্মানিত করা হল। সেখানে কয়েকজন তাকে তার লেখার উপর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করলে তিনি যথাযথ উত্তর দিতে পারল না। সেই সভায় জ্ঞানী সাধকের কয়েকজন ভক্তও উপস্থিত ছিল। তারা সব দেখে আসল ঘটনাটি বুঝল। তারা জ্ঞানীকে এসে সব বলল। সব শুনে জ্ঞানী শুধু হাসলেন। অন্য ভক্তরা কিন্তু ছাড়ল না। তারা court-এ সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে case করল। চুরির দায়ে লোকটির devaluation charge হল পাঁচ লক্ষ টাকা। তখন সেই লোকটি জ্ঞানীর পায়ে এসে কেঁদে পড়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল।

ঘটনাটি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই ধরনের ব্যাপার এখানেও হয়েছে। যারা চুরি করে তাদের জ্ঞান তো পূর্ণ নয়, তাই আগে-পরে প্রশ্ন করলে উত্তর দিতে পারে না। অবশ্য সমাধিস্থ না-হয়েই অন্যের সমাধিলব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করলে প্রকৃতি ছেড়ে দেবে না। 'যথাবৎ কর্মপ্রবৃত্তি তথাবৎ ভোগসৃষ্টি।'

বোধ দিয়েই হয় মনের চিন্তা ও কর্ম, ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তা এবং বুদ্ধির কার্যকারিতা। বোধের জ্যোতিতেই মন ও বুদ্ধি জ্যোতিষ্মান। তবে মনের বোধ হল reflected light। মন হল তমোগুণাত্মক। বুদ্ধি সত্ত্বগুণী হলেও সংসারীরা বিষয় বিষে তাকে করে ফেলে তামসিক। অহংকার হল রাজসিক। তপস্যার মাধ্যমে এই তামসিক মন-বুদ্ধিকে রাজসিক করে তারপরে তাকে সাত্ত্বিক করতে হয়। বিনা তপস্যায় স্বভাবের দিব্য রূপান্তর হয় না। নিষ্ঠা ও গুরুর প্রতি আনুগত্য ব্যতীত তপস্যাও ফলপ্রদ হয় না। গুরুসেবায় গুরু তুষ্ট হলে গুরুকৃপায় শিষ্যের যোগ্যতার মান বাড়ে। যোগ্যতার উৎকর্ষের ফলে কৃতজ্ঞতাবোধ জাগে। তার ফলে অনুগত শিষ্য নিষ্ঠা ও আনুগত্যের ফলে গুরুকৃপা লাভ করে। গুরুকৃপা ব্যতীত মনকে শুদ্ধসাত্ত্বিক করা যায় না।

মন-বুদ্ধি আত্মার জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান হলেও তা কিন্তু আত্মাকে জানে না। যদিও মন-বুদ্ধির আত্মাকেই সেবা করা উচিত, কিন্তু তারা তা না-করে অনাত্মার সেবা করে। কলি যুগে মানুষ শুধু অনাত্মারই সেবা করে, জ্ঞানের সেবা করে না বলে এ যুগে জ্ঞানী তৈরি হয় না। যদি বা এক-আধজন আসেন, মানুষ তাঁদের পাগল বলে প্রচার করে, তাঁদের থেকে দূরে থাকে। সংসারে যারা কায়দা করে চলে তারাই সংখ্যায় বেশি। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় অর্থলোলুপ লোকেরা। এরাই হল অবিদ্যার মূর্তি এবং স্ত্রীসঙ্গলোলুপ। বর্তমানে বিদ্যার সংসার একেবারেই নেই। সবটাই অবিদ্যার সংসার। তাই সংসারে স্বার্থের বশে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে পরস্পরের মধ্যে, পরিণামে প্রকাশ পায় ঝগড়াঝাটি, মারামারি, বিবাদ, বিসংবাদ। Make up দিতে চাইলেও make up দেওয়া যায় না। কারণ এ সব এদের মধ্যে cancer-এর মতো ছড়িয়ে গিয়েছে। ভিতরে ভিতরে যা ক্ষয় হবার তা তো হয়েই চলেছে—উপরে এসে বাইরেও ছড়াচ্ছে। নিজের বিচার, নিজের শাসন, নিজের কাছেই হওয়া উচিত। ঈশ্বর তো প্রত্যেকের মধ্যেই আছেন, তবু তাঁকে না-জেনে বাইরে সবাই কল্পনা করে অজ্ঞানের প্রভাবে। আবার ঈশ্বরই যে সব কিছুর মালিক, এটা এদের মন মানতে

পাবে না। নিজে মালিক হয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে চেয়ে নেয় ভোগের বস্তু। সকলের মঙ্গলের জন্য যে sincerity ও honesty প্রয়োজন, তা তাদের নেই—আছে শুধু ভান, আসল কিছু নেই।

৭। ৬। ৯৫

৩৩৯

সংসারে মানুষ শুদ্ধজ্ঞানের আশ্রয় নেয় না। মিশ্রজ্ঞানের আশ্রয় নেয়, মতলবি ভক্তির আশ্রয় নেয়। প্রতিনিয়ত অজ্ঞানের সাথে মোকাবিলা করতে হয় বলে অজ্ঞানকে এড়িয়েও থাকতে পারে না। মিশ্রজ্ঞান দ্বারা মুক্তি, ঈশ্বরদর্শন, আত্মদর্শন হয় না। যে জ্ঞানের অভাবে দেহ, দেহাত্মবুদ্ধি ও পরিদৃশ্যমান বিকারী জগৎকে সত্য মানা হয় তা-ই মিশ্রজ্ঞান। শুদ্ধজ্ঞানদৃষ্টি যাঁর খুলেছে, তাঁর কথায় সেই জ্ঞানের কথাই পাওয়া যায়—তা সাধারণ মতবাদের সাধকের সঙ্গে মেলে না বলেই তাঁরা কষ্ট পায়, আহত হয়। তাই সত্যজ্ঞানীর পক্ষে অজ্ঞানীর সঙ্গে সহবাস সম্ভব নয়। জ্ঞানীর বিবেকবিচার সদাজাগ্রত থাকে বলে কোনও রকম দ্বৈতবিকারের সাথে তাঁর যোগাযোগ থাকা কখনওই সম্ভব নয়। মিশ্রজ্ঞানের অধিকারীরা এ সব বোঝে না। অজ্ঞানের প্রতি মোহ, যা আপন নয় তাকে আপন ভাবা ও কল্পিত কল্পনা—এই তিনটি নিয়েই হয় সংসার। জ্ঞানীর কাছে জ্ঞানও নেই, অজ্ঞানও নেই, আছে শুধু এক আমি। এগুলি কোনও intellectual conviction নয়। Intellectual conviction হল অজ্ঞানজাত মন-বুদ্ধির খেলা। মন-বুদ্ধি কিন্তু তার অধিষ্ঠান কূটস্থকে জানতে পারে না। যদিও কূটস্থ আত্মার জ্যোতিতেই তারা সক্রিয়। মন অ-মন হলে, বুদ্ধি গলে গেলে বোধস্বরূপ কূটস্থ আত্মা স্বয়ং প্রকাশিত হয়।

মানুষের মিশ্রজ্ঞানই যত দুঃখ ও অশান্তির কারণ। শুদ্ধজ্ঞানে কোনও দুঃখ, অশান্তি নেই। কারণ সেখানে দুই নেই—বিরোধ, দ্বন্দ্ব আসবে কোথা থেকে? অজ্ঞানই মানুষকে করে অভিমানী। অজ্ঞানই মানুষকে কোথা থেকে কোথায় টেনে আনে। নামিয়ে আনাই হল অজ্ঞানের খেলা আর পুঁথিগতবিদ্যা বা book knowledge-ই হল অজ্ঞানের লক্ষণ। অপরপক্ষে জ্ঞান হল স্বতন্ত্র সম্বিৎস্বরূপ—যার কোনও প্রতিবন্ধ, প্রতিপক্ষ ও বিকার নেই। এই সম্বিৎস্বরূপ হল কূটস্থচৈতন্য—যা প্রত্যেক মানুষেরই হৃদয়গুহায় বর্তমান। তার অস্তিত্ব অন্য কোনও কিছু দিয়ে জানা যাবে না। শুদ্ধবোধের সঙ্গে যাঁর একাত্মতা সিদ্ধ হয়েছে তিনিই শুদ্ধ জ্ঞানী। তিনিই একমাত্র পারেন শুদ্ধবোধের কথা বলতে। আর মুমুক্ষু সাধক, যাঁর চিত্ত শুদ্ধবোধকে জানবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে, তিনিই একমাত্র শুদ্ধ জ্ঞানীর সঙ্গ করে তাঁর কৃপাতে শুদ্ধবোধের অধিকারী হতে পারেন।

বেশির ভাগ মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব হয় না। মানুষের পুঁথিগত বিদ্যা বা conventional শিক্ষার অভিমান-অহংকার তার কারণ। তার সঙ্গে জুড়ে আছে 'আমি আমার বোধ'। এগুলি সরে গেলেই অদ্বয় জ্ঞান স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রকাশ পায়। তাকেই বলা হয়েছে স্বসংবেদ্য স্বানুভবদেব।

জ্ঞানের জন্য চাই বিবেক। বিবেক জাগ্রত হয় বিচারের মাধ্যমে। আবার বিবেক জাগ্রত হলে বৈরাগ্য জাগবেই। জ্ঞানের পথে তাই বিচার হল প্রথম সোপান। আত্মা-অনাত্মা বিচার দ্বারা যা-কিছু বিকারী, পরিণামী ও অনিত্য বস্তু আছে, তা অনাত্মাজ্ঞানে ত্যাগ করে, যা একমাত্র নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত অপরিণামী অবিকারী, তাকেই পরমসত্য জ্ঞানে আশ্রয় কর। দৃশ্য বস্তু মাত্রই অনাত্মা, অজ্ঞান। জ্ঞান কখনও দৃশ্য বস্তু হতে পারে না। দৃশ্য বস্তু হল বৈচিত্র্যময়, কিন্তু আমিকে বা আত্মাকে কখনও ভাগ করা যায় না, আত্মা কখনও বহু হয় না। এটাই হল 'Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge'। তাঁকে কখনওই বিকৃত করা যাবে না।

অজ্ঞানী নিজেকে জ্ঞানী ভাবে। সাধারণ মন সব সময় অবিদ্যা-অজ্ঞানের সেবা করে, কিন্তু যে মন বোধের সেবা করে সেই মন হল অ-মন। মন অ-মন হলেই শুদ্ধবোধস্বরূপের সঙ্গে একীভূত হয়। কিন্তু তোমাদের মন সবসময় ছুটছে ব্যক্তি-বস্তুর পিছনে, ভোগের সন্ধানে। তাই পুরুষ ছুটছে নারীর পিছনে, নারী ছুটছে পুরুষের পিছনে। কিন্তু কিসের আকর্ষণে? প্রত্যেকটি দেহ তো অস্থি, মজ্জা, মাংস, স্নায়ু ও হাড়ের সমষ্টি—এ ছাড়া তার মধ্যে এমন কী আছে যার ফলে একে অপরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণ ব্যাপারটাই মনের। যাঁর বিচার আছে তাঁর বিবেক জাগ্রত, তাঁর কোনও বস্তুর প্রতিই আকর্ষণ থাকে না। একমাত্র যা সত্য নিত্য তা-ই কাম্য।

জ্ঞানী, অজ্ঞানী উভয়ই গৃহে বাস করে। অজ্ঞানীর গৃহ হল বিষয়-আশয় ও দেহবুদ্ধি, অর্থ প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির হিসাবক্ষেত্র। আর জ্ঞানীর গৃহ হল বিশ্বাশ্রম। সেখানে প্রাপ্ত-অপ্রাপ্ত, কর্তব্য-অকর্তব্য কিছুই নেই। জ্ঞানী নিত্যতৃপ্ত সদা সর্বসমবোধে বাস করেন। আর যারা গৃহত্যাগ করে আশ্রম তৈরি করে, তারা তো একটি ছোট গৃহকোণ ছেড়ে বড় গৃহ তৈরি করে সেখানে আরও অনেকের সঙ্গে বাস করে। সেখানেও আছে দ্বন্দ্ব-বিরোধ, স্বার্থ এবং অশান্তি। কিন্তু এই বিশ্বই যার কাছে আশ্রম তার আর দ্বিতীয় আশ্রম করার কী প্রয়োজন?

অজ্ঞানী সংসারে বাস করে, সামান্য সুযোগে তারা কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্যকে জাগিয়ে তোলে এবং এই সব রিপুর বশবর্তী হয়ে চলে। কিন্তু যাঁর বিবেক জাগ্রত হয় সে আর সংসারে থাকে না, সংসার তাঁর ছুটে গিয়ে হয় সমসার। তখন তাঁর কাছে ব্যক্তি-বস্তুর আর পৃথক অস্তিত্ব থাকে না। এই প্রসঙ্গে তোমাদের এক জ্ঞানী সাধকের গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

জ্ঞানী সাধক প্রতিদিন ধ্যানে বসে একাগ্র হলেই তাঁর পূর্বজন্মের সুন্দরী স্ত্রীর মুখটি ভেসে উঠত। সাধক বিব্রত বোধ করতেন এবং তাঁব ধ্যানও সিদ্ধ হত না। তিনি দৃশ্যশূন্য অনামী জ্ঞানের সন্ধান কিছুতেই পেতেন না। ব্যতিব্যস্ত হয়ে সাধক এ সবের সমাধানের আশায় অনেকেরই কাছে যেতেন, কিন্তু কেউই বিশেষ কোনও আশার কথা বলত না। অবশেষে সেই সাধকের সঙ্গে এক তত্ত্বজ্ঞের দেখা হয়। সেই তত্ত্বজ্ঞের কাছে সাধক তাঁর অসুবিধার কথা জানায়। সাধক তাঁকে বলেন—ঈশ্বরের জন্য সংসার ছেড়েছি ঠিকই, কিন্তু সংসার আমাকে ছাড়েনি। সব শুনে সেই তত্ত্বজ্ঞ তাঁকে

ব্রহ্মবিচারের দৃষ্টিতে তত্ত্বভাবনার বিজ্ঞান দিলেন। এই ভাবে বিচার করতে করতে সেই স্ত্রীমূর্তি ধীরে ধীরে আবছা হতে হতে আত্মভাবের মধ্যে মিশে গেল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—এ সব কোনও কথার কথা নয়। যাঁর বোধনয়ন খুলে গিয়েছে তিনি বোধের দৃষ্টিতে বোধ ছাড়া আর কিছুই দেখেন না। এ সব intellect-এর কোনও ব্যাপারই নয়। তোমরা তো visual panorama-র মধ্যে আটকে আছ। আর যিনি কোনও ব্যক্তি-বস্তু কিছুই দেখেন না, শুধু জ্ঞানকেই দেখেন—তাঁর কথাও তোমাদের মনে ধরে না। তাঁর কোনও কথাই মান না, কিন্তু অনুযোগ কর—কিছুই তো হল না, এত তো শুনলাম! জ্ঞানীর কাছে নারীর কোনও রূপই নেই অথবা একটি সুন্দরী নারী ও একটি কুৎসিত নারীর মধ্যে কোনও ভেদই নেই। একই মাটি দিয়ে তৈরি হয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, মা দুর্গা, অসুর ও সিংহাদি—কুম্ভকার জানে এগুলি সবই মাটিমাত্র, কিন্তু সংসারীরা ঘরে মূর্তি এনে তাঁদের আলাদা আলাদা করে পূজা করে অন্তরের কামনাবাসনা পূরণের আশায়।

আসলে সংসারদশার কারণই মানুষ জানে না। মানুষ সংসারে বাস করে দুঃখকষ্ট, জরাব্যাধি ও মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করে। যদিও তত্ত্বজ্ঞের কাছে গেলে এ সব থেকে উদ্ধারের পথ পায়, কিন্তু অজ্ঞানের এমনই মোহ বা আকর্ষণ যে, এই অজ্ঞান থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে না এবং মুক্তও হতে চায় না। অজ্ঞানে থেকেই তৈরি করে relation—স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, ছেলে-মেয়ে, মা-বাবা ইত্যাদি। কিন্তু জানে না এই relation, এই রূপ—এ সবই মনের কল্পনা। এমনকী শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের এই রূপও (নিজেকে নির্দেশ করে) কল্পনা, তা 'এর' কাছে ছায়ামাত্র। তবু তোমরা দেহকেই প্রশ্রয় দিয়ে চল। তাহলে গাঢ় ঘুমে bodyless হয়ে থাক কী করে? কোথায় যায় তোমার দেহ ও দেহাত্মবুদ্ধি। এই হল মূল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের অধিষ্ঠান হল কূটস্থ আত্মা। এই আত্মা বা সাক্ষিদ্রষ্টা আছে বলেই জানতে পার তোমার গাঢ় ঘুমের state-কে। এই কূটস্থ সাক্ষী আত্মাই হল তোমার স্বরূপ, তাঁকে না-জেনে তোমরা তোমাদের দেহকে নিয়েই মেতে আছ। দেহাদি সুখভোগে বৈরাগ্য ও বিচার আসে না, বিবেক জাগে না। কাজেই শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপের সাক্ষাৎ মেলে না। শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপই হল তোমার স্বরূপ। শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপের জ্যোতিরই প্রতিফলন হয় তোমার অন্তরে। অন্তঃকরণ কিন্তু জড়। চিৎস্বরূপের জ্যোতিতে আভাসিত বলে অন্তঃকরণ হল চিদাভাস। আর এই চিদাভাসের reflection হল জগৎ। জগৎ হল reflection-এর reflection। অর্থাৎ মন-বুদ্ধিরূপ reflection-এর reflection। Reflection-কে ধরে Real-কে পাওয়া যায় না। Reflection Real-এর মুখোমুখি হলে তা Real-এর সঙ্গে মিশে যায়, যেমন আয়নায় সূর্যের যে reflection তাকে সূর্যের মুখোমুখি করলে reflection আর থাকে না, সূর্যের সঙ্গে মিশে যায়। আবার সূর্যকে দেখতে লাগে চোখ। চোখের আলো কিন্তু সূর্যের আলো নয়। বস্তুকে দেখতে লাগে চোখের আলো ও চোখ। আবার চোখকে দেখার জন্য দরকার চিদাভাসের।

বিবেক জাগলে কী হয় তা একমাত্র যাঁর বিবেক জেগেছে তিনিই বলতে পারেন। বিবেক সমস্ত রকম ভোগের উপকরণ থেকে মনকে সরিয়ে অন্তরে একাগ্র ও শান্ত করে। তোমরা তো cinema-র মধ্যে নারী-পুরুষ দেখেও তাতে লিপ্ত হয়ে যাও। যে কামী সে লিপ্ত হয়, আর যিনি জ্ঞানী তিনি নির্বীজ। তিনি নির্লিপ্ত ভাবে সব দেখেন। অবিবেকী ছায়া দেখেও ভয় পায়। তাই তো অজ্ঞানী দড়িকে সাপ মনে করে ভয় পায়, শুক্তিতে রজতের লোভ করে, জলভ্রমে মরীচিকার পিছনে ছুটে তার মৃত্যু হয়। মানুষ জ্ঞানকে জীবনে ব্যবহার না করে ব্যবহার করে কর্ম। জ্ঞানে কোনও কর্ম নেই। কর্ম থেকেই আসে কর্তৃত্বাভিমান। মানুষের এই অভিমানকে নাশ করার জন্য, অহংকারকে চূর্ণ করার জন্য চাই অন্তরের ব্যাকুলতা। সেই ব্যাকুলতা তীব্র হওয়া চাই। জলে ডুবন্ত মানুষের বাঁচবার যে আকুলতা, অর্থাৎ মৃত্যু থেকে রেহাই পাবার যে আকুলতা, সেই রকম ব্যাকুলতা যখন জাগবে আত্মজ্ঞান লাভের জন্য, তখনই পাবে সদ্‌গুরুর কৃপা, আত্মগুরুর কৃপা।

১৪। ৬। ৯৫

৩৪০

পরমবোধির ঘরই হল তোমাদের স্বঘর। সেই স্বঘর হল silence। All perfection must pertain to silence। অদ্বৈতজ্ঞানের প্রকাশ হল spontaneous, কিন্তু দ্বৈতজ্ঞানের প্রকাশ হল conditional। তবে মন-বুদ্ধি কেন্দ্রে স্থিত হলেই অদ্বৈতজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু মন-বুদ্ধিকে কেন্দ্রে নেওয়াই কঠিন। মন-বুদ্ধির বহির্মুখী প্রবৃত্তিই বেশি। বহির্জগতের রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ তাদের টানে। অতএব মনের অন্তর্মুখী হবার অন্তরায় হল পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের জ্ঞেয় বস্তু। যদি কেউ সদ্‌গুরুর শরণাগত হয় তবে তিনি তাঁর আশ্রিতের ঘুম, আহার, অভিমান-অহংকার ধীরে ধীরে কেড়ে নেন এবং তমোগুণকে রজোগুণ দিয়ে সরিয়ে আবার সত্ত্বগুণ দিয়ে রজোগুণকেও সরিয়ে দেন। তারপর শুদ্ধসত্ত্বগুণের সাহায্যে সত্ত্বগুণকে সরিয়ে তাকে শুদ্ধসত্ত্ব বোধস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

মনের বিকারের পরিণামই হল এই জগৎ। এই জগৎ হল কল্পনা। কারণ মন ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হলেই হয় দৃশ্য। আর মন যখন বহির্মুখী প্রবণতা ছেড়ে অন্তর্মুখী হয় তখন আর দৃশ্য থাকে না। দৃশ্য না-থাকলে দ্রষ্টাও নেই, তখনই আসে একাকীত্ব। এই একাকীত্ব মন সহ্য করতে পারে না। তাই সে সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। মন নিজের মধ্যে নিজে থাকতেই পারে না। তাই তো মানুষ তার leisure period-এ লোকের বাড়ি গিয়ে আড্ডা মারে, T.V. দেখে বা খেলাধুলা করে কাটায়।

যারা তিরিশ/চল্লিশ বছর আধ্যাত্মিক জগতে থেকে শুধু বিষয়ই বাড়ায় তাদের কাছে আর কী আশা করা যায়। এক দিকে তারা আশ্রমবাসী, অন্য দিকে আবার নিজস্ব গাড়ি, বাড়ি করে বিত্তশালীর মতো জীবন কাটায়। তাদের এই ভানের কী প্রয়োজন? একদিন কথাপ্রসঙ্গে আশ্রমের এক অধ্যক্ষ মহারাজকে বলা হয়েছিল— তুমিই বা কী করলে জীবনে? আশ্রমের পর আশ্রম স্থাপন করে চলেছ, লোকহিতকর

কাজ করছ। নিজের জন্য কী করলে? 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) আশ্রমও করেনি, দীক্ষাও দেয়নি। 'এর' যা-কিছু সবই নিজস্ব, অর্থাৎ নিজ অতিরিক্ত যা-কিছু তা 'এ' ত্যাগ করেছে। আর তোমাদের নিজবোধের অভাব এবং নিজ অতিরিক্ত ভাববোধ আছে বলেই তোমরা বদ্ধ। স্ববোধে বাস করতে হলে 'আমার আমিকে' সবার আগে ত্যাগ করতে হবে। 'এর' কেউ আপন নেই, কেউ ছিল না, কেউ থাকবেও না। আবার কেউ 'এর' আপন ছিল না, নেই ও থাকবেও না। 'এ' কোনও মতপথে—conventional পথে চলে না। 'এর' কথা তোমরা শোন, কিন্তু 'এর' কাছে এটা একটা mere game। 'এ' কিন্তু তোমাদের মধ্যে এক আত্মাকেই দেখে। তাই দেখি আমিই বলছি, আমিই শুনছি, এখানে দ্বিতীয় কেউ নেই। এখানে বক্তা ও শ্রোতা একজনই।

এত শুনেও তোমরা কিন্তু এ সব কথা ধরে রাখার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করনি বা তৈরি করনি। তাই এ সব কথার মর্ম তোমরা উপলব্ধি করতে পার না। আসলে 'আমারভাব' maintain করলে আর আত্মজ্ঞান লাভের আশা নেই। স্বস্বরূপ সন্ধানের জন্য তোমাদের যত প্রশ্ন তার সবগুলির উত্তর দিলেও তোমরা আত্মজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। কারণ তোমাদের মন তৈরিই হয়নি। তোমরা তোমাদের মনকে বিকিয়ে দিয়েছ ভোগের রাজ্যে। তাই তো তোমাদের রসনা নিত্য নূতন খাবারের সন্ধান করে, তোমাদের মনোরঞ্জনের জন্য আছে T.V.-র programme, আছে আড্ডা ও গল্প। গল্পের মধ্যে কোনও তত্ত্বকথা থাকে না, থাকে নিছক ইয়ার্কি ফাজলামি। আর তোমাদের মেজাজ তো সবসময়ই থাকে চরমে। আসলে ধর্মভাব তো তোমাদের ভান। শুধু তোমরা কেন, যারা সাধুর বেশ ধরে আছে, তারাও তো সাধু নয়। কারণ তাদের অন্তরও তো সাধে ভরা। যাঁর সব সাধ উড়ে গিয়েছে তিনিই তো সাধু। সাধ থাকলে সাধু হওয়া যায় না। 'সাধু' শব্দের সংজ্ঞা শুনে নিত্যানন্দ মহারাজ বলেছিলেন—আপনি এত সহজ ভাবে বলেন, কিন্তু তা তো মানা কঠিন। উত্তরে বলা হয়েছিল—তোমরা মান কী না-মান তাতে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কিছু আসে যায় না। 'এ' যা অনুভব করেছে তা-ই বলে। সাধু হলেন তিনি, যিনি absolutely desire-free। আমি মুক্ত হব—এই সাধটুকুও তাঁর থাকে না। অবশ্য তোমরা নিজেকে বদ্ধ ভাব, তাই নিজেকে মুক্ত করার কথা ভাব। কিন্তু Self তো নিত্যমুক্ত। তাঁর আবার বন্ধন-মুক্তি কোথায়? নিত্যানন্দ মহারাজ বলেছিলেন—আপনি তো সব সময় তুরীয় থেকে কথা বলেন, একবারও কি নামবেন না? তাঁকে বলা হয়েছিল—'এর' কোনও স্তর বা level নেই। 'এ' সর্বাবস্থায় সর্বক্ষণ এক-এই থাকে। সেখান থেকে কেউ 'একে' সরাতে পারবে না। আর 'একে' ধরার কী আছে? সংসারে যাকে ধরবে সে-ই ডোবাবে। এক-এর বিজ্ঞানে কোনও support-এর provision নেই। Support নিয়ে চললেই তুমি সংসারী। সংসারী support ছাড়া চলতেই পারে না। এই support-কে ছাড়লেই তুমি হবে সমসারী, কারণ you are eternally One। Duality-ই হল relativity। নিত্যানন্দ মহারাজ আরও বলেছিলেন—আপনি prac-

tical দিক থেকে কথা বলেন না। তাঁকে বলা হল—Practical কথা বলে অহংকার। Oneness-এ practical হবার কথা থাকতেই পারে না। নিত্যানন্দ মহারাজ Kant-এর কথা তুললে তাঁকে বলা হল—Western philosopher-রা তো intellectual, তাঁরা তো intellect-এর ঊর্ধ্বে যেতেই পারেন না। আর এখানে যা বলা হয় তা হল super-intellectual। Western philosophy হল physics and metaphysics mixed। Truth Itself is metaphysics, তার মধ্যে আবার physics কোথায়? Intellectual conviction কখনওই realization নয়। Supernatural proposition-এর সঙ্গে intellect-এর মিশ্রণই হল objective। Truth is always super-subjective and beyond। যেমন থিয়েটারের actor, actress, producer, director, dramatist, audience and all others related to the drama—সবাই Consciousness-এ গড়া। Consciousness ছাড়া আর কিছুই নেই।

এই চৈতন্যস্বরূপের কথাই গানের মাধ্যমে তোমাদের কাছে ব্যক্ত করা হয়েছে। বুদ্ধি দিয়ে এ সব গানের ব্যাখ্যা করতে গেলে কিছুই বোঝা যাবে না। Compose করা গান ও revealed গানের এখানেই পার্থক্য। গান composed হয় intellect দিয়ে, কিন্তু revealed গানে intellect-এর কোনও স্থান নেই। Revealed গান আসে super-intuition থেকে, আর তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হয়। দ্বৈতবিজ্ঞান তো intellectual। সমাধির মাধ্যমে দ্বৈতজ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞানে পরিণত হয়। দ্বৈতবাদী সমাধিতে বিশ্বাস করে না। তারা বলে যে, তারা চিনি খেতে চায়, চিনি হতে চায় না, অর্থাৎ ঈশ্বরের লীলা আস্বাদন করতে চায়, কিন্তু ঈশ্বরের সাথে একীভূত হতে চায় না। তাদের বলা হয়েছে—চিনি খেতে চাও? চিনি খেতে তো চিনি কিনতে হবে, পয়সা ছাড়া কেনা যাবে না, পসরার জন্য পয়সা। অর্থের পিছনে ছুটতে হবে। সেই আবার ভোগের রাজ্যে এসে গেলে। এই ভোগের রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসতে চাই বিবেকবিচার ও বৈরাগ্য। বিবেক কী, তা সাধারণ মানুষ জানে না। বিবেক জাগলে কী হয়, তা যার বিবেক জাগেনি সে জানতে পারে না। গৃহস্থ ভোগীরা তাই বিবেকসিদ্ধির বিজ্ঞান নিতেই পারে না। কারণ এই বিজ্ঞান intellectually গ্রাহ্যই হতে পারে না।

স্থূল ও সূক্ষ্ম স্তরের জিজ্ঞাসা সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর না-হলে কারণের দিকে এগোতেই পারবে না। বেদান্তমতে জগৎ সৃষ্টিই হয়নি। কারণ without imagination there cannot be any creation। গাঢ় ঘুমে কোনও imagination নেই, তাই কোনও creation নেই। এই গাঢ় ঘুম হল unmanifested, unconditional, non-dual Consciousness—এখানে duality meaningless। 'এব' (নিজেকে নির্দেশ করে) কথা শুনে ধর্মজগতের লোকেরা 'একে' পাগল বলেছে।

'এর' কাছে realization is not an intellectual understanding, but it is something beyond and beyond—supra-rational, supra-intuitive awareness of awareness of spontaneous revelation। সংসারে ভোগবিলাসের মধ্যে

থেকে এই revelation কখনওই সম্ভব নয়। সংসার মানুষকে টেনে রাখে, ছাড়তেই চায় না। ছাড়তে চাইলেও ছাড়ে না। এই প্রসঙ্গে তোমাদের এক যোগীর গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

বর্তমান বাংলাদেশের এক মুসলমান যোগী, নাম ছিল মেহের আলি। স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূকে নিয়ে দারিদ্রের সংসার। একটি ঘরের মধ্যেই সকলে থাকত। সেখানেই মেহের আলি যোগাভ্যাস করতেন। তিনি ক্রমে যোগসাধনায় বেশ সিদ্ধিলাভ করলেন। কুম্ভক করে তিনি শূন্যে ভেসে থাকতে পারতেন। এ রকম একরাতে তাঁর স্ত্রী হঠাৎ দেখতে পেল মেহের আলি ঘরের চালের কাছাকাছি শূন্যে ঝুলছেন। স্ত্রী ভয় পেয়ে পুত্রকে ডাকল। পুত্র ঘুম ভেঙে ঐ দৃশ্য দেখে আর কিছু না-ভেবেই মেহের আলির লুঙ্গি ধরে টেনে নামিয়ে বলল—আরে! বাপজান যাও কোডা? মেহের আলি নেমে এসে বুঝলেন যে, সংসারে থেকে সাধনা করা সম্ভব নয়। সংসার তাঁকে সিদ্ধ হতে দেবে না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—একসময় একজন ভদ্রমহিলা এখানে আসতেন। তিনি খুব মন দিয়ে এখানকার কথা শুনে তা বাড়ি গিয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করতেন। তাতে তার সংসারে খুব অশান্তি দেখা দিল। তার স্বামী একদিন 'একে' বলল—আপনি আমাদের সংসারে অশান্তি সৃষ্টি করছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হল—অসুখ করলে ডাক্তারের কাছে যাও কেন? সে বলল— রোগ নিরাময়ের জন্য। তখন তাকে বলা হল—এখানেও তো ভবব্যাধি নিরাময়ের জন্য ওষুধ দেওয়া হয়। সে বলল—বাজে কথা। উত্তরে বলা হল—তোমাদের কাজের কথায় দুর্গতি যায় না কেন? তোমার ভিতরের সব খবর focus করে দেব? গতকাল কী করেছ? আজও কী করেছ? সব বলে দেব? এই কথাতে সে একেবারে চুপ হয়ে গেল। সেই যে গেল আর 'এর' কাছে আসেনি।

তোমাদেরও সব কুকীর্তির খবর 'এ' রাখে। সব কুকীর্তি যদি expose করে দেওয়া হয় তাহলে কী করবে? কী দিয়ে ঢাকবে? তোমাদের মনের মধ্যে কত কী কিলবিল করছে। মন শান্ত হলে এ সব কেটে যাবে। তোমরা তো মনকে শান্তই করতে চাও না। মনকে শুধু অশান্তই করে রেখেছ। একবার মন স্থির করে দেখই না কেমন লাগে।

১৯। ৭। ৯৫

৩৪১

ভোগের মধ্যে থাকলে আত্মজিজ্ঞাসা জাগতেই পারে না। আত্মজিজ্ঞাসা জাগে সর্বত্যাগের শেষে। ভোগীর সবসময়ই আছে ভোগের জিজ্ঞাসা। আর তত্ত্বান্বেষী বা জিজ্ঞাসুর কোনও জাগতিক ভোগের জিজ্ঞাসা থাকে না। সমস্ত জিজ্ঞাসা মার্জিত হলেই আসে সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসা—কে এই আমি? আর গুরুর কৃপায় একদিন জানতে পারে—অসঙ্গ অভঙ্গ অখণ্ড অলিঙ্গ নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত নিষ্কল নির্মল নিরঞ্জন অজর অমর অপাপবিদ্ধ এই আমি-ই সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলম্। আমি দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধি নই এবং

অহংকার, প্রকৃতি, ভাব ও বৃত্তিও নেই—আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বাতীত অদ্বয় বোধস্বরূপ কেবল। এ কথা যিনি বলবেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ। না-জেনে, না-অনুভব করে এ সব কথা বলা তো মিথ্যাচার।

কোনও একদিন এক গুরু তাঁর শিষ্যদের কাছে মহাবাক্যের কথা ব্যক্ত করছিলেন। কাছেই বসে একটি পাগল সেসব কথা শুনছিল। পাগলটি হঠাৎ বলল—কে কাকে জ্ঞান দিচ্ছে? যার অহংকার আছে তার মধ্যে অবিদ্যা আছে। অবিদ্যা থাকলে বিদ্যার কথা হয় না। জ্ঞানদাতা ও জ্ঞানগ্রহীতা দু'জনই দ্বৈতবোধে থাকে। দ্বৈতবোধ থাকলে অদ্বৈতের কথা কী ভাবে বলবে? যারা বলে, তারা সবাই ভণ্ড।

পাগলের কথায় গুরুর টনক নড়ল। পাগলের দেওয়া বীজ তার বোধ খুলে দিল। সে তখন পাগলকে গিয়ে ধরল। পাগল তখন আরও বলল—জগৎ সংসার সবই মিথ্যা। তুমি এবং আমি দু'জনই মিথ্যা। এই কথাটি তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি। তুমি যখন জানবে তখন তুমিও পাগল হবে।

গল্পের গূঢ়ার্থ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানে পাগলের কথা হল প্রজ্ঞানের বিজ্ঞানের অর্থাৎ Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge-এর কথা। যার মধ্যে এই বিজ্ঞান set হয়ে যায় তার আর জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কিছুই থাকবে না, সব একাকার হয়ে যাবে। একবার অখণ্ডের সাথে identified হলে আর কোনও কিছুই বাকি থাকে না। আমি-ই জ্ঞানস্বরূপ—এই স্বানুভূতি হলে হয় Realization of Realization। তখনই হয় 'নিত্যাদ্বৈত'-এর অনুভূতি। তখনই জগৎসংসার হয় 'Sportful dramatic sameside game of Self-Consciousness'। তখনই হয় নিজের সঙ্গে নিজের কথা। তখন আর জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ভাব থাকে না। বোধের সঙ্গে মিলেমিশে গিয়ে বোধকে নিয়ে বোধের খেলা। তখন আর কোনও ভীতি, শঙ্কা, সন্দেহ, অভিমান, আশঙ্কা থাকে না—কারণ এ সবই দ্বৈতবোধজাত। আবার দ্বৈতে থাকলে অদ্বৈতে যাওয়া যায় না। কারণ সত্য কখনও objectified হয় না। Knowledge can never be predicated. তোমরা যা নিয়ে আছ সে সবই জ্ঞানাভাস। জ্ঞানাভাস কখনও জ্ঞান হয় না।

২৩। ৮। ৯৫

৩৪২

কথায় বলে ঈশ্বরদর্শন হলেই না কি মানুষের মুক্তি হয়। অথচ দীর্ঘকাল তপস্যার পরে মুনি, ঋষিরা ঈশ্বরদর্শন পেয়ে তাঁর কাছে তাঁদের অভিলাষের জিনিস চেয়ে নিয়েছেন। কেউ চেয়েছেন অর্থ, কেউ চেয়েছেন বিত্ত, কেউ বা চেয়েছেন রাজত্ব। এই ভাবে তাঁরা আবার ফিরে এসেছেন ভোগের রাজত্বে। শ্রীচণ্ডীতে মধুকৈটভ, মহিষাসুর, শুম্ভ, নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুরের বধের বর্ণনা আছে। এই তিন অসুর এখনও মানুষের মধ্যেই আছে, মানুষ কিন্তু তাদের বধ করতে পারে না।

পুরাকালে মেধস নামে এক ঋষি ছিলেন। একবার রাজা সুরথ ও বৈশ্য—এই দু'জন প্রিয়জন দ্বারা সংসারে উৎপীড়িত হয়ে সংসার ছেড়ে আসতে বাধ্য হন। তারা

দু'জন মেধস ঋষির কাছে এলেন। সব শুনে মেধস ঋষি তাদের মহামায়ার উপাসনা করতে বললেন। মায়াশক্তি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে থেকে তাদের মোহগ্রস্ত করে। তার হাত থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হলেন মহামায়া। তিনিই পারেন মায়াকে বশ করতে। মধুকৈটভ, মহিষাসুর ও শুম্ভ, নিশুম্ভ হল এই মায়াশক্তি।

সুরথ ও বৈশ্যের তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মা আবির্ভূতা হলেন। মা তাদের বর দিতে চাইলে সুরথ চাইল রাজত্ব। কিন্তু বৈশ্য মায়ের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলল—জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করেছি। আমার সকল দুঃখের অবসান করে আমায় মুক্তি দাও। মা তা-ই দিলেন। সুরথ রাজা হয়ে আজও রাজত্ব করছে। এখনও সুরথ মুক্তি পাননি। আর বৈশ্য মুক্ত হয়ে সংসারের উর্ধ্বে চলে গিয়েছে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সংসারে মানুষ ভোগ ও কামনাবাসনার উর্ধ্বে কখনওই উঠতে চায় না। তাদের ভক্তি হল লোকদেখানো। আরও কিছু পাবার আশায় ধর্মের ভান করে মন্দিরে, মসজিদে ঘুরে বেড়ায়। তাদের মুখে মা, অন্তরে সিনেমা। ভোগে পোক্ত হলে ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্ত না-হলে ইষ্ট লাভ হয় না। ভক্ত হতে গেলে ভোগকে পরিহার করতে হবে। ভোগকে পরিহার করা বড় শক্ত। তার জন্য চাই মনোবল। মানুষ সংসার ছাড়ার সামান্য সংকল্পই করতে পারে না, সংসারমুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে তো কঠিন কাজ। তাই তো কলুর বলদের মতো একই জায়গায় জন্ম জন্মান্তর চক্রাকারে ঘুরছে।

১। ৫। ৯৬

৩৪৩

একবার একজন এসে বলেছিল, রাশিয়ায় দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ তৈরির জন্য গবেষণা চলছে। তাকে বলা হয়েছিল—দ্বিতীয় রবীন্দ্রনাথ তো হবে imitation। তা তো কখনওই original হতে পারে না। Original-এর imitation হতে পারে, কিন্তু imitation কখনও original হবে না। বুদ্ধির বলও তাই অধ্যাত্মপথে original-কে পেতে পারে না।

অনেকেরই সখ আছে বাগানবাড়ির। এক ভদ্রলোকের শহরে একটি বাড়ি আছে। তিনি গ্রামের দিকে একটি বাগানবাড়ি তৈরি করে তাতে নানা রকম ফল-ফুলের গাছ ও orchid লাগিয়ে সাজিয়েছেন। ভদ্রলোক মাঝে মাঝে এসে সেখানে থাকেন। একদিন তিনি দেখলেন তার কলমের আম গাছে অনেক ছোট ছোট আম ধরেছে। তিনি মালিকে খুব সাবধান করে দিয়ে বললেন, ভাল করে পাহারা দিতে যাতে কেউ সেই আম তুলতে না-পারে। মালির তীক্ষ্ণ নজর এড়িয়ে ছোট ছেলেরা কিছুতেই সেই আম পাড়তে পারছে না। তারপর তারা একদিন যুক্তি করে তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে মালিকে উত্যক্ত করতে লাগল। মালি এক দলের কাছে ছুটে যেতে অন্য দল সেই সুযোগে আম পেড়ে পালিয়ে গেল। এ ভাবে তারা তিন দলে প্রায় সব আম পেড়ে নিয়ে গেল। মালি তো নিরুপায়, কী করবে বুঝে উঠতে পারল না। একদিন তার

মালিকের ইচ্ছা হল, এই আম দেবতাকে নিবেদন করবেন। কিন্তু তা তো হবেই না, উপরন্তু মালির চাকরিও যাবে! মালি তখন বুদ্ধি করে বাজার থেকে আম কিনে এনে প্রত্যেক আমের বোঁটার সঙ্গে সুতো বেঁধে গাছে ঝুলিয়ে দিল। মালিক তো দূর থেকে আম গাছগুলি দেখে খুব খুশি হলেন। কয়েকদিন পরে তিনি মালিকে বললেন—আমগুলি আর বাড়ছে না, কেমন শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। মালি তো চুপ করে থাকে। মালিক তখন ঠিক করলেন যে, পরেরদিন গিয়ে আম গাছগুলি কাছ থেকে দেখবেন। পরের দিন কাছ থেকে গাছগুলি দেখে তো তিনি হতবাক। তখন তিনি মালিকে পিটিয়ে প্রায় মেরে ফেলেন আর কী!

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই তো হল বুদ্ধির দৌড়! আসলে পাণ্ডিত্য হয় পাঁচ জায়গা থেকে জ্ঞানাভাস সংগ্রহ করে, তা ever-growing ও original নয়। যা original তা ever-growing। কাজেই book knowledge দিয়ে Self Knowledge পাবে না। বুদ্ধিকে নিয়ে জীবনজিজ্ঞাসা শুরু করলে অব্যক্ত পর্যন্ত যেতে পারবে। সেখান থেকে বুদ্ধি আবার নিচে নেমে আসবে, তার উপরে আর যেতে পারবে না! কাজেই অধ্যাত্মপথের পাথেয় হিসাবে যে বলের কথা বলা হয়েছে, তা কখনওই বুদ্ধির বল নয়, for Buddhi or intellect is not enough to reach the highest goal. To reach there, you must give up the mental and intellectual exercise. Self বা আত্মা হল বাক্যমনাতীত। কাজেই যা মন-বুদ্ধির অতীত, তাকে মন-বুদ্ধি দিয়ে ধরবে কী করে? যে দৃষ্টিতে মন-বুদ্ধিকে আত্মজ্ঞানের অন্তরায় বলা হয় সেই দৃষ্টিতে এক আত্মা ছাড়া আর কিছুই নেই। এই আত্মজ্ঞানের অভাবে ও অনাত্মপ্রীতির প্রভাবেই মানুষের রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি ও পুনর্জন্ম হয়। এই অনাত্মপ্রীতি হয় মন-বুদ্ধির প্রভাবে। কাজেই মৃত্যুকে অতিক্রম করে অমৃতত্বকে গ্রহণ করতে হলে মন-বুদ্ধিকে ছাড়তেই হবে অথবা ঈশ্বর-আত্মার অনুগত করে রাখতে হবে।

১। ৫। ৯৬

৩৪৪

অফিসে, ব্যাঙ্কে যারা কাজ করে তাদের সব সময় হিসাবের খাতা মিলিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু হিসাবের খাতায় ভুল হলে তো মেলাতে সময় লাগে। গোজামিল দিয়ে মেলালে পরে তার ফল ভোগ করতে হয়। ঠিক তেমনই জীবনে অঙ্কের হিসাবে যখন ভুল হয় প্রথমে মানুষ তা চাপা দিতে চায়, কিন্তু পরে তা ঠিকই exposed হয়ে যায়। তখন তাকে ভুলের মাশুল দিতে হয়। মানুষের এই ভুলের মাশুল হল পুনর্জন্ম। এই পুনর্জন্ম সবার কাছেই রহস্যপূর্ণ। কেউই জানে না কে কোথায় কী ভাবে আবার জন্ম নেবে। এমনকী সাধুসন্তরাও জানেন না এই জন্মান্তরের রহস্য। কাকে আর কত জন্ম এ ভাবে দুর্ভোগ ভুগতে হবে তা একেবারেই রহস্যাবৃত। পুরাণাদির পাতায় পাতায় কর্মফলের উত্থান-পতনের নজির আছে ঠিকই, কিন্তু তার মাধ্যমে মানুষের ধারণা পাকা হওয়া কঠিন। তা পাকা হয় গুরুকৃপায় আত্মবিচারে আত্মজ্ঞানে আত্মধ্যানে।

মুনিদের হৃদয় সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকটাই উন্নত। কারণ তাঁদের দ্বেষ, হিংসা, কামনাবাসনা সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক কম। তবুও তাঁদের জীবনে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যার ফলে তাঁদেরও সেই ভুলের মাশুল দিতে হয়—যেমন ভরত মুনি।

একদিন ভরত মুনি তাঁর আশ্রমে আত্মধ্যানে রত ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ একটি হরিণ শিশু তাঁর কোলের কাছে এসে পড়ল। তিনি দেখলেন হরিণ শিশুটি ভয়ে কাঁপছে আর কিছু দূরে একটি বন্য জন্তু দাঁড়িয়ে আছে। তিনি উঠে গিয়ে সেই বন্য জন্তুটিকে তাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু এই হরিণ শিশুটির কী ব্যবস্থা করবেন সে সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি হরিণ শিশুটিকে আশ্রমেই রেখে দিলেন এবং পরমস্নেহে তাকে পালন করতে লাগলেন। ক্রমে হরিণটির উপর তাঁর মায়া পড়ে গেল। এদিকে তাঁর অন্তিম সময় উপস্থিত হলে তিনি কেবলই ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর অবর্তমানে হরিণটির কী হবে! এই কথা ভাবতে ভাবতেই তিনি দেহত্যাগ করলেন। মৃত্যুকালে হরিণের চিন্তা করার ফলে ভরত মুনিকে পরের জন্মে হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করতে হল। পর পর তিনটি হরিণজন্ম পার করে তবে ভরত মুনি চতুর্থ জন্মে মুক্তিলাভ করলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মৃত্যুর সময় মানুষ যা চিন্তা করে পরবর্তী জন্মে সেই চিন্তা অনুরূপ তার জন্ম হয়। Last thought is the cause of future destiny of life. তাই আমাদের দেশে মৃত্যুপথযাত্রীদের ভগবানের নাম, কথা ইত্যাদি শোনানো হয়, যাতে তাদের মনে শুধু ঈশ্বরচিন্তাই আসে। কিন্তু সত্যিই কি তা হয়? প্রত্যেকের জীবনে কিছু privacy আছে, মৃত্যুকালে মানুষের সে সব কথাই বেশি মনে পড়ে। তবে দেখা যায় সারাজীবন নিজের বল-বুদ্ধির অহংকারে কাটিয়ে বৃদ্ধ বয়সে যখন আর কোনও উপায় থাকে না তখনই আস্তিক্যভাব আসে। কিন্তু তাতে আর কী লাভ! মন্দের ভাল, তার ফলে শুভসংস্কারের কিছু বৃত্তি তৈরি হয়।

আসলে মানুষের মোহই তার এই বন্ধনের কারণ। সংসার হল কল্পনা। মানুষ এই কল্পনার সংসারে রূপ-নাম-ভাবের মোহে বদ্ধ হয়। কারণ মানুষ সংসারে সমঝোতা করেই চলে, কিন্তু নিজের সম্পর্কে সে সচেতন হয় না। মুক্তির বিজ্ঞানে কোনও compromise নেই। তাই সাধুসন্তরা জীবন সম্পর্কে কিছুটা সচেতন। যার মধ্যে যে চিন্তা dominating থাকে তার জীবন হয় সেই অনুরূপ। বিষয়াসক্ত চিত্তে বিষয়চিন্তা ও বিষয়ের প্রতি আসক্তি যতটা, ঠিক ততটাই অনাসক্তি ঈশ্বরের প্রতি। আবার যার ঈশ্বরের প্রতি আকর্ষণ বেশি তার বিষয়াসক্তি থাকে না। এই বিষয়াসক্তির জন্য নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত আত্মা জীবরূপে বন্ধনদশা ভোগ করে। তাতে আত্মার কিছু যায় আসে না, আত্মা আত্মাই থাকে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞানের অভাবে অনাত্মার সাথে যে সম্পর্ক হয় তাকেই বলা হয়েছে জীবভাব। এই জীবভাবে মানুষের বহু জন্ম কেটে যায়। তারপর আসে স্বঘরে ফেরার পালা। নিত্য শুদ্ধ আত্মার বক্ষেই অনাদি মায়ার খেলা চলে স্ববোধের ফাঁকে। কিন্তু সংসারের দৃশ্য দেখে মানুষের তা বোঝার উপায় নেই। একমাত্র সদ্‌গুরুর সাহায্যেই তা বোঝা যায়, যদি তিনি কৃপা করে বুঝিয়ে দেন। কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপা লাভের জন্যও নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। অন্তরের ব্যাকুলতা

অনুসারেই যোগ্যতার মান নির্ণিত হয়। অন্তরের ব্যাকুলতা তীব্রতম না-হলে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আসে না।

দেহবুদ্ধি থেকে শুরু করে ঈশ্বরাত্মবোধের পূর্ব পর্যন্ত সংসার। অবশ্য দেহ তো সংসারীরও আছে আবার মুক্তপুরুষেরও আছে, কিন্তু উভয়ের ব্যবহার সম্পূর্ণ বিপরীত। সংসারীর কাছে দেহই সব, দেহের জন্যই সব। কিন্তু মুক্তপুরুষের দেহ থেকেও না-থাকার মতো। এর কারণ হল সংসারীর তপস্যা নেই, আছে শুধু অপকর্ম। যে কর্ম করে কর্মফল ভোগ করতে হয় তা-ই হল অপকর্ম। আর ফলাশা না-রেখে কর্তৃত্বাভিমানশূন্য হয়ে যে কর্ম তা-ই হল অধিকর্ম। এ রকম কর্ম হলেই কর্মফল থেকে রেহাই পাওয়া যায়। অবশ্য অধিকর্ম সদ্‌গুরুর কাছেই শিখতে হয়।

প্রাণীদের মধ্যে মনুষ্যজন্ম অতি দুর্লভ জন্ম। তার কারণ মানুষের যে সুবিধা তা অন্য প্রাণীদের নেই, যদিও ক্রম ধরে গাছপালা, কীটপতঙ্গ, পশুপাখির স্তর থেকে মানুষের স্তর পর্যন্ত আসতে অনেক জন্ম কেটে যায়। আবার মনুষ্য স্তরে এসেও মানুষের মনের বৃত্তি ও চিন্তা অনুসারে তাকে আবার পশু জন্মে ফিরে যেতে হতে পারে। এ ব্যাপারে first law হল নিয়তি। সৃষ্টির সর্বোত্তম দায়িত্ব নিহিত আছে নিয়তিরই হাতে। নিয়তির বিধানকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও খণ্ডন করতে পারেন না। একমাত্র নিয়তিকে তুষ্ট করতে পারলেই এই জন্মান্তরের দুর্ভোগ এড়ানো সম্ভব হয়। নিয়তি তুষ্ট হয় আপনবোধে সব মানলে, তখন আত্মবোধ প্রকাশ পায়, তাতে নিয়তি শান্ত হয়।

৮। ৫। ৯৬

৩৪৫

জ্ঞানগঙ্গা হল Knowledge of Knowledge। তা বাইরে কোথাও খুঁজে পাবে না, তা আছে প্রত্যেকের অন্তরে। একমাত্র সদ্‌গুরু ভিন্ন কেউ তার হদিশ দিতে পারবে না। আর সেই গঙ্গার হদিশ পেতে হলে নিজেকে বিকারমুক্ত হতে হবে। মানুষের কর্মের বিকার একবার শুরু হলে তাকে আর check দেওয়া যায় না। কারণ মানুষ যদি দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ-বুদ্ধিকে সংযত করতে না-পারে তবে তো বিকার ঘিরে ধরবেই। আর বিকার দ্বারা বদ্ধ হয়ে দীক্ষা নিয়ে কী হবে? শুধু দীক্ষামন্ত্র জপ করে ঈশ্বরের সন্ধান পাবে না। কিন্তু সংযত চিত্তে কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরহিত মনে তাঁর জন্য যে অপেক্ষা করে, তার সে সুযোগ একদিন আসবে। তা সে শুধু নিজেই জানবে, অপরে টেরও পাবে না। অন্তরে যখন অধরা ধরা দেবেন, তখন তা মন-বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। তিনি beyond any intellectual analysis। মন-বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরা যাবে না। যতদিন দেহাত্মবুদ্ধি আছে ততদিন চিত্ত মলিন। দেহে মতি হলে হয় শবাকার মন, আর বোধে মতি হলে হয় শিবাকার মন। দেহ হল বোধের reflection-এর reflection। Reflection cannot touch the Real and reflection of reflection is far from the Real. এই দেহ হল পঞ্চভূতের এক অদ্ভুত মিশ্রণ। প্রকৃতির খেয়ালে এই দেহ যখন তৈরি হয়েছে, তখন তা Consciousness-এর reflection দিয়ে চলতে থাকে। তারপর একদিন প্রকৃতির খেয়ালেই পঞ্চভূত আলাদা হয়ে দেহ আর থাকে না।

চৈতন্যের কিন্তু কোনও বিনাশ নেই। আত্মচৈতন্য পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত দেহের মধ্যে যেমন ছিল, তেমনই পঞ্চভূতের মধ্যেও আছে। Material sky আছে mental sky-তে আবার mental sky আছে spiritual sky-তে। অর্থাৎ চিদাকাশে ভাসে চিত্তাকাশ, চিত্তাকাশে ভাসে ভূতাকাশ, আর ভূতাকাশে ভাসে এই সংসার।

মানুষকে কী ভাবে এই রহস্য বোঝানো যায় তা নিয়ে ঈশ্বর, মুনি, ঋষি ও দেবতারাও চিন্তা করেন। মর্তলোকে শিবের ভক্তদের দুর্দশা দেখে একদিন মাতা পার্বতী শিবকে বললেন—নরলোকে তোমার ভক্তদের এত দুর্দশা, তুমি কিছু কর না কেন? শিব হেসে বললেন—তোমার ভক্তদেরও তো কত কষ্ট, তুমিই কিছু একটা কর।

শিব হলেন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে democratic। তিনি অল্পেই তুষ্ট। তাই তো তিনি দেবাদিদেব। গুরু মহেশ্বর হলেন বিশেষ অর্থে সদাশিব বা ব্রহ্ম স্বয়ং। তিনি বৈরাগ্যের প্রতিমূর্তি, কোনও কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করে না। তাঁর ভক্তরাও তাই তাঁরই মতো। মাতা পার্বতী শিবভক্তের আসার পথে একথলে মোহর রেখে দিলেন। শিবের ভক্ত কিন্তু সেই মোহরের থলি ডিঙিয়ে চলে গেল। সে একবারও ফিরেও দেখল না। এই হল শিবভক্ত—অর্থে, বিত্তে কোনও মোহ নেই।

শিবের মতো বিষ্ণু জগৎপাতা হিসাবে অনেকটা aristocratic। তাই তো তিনি এত গয়নাগাটি পরে সেজেগুজে থাকেন। কিন্তু তাঁর ভক্তরা হল অকিঞ্চন। জীবনধারণের জন্য ঠিক যতটুকু প্রয়োজন একজন প্রকৃত বৈষ্ণব তার চেয়ে এক মুঠোও বেশি গ্রহণ করে না। নিজের বলে যা-কিছু আছে তা অপরকে দান করেই তার আনন্দ। নিজের অন্ন, বস্ত্রটুকুও কেউ চাইলে তারা তা দিয়ে দিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা বড়ই অতিথিবৎসল। অতিথি তাদের কাছে নারায়ণ। আসলে ভক্ত হিসাবে শিবের ভক্ত বা বিষ্ণুর ভক্তে কোনও ভেদ নেই। আসল ভক্তের জাতই আলাদা।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক দরিদ্র ভক্তের ঘরে অন্ন নেই দেখে মাতা অন্নপূর্ণা লোক মারফত অন্ন ও অন্যান্য খাবার তার বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। ভক্ত বেরিয়েছিল মাধুকরীতে। ফিরে এসে ঘরে এত খাবার দেখে সে তার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করল—এগুলি কে দিল? ভক্তের পত্নী বলল—সেকি, তুমিই তো রেখে গেলে! পত্নীর এই কথা শুনে ভক্ত তার পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলল—তুমি ধন্য, তুমি আমার প্রভুর দর্শন পেয়েছ। আমি এতই অভাগা যে, তাঁকে দেখতেও পেলাম না। ভক্ত আনন্দে সে সব খাবার সবার মধ্যে প্রভুর প্রসাদ বলে বিলিয়ে দিল।

গল্পটি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রকৃত ভক্তের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বললেন—ভক্তের বশ সবাই। সে সব কিছু দিয়েই ভক্ত হয়েছে। কিন্তু এমন ভক্ত আর কোথায় পাবে? বর্তমানে যারা নিজেদের ভক্ত বলে দাবি করে তারা তো শাস্ত্রপাঠ, পূজা, জপতপ, ধ্যানে রত, কিন্তু তাদের দেহাত্মবুদ্ধি তো যায়নি। যথার্থ ভক্তের দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না। তাই তো এক বৈষ্ণব ভক্ত ঘরে আগত অতিথিকে সেবা করার জন্য নিজের ঘরের দরজাটুকুও বেচে দিতে দ্বিধা করে না—ঝড়জল, দুঃখকষ্টের কথা একবারও তার মনে আসে না। ভক্তের কাছে ঈশ্বরই সব, জ্ঞানীর কাছ ঈশ্বর-আত্মাই সব।

৮। ৫। ৯৬

৩৪৬

মানুষ তারাই, যারা মনকে নিয়ে চলে। মানুষ পদে পদে ভুল করে। এই মন শুদ্ধ হলে তা দেবতাদের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রাণের স্তরের অনুশীলন হয় মন দিয়েই, কিন্তু বুদ্ধির স্তরের অনুশীলন মন দিয়ে হয় না। প্রাণের ধর্ম প্রাণী, মনের ধর্ম মানুষ, বুদ্ধির ধর্ম বিজ্ঞান, দেবতা অর্থাৎ ঈশ্বর। বুদ্ধির উপরে আছেন পরমবোধি। তিনিই পরমাত্মা পরব্রহ্ম। সত্ত্বগুণের অনুশীলনে তাই শুদ্ধসত্ত্ব ঈশ্বরের দেখা পাবে। কিন্তু ব্রহ্ম হল গুণাতীত। কাজেই সাধনার দ্বারা ঈশ্বরলাভ হলেও থামবার কোনও প্রশ্ন নেই, আরও এগিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না পরমবোধির দর্শন মেলে। যতক্ষণ দুই আছে ততক্ষণ পরমবোধিকে পাবে না। পরমবোধ হল perfect Knowledge অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ। তা স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বানুভবদেব স্বয়ং—তাকেই এখানে বলা হয়েছে Science of Oneness, Knowledge of Oneness and Oneness of Knowledge, that is Knowledge of Knowledge। তাই বুদ্ধি দিয়ে এই Science of Oneness-কে বোঝা বা বিশ্লেষণ করা কখনওই সম্ভব নয়। বুদ্ধি দিয়ে সত্ত্বগুণের অনুশীলন চলে, কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বের উপরে যে ব্রহ্মতত্ত্ব তা অবগত হবার জন্য সদ্‌গুরুর বা অনুভবসিদ্ধ গুরুর সাহায্য একান্তই প্রয়োজন। যে গুরু ঈশ্বরতত্ত্বের পরিচয় পেয়েছেন তাঁর পক্ষে তত্ত্বস্বরূপের পরিচয় দেওয়া কখনওই সম্ভব নয়। তাঁরা মতপথের পথিক, তখনও তাঁরা গুণের অধীন, তাঁরা ব্রহ্মবাদের কথা কী করে বলবেন? একমাত্র যিনি ব্রহ্মকে জেনেছেন—এই রকম স্বানুভবসিদ্ধ গুরুই হলেন সদ্‌গুরু। তিনিই একমাত্র পারেন অপর একজনকে ব্রহ্মতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে।

রাজা উত্তানপাদের দুই রানি—সুনীতি ও সুরুচি। সুনীতির পুত্র ধ্রুব ও সুরুচির পুত্র উত্তম। সুরুচি অর্থাৎ ছোট রানি খুব ঈর্ষাপরায়ণা। রাজা একদিন ধ্রুবকে আদর করছেন দেখে তার মনে ঈর্ষা হল। তিনি রাজাকে ধ্রুব ও তার মাকে নির্বাসিত করতে বাধ্য করলেন। বনে এসে তারা কুটির বানিয়ে নিভৃতে একাকী দিন কাটাতে লাগল। শ্বাপদসংকুল জঙ্গলে হিংস্র জন্তুদের মধ্যে তারা ভয়ে ভীত হয়ে থাকে। ছোট ধ্রুবকে মা সান্ত্বনা দিয়ে বলেন যে, তার এক দাদা আছেন এই জঙ্গলে, তিনিই তাদের একমাত্র সহায়। তাঁকে ডাকলেই তিনি এসে তাদের সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করবেন।

ছোট্ট বালকের চিত্তে কোনও complexity নেই, একেবারেই pure। তাই সে সরল বিশ্বাসে মঙ্গলময় মধুসূদনকে ডাকতে থাকে। কখনও ডাকতে ডাকতে রাত হয়ে যায় এবং বাড়ি ফিরতে পারে না। কিন্তু তবুও সে ডাকে। ক্রমে বালক একপায়ে দাঁড়িয়ে একাগ্র মনে মধুসূদনকে ডাকতে ডাকতে বিভোর হয়ে যায়। ছোট্ট বালকের ডাকে বৈকুণ্ঠে শ্রীহরির প্রাণে দোলা দেয়। তিনি কিছুতেই থাকতে পারেন না। কিন্তু তিনি সশরীরে এলে ভক্ত যদি তাঁকে চিনতে না-পারে! শুদ্ধসাত্ত্বিককে সে চিনবে কী করে? তাকে তো আগে চেনাতে হবে। তখন শ্রীহরির একমাত্র নারদের কথা মনে পড়ল। ঠিক তখনই নারদ এসে উপস্থিত হলেন। শ্রীহরি নারদকে বললেন—তোমাকে একটা কাজ করতে হবে। নারদ হেসে বললেন—আমাকে দেখলেই তোমার কাজের

কথা মনে হয়! শ্রীহরি বললেন—তোমাকে দিয়ে যে কাজ হয় অন্যকে দিয়ে তা হয় না। নরলোকে ধ্রুব নামে একটি বালক আমায় প্রাণ ভরে ডাকছে, আমি আর থাকতে পারছি না। তুমি তার কাছে যাও। তাকে তুমি আমার কথা শোনাও। আমার সম্পর্কে তার স্পষ্ট ধারণা না-হলে তো আমি যেতে পারি না। তোমার কথায় ধ্রুবর মনে আমার সম্বন্ধে ধারণা হবে। তারপর আমি যথাসময়ে দেখা দেব।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটু থেমে গুরুবাদ প্রসঙ্গে বললেন—আসলে এখানে শ্রীহরি গুরুবাদের কথা বলেছেন। গুরু বিনা ইষ্টদর্শন হয় না। গুরুই শিষ্যের মনে ইষ্টের ধারণা তৈরি করেন এবং সেই মতো শিষ্যের ইষ্টদর্শন হয়। এটা গুরুবাদের একটি বিশেষ উদাহরণ। ভক্ত ও ভগবানের সম্পর্ক যে কী রকম তা বুদ্ধি দিয়ে বোঝার বিষয় নয়। বুদ্ধি দিয়ে তা বোঝা যায় না।

শ্রীহরির নির্দেশ মতো নারদ সেই বনে প্রবেশ করে ভক্ত ধ্রুবর দেখা পেলেন। তিনি অবাক হয়ে দেখলেন এই গভীর অরণ্যে এতটুকু বালক কী ভাবে হরিধ্যানে মগ্ন। নারদ তাকে ডেকে বললেন—হে বালক, অরণ্যে এত রাতে তুমি কী করছ? তুমি বাড়ি ফিরে যাও। ধ্রুব বলল—আমি মধুসূদনকে ডাকছি। মায়ের কাছে শুনেছি যে, তিনিই একমাত্র আমাদের আপনজন, তাই তাঁকে ডাকছি। নারদ তার ধ্যানভঙ্গ করায় সে বিরক্ত হয়ে বলল—আমি ডাকছি, তুমি আমায় বাধা দিচ্ছ কেন? বিরক্ত করছ কেন? তুমি যাও। নারদ ভাবলেন, শিশুটির মধ্যে কত ভাল সংস্কার আছে যে, ঈশ্বরের জন্য তার প্রাণ এমনভাবে কাঁদছে।

নারদ ধ্রুবকে বললেন—তুমি একাকী এই গভীর অরণ্যে এই ভাবে দাঁড়িয়ে আছ, কোনও বিপদে পড়লে কে তোমায় দেখবে?

ধ্রুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—আমার মধুসূদন দাদা দেখবে।

নারদ দেখলেন এমন দৃঢ় ভক্তি তো দেখা যায় না। তখন ধ্রুবকে তিনি বললেন—তুমি যাঁকে ডাকছ তাঁর কথা আমি অনেক জানি, তুমি শুনবে? ধ্রুব খুশি হয়ে তার মধুসূদন দাদার কথা জানতে চাইল। নারদ যতই হরির গুণগান করেন, ধ্রুব আরও শুনতে চায়। ধ্রুবর যেন আর তৃপ্তি হয় না। নারদ শ্রীহরির সগুণতত্ত্বের সব কথা বলে ভাবলেন, এবার বোধহয় ধ্রুব তৃপ্ত হবে। কারণ মানুষ তো একটু জপধ্যান করে, একটু আধটু দর্শন ও স্পর্শ পেয়েই অহংকারে, গর্বে ফেটে পড়ে। অনেকেই ভাবে তাদের জ্যোতি দর্শন হয়েছে। আসলে divine জ্যোতি অত সহজ ব্যাপার নয়। তারা যে জ্যোতি দেখে তা হল দেহ অভ্যন্তরস্থ পাচকরস যখন পাঁচ প্রকার পিত্তরসের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন তার মধ্যে যে জ্যোতি দেখা যায়—সেই জ্যোতি। তা কখনওই ঈশ্বরজ্যোতি নয়। ঈশ্বরজ্যোতি হল জ্যোতির জ্যোতি, অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান। তা প্রাকৃত দর্শন নয়। তার কোনও বিকল্প নেই, সুতরাং আকার-বিকারও নেই। স্বানুভূতিই হল তার সত্য পরিচয়। ঈশ্বরজ্যোতি হল অরূপ জ্যোতি আকার—তা দেখা অত সহজ নয়।

যাই হোক, নারদ ধ্রুবকে শ্রীহরির নির্গুণতত্ত্ব প্রসঙ্গে বলতে লাগলেন। তাঁর যতটা জানা ছিল সবটা বলার পরও ধ্রুব আরও জানতে চায় দেখে নারদ প্রীত হয়ে তাকে

আশীর্বাদ করে বললেন—এবার তোমার ইষ্টদর্শন, ইষ্টস্ফূর্তি হোক। নারদের মতো গুরুর আশীর্বাদে ধন্য হল ধ্রুব। চিত্ত যার সহজ সরল তার আর কিসের ভয়? ধ্রুব তখনও মধুসূদনকে ডাকতে লাগল। নারদও ধ্রুবর মতো ভক্তশিষ্য ও যোগ্য আধার পেয়ে আনন্দিত হয়ে ফিরে গেলেন।

শ্রীহরির সগুণ ও নির্গুণ তত্ত্ব প্রাণ ভরে শোনার পর ধ্রুবর অন্তর illumined হয়ে গেল। তার হৃদয়ের দ্বার খুলে গেল। অবশেষে শ্রীহরি এলেন। তিনিও ভক্তকে পরীক্ষা করলেন। প্রথমে তিনি নানা হিংস্র জন্তুজানোয়ার, রাক্ষস ইত্যাদির বেশে তার কাছে এলেন। ধ্রুব যাকেই দেখে তাকেই আলিঙ্গন করে বলে- তুমিই কি আমার শ্রীহরি? এ সব গল্প নয়. যার চিত্ত শুদ্ধ হয়েছে তার কাছে everything is real। তার কাছে বাসুদেব হরিই সব। "বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ, হরিরেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ, গুরুরেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ, মাতৃরেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ, অহমেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।"

অবশেষে ধ্রুবকে শ্রীহরি দর্শন দিয়ে বললেন—তুমি গুরুকৃপা পেয়েছ তাই তুমি আমায় পেলে। বল তুমি আমার কাছে কী চাও? ধ্রুব সরল ভাবে তাঁকে বলল—তুমি এসেছ: আর তো আমি কিছু চাই না, আমার আর চাইবার কিছু নেই। শ্রীহরি তখন তাঁকে বললেন—তোমার মতো ভক্তকে কিছু না-দিতে পারলে আমার ঐশ্বর্য-মাধুর্য কিসের জন্য? ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-মাধুর্য জাগতিক কিছু নয়, তা আত্মিক শক্তি, সামর্থ্য ও অনুভূতি।

ধ্রুব বলল—তুমি যা দেবে তার ভার তোমাকেই নিতে হবে। শ্রীমধুসূদন তাকে বর দিয়ে বললেন—তুমি রাজার ছেলে, তুমি তোমার রাজ্য ফিরে পাবে। আর তোমার নামে অমর হয়ে থাকবে ধ্রুবলোক।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—গুরুকৃপা যে পায় সে-ই ধন্য। মাতৃগুরুর কৃপা যারা পায় তারাই fortunate। জীবনে প্রথম গুরু হলেন মাবাবা—পিতামাতার কৃপা ভিন্ন অন্য কৃপা আসে না। কৃপারও ক্রমধারা হল প্রথমে আশিস, দ্বিতীয়তে কৃপা, তৃতীয়তে করুণা এবং চতুর্থতে হল অনুগ্রহ/অনুকম্পা।

৫। ৬। ৯৬

৩৪৭

তোমরা রামায়ণ পড়েছ। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) রামায়ণ দেখা---যা কোনও গল্পগাথা নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। দ্বৈতবাদীর কাছে রামচন্দ্র হলেন ঈশ্বর, ভগবানের অবতার—নিষ্কল নির্মল পুরুষোত্তম। আর রাবণ হলেন অত্যাচারী ও দুরাচারী রাক্ষস। তাঁকে নিধনের জন্যই রামচন্দ্রের জন্ম। অবশ্য 'এর' কাছে রাম ও রাবণের মধ্যে কোনও ভেদ নেই। রামও Self, রাবণও Self। তবে রাবণের মধ্যে এমন অনেক quality আছে যা তাঁকে অনেক উচ্চ আসনের মর্যাদা দিতে পারে। রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি বানাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নানা কারণে সেই কাজ তিনি শেষ করতে পারেননি। তা পারলে স্বর্গে যাবার পথ অনেক সুগম হত।

রামচন্দ্রকে রাবণনিধনের জন্য দেবী মায়ের অকালবোধন করতে হবে। কিন্তু অকালে দেবীর ঘুম ভাঙাতে পারেন এমন কোনও সিদ্ধ, সাধ্য, মুনি, ঋষি পাওয়া গেল না। অর্থাৎ রামের পূজার পুরোহিত পাওয়া গেল না। ব্রহ্মা বসলেন ধ্যানে। তিনি জানতে পারলেন, একমাত্র রাবণই পারেন মায়ের অকালবোধন করতে। রাবণনিধনের পূজা রাবণকে দিয়েই করাতে হবে। ব্রহ্মাও ছলনার আশ্রয় নিলেন। তিনি ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করে রাবণের কাছে গেলেন। রাবণ ব্রহ্মাকে দেখে চিনতে পারলেন, কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। ব্রহ্মা বললেন—তোমার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে এসেছি, তোমাকে আমার প্রার্থনা পূরণ করতে হবে। রাবণ সব জেনে-বুঝে ব্রাহ্মণরূপী ব্রহ্মার কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। ব্রহ্মা রাবণকে জানালেন যে, ত্রিভুবনেশ্বর রাম অকালবোধন করে দেবীকে জাগাবেন। একমাত্র রাবণ ছাড়া আর কেউই দেবীকে জাগাতে পারবেন না। তাই তাঁকেই রামচন্দ্রের এই অকালবোধনের পুরোহিত হতে হবে। রাবণ জানতেন যে, দেবীর অকালবোধন হলে তাঁরই নিধন হবে তবুও ব্রাহ্মণকে দেওয়া কথা রাখতে তিনি রাজি হলেন। কী অপূর্ব তাঁর সত্যনিষ্ঠা!

ব্রহ্মাকে রাবণ জানালেন—একটি শর্ত আছে! আমি ব্রাহ্মণবেশে সেখানে যাব, কিন্তু আমি যে কে তা যেন রাম-লক্ষ্মণ জানতে না-পারেন।

ব্রহ্মা রাবণের কথাতে রাজি হয়ে গেলেন এবং খুশি মনে বিদায় নিলেন।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর রাবণ প্রসঙ্গে বললেন—এখন প্রশ্ন হল, দেবী রাবণের লঙ্কাপুরী ছেড়ে চলে গিয়েছেন, তাঁকে জাগাবার অধিকার কেন শুধু রাবণেরই আছে? রাবণ সেই অধিকার পেয়েছেন by virtue of his ব্রহ্মচর্য। রাবণের যে ব্রহ্মচর্য ছিল তা অন্য কোনও সাধুসন্তেরও ছিল না। রাবণের চরিত্রের কী অপূর্ব মহিমা! যে মা তাঁব ধ্বংসের জন্য তাঁকে ছেড়ে গিয়েছেন, সেই মায়ের অকালবোধন করতে তিনিই চলেছেন তাঁর শত্রু রামের কাছে। ভক্তিবাদীদের কী partiality যে, এতবড় ভক্তকে তারা রাক্ষস বলে কলঙ্কিত করে রামের মহিমা কীর্তন করছে।

ব্রহ্মা এসে রামচন্দ্রকে জানালেন যে, পুরোহিত পাওয়া গিয়েছে। পূজার আয়োজন শুরু হল। বিভীষণ জানালেন তার দাদা (রাবণ) যখন মায়ের পূজা করতেন তখন কোথা থেকে যেন একশো আটটি নীলকমল আনতেন। সেই জায়গাটি তার জানা নেই, কিন্তু পবনপুত্র হনুমান নিশ্চয়ই হিমালয়ে খোঁজ করে সেই নীলকমল আনতে পারবেন।

রামচন্দ্র হনুমানকে ডেকে বললেন যে, তিনি খুব বিপদে পড়েছেন এবং সেই বিপদ থেকে উদ্ধার করার যোগ্যতা একমাত্র হনুমানেরই আছে। রামচন্দ্র হনুমানকে বললেন—তোমাকে এক্ষুনি হিমালয়ে গিয়ে একশো আটটি নীলকমল সংগ্রহ করে আনতে হবে। হনুমান হলেন পরমভক্ত। তিনি বললেন—আপনি আদেশ করছেন কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমার যোগ্যতা, সামর্থ্য, বুদ্ধি ও সিদ্ধি আপনাকেই জোগাতে হবে। ভক্তের প্রার্থনায় রামচন্দ্র রাজি হলেন। হনুমানও 'জয় শ্রীরাম' বলে যাত্রা শুরু করলেন। হনুমান তো সিদ্ধ মহাযোগী। তিনি অচিরেই পদ্মবন খুঁজে পেলেন। তিনি দেখলেন যে, সেই বন পাহারা দিচ্ছে মায়েরই সব ভক্তরা। হনুমানের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ লেগে গেল। কিন্তু মায়ের ভক্তরা তাঁর কাছে হেরে যেতে বাধ্য হল। এক দিকে গুরুশক্তি আর অন্য দিকে মায়ের ভক্ত—অভিমানী অহংকারীর দল। তাদের

ভক্তি supreme ছিল না। তাই রামভক্তের হাতে তাদের পরাজয় হল। হনুমান নীলকমল নিয়ে রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এলেন।

পূজার আয়োজন সম্পন্ন হল, পুরোহিতও এলেন। দিব্যকান্তি সুঠাম সৌম্য ব্রাহ্মণ। রাম-লক্ষ্মণ পাদ্যার্ঘ্য নিয়ে এলেন। পুরোহিত বললেন যে, তিনি পাদ প্রক্ষালণ করে এসেছেন, পাদ্যার্ঘ্যের কোনও প্রয়োজন নেই। রাবণ পাদ্যার্ঘ্য নিলেন না কেন, এই প্রশ্ন কিন্তু কারও মনে জাগল না।

রাবণ মন্ত্র পড়ে একটি একটি করে পদ্ম অর্ঘ্য দিতে লাগলেন। মাও পড়লেন দ্বিধায়। তাঁরই পরমভক্ত নিজের নিধনের জন্য যজ্ঞ করে চলেছেন! মা রামচন্দ্রকে পরীক্ষা করবার জন্য অঞ্জলির একটি পদ্ম সরিয়ে নিলেন। এদিকে পূজা অসমাপ্ত থেকে যায়। পদ্ম পাওয়া যাচ্ছে না দেখে রামচন্দ্র তাঁর পদ্মপলাশ লোচনকে পদ্মের বিকল্প হিসাবে উপড়ে দিতে গেলে মা বাধা দিলেন এবং পদ্মও ফিরিয়ে দিলেন। পূজা সমাপ্ত হল। এমন পক্ষপাতদুষ্ট মা কিন্তু 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মা নয়। 'এর' মা হলেন Self Consciousness।

এবার পুরোহিত বিদায় নিলেন। রাম-লক্ষ্মণ তাঁকে প্রণাম করতে গেলে তিনি প্রণাম নিলেন না। অথচ কেউ জানল না কে এই ব্রাহ্মণ। আর এই রামচন্দ্রই না কি পরব্রহ্ম সনাতন। সবখানেই fallacy-তে ভরা।

রাবণ বধ হলেন। রামচন্দ্র পড়লেন মহামুস্কিলে। তিনি শুধু ভাবছেন, এতবড় একটা জীবন নষ্ট করলাম, কিন্তু এঁর greatness-কে তো নিতে পারলাম না! তিনি রাবণের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। রামচন্দ্রকে তখন রাবণ বললেন—তুমি ভেব না আমি ভুল করেছি বলে আমার পতন হল। ভুল তুমিও করেছ। আমার ভুলের মাশুল আমি দিচ্ছি আর তোমার ভুলের মাশুল তোমাকেও দিতে হবে। রামচন্দ্র তখন রাবণের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলেন। রাবণ তখন রামচন্দ্রকে সাতাশটি উপদেশ দিলেন। সেই উপদেশগুলি হল—(১) মনের দাস হয়ো না। (২) নারীর ছলনায় ভুলো না (সীতার সোনার হরিণের বায়নাই রামচন্দ্রকে সীতার থেকে দূরে নিয়ে গিয়েছিল। রামচন্দ্র একবারও ভাবলেন না যে, হরিণ কখনও সোনার হয় না)। (৩) পরের কথায় কোনও কাজে লিপ্ত হয়ো না (রাবণের বোন শূর্পণখা রাবণকে কী বলল, রাবণ তা শুনে বেরিয়ে পড়লেন সীতাহরণ করতে)। (৪) আত্মা অতিরিক্ত অন্য কোনও দেবতাকে মেন না। (৫) করব করব বলে কোনও কাজ ফেলে রেখ না। (৬) আত্মনীতিকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত কোর না। (৭) কারওকে তুষ্টও করবে না. রুষ্টও করবে না। (৮) তপস্যার শক্তি বিকৃত কোর না। (৯) বিচার না-করে কারওকে বিশ্বাস কোর না। (১০) নিগূঢ় তত্ত্ব সবাইকে বলবে না। (১১) বিচার না-করে কোনও কর্ম করবে না। (১২) অভিমানকে প্রশ্রয় দেবে না। (১৩) শক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের গুরুত্ব বেশি দেবে। (১৪) সংসারে কেউ আপন নয়। (১৫) ভুল শোধন করতে না-পারলে ভুলের বিকার ভোগ করতে হয়। (১৬) সংকল্প করতে পার, কিন্তু প্রতিজ্ঞা কোর না। (১৭) প্রতিজ্ঞা পূরণ করতে না-পারলে তার ফল ভোগ করতে হয়। (১৮) দেবতাদেরও পূর্ণ বিশ্বাস

করবে না। (১৯) জগতে নিজ অপেক্ষা প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ অন্য কেউ নেই। (২২) ধর্মের রহস্য না-জেনে ধর্মাচরণ করবে না। (২৩) জীবনাদর্শ সবার সমান হয় না, তা জেনে অন্যের সঙ্গে ব্যবহার করবে। (২৪) আত্মানুশাসন ও রাজ্যশাসন (প্রজা অনুশাসন) সমান হয় না। (২৫) অপরাধীকে তিনবার ক্ষমা করবে, চতুর্থবার ক্ষমা করবে না। (২৬) কূটনীতিশূন্য রাজনীতি হয় না। (২৭) সত্যশূন্য আত্মনীতি হয় না এবং আত্মনীতি বাদ দিয়ে মুক্তিশান্তি মেলে না।

উপদেশান্তে রাম রাবণকে জানালেন—যা জানতাম না তা জেনে আমি তোমাকে গুরু বলে মেনে নিলাম। আত্মার standpoint-এ এটাই সম্ভব।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পটি শেষ করে বললেন—এতবড় একজন মহৎ character-কে দেবতারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দেববিদ্বেষী, রাক্ষস ইত্যাদি নানা ভাবে কলুষিত করেছেন। অথচ স্বয়ং শিব ছিলেন রাবণের দ্বারী, ভগবতী মাতা ছিলেন তাঁর ইষ্টদেবী। ছল করে দেবতারা তাঁর সব শক্তি কেড়ে নিয়ে শ্রীরামকে মাথায় তুললেন। এই রামচন্দ্র যিনি সীতার জন্য এতদিন এত প্রাণক্ষয় করা যুদ্ধ করলেন তিনিই দেশে ফিরে প্রজাদের কথায় সীতাকে ত্যাগ করলেন। সীতাকে পরে অগ্নি পরীক্ষা দিতে বাধ্য করাতে সীতা ধরিত্রী মাতার কোলে আশ্রয় নিয়ে শান্তি পেলেন। এই সীতাকে কী করে জগন্মাতা বলা যাবে? কার্য যেন কারণের মধ্যে প্রবেশ করল। এ সব ভাবলে মনে হয় sad, রামায়ণ কত fallacy-তে ভরা।

আবার দেখ বালী ও সুগ্রীব দুই ভাই। একজন পরাক্রমশীল, অপরজন স্বার্থান্বেষী। একবার তাদের রাজ্যে এক দৈত্যের আবির্ভাব হয়। দু'জনেই দৈত্যটির সঙ্গে যুদ্ধ করছিল। হঠাৎ দৈত্যটি বালীকে একটি গুহার মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। সুগ্রীব তখন গুহামুখে দাঁড়িয়ে। এই ভাবে অনেকদিন কেটে গেল। বালী আর ফিরছে না দেখে সুগ্রীব ভাবল, তার দাদা হয়ত দৈত্যের হাতে মারা গিয়েছে। সে গুহার মুখে বিরাট একটি পাথর চাপা দিয়ে রাজ্যে ফিরে এল। এটাই সংসারীর ধর্ম! এদিকে বালী দৈত্যকে বধ করে ফিরে এসে দেখে গুহার দ্বার বন্ধ। তার অসীম শক্তি দিয়ে সেই পাথর সরিয়ে সে বেরিয়ে আসে। সেই থেকে বালী ও সুগ্রীবের মধ্যে রয়েছে শত্রুতা।

বালী একবার সুগ্রীবের স্ত্রীকে হরণ করল। দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হল। সুগ্রীব হেরে যাচ্ছিল। সে রামচন্দ্রের শরণাপন্ন হলে রাম বালীকে বধ করলেন : মৃত্যুর সময় বালী রামচন্দ্রকে বললেন—আমি তো তোমার সঙ্গে কোনও শত্রুতা করিনি, তবু তুমি কেন আমায় মারলে? রামচন্দ্র বললেন—তুমি আমার মিত্রের শত্রু তাই। আমার মিত্র আমাকে আমার স্ত্রীকে রাবণের হাত থেকে উদ্ধার করতে সাহায্য করবে। বালী বলল—তোমার রাবণের প্রয়োজন ছিল তো আমায় বললে না কেন? আমি ওকে বেঁধে এনে তোমার পায়ে ফেলে দিতাম। আমি চৌদ্দবার রাবণকে জলে চুবিয়েছি। রামচন্দ্র বালীর কথা শুনে নিরুত্তর রইলেন, কী আর বলবেন। ভগবানেরও লোক চিনতে ভুল হয়।

চৌদ্দ বছর বনবাসের পর রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরলে ভরত তাঁকে আসন ফিরিয়ে দিলেন। রামায়ণে একমাত্র ভরতের চরিত্র হল সৎ, নিষ্ঠাবান ও নিষ্কলঙ্ক। কিন্তু কল্পিত ভগবান রামকে বড় করে দেখাবার উদ্দেশ্যে ভরতের চরিত্রকে খর্ব করা হয়েছে।

অনেকেই প্রশ্ন করেছে—তুমি রামচন্দ্রের চেয়ে রাবণকে কেন বড় করে দেখ? তাদের বলা হয়েছে—তোমাদের কল্পিত রামকে বড় করে দেখি না কেন? 'এর' কাছে Self is not two, there is only one Self—রাম এবং রাবণ দু'জনেই Self। ভক্তিবিজ্ঞানে বলা হয়, Self এক হলে ভগবানের লীলা হবে কেমন করে? লীলা বলতে তারা কী বোঝে তা তারাই জানে। আত্মজ্ঞানের দৃষ্টিতে লীলা হল ঈশ্বরের dream।

ভক্ত শিরোমণি হনুমানকে লক্ষ্মণ একটু ঈর্ষা করতেন। লক্ষ্মণের মতে তিনিই একমাত্র রামভক্ত। হনুমানের ভক্তিকে তিনি সহ্যই করতে পারতেন না। তিনি হনুমানকে পরীক্ষার দ্বারা ভোলাতে চাইলেন। লক্ষ্মণ তাঁর গলার মুক্তোর মালাটি হনুমানকে দিলেন। হনুমান একটি একটি করে মুক্তো দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে কামড়ে ফেলে দিতে লাগলেন, কারণ তাতে রামচন্দ্র নেই। লক্ষ্মণ হনুমানের এই আচরণে বিরক্ত হয়ে তাঁকে জানোয়ার বলে গালি দিলেন ঠিকই, কিন্তু বুঝলেন হনুমানের ভক্তির পরিমাপ। যাতে রাম নেই তা হনুমানের প্রয়োজন নেই। রামই হনুমানের কাছে সব, রাম ছাড়া কোনও কিছু তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

রামচন্দ্র পুনরায় অযোধ্যার রাজা হয়ে বসলে তাঁর দক্ষিণের বন্ধুদের ফেরার পালা। বিভীষণের অভিষেক হয়ে গিয়েছিল, তাকেও এখন ফিরে যেতে হবে। সুগ্রীবকেও তার রাজ্যে ফিরে যেতে হবে, হনুমানকেও ফিরতে হবে। হনুমানকে রাম জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার সাথে আমার কিসের সম্পর্ক? হনুমান বললেন—সেটাও আমার মুখ দিয়ে তোমাকেই বলতে হবে। তারপর তিনি বললেন—বাইরে তুমি আমার প্রভু আর আমি তোমার দাস, অন্তরে অংশ ও অংশী এবং হৃদয়ে তুমি-আমি অভিন্ন।

হনুমানের এই উক্তি যোগ, ভক্তি ও জ্ঞানের চরম কথা। কিন্তু দ্বৈতবাদীরা কী এমন মানে? তারা পূজা করে ভক্তি দেখায় স্বার্থের খাতিরে। স্বার্থপূরণের আশায় ভগবানকে বলে—পাঁঠা দিয়ে পূজা দেব। আর স্বার্থপূরণ হলে নিজের কথা রাখে না। তখন ভগবানকে বলে— ঠাকুর তুমি ধরে খেও। আসলে বর্তমানে মানুষ সহজে কিছু পেয়ে যাবার আশায় ক্রিয়াকলাপের প্রতি বেশি গুরুত্ব দেয়। তার উপরেই তারা জোর দেয় বেশি, তাকেই ধর্মের পথ বলে মনে করে। কোনও মতপথই পূর্ণ নয়, no means and process is perfect। যত মতপথ আছে তার অনুশীলনে ধর্মকে পাওয়া না-গেলেও তা মনকে শান্ত করতে কিছুটা সাহায্য করে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত ও বিগড়ে যাওয়া মনকে কী করে সামাল দেবে? এই মনকে সামাল দিতেই চাই Self-Knowledge। Self-Knowledge জাগ্রত হলে তা আর কখনও হারায় না। আত্মসূর্য কখনও অস্ত যায় না।

১৪ । ৭ । ৯৬

৩৪৮

সংসারীর সাধ অনেক অথচ সাধপূরণের জন্য তার নিজের কোনও চেষ্টা নেই। সাধুসন্ন্যাসীদের পিছনে ঘুরে শুধু ফোকটে পাওয়ার ধান্দা। কোনও কিছুই এমনি এমনি পাওয়া যায় না। তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন।

একটি লোক ছিল। তার মন ভরা ছিল সাধ, কিন্তু নিজে কিছু করে না। সারাদিন বাড়িতে বসে থেকে বাড়ির লোকেদের দিয়ে সব করিয়ে নেয়। নিজে রোজগারও করে না, আবার অহংকার-অভিমানে ভরা। একদিন বাড়ির লোকেদের সাথে তার ঝগড়া হল। সে তো মেজাজ দেখিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। বাড়ি থেকে বেরিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায়, কিছুই খাওয়া জোটে না। তার নিজের থেকে কিছু করারও ক্ষমতা নেই। কিন্তু কাজ না-করলে তো কেউ খেতেও দেবে না। না-খেতে পেয়ে অভিমান-অহংকারে অসুস্থ অবস্থায় সে একটি গাছের তলায় পড়ে রইল।

সেই সময় এক পাগল সেখানে এল। সে প্রথমে ভাবল, তার এলাকায় নূতন কেউ এসেছে, কাজেই তাকে তাড়াতে হবে। পাগল সেই লোকটিকে দেখে বুঝতে পারল যে, তার কী হয়েছে! পাগল তাই তাকে তার কৃত কর্মের ফল ভোগ করাবার জন্য মনে মনে ঠিক করল। লোকটি পাগলের কাছে সাহায্য চাইল। অনাহারে অসুস্থ লোকটি কোনও কথাই বলতে পারছিল না। পাগল কিন্তু তাতে গলে না-গিয়ে লোকটিকে বলল—এতদিন আরাম করেছ, এবার ষোলো আনা ফিরিয়ে দিতে হবে। বিকার যা হয়েছে তা তো ভোগ করতেই হবে।

সেদিন পাগল তাকে ঐ অবস্থায় ফেলে রেখে দিয়ে চলে গেল। তখন সেখানে এক সহৃদয় ব্যক্তি এল। সে এই অসুস্থ লোকটিকে আহার ও জল দিতে চাইলে পাগল ছুটে এসে বাধা দিল। সে বলল—এটা আমার এলাকা, কারওকে কিছু দিতে হলে আমাকে আগে ভাগ দিতে হবে। লোকটি তাতে রাজি হল, পাগল সবটাই নিজে নিয়ে নিল। অসুস্থ লোকটিকে পাগল কিছুই দিল না। সেই লোকটি চলে গেল। অসুস্থ লোকটি তখন একটু জলের জন্য হাপিতোশ করছিল। তাব ক্ষমতাও নেই যে একটু উঠে গিয়ে জল সংগ্রহ করবে। তখন পাগল হাতে করে একটু জল এনে তার মুখে দিল আর বকাবকি করে সেখান থেকে চলে গেল।

পরদিন আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল। প্রকৃতির কী খেলা! লোকটি তখন বৃষ্টির জল খেল। বৃষ্টির জলে স্নান করে তার দেহের গ্লানি অনেকটা ধুয়ে গেল। মায়ের খেলাই মায়ের লীলা। পরদিন নির্মল আকাশের বিশুদ্ধ বাতাসে লোকটি বেশ সতেজ হয়ে উঠল।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানেই দেখ প্রকৃতি মায়ের খেলা! মা হলেন সর্বশক্তিস্বরূপিণী। তিনিই সবাইকে চালাচ্ছেন। এমনকী ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও তাঁর অঙ্গুলি হেলনে চলছেন। তা না-হলে মহেশ্বরের পত্নী সতীকে বাপের বাড়ি যেতে বারণ করায় সতী যখন স্বমূর্তি ধারণ করলেন তখন শিবও ভয়ে কেঁপে উঠেছিলেন। শক্তির এমনই খেলা! এই শক্তির কোনও রূপ নেই। শক্তি তাহলে কোথায়? দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একে একে কেটে ফেললেও দেহ তখনও থাকে, অর্থাৎ মৃত্যু হয় না। কিন্তু প্রাণ না-থাকলেই দেহ মৃত হয়। তবে প্রাণই কি শক্তি? প্রাণ তো বায়বীয় শক্তি, তার তো চেতনা নেই। আসলে চৈতন্যই হল শক্তি। তা দেহের মধ্যে থাকে, প্রাণের মধ্যে। প্রাণ দুই প্রকার—মুখ্য প্রাণ ও গৌণ প্রাণ। চৈতন্য আছে মুখ্য প্রাণে আর গৌণ প্রাণ

হল বায়বীয় শক্তি। প্রাণের মধ্যেই আছে এই চৈতন্যশক্তি। এই চৈতন্যশক্তি না-থাকলে কিছুই সম্ভব হয় না। এই চৈতন্যস্বরূপকে জানতে পারলে মুক্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে। তোমাদের কল্পিত ধর্মাচরণ ও ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে মুক্তস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। মন, প্রাণ, বুদ্ধি, দেহ, ইন্দ্রিয় ও অহংকারের ধর্ম সব আলাদা আলাদা। তাদের একত্রিত করে সামঞ্জস্য আনা সম্ভব নয়। কাজেই ধর্মকেও পেতে হবে কর্মের মাধ্যমেই।

প্রসঙ্গ শেষ করে তিনি গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন—হ্যাঁ, সেই লোকটির কথা বলছিলাম। লোকটি যখন একটু সতেজ হয়েছে তখন পাগল কিছু ফল নিয়ে এসে তাকে সবচেয়ে ছোট ফলটি দিল। লোকটি সবচেয়ে বড় ফলটি চাইলে পাগল বলল—এটা পেতে অনেক দেরি আছে। সে আরও একটু সুস্থ হলে পাগল তাকে কাঠ সংগ্রহ করতে পাঠাল। লোকটি কোনওক্রমে কাঠ নিয়ে এল। পাগল এবার তাকে জল সংগ্রহের কথা জানালে লোকটি পাগলকে বলল—জল আনব কিসে? পাগল বলল—যে-ভাবে পার নিয়ে এস। কী ভাবে আনবে সেটা তোমার নিজের ব্যাপার। লোকটি পথে যেতে যেতে একটি মাটির হাঁড়ি পেল, শ্মশান যাত্রীরা হয়ত মড়া পোড়াতে এসে ফেলে গিয়েছে। অগত্যা সেই হাঁড়ির মধ্যে করেই লোকটি জল আনল। তা দেখে পাগল বলল—এটা তো মড়ার হাঁড়ি। যাক, এনেছ যখন রেখে দাও। এই ভাবে ধীরে ধীরে লোকটিকে সংস্কারমুক্ত করতে লাগল পাগল। এখানে পাগলের ভূমিকা হল মা ও গুরুর। গুরুবরণ করলে তো তাঁকে দক্ষিণা দিতে হয়।

এরপর পাগল তাকে পাঠাল ফলমূল সংগ্রহ করে আনবার জন্য। সেখানে সে বন্যজন্তুর তাড়া খেয়ে ফিরে এল। পাগল তখন লোকটিকে বলল—তাহলে শহরে যাও, সেখান থেকে খাদ্য সংগ্রহ কর।

পাগল একটু একটু করে তৈরি করছে লোকটিকে। লোকটি বলল—আমি তো শহর চিনি না। পাগল বলল—তোমার হাত, পা, মাথা, চোখ, কান আছে। নিজের ব্যবস্থা নিজে কর। লোকটি তো শহরে এল। সেখানে কারও কাছে কিছু খেতে চাইলে তারা বলে—চেয়ে খেতে লজ্জা করে না? গতর আছে, খেটে খাও। ঘুরতে ঘুরতে কাজের সন্ধানে লোকটি এক জায়গায় এল যেখানে মাটি কেটে অন্যত্র ফেলে আসা হয়। সেখানে সে কাজ চাইল। কিন্তু সে তো কোনও দিন কাজ করেনি, সে কী করে কাজ করবে? একঝুড়ি মাটি ফেলে সে হাঁপিয়ে উঠল। সে তখন ভাবতে বসল নিজের কথা। কিন্তু মালিকের তাড়া খেয়ে কাজ করতেই হয়। এটাই তার প্রথম practical work।

কর্ম তিন প্রকার, যথা—কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম। কর্ম করলে তার একটা ফল আসে। তা শুভ, অশুভ এবং শুভাশুভ। কিন্তু এমন কর্মও আছে যা করলে আর কোনও ফল আসে না। কর্মফল আসে কর্মের ব্যবহার অনুসারে। ব্যবহারদোষেই জীবনে আসে জন্ম-মৃত্যু, জরা-ব্যাধি। এ সব নিয়েই সংসার। আর ব্যবহারদোষ না-থাকলে সব সমসার, তখন আর কোনও বিপদ নেই।

তাই বলা হয়েছে, 'কৃপা'-র অর্থ হল করে পাওয়া। যা-কিছু পাবার তা নিজেকেই নিজের জন্য করে পেতে হবে। সবই আছে নিজেরই মধ্যে। মুক্তিও সেখানেই আছে।

শুধু তা হারিয়ে গিয়েছে—তাকে আবার অর্জন করতে হবে। জগতে সব কিছুই হয় বিনিময়ে। কাজের বিনিময়ে অর্থ এবং অর্থের বিনিময়ে খাদ্য। খাদ্যের বিনিময়ে সামর্থ্য। তাই তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে, এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।"

এই ভারতভূমি একসময় শিক্ষাদীক্ষায়, সাহিত্যে, শিল্পে সবার আগে ছিল। কেউ কেউ প্রশ্ন তোলে যে, বিজ্ঞানে ভারত পিছিয়ে ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানে ভারত পিছিয়ে ছিল না। কতটুকু ভারতের ঐতিহ্যের খবর রাখে মানুষ? ঈশ্বর গুপ্ত তাই বলেছিলেন—"বিদেশি কুকুর পূজি দেশের ঠাকুর ফেলি।" নিজের দেশকে জান, নিজেকে জান। I must be conscious about myself. প্রথমে outer nature-কে জান, তারপর inner nature-কে, তারপর আরও greater-কে জানতে বোধের কেন্দ্রে যেতে হবে। যাঁকে তুমি ভগবান বলে মানছ, তাঁ হল তোমারই বৃহত্তর অংশ। ভগবান বলে আলাদা কিছু নেই। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) এই greater part-কেই বলেছে আমি। এই আমি হল চৈতন্যস্বরূপ—Consciousness Itself। এই Consciousness-কে অখণ্ড একবোধে মানতে হবে। খণ্ডবোধে নিলে ঠকবে। অখণ্ডকে গ্রহণ করলে কোনও দিন ঠকবে না।

প্রসঙ্গটি এখানে শেষ করে তিনি আবার গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন—যাক, ধীরে ধীরে লোকটির মধ্যে সামর্থ্য তৈরি হল। তারপর সে নিল পাথর বহন করার কাজ। ধীরে ধীরে তার যোগ্যতা ও সামর্থ্য বাড়তে লাগল এবং সে তা নিজেই অর্জন করল। তারপর লোকটি contractor হয়ে business খুলে বসল।

লোকটি একদিন দেখল এক সাধু একটি গাছের নিচে বসে কয়েকজন লোকের কাছে ধর্ম ব্যাখ্যা করছেন। লোকটি এখন কাজের মধ্যে থেকে থেকে এমন অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে যে, অন্যদেরও কাজ ছাড়া বসে থাকতে দেখতে পারে না। লোকটি সাধুর ভক্তদের বলল—তোমরা যে এখানে বসে আছ, তোমাদের কোনও কাজ নেই? একজন উত্তর দিল—এখানে যা শুনছি পরে তা কাজে লাগবে। এখানকার কথাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে কাজে ব্যবহার করতে পারলে কাজ নির্ভুল হবে। এখানে সাধু বলছিলেন—(১) চোখে দেখে পথ চলবে; (২) নিজের কানে শুনে তবেই বিশ্বাস করবে, অপরের কাছে শোনা কথা বিশ্বাস করবে না; (৩) নিজে হাতে কাজ করবে; (৪) মাথা ঠান্ডা রেখে শান্ত হয়ে কাজ করবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর ভক্তদের উদ্দেশে বললেন—সমাধির গভীরে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) এগুলি দর্শন হয়েছে। সমাধি হল দর্শনের বিজ্ঞান। সেখানে কোনও ফাঁকি নেই। কোনও কিছু জানতে হলে নিজেকে assert করতে হয়, ফাঁকি দিয়ে নয়। কাজ ফেলে রাখবে না। যখনকার কাজ তখনই করবে। কর্মকে অনুভূতির রাজ্যে আনলে হয় ধর্ম। আর অনুভূতিকে স্বানুভূতিতে ডোবালে হয় সারমর্ম। কিন্তু সংসারী মানুষ তো স্বখাতসলিলে ডুবছে। নিজের কাছে নিজেই ধরা পড়বে। মিথ্যা কথা, কুচিন্তা ও কুসঙ্গ করে দিন কাটাচ্ছ, এর ফল তো একদিন নিজেকেই

ভুগতে হবে। কেউ এসে তোমার কর্মফল ভোগ করবে না। কর্মফল ভোগ না-করলে তা শেষ হবে না। নিজেকে শোধন করে উপযুক্ত করে তুলতে বহু যুগ লেগে যাবে।

২৫ । ৮। ২০০০

৩৪৯

সচ্চিদানন্দস্বরূপের স্বভাব সচ্চিদানন্দময় হলেও তার প্রকাশভঙ্গিমা স্বতন্ত্র। স্বভাবের রূপ-নাম-ভাবের মহিমাকে বারবার প্রকাশ করেই তার আনন্দ। এই আনন্দ যখন পরিপূর্ণ হয়, তখন আবার স্ববোধে ফিরে যেতে অন্তর ব্যাকুল হয়। শুধুমাত্র তপস্যা বা সাধনভজন দ্বারা স্ববোধে ফেরবার চাবি পাওয়া যায় না। স্বভাব থেকে স্ববোধে যাবার সাধনা হল এক অভিনব সাধনা। এই সাধনা পরিশেষে আত্মভজনার রূপ নেয়। স্ববোধে ফেরার জন্যই আত্মভজনা। অন্যান্য ভজন হল স্বভাব মহিমা কীর্তন। স্ববোধ ও স্বভাবের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল ভাবের। স্বভাবে রূপ-নাম মিশে আছে ভাবে। কিন্তু স্ববোধে রূপ-নাম নেই। সেখানে ভাব মিশে গিয়েছে প্রেমে, যে প্রেমের সন্ধান পাওয়া যায় সমাধির গভীরে। স্বভাবে মনের ভাববৃত্তি হল অনুভূতি আর স্ববোধে মনের শুদ্ধবোধে হয় স্বানুভূতি। এই স্বানুভূতির পরিচয় বুদ্ধির অতীত। বুদ্ধি দিয়ে তা ধরা-ছোঁয়া যাবে না। কদাচিৎ দু-একজন সাধকের মনে এই স্বানুভূতি খেলে, তত্ত্বস্ফূর্তি হয়। তার জন্যই প্রয়োজন হয় আত্মভজনের। ভজন স্বভাবের মহিমাকে অবলম্বন করে গড়া ও সে-ভাবেই হয় তার আস্বাদন। আস্বাদন কে করে ও কাকেই বা করে? রসের আস্বাদনের জন্য একজন রসবেত্তা তো চাই। তখনই হয় ত্রিগুণের বিস্তার, permutation and combination করে ত্রিগুণ ছড়িয়ে পড়ে। হৃদয়ের তাগিদ না-থাকলে এ সব ভজন শুনেও কোনও লাভ হবে না। কিন্তু যখন নিজের মধ্যে, নিজের ঘরে (স্বঘরে) ফেরার তাগিদ অনুভূত হবে, ব্যাকুলতা জাগবে, টান আসবে 'ফিরে চল আপন ঘরে', তখনই আত্মভজনার মাধ্যমে ফেরার পথ সুগম হবে। স্বভাবের আছে মৃদু, মন্দ, তীব্র ও আরও কত ভাবভঙ্গি, কিন্তু স্ববোধে এ সব নেই। স্ববোধ স্থির ও শান্ত। বাইরে থেকে তার স্বরূপ আন্দাজ করা যায় না। যতই অখণ্ড সম্বন্ধে, স্ববোধ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা কর, তা তো সবই অনুমান। অনুমান সত্য হয় না। স্ববোধকে গ্রহণ করার মতো অধিকারী বুদ্ধি খুব কম। সবাই স্বভাব নিয়ে আছে। স্ববোধের মহিমা জানে ক'জন? স্ববোধের মহিমা যিনি জেনেছেন, তখন কে করে কার মহিমা কীর্তন? তাঁরা তো স্ববোধে অভেদে বাস করেন। তাঁরা জগতে যে পরিচয় রেখে যান, তা একমাত্র উত্তম অধিকারীই পায়। সাধারণ মানুষ তা ধারণাও করতে পারে না। তবু মানুষ চেষ্টা করে। কারণ সবাইকে একদিন স্ববোধে ফিরতেই হবে। অনেকের মতে, সংসারে থেকেই সাধনভজন করে স্ববোধে ফেরা সম্ভব। আবার অনেকে বিশ্বাস করে যে, সংসারে থেকে সাধনা হয় না। সাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করতেই হয়।

একবার এক মহাপুরুষের কাছে একজন মস্ত বড় অধিকারী এল। সে বিদেশি ছিল। অর্থ, বিত্ত, বিদ্যা, স্বাস্থ্য, কুল, মান, যশ সব থাকা সত্ত্বেও তার মধ্যে বৈরাগ্যের ভাব

প্রবল ছিল। পাশ্চাত্যদেশে বৈরাগ্যের মূল্য কেউ দেয় না। সেই বিদেশি প্রাচ্যদেশ ভারতবর্ষের দর্শন সম্পর্কে কিছু জানত। তাই সে এই দেশে চলে আসে। নানা জায়গা ঘুরে ঘুরে একসময় তার এই মহাপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অন্তরের বৈরাগ্যের তাড়নায় সে একদিন মহাপুরুষের কাছে সন্ন্যাস ভিক্ষা চাইল। মহাপুরুষ তাকে বললেন—সন্ন্যাস নেবার আগে তোমার কিছু অর্ধসমাপ্ত কাজ শেষ করতে হবে। এ কথা শুনে বিদেশি লোকটি বলল—আমার সব কাজ হয়ে গিয়েছে। এ সবে আর মন লাগে না বলেই তো আপনার কাছে সন্ন্যাস চাইছি।

মহাপুরুষ তাকে বললেন—সন্ন্যাস নিতে হলে কী কী করতে হবে আগে তা তোমাকে শিখতে হবে। তোমার জানা যে বিদ্যা আছে আগে তা ঈশ্বরসেবায় নিয়োগ কর।

বিদেশি লোকটি বলল—তাহলে তো আবার সংসার ভাববোধে ফিরতে হবে।

মহাপুরুষ বললেন—সংসার তো ঈশ্বর-আত্মা ছাড়া নয়। সেখানে তাহলে তোমার আত্মার বা ঈশ্বরের সেবা কী ভাবে করতে পারবে?

বিদেশি লোকটি বলল—আচ্ছা, তাহলে আমি আগে দেশকে ভাল ভাবে দেখে নিই।

মহাপুরুষ তাকে বললেন—biased, prejudiced মন দিয়ে নয়, খুব খোলা মনে দেখতে হবে।

বেশ কিছুদিন পরে বিদেশি লোকটি এসে মহাপুরুষকে বলল—এখানে মানুষের কত দুঃখকষ্ট, দারিদ্র, অভাব, লাঞ্ছনা ও অশিক্ষা। মহাপুরুষ তাকে বললেন—তাহলে এখন তুমি কী করবে? বিদেশি লোকটি বলল—আমি আমার বিবেক-বৈরাগ্য আপনার কাছে জমা রাখলাম। এখন আপনি যা নির্দেশ দেবেন তা-ই করব। মহাপুরুষ বলল—তাহলে এই সব নররূপী নারায়ণের সেবায়, এই সব আত্মাদের মঙ্গল কামনায় তোমার বিদ্যা প্রয়োগ করে এদের জন্য কাজ শুরু কর। তোমার কাজ তুমি স্বাধীন ভাবে করবে।

সে বেশ কয়েকদিন ভাবল, অন্যের সাহায্য ছাড়া কাজ করতে হলে নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগাতেই হবে। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগাতে সে ব্যাকুল হল। তার অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতাই তার কর্মশক্তিকে ঈশ্বরজ্ঞানে জীবসেবায় নিয়োগ করল। লোকটির কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণা ছিল। সেই গবেষণা ও আপন অন্তরের অনুভূতিকে প্রয়োগ করে সে plant life ও animal life-এর নিবিড় সম্বন্ধ আবিষ্কার করল। Plant life-এর মধ্যে একটা vibration আছে। আবার animal life-এর মধ্যেও আছে প্রাণের স্পন্দন বা vibration। এই vibration-কে কাজে লাগাতে গিয়ে প্রাচীন এক আয়ুর্বেদিক ভাবকে সে উদ্ধার করে ফেলল। এই ভাবে সে একটি electromagnetic যন্ত্র আবিষ্কার করে ফেলল। এই যন্ত্রটি plant life-এর ফুল-পাতার vibration note করে animal life-এ যেখানে ঘাটতি আছে সেখানে তা put করে ঘাটতি পূরণ করতে পারত।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সেই বিদেশি লোকটি একদিন 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) বলেছিল—আপনার "All Divine for All Time, as It Is"

—এই বক্তব্যটি বড় সুন্দর। "All Divine for All" এটুকু তো অনেক শাস্ত্রেই আছে, কিন্তু "as It Is"-টুকু কোথায় পেলেন?

জীবন দিয়েই জীবনকে পাওয়া যায়—এই দৃষ্টিতে জড় বলে কিছু থাকতেই পারে না। বেদান্তও বলেছে চেতন অতিরিক্ত কিছু নেই, তাহলে অচেতন বস্তু কিছু থাকতেই পারে না, জড় বা চেতনের অনুভূতিই হতে পারে না। সচেতন অনুভূতি বা স্বানুভূতি হল মাতা, বুদ্ধি হল সন্তান। সন্তান তার মাকে মাপবে কী করে? বুদ্ধি দিয়ে তাই স্বানুভূতিকে কখনও জানা যায় না।

একটি প্রদীপ বা candle দিয়ে লক্ষ candle জ্বালানো যায়। এই সব আলো সমপর্যায়ের। তেমনই একজন আত্মজ্ঞপুরুষ হাজার হাজার মানুষকে আত্মবোধে সমৃদ্ধ করতে পারেন। যে জীবন স্বানুভূতির জন্য তৈরি হয়েছে তার মধ্যেই স্বানুভূতির ভাব-ভাষা নেমে আসে। শাস্ত্রের মূলকে যিনি ধরতে পেরেছেন তাঁর কাছে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা তো dry লাগবেই। শাস্ত্রের মূল আছে নিজের মধ্যে নিজের বোধে—স্বহৃদয়ে স্ববোধে। নিজেকে জানাই তাই একমাত্র লক্ষ্য। নিজেই নিজের আরাধ্য। পূজা হয় নিজেরই বৃহত্তম অংশের। তাই তো মহাপুরুষগণ বলে গিয়েছেন—দুর্লভ এই মনুষ্যজন্ম পেয়েছ। এই জীবনের মধ্যেই আছে ব্রহ্মত্ব ও আত্মত্বের বীজ। সেই বীজকে অঙ্কুরিত কর। তাকে জাগাও অন্তরে। আত্মবোধের ফসল ফলাও। এই আত্মবোধই হল সর্বচেতনের মূল—Reality, Consciousness as It Is. এই আত্মবোধ which reveals not only all else but also reveals its truth, beauty and goodness—যাকে বলা হয় "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"।

১৫। ৯। ২০০০

৩৫০

এখানকার (সোসাইটির সৎসঙ্গে) কথা যার যেমন সামর্থ্য সে সে-ভাবেই গ্রহণ করবে। একবার হাওড়ার এক গ্রামে programme করার জন্য কলকাতা থেকে বড় বড় artist নিয়ে আসা হয়েছিল। উদ্যোক্তাদের বলা হল—গ্রামের লোক এ সব গান শুনতে অভ্যস্ত নয়, তাদের এই গান ভাল লাগবে না। তাদের যেটা ভাল লাগে সেটা করাই ভাল। তারা কেউ এই কথা শুনল না। শেষে দেখা গেল function শুরু হলে একজন একজন করে লোক উঠে চলে যেতে লাগল, মাত্র তিনজন বসে শুনল। অর্থাৎ যে যেমন তাকে সে রকম ভাবেই দেওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি, শোন।

এক তেল চকচকে বৈদান্তিক এক গ্রামে গিয়ে এক ব্যক্তির বাড়িতে উঠেছিল। সেখানে সে দুধ, ঘি দিয়ে সাত্ত্বিক আহার করে আর গ্রামের লোকেদের ত্যাগ-বৈরাগ্যের জ্ঞান দেয়। কিছুই কিছু নয়, সব মায়া—এই কথা তিনি সর্বদা বলেন। বেশ কয়েকদিন ধরে তার জ্ঞান শুনে গ্রামবাসীদের মনে বৈরাগ্যের ভাব জাগে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা হল যে, তারা প্রায় রান্না-খাওয়া বন্ধই করে দিল। কয়েকটি যুবক এ সব দেখে প্রমাদ গুণল। তারা গিয়ে সেই বৈদান্তিককে challenge করে বলল—তুমি যে এ সব

জ্ঞান দিচ্ছ, ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলছ, আমাদের তো না-খেয়ে মরার উপক্রম হয়েছে। আর তুমি নিজে তো বেশ ঘি, দুধ খাচ্ছ।

বৈদান্তিক বলল—আমি না-থাকলে বলবে কে?

যুবকরা বলল—আমরা না-থাকলে শুনবে কে? দাড়াও তোমায় মজা দেখাচ্ছি।

এই কথা বলে যুবকরা সেই বৈদান্তিকের গলায় গামছা দিয়ে টানতে টানতে নদীর পারে নিয়ে এল। তারা বৈদান্তিককে বলল—এতদিন তুমি আমাদের মেরে আনন্দ পাচ্ছিলে, এবার তোমাকে নদীর মধ্যে ডুবিয়ে মেরে আমরা আনন্দ করব। বৈদান্তিক তো কেঁদেকেটে হাতে-পায়ে ধরে কোনও রকমে পালানোর চেষ্টা করল।

তখন যুবকরা তাকে বলল—অপাত্রে জ্ঞান দেবে না। জ্ঞান কেউ চাইলে দেবে, অযাচিত ভাবে জ্ঞান দেবার কোনও প্রয়োজন নেই। আর যেই জ্ঞানে তুমি নিজে প্রতিষ্ঠিত নও সেই জ্ঞান অন্য কারওকে দেবে না। সবকে এক-এ আনা মানে খাওয়া বন্ধ করা নয়। প্রকৃত অর্থকে অনুধাবন করতে হয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—সব কিছুকে এক-এ আনা হল ignorance-কে বা অজ্ঞানকে দূর করা। Ignorance is a concept of mind. জ্ঞান ও অজ্ঞান—দুটিই মনের বৃত্তি। মনের এক দিকে জ্ঞান, অন্য দিকে অজ্ঞান। যে তুমি নিজেকে সসীম ও মৃত্যুর অধীন ভাবছ, সেই তুমিই অসীম অনন্ত পূর্ণ। তোমার ভিতরের আমিকে নাড়া দিয়ে তোমার মধ্যে যত ভ্রান্তি, ভীতি আছে তা দূর করতে হবে। তুমিই একদৃষ্টিতে তোমার ভ্রান্তি, ভীতির knower, আবার তুমিই অন্যদৃষ্টিতে তোমার আত্মার knower। Knower একজনই—the One Self।

২৯। ৯। ২০০০

৩৫১

বোধের বৃত্তি জীবনে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির মাধ্যমে খেলছে। বৈচিত্র্য ভাবে খেলতে খেলতে মার্জিত ও শান্ত হয়। পরে আরও মার্জিত হয়ে একেবারে শান্ত হয়। তারপর শান্ত হতে হতে স্থির হয় এবং একাত্ম হয়ে যায়। এবার একেবারে গভীরের কথা বলা হচ্ছে।

সত্তা স্থির। তাঁর বক্ষে শক্তি নিত্যযুক্ত হয়ে তাঁর ইচ্ছাতেই খেলছে। সত্তার কোনও ইচ্ছা জাগে না। দর্শন, বিজ্ঞান ও ধর্ম কিন্তু lowest unit of Consciousness-কেই সত্য বলে মনে করছে। তাই দর্শন এক ভাবে ব্যাখ্যা করছে, বিজ্ঞান আরেক ভাবে ভাবছে ও ধর্ম অন্য ভাবে তা গ্রহণ করছে। একমাত্র স্বানুভূতির গভীরেই এই তিনের মর্ম এক হয়ে ফুটে ওঠে। তা-ই হল 'Knowledge of Knowledge'। এই 'Knowledge of Knowledge' লাভ করতে হলে জীবনকে মার্জিত করতে হবে, inner nature-কে refine করতে হবে। মানুষ তা পারে না, কারণ মানুষ প্রবৃত্তি মার্গে চলতেই অভ্যস্ত। সে নিবৃত্তি মার্গে চলার অভ্যাস করে না। মনে সাধ-আহ্লাদ রেখে তো আর ধর্ম হয় না!

মানুষের জীবনের ইতিহাসের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, যুগে যুগে মানুষের ভাবের ধারা পাল্টেছে। সত্য যুগে এক রকম, ত্রেতা যুগে এক রকম,

দ্বাপরে এক রকম এবং কলি যুগে আরেক রকম। এ ভাবেই চলছে ধারা। কলি থেকে সত্য যুগে ফিরে যেতে তাই আবার ভাবের পরিবর্তন করতেই হবে। ফাঁকি দিয়ে এ সব সম্ভব নয়। তার জন্য চাই humble submission। এবার তোমাদেব একটি গল্প বলি।

এক জহুরি দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে রত্ন সংগ্রহ করে। সে পরে আবার সেই রত্নগুলি উপযুক্ত মূল্য নিয়ে বেচে দেয়। এ ভাবেই চলছিল। কিছুদিন পরে এক দেশে সে এমন একটি রত্ন পেল যার কোনও মূল্যই ধার্য করতে পারল না। সে কারও কাছে সেই রত্ন বিক্রি করতে পারছিল না। এই রত্ন যেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

জহুরি বহু যত্ন করে সেই রত্নকে সামলে রাখে। একদিন সে পুকুরঘাটে দেখল এক নির্লোভ ভিখারি আপনমনে বসে আছে। তাকে দেখে জহুরি বলল—আমার এই পুঁটলিটি তোমার কাছে রাখলাম। আমি পুকুরে স্নান করে আসছি। সেই নির্বিকাব ভিখারিটির কোনও ভাবান্তর হল না। সে যেমন বসেছিল তেমনই বসে রইল।

এদিকে জহুরির পুঁটলিতে অনেক কিছু পাওয়া যাবে এই ভেবে একটি চোর তাকে অনেকক্ষণ অনুধাবন করছিল। সুযোগ বুঝে সে এসে হাজির হল। সে পুঁটলিটি খুলে দেখল অনেক রত্ন। সেখান থেকে সে সবচেয়ে চকচকে রত্নটি নিয়ে পালাল। লোকটি যখন চুরি করছে, সেই নির্বিকার রক্ষকও কিছুই বলল না। সে যেমন নির্বিকার ভাবে তাকিয়ে ছিল সে-ভাবেই বসে রইল।

কিছুক্ষণ পরে জহুরি ফিরে এসে দেখে তার পুঁটলিতে কেউ যেন হাত দিয়েছে, কারণ সে যে-ভাবে তা রেখে গিয়েছিল, তা সে-ভাবে ছিল না। সে ভিখারিটিকে জিজ্ঞাসা করল—কেউ কি এটা ধবেছিল? ভিখারি তার কথাব কোনও উত্তর না-দিয়ে নির্বিকার রইল। জহুরি পুঁটলি খুলে দেখল কিছু নকল রত্ন চুরি হয়ে গিয়েছে, আর তাব আসল শ্রেষ্ঠ রত্নটি যথাস্থানেই আছে। তা দেখে সে নিশ্চিন্ত হল।

এই পর্যন্ত গল্পটি বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—পৃথিবীতে কত রকমের লোক আছে। একদল লোভী, লোভ আছে কিন্তু তার মূল্য দেবার ক্ষমতা নেই। আবার একদল আছে যাদের লোভ আছে এবং তার মূল্য দেবার ক্ষমতাও আছে। আবাব আসল জিনিস চেনার ক্ষমতা সবার থাকে না। 'আসল রত্ন রইল পড়ে, নকল নিয়ে রইল মেতে।'

জহুরি জীবনভরের অভিজ্ঞতায় শক্তিমান। এক পাগল এসে তাকে জিজ্ঞাসা করল—তোমার কাছে রত্নের মূল্য কী? জহুরি বলল—অবশ্যই জীবনের সমান নয়।

গল্পটি শেষ করে তিনি গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—বস্তুর মূল্য জীবনের থেকে কম। এই বোধ মানুষের নেই বলেই তারা এত materialistic। আবার জীবনের মধ্যেও gradation আছে। সর্বোত্তম জীবনকেই বা কে বোঝে?

একদিন এক গানের আসরে ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার ভিন্ন ভিন্ন শিল্পী ষোলোটি রাগের গান পর পর গেয়ে গেল। উপস্থিত শ্রোতারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল, কেউ বুঝতেই পারল না, কোনটা কী রাগ। তখন এক পাগল এসে জানতে চাইল—জীবন বড় না

তাতে যা প্রকাশাদি হয় তা বড়? প্রকাশ নিয়ে মাতামাতি করছ, কিন্তু জীবনের মূল্য বোঝ না। প্রকাশের মধ্যে বৈচিত্র্য আছে, আর যারা প্রকাশ দেখে তারা বৈচিত্র্যকেই দেখে। কিন্তু যাঁরা প্রকাশকে না-দেখে প্রকাশককে দেখেন তাঁরা বহু না-দেখে এক-কেই দেখেন।

আবাব এক কবিসম্মেলন চলছে। বিভিন্ন কবি তাদের স্বরচিত কবিতা পাঠ করছে। উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচারে তাদের নিজেদের মধ্যেই দ্বন্দ্ব-বিরোধ শুরু হয়ে গেল। আবার সেই পাগল এসে প্রশ্ন করল—কাব্যের মূল্যবোধ কোথায়? তোমরা তো প্রকাশ নিয়ে ঝগড়া করছ, মূলকে তো খুঁজে পাওনি। কাব্যের মূলকে না-জানলে কাব্যবোধ জাগে না। Individualization of understanding is limitation. Limitation থাকলে আর transcendental-কে পাবে কী করে?

এরপর এক সাধুসম্মেলনে ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী তাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত ছিলেন। ধর্মের কথা তারা কী করে আর বলবেন। তাদের মধ্যেও ঝগড়া শুরু হয়ে গেল। আবার সেই পাগল এসে বলল—সত্যের সন্ধান তোমরা পাওনি। তোমাদের চিত্তে সংযম নেই, তোমরা কী করে সত্য দর্শন করবে? সত্য দর্শন ছাড়া সত্যের কথা বলা যায় না। সেখানে চারজন দার্শনিক ও চারজন ধার্মিক তাদের বক্তব্য পেশ করলে পাগল তাদের জিজ্ঞাসা করল—তোমাদের অনুভূতি ধার করা না নিজস্ব? চারজনের মধ্যে তিনজন নিজেদের justify করার জন্য নানা যুক্তি উপস্থাপন করল, কিন্তু চতুর্থজন মুখ খুলল না। ধর্ম কী, এর উত্তরে চারজন ধার্মিকের একজন বলল—বৈচিত্র্যই ধর্ম। দ্বিতীয়জন বলল—দ্বৈতই ধর্ম। তৃতীয়জন বলল—দুই-এ ধর্ম হয় না, শান্ত হলে বা এক-এ প্রতিষ্ঠিত হলেই হয় ধর্ম। চতুর্থজন চুপ করে রইল।

কার কতটা retentive capacity পরীক্ষা করতে এক তবলাবাদককে ডাকা হল। সে পর পর অনর্গল বোল বাজিয়েই চলেছে—কিন্তু কেউ তার repetation করতে পারছে না।

তখন পাগল এসে বলল—সবই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো ইন্দ্রজালসম ভ্রমমাত্র।

এরপর সিদ্ধপুরুষদের সম্মেলনে এসে উপস্থিত হল সেই পাগল। সেখানে কেউ কোনও আলোচনা করছেন না। সবাই চুপ করে বসে আছেন আর কুশলাদি জিজ্ঞাসা করছেন...।

সর্বশেষে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর মন্তব্য করলেন—কর্ম যতক্ষণ চেষ্টাসাপেক্ষ ততক্ষণ বৃত্তি থাকবেই। চেষ্টা শেষ হয় ইচ্ছা শেষ হলে। ইচ্ছা শেষ হয় মূলে পৌঁছলে। যে বিন্দুতে অন্তঃকরণ অর্থাৎ মন-বুদ্ধি-অহংকার-চিত্ত চৈতন্যে মিলে যায় তার নামই কূটস্থ। সেখানে মানুষের জীবনের সব কিছু negated হয়ে যায়। অর্থাৎ "যস্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে"—যেখানে পর এবং অবর একাকার হয়ে যায়। পর হল Science of Oneness এবং অবর হল science of manyness। যখন হৃদয়কেন্দ্রের হৃদয়গ্রন্থি (কামাদিগ্রন্থি) ছিন্ন হয়, সর্বসংশয়, বৈচিত্র্য ও দ্বন্দ্বের নিরসন হয় এবং সর্ব কর্মসংস্কার নির্মূল হয় তখন a new life is born in this life—a life within the life। যেমন গাছের বীজ পোঁতা হল, বীজ অঙ্কুরিত হল, সেই অঙ্কুর মাটিকে আঁকড়ে ধরল এবং

উপরে উঠল কাণ্ড। ধীরে ধীরে ডালপালা ও পাতা বিছিয়ে বড় হতে তাতে ফুল হল, ফুল গন্ধ ছড়াল ও তার পরিণতি হল ফলে। ফলের মধ্যে এল নূতন বীজ। এই ভাবে cyclic order-এ চলছে life within life, organism within organism। আর এ সবের মূলেই হল Science of Oneness। ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখলে আকার থাকে, মন দিয়ে দেখলেও আকার থাকে। বুদ্ধির খেলায় আকার থাকে না। আর আরও গভীরে অর্থাৎ Conscience-এর মধ্যে মিশে গেলে হয় নিজের মধ্যে নিজের ইষ্টসাধন।

১৯। ০১। ০১

৩৫২

সবকে মানিয়ে চললে সংসারে বিবাদ কম ও শান্তি বেশি থাকে। মায়েরা সংসারে লক্ষ্মীভাবে চললে শৃঙ্খলা বজায় থাকে।

একজন 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) বলেছিল—আপনার মাথা থেকে কত কী আসে! তাকে বলা হয়েছিল—যোগীর গাথা, জ্ঞানীর আধা, ভক্তের সাধা, প্রেমিকের মাথা আর কর্মীর কাঁধা (কাঁদা)। এর অর্থ বোঝ? গাথা হল ঐশ্বর্য—যোগী সাধনা করেন ঐশ্বর্যপ্রাপ্তির জন্য, জ্ঞানীর মনে আসে আনন্দধারা, ভক্তের জীবনে তার সাধন হল ইষ্টপ্রাপ্তি, প্রেমিক মাকে নিয়ে মায়েতে থাকেন এবং কর্মীর কাঁধা অর্থ হল কর্মী নিজ হাতে কাজ করেন ও কষ্ট হলেও কাঁধে ভার বহন করেন। মাকে নিয়ে থাকার ফলে কী হয় সে প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলি।

এক বাবার পাঁচটি ছেলে। পাঁচজন ছেলে পাঁচ রকমের। প্রত্যেকেই চাকরি করে। মাস গেলে তারা মাইনে পায়। মাইনে পেলে পাঁচজন তা পাঁচ ভাবে খরচ করে। বড় ছেলে পুরো টাকাটাই bank-এ রেখে দেয় সুদে-আসলে অনেক পাবার আশায়। মেজ ছেলের বেড়াবার সখ। সে তার টাকাটা ভ্রমণ করেই শেষ করে দেয়। সেজ ছেলের খুব সখ। সে নিত্যনূতন জামাকাপড় বানিয়েই টাকা খরচ করে। তার পরের ছেলের ব্যবসা। সে লোককে টাকা ধার দেয়। আর ছোট ছেলে পুরো টাকাটা মায়ের হাতে জমা দিয়ে দেয়। মা বলেন—তোর টাকা তুই রাখ। ছেলে বলে—রাখ না তোমার কাছে, যখন লাগবে আমি চেয়ে নেব।

তারপর একদিন দেখা গেল বড় ছেলের bank liquidation-এ চলে গিয়েছে। ফলে তার সব টাকা জলে গেল। মেজ ও সেজ ছেলে তো আগেই সব টাকা খরচ করে ফেলেছে। আরেক ছেলের ধারের কারবারিরা তাকে আর টাকা শোধ করল না। কিন্তু ছোট ছেলের টাকা তো মায়ের কাছেই জমা ছিল। তারই একমাত্র ষোলো আনা থাকল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কাজেই মায়ের কাছে সব সঁপে দিয়ে নিশ্চিন্ত হও। মা হলেন তিনিই যাঁকে মাপা যায় না। তিনি সব কিছু প্রকাশ করে নিরন্তর পালন করে চলেছেন। মা শব্দের নিগূঢ় অর্থ হল নিরন্তর মমতা। তিনিই প্রেমের embodiment। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) জীবনে চারজন মায়ের কথা বলে। সর্বপ্রথম হলেন গর্ভধারিণী মা, তারপর দেশমাতৃকা, তারপর বিশ্বমাতা এবং সর্বশেষে

পরমাত্মরূপিণী সচ্চিদানন্দময়ী মা। বাইরে মা, অন্তরে দেশমাতৃকা, কেন্দ্রে জগন্মাতা ও তুরীয়তে সচ্চিদানন্দময়ী মা। তিনি বাইরে gross থেকে অন্তরে subtle হচ্ছেন, কেন্দ্রে subtler এবং তুরীয়তে subtlemost হয়ে আবার subtlemost থেকে subtler, subtle হয়ে gross রূপে প্রকাশ হচ্ছেন। তিনি অখণ্ড স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। তিনি কাকেই বা সৃষ্টি করবেন আর কাকেই বা নাশ করবেন? তিনি তো পূর্ণ। তিনি ছাড়া তো কিছুই নেই। তোমার তো নিজের বলে কিছুই নেই, সবই তো তাঁরই দেওয়া। তবে কিসের এত অভিমান-অহংকার!

২। ০৩। ০১

৩৫৩

'রসিক জানে রসের মর্ম অন্যে জানে না
মনের মতো মানুষ পেলে পয়সা লাগে না।'

কে এই মনের মানুষ? পয়সাই বা কী? পয়সা অর্থাৎ অর্থ objective-এর পর্যায়ে পড়ে। মনের মানুষের খোঁজ বাউলসম্প্রদায় সারাজীবন ধরে করে চলেছে। যাঁর মন চিৎস্বরূপের সঙ্গে একীভূত হয়েছে, যাঁর মধ্যে সচ্চিদানন্দধারা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে খেলে চলেছে, অর্থাৎ যাঁর স্বানুভূতি জেগেছে তিনিই হলেন মনের মানুষ। তিনি "ভাবাতীতভাবং স্বতঃসিদ্ধং স্বতঃস্ফূর্তং স্বসংবেদ্যম্"—সংজ্ঞা দিয়ে দেওয়া হল। কিন্তু অভিমানী মন-বুদ্ধি এই অর্থের নাগাল পাবে না। কারণ বুদ্ধি মানুষের জন্ম জন্মান্তরের ফল। এই বুদ্ধিকে যারা সংযত করে সঁপে দেয় unconditionally and consciously to the innermost Divine Self, তারাই তাঁর সঙ্গে মিশে এক হয়ে যায়। একঘটি জল সমুদ্রে ফেললে তা আর ফিরে পাওয়া যায় না। একঘটি জল সমুদ্র থেকে নিতে পার, কিন্তু তা তোমার পূর্বের ফেলা জল নয়। কাজেই যে চিত্ত একবার চিৎতত্ত্বে প্রবেশ করে সে আর কোনও দিনই আগের চিত্ত থাকে না। এমন অবস্থায় যাঁরা পৌঁছেছেন এই সব ঋষিকল্প পুরুষদেরও নানা রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। এ রকম অনেক গল্পগাথা হয়ত তোমাদের জানা আছে। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন।

যবন হরিদাস ব্রাহ্মণের ছেলে, কিন্তু তিনি মুসলমানের ঘরে পালিত হয়েছিলেন। হরিদাসের মুখে সর্বদা হরি নাম ছিল। মুসলমান কাজিরা তা একদম পছন্দ করত না। তারা হরিদাসকে পরীক্ষা করবার জন্য এক বারবনিতাকে তাঁর কাছে পাঠায়। সেই বনিতা প্রতিদিন নানা সাজে সজ্জিত হয়ে হরিদাসের জীর্ণ কুটিরে আসত। হরিদাস দাওয়ায় বসে একমনে হরি নাম জপ করতেন। তিনি বনিতার দিকে লক্ষ্যই করতেন না।

একদিন সেই বনিতা হরিদাসকে বলেই বসল—তুমি আমাকে গ্রহণ কর। হরিদাস বলল—আমি তো হরিকে আগেই গ্রহণ করেছি, আর তো জায়গা নেই। দিল মে ব্যায়ঠা লিয়া দিল কে মালিক কো।

বনিতা তো হরিদাসের কোনও কথা শুনতে রাজি নয়। সে হরিদাসের দেহকেই চাইল। হরিদাস তখন সেই বনিতাকে বললেন—তুমি তিন লক্ষ জপ পূরণ কর, তারপর দেব। বনিতা তখন জপে বসল। জপ করতে করতে তার ভিতরে change হতে লাগল। তার মন ধীরে ধীরে গলতে শুরু করল। তখন হরিদাস তাকে বললেন—তুমি এখানে জপ কর, ততক্ষণে আমি স্নান সেরে আসছি। হরিদাস স্নান সেরে একঘটি জল নিয়ে কুটিরে ফিরে এলেন। তারপর তিনি বনিতাকে বললেন—এবার তুমি স্নান সেরে এস। তোমাকে গ্রহণ করে একজনের কাছে দিয়ে দেব। বনিতা স্নান করে ফিরে এলে হরিদাস বললেন—এই জল ধর আর তুলসীতলায় দাও। তাঁর কথা মতো বনিতা তা-ই করল। এ ভাবে যখন তার ভিতরে পুরোপুরি change এসে গেল তখন সে নিজের ভুল বুঝতে পেরে কান্নায় ভেঙে পড়ল। হরিদাস তাকে দীক্ষা দিলেন। বনিতার নূতন নাম হল তুলসী।

এই ঘটনার পরেও কাজির মনের পরিবর্তন হল না। হরিদাসকে বাইশটি বাজারে সকলের সামনে বেত্রাঘাত করা হল। হরিদাস কিন্তু একমুহূর্তের জন্যও শ্রীনাম জপ বন্ধ করেননি। পরে তিনি কাজিদের বুঝিয়েছিলেন যে, আল্লা ও হরিতে কোনও ভেদ নেই। যিনি রাম তিনিই রহিম, যিনি কৃষ্ণ তিনিই করিম। পরে কাজি হরিদাসের কাছে তার দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি বলেছিলেন—ক্ষমা যদি চাইতেই হয় তবে ঈশ্বরের কাছে চাও। তিনিই তো দুনিয়ার মালিক।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—মানুষ ভাবে তার মনের ভাব কেউ জানতে পারে না। তার মধ্যে যে অন্তর্যামী আছেন তিনিও কি জানতে পারেন না? তারা বোঝে না যে, চিত্তমূলে যিনি আছেন তিনিই চিত্তের সব খবর রাখেন। তিনিই হলেন অন্তর্যামী. তিনিই হলেন আমি। তিনিই জ্ঞানাগ্নি। এই আমি-র মধ্যে কেউ প্রবেশ করতে পারে না। এই জ্ঞানাগ্নির সঙ্গে individual তার individuality বজায় রেখে মিশতে পারে না। এই জ্ঞানাগ্নি individual-এর সমস্ত অভিমান-অহংকারকে ভস্ম করে শুদ্ধ করে নেয়। তখনই হয় শুদ্ধ জ্ঞান। শুদ্ধ জ্ঞানে কোনও mixture থাকতে পারে না, যেমন শুদ্ধা ভক্তিতে কোনও mixture থাকে না। যখন নিজের দুঃখের কারণ হিসাবে নিজেকেই দায়ী করবে তখনই লাভ অসৎ-এর প্রভাবমুক্ত হতে পারবে। সব সময় মনে রাখবে জগতের নানাত্ব-বহুত্ব ও প্রভুত্বের সমস্ত ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার একমাত্র কারণ হল আমি। এই আমি-র কাছে এলে জীবের আমি সরে যাবে এবং সমস্ত বিকারও চলে যাবে।

২৩। ৩। ০১

৩৫৪

দেবতাদের মধ্যেও হানাহানি, মারামারি হয় কে বড় তাই নিয়ে। দেহের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়গুলি আছে তাদের প্রত্যেকেরই অধিষ্ঠান দেবতা আছে। কে শ্রেষ্ঠ তার প্রমাণ দিতে এক এক করে প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের দেবতারা সব সরে গেলেও দেখা গেল যে দেহ

তখনও টিকে আছে। অসুবিধা হলেও দেহের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু প্রাণ যখন বেরিয়ে যেতে চাইল তখন সবাই ভীত হয়ে উঠল। প্রাণ চলে গেলে তো আর দেহ থাকে না। তাই সেই থেকে ইন্দ্রিয়রা প্রাণের সেবা করে চলেছে।

প্রাণের আবার অনেক প্রকাশ—অগ্নি, সূর্য, বায়ু, বরুণ, জল। এরা সবাই প্রাণেরই unit। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি, মন দিয়ে শোন।

অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধে জয়ী হয়ে দেবতাদের খুব গর্ব হল। দেবতাদের গর্ব খর্ব করতে পরমাত্মা একবার একটি ব্যবস্থা করলেন। তিনি এক বিরাট জ্যোতির্ময় পুরুষের রূপ ধারণ করে দেবতাদের দৃষ্টিগোচর হলেন। এই জ্যোতির্ময় পুরুষকে দেখে তাঁর পরিচয় জানবার জন্য দেবতাদের মধ্যে শোরগোল পড়ে গেল।

সর্বপ্রথম গেলেন অগ্নি। অগ্নি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন—আমি তো 'আমি'। তুমি কে? অগ্নি বললেন—আমি অগ্নি। জ্যোতির্ময় পুরুষ অগ্নিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার কী ক্ষমতা? অগ্নি—আমি সব পুড়িয়ে ছারখার করি। সেই পুরুষ বললেন—এই তৃণটি পোড়াও দেখি। অগ্নি তাঁর সর্বক্ষমতা দিয়েও তৃণটিকে পোড়াতে না-পেরে মাথা নিচু করে ফিরে গেলেন।

দেবরাজ ইন্দ্র অগ্নিকে প্রশ্ন করলেন—কী অগ্নি খোঁজ পেলে? অগ্নি নিরুত্তর রইলেন। তাই দেখে অগ্নির প্রতিদ্বন্দ্বী বায়ু খুব খুশি হলেন। বায়ু ভাবলেন, এটাই তো অগ্নিকে হারাবার সুযোগ। এবার বায়ু চললেন জ্যোতির্ময় পুরুষের খোঁজ নিতে।

বায়ু সেই জ্যোতির্ময় মূর্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কে? তিনি একই ভাবে উত্তর দিয়ে বললেন—আমি তো 'আমি'। তুমি কে? বায়ু নিজেব পরিচয় দিয়ে বললেন—আমি আমার শক্তি দ্বারা সব কিছু উড়িয়ে দিতে পারি। জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন—তাই না কি? এই কুটোটি ওড়াও তো দেখি। বায়ু তাঁর সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও কুটোটি সামান্যও হেলাতে পারলেন না। তিনিও মাথা নিচু করে ফিরে গেলেন।

এবার জলের দেবতার পালা। যথারীতি তিনি প্রশ্ন করলেন—তুমি কে? এবারও জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন—আমি তো 'আমি'। তুমি কে? তোমার কী ক্ষমতা? জলদেবতা বললেন—আমি সব ভাসিয়ে নিয়ে যাই। জ্যোতির্ময় পুরুষ বললেন—এই কুটোটিকে ভাসাও তো দেখি। কিন্তু জলদেবতা তাঁর সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করেও কুটোটিকে সামান্যতম সরাতে পারলেন না।

এদিকে এ সব দেখে দেবরাজ ইন্দ্র তো প্রমাদ গুনলেন। কে এই শক্তিমান পুরুষ? ইন্দ্র ভাবলেন, এঁর অবস্থানে তো আমার গদিও টলমল করবে। কেউই তো এঁর সাথে পেরে উঠছে না। ইন্দ্র তাঁর ইন্দ্রত্বের স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়লেন। ইন্দ্র কারওকে তপস্যা করতে দেখলে ভীত হয়ে তার তপস্যা ভঙ্গ করার চেষ্টা করেন, কারণ তাঁর ভয় তিনি যদি তাঁর ইন্দ্রত্ব হারান। যাই হোক, ইন্দ্র তাঁর দিকে এগোতেই সেই জ্যোতির্ময় মূর্তি আকাশে মিলিয়ে গেলেন। আর সেই জায়গায় ভেসে উঠল এক দিব্যশ্রী নারী মূর্তি। ইন্দ্র তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—দেবী তুমি কে? একটু থেমে

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ইনিই হলেন হৈমবতী, আমরা যাঁকে উমা বলি। ইনি জগজ্জননী মাতা ভগবতী।

মাতা আপন পরিচয় ব্যক্ত করে ইন্দ্রকে বললেন—তোমরা অসুরনিধন করে ভাবছিলে তোমরা নিজেদের শক্তিতেই এ কাজ করেছ। তোমরা এই জন্য গর্বিত বোধ করছিলে। কিন্তু যিনি তোমাদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে এ কাজ করেছেন তিনি হলেন সেই সর্বময়পুরুষ পরমাত্মা পরমেশ্বর। তোমরা তাঁকে জান না। অহংকারকে তোষণ করে তাঁকে জানা যায় না। তোমরা এতদিন অহংকারকে তোষণ করেছ তাই তাঁকে জানতে পারনি।

দেবী তখন ব্রহ্মশক্তির কথা ইন্দ্রকে বললেন। মাতৃকৃপায় দেবতাদের মধ্যে কেবল ইন্দ্রই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়েছেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর মাতৃশক্তি ও গুরুশক্তির অভিন্নতা প্রসঙ্গে বললেন—গুরুশক্তি ও দেবীশক্তি অভিন্ন। মাতৃশক্তি ও আত্মা অভিন্ন। এগুলি বুঝতে গেলে সদ্‌গুরুর শরণাগত হতে হয়। তখন গুরু শরণাগতের অন্তরে যার মাধ্যমে সেই বোধের জ্যোতি প্রকাশ করেন, তা ভক্ত অনুভব করতে পারে। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও পন্থা নেই। অন্য কোনও দেবতাও তা দিতে পারবেন না। মানুষ জাগতিক চাহিদাপূরণের জন্য মনসা পূজাও করে, চণ্ডী পূজাও করে আবার অশ্বত্থ বৃক্ষ পূজাও করে। মানুষের জীবন ভীতিতে গড়া, ভীতিতে ভরা—কখন কী হয়! কাজেই মানুষ নিজেকে ভুলে বসে আছে ও তার চেতনাও আবৃত হয়ে ম্রিয়মাণ হয়ে আছে।

১৭। ০৭। ০১

৩৫৫

এত কথা শোনার পরও যদি তোমার চেতনা ঐ মতলবি বুদ্ধি নিয়ে চলে তাহলে suffer করবে লক্ষ জন্ম। কেউ তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। তাই বলা হয়েছে—হে দুর্ভাগা মানুষ, তুমি নিজের জালে নিজে জড়িয়ে আছ আর ভাবছ অপরে তোমার ক্ষতি করছে। কে কাকে শেষ করছে? 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) মায়াকে বা অজ্ঞানকে খুঁজে পায়নি, তাই অজ্ঞানকে স্বীকার করতে পারেনি। অজ্ঞান হল তোমারই reflection। 'এর' মনটা revolutionary mind নয়—এই মন এ ভাবেই গড়া। 'এ' credit নিতে আসেনি। কার কাছে credit নেবে? I do not accept any second entity, দুইকে মানিই না, কাজেই কার কাছে বাহাদুরি নেব? কার কাছে যাব? একটি সাগর কি একটি পুকুরের কাছে যাবে জল চাইতে?

বড় বড় পণ্ডিত ও সাধু সমাজে 'একে' দু-একবার থাকতে হয়েছিল। তাদের শাস্ত্রজ্ঞান তো অপার। তাদের বলা হয়েছিল—'এ' কিন্তু শাস্ত্র বোঝে না। তারা জিজ্ঞাসা করেছিল—তুমি কী বোঝ? তখন বলা হয়েছিল—'এ' যে কিছু বোঝে না—এটা বোঝে। তাবা অবাক হয়ে বলল—কিছু বোঝ না তো কী বোঝ? তাদের বলা হল—কিছুর উপরে যা তা-ই বুঝি। কেন তোমরা যে বল something is better than nothing। কিন্তু 'এর' কাছে nothing is the best, something is good।

কিছু 'না-হলে উত্তম, কিছু হলে ভাল'। Oneness is free from duality. Duality is something. Something is not Reality. Something নিয়ে কী হবে? Something আজ আছে, কাল থাকবে না। কাজেই কিছু নিয়ে 'এর' কোনও কারবার নেই।

'এর' কথা শুনে পণ্ডিতরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। তারা 'এর' মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের তখন বলা হল—এমন এক ঘটনা আগেও একবার ঘটেছিল জনক রাজার সভাতে। ব্রহ্মবিদ্‌দের পরীক্ষা হচ্ছিল। সেই সভাতে 'এর' মুখ থেকে এমন কথা বেরিয়েছিল।

রাজা জনক গুরুবরণ করবেন। সেই জন্য তাঁরই সিংহাসনের পাশে আরেকটি বিরাট সিংহাসন বানিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌কে তিনি গুরুবরণ করে সেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করবেন। সভায় উপস্থিত কেউই সিংহাসনে বসবার সাহস পাচ্ছিলেন না। যদিও তাঁরা সবাই ব্রহ্মবিদ্‌ তবুও কেউই নিজের সামর্থ্যকে বুঝে উঠতে পারছিলেন না। এমন সময় অষ্টাবক্র, যাঁর শরীরে আটটি বাঁক ছিল, তিনি গড়িয়ে গড়িয়ে ঐ সিংহাসনের উপরে গিয়ে বসলেন।

অষ্টাবক্র যখন মাতৃগর্ভে তখন তাঁর পিতা কহোর একদিন মাতা সুজাতার পাশে বসে বেদ আবৃত্তি করছিলেন। মাতৃগর্ভে থেকেই শিশু বলে উঠল—পিতা, তোমার কৃপায় আমি বেদজ্ঞান লাভ করেছি তুমি রাগ কোর না, তোমার পাঠে কিছু ভুল উচ্চারণ হচ্ছে। তুমি ভুল পাঠ করছ, তুমি ঠিক করে পাঠ কর।

অষ্টাবক্রের পিতা কহোর মাতৃগর্ভস্থ শিশুর এই উক্তিতে খুব অপমানিত বোধ করলেন। কারণ তিনিও একজন বড় মুনি ছিলেন। তখন তিনি বলে উঠলেন—হে গর্ভস্থ শিশু, তুমি কে তা আমি জানি না। তুমি যক্ষ, রাক্ষস, দেবতা না দানব তা আমি জানি না। তবে তোমার ঔদ্ধত্যকে আমি ক্ষমা করব না। তুমি যখন জন্মাবে তখন তোমার দেহে আটটি বক্র নিয়ে জন্মাবে। তা-ই হল।

এই পর্যন্ত বলে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—কাহিনি যখন শুরু করা হয়েছে তখন reference না-দিলে তো বুঝবে না। এ সব খুবই কঠিন বিষয়।

রাজা জনক মহাজ্ঞানী (আর বর্তমানে মানুষের তো তাঁর কোটি ভাগের একভাগও জ্ঞান নেই। অথচ কত পণ্ডিতসভা হচ্ছে নানা জায়গায়)। রাজার এক পুরোহিত ছিল, তার নাম অশ্বল। রাজপুরোহিত হওয়ার জন্য তার খুব অভিমান ছিল। আর রাজার সভায় ছিলেন বরুণপুত্র বন্দিন। তিনি কর্মযজ্ঞের authority ছিলেন।

সাগরবক্ষে বরুণ একশো বছরের এক যজ্ঞ শুরু করেছেন। এখন সেই যজ্ঞের জন্য পুরোহিত দরকার। পুরোহিতকে হতে হবে বেদের কর্মকাণ্ডের master। (বর্তমানের পুরোহিতদের সঙ্গে তাদের তুলনা করা যাবে না)। বরুণ বন্দিনকে পাঠিয়েছেন জনকের সভায়, কারণ সেখানে অনেক জ্ঞানীগুণীর সমাবেশ হয়েছে। সেখানে গিয়ে বন্দিন কর্মকাণ্ডের উপর তর্কে যাকে পরাজিত করতে পারবে সে-ই হবে এই যজ্ঞের পুরোহিত। আর যদি বন্দিন হেরে যান তবে তাঁকেই এই যজ্ঞ পরিচালনা করতে হবে।

বরুণপুত্র বন্দিন সে-ভাবে তৈরি হয়েই জনক রাজার সভায় এসেছেন। (যে কাহিনি বলা হচ্ছে তার সঙ্গে 'এর' একটি বিশেষ সম্বন্ধ আছে বলেই বলা হচ্ছে)।

অষ্টাবক্রের পিতা কহোর একদিন অর্থ সংগ্রহের জন্য জনক রাজার দরবারে এলেন। তখনকারদিনে মুনিরা মাঝে মধ্যে রাজদরবারে অর্থ সংগ্রহের জন্য যেতেন। রাজশক্তি মুনিদের সাহায্য করত। কারণ তাঁরা তো বর্তমানের সাধুদের মতো ভণ্ড ছিলেন না। রাজারাও ছিলেন শাস্ত্রপরায়ণ ও প্রজাবৎসল। কারওকে কিন্তু criticize করা হচ্ছে না—এগুলি হল 'এর' নিজের বক্ষে নিজের খেলা। সমুদ্র যেমন তার তরঙ্গ, লহরী নিয়ে খেলে তেমনই।

জনক রাজার সভায় তখন বন্দিন ছিলেন। জনকের সঙ্গে পরামর্শ করে বন্দিন কর্মকাণ্ডের উপর তর্কযুদ্ধে কহোরকে আহ্বান করলেন। কহোরেরও কর্মকাণ্ডের উপর অনেক জ্ঞান ছিল। তিনি বন্দিনের challenge গ্রহণ করলেন। দীর্ঘ নয় দিন ধরে চলল আলোচনা। অবশেষে কহোর পরাজিত হলেন। শর্ত অনুসারে তাঁকে বরুণের যজ্ঞ পরিচালনার জন্য সাগর গর্ভে চলে যেতে হল।

এদিকে বহুদিন হয়ে গেল কহোর বাড়ি ফিরছেন না। তাঁর সংসারে অভাব-অনটন ছিল, কিন্তু কহোর না-থাকায় সেই কষ্ট এবার চরম সীমায় পৌঁছাল। সামান্য চাল বেটে জলে গুলে তা-ই দুধ বলে খেতে হচ্ছে। লতাপাতা খেয়ে দিন কাটাতে হচ্ছে। অষ্টাবক্রের আর ভাল লাগছিল না। তিনি একদিন তাঁর মামা শ্বেতকেতুকে বললেন—চল আমরাও এবার অর্থ সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে পিতার খোঁজও করে আসা যাবে।

অষ্টাবক্র কোনও ক্রমে শ্বেতকেতুকে সঙ্গে নিয়ে জনক রাজার দ্বারে এসে পৌঁছলেন। দ্বারী কিছুতেই তাঁদের দরবারে রাজার কাছে যেতে দেবে না। অষ্টাবক্র দ্বারীকে বললেন—তুমি আমায় প্রশ্ন কর, আমি সব উত্তর দেব, কিন্তু তুমি আমায় রাজার সঙ্গে একবার দেখা করতে দাও। তাঁর এই দৃঢ়দীপ্ত কথা রাজার কানে গেল। তিনি সভাস্থ একজনকে পাঠালেন খোঁজ নিতে। অষ্টাবক্র সভায় এসে রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁর পিতা কোথায়? রাজা তাঁর পরিচয় জানতে চেয়ে বললেন—তুমি কে? অষ্টাবক্র বললেন—আমি পিতার পুত্র। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার পিতার নাম কী? রাজা নাম শুনে কহোর ও বন্দিনের বৃত্তান্ত তাঁকে বললেন। অষ্টাবক্র তখন বললেন—আমার পিতাকে যে পরাজিত করেছে আমি তাঁর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাই।

বন্দিন এলেন। দীর্ঘ আঠারো দিন ধরে চলল বাক্‌যুদ্ধ কর্মকাণ্ডের উপর। একেবারে শেষ দিনে অষ্টাবক্র বললেন—আমি জ্ঞানস্বরূপ, "সর্বকর্মঃ জ্ঞানাৎ প্রবর্ততে জ্ঞানেন সম্পন্নং এবং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে"। পরাজিত বন্দিন কী আর বলবেন। তাঁকে ফিরে যেতে হল সাগর গর্ভে। কহোর ফিরে এলেন।

কহোর পুত্রের ব্যবহারে খুশি হয়ে বললেন—পুত্র এবার আমি তোমায় দীক্ষা দেব। অষ্টাবক্র বললেন—আমার দীক্ষার কোনও প্রয়োজন নেই—"সুদীক্ষিতম্ মাং কেন পুনঃ দীক্ষিতমিচ্ছতি"। অষ্টাবক্রের এই কথায় সবাই অবাক হয়ে গেল। রাজা তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দিলেন। এরপর তাঁরা বাড়ি ফিরে এল।

গৃহে ফিরে এসে পিতা তাঁর পুত্রকে সংস্কৃত করার জন্য স্নান সেরে আসতে বললেন। কিন্তু অষ্টাবক্র পিতাকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর এই চেহারার জন্য তিনি

এতটুকুও দুঃখিত নন। তিনি বললেন—আমার মতো এ রকম শরীর তো আর কারও নেই। আমি আমার শরীর সোজা করতে চাই না। তবে তুমি আমাকে কী বলবে তা আমি জানি, তাই তোমাকে পিতা বলে একটি প্রণাম করছি।

অষ্টাবক্র আবার একদিন জনক রাজার সভায় আসলেন ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীরা কী আলোচনা করেন তা শুনতে। সেখানে বিরাট বিরাট ব্রহ্মবিদেরা ব্রহ্মবাদের উপর নানা কথা বলছেন। অষ্টাবক্র মন দিয়ে তাঁদের আলোচনা শুনছিলেন আর মনে মনে হাসছিলেন।

এই সময় একদিন রাজা ঘোষণা করলেন যে, শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্‌কেই তিনি গুরুরূপে গ্রহণ করবেন এবং রাজসিংহাসনের তদনুরূপ সিংহাসনেই তিনি উপবিষ্ট হবেন। সেই জন্য রাজা একটি প্রশ্ন করবেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তরের আর কোনও প্রতিপ্রশ্ন হতে পারবে না।

রাজসভায় যাজ্ঞবল্ক্যের মতো মহান ঋষিরা উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু কেউই উঠে গিয়ে সিংহাসনে বসে প্রশ্নের সম্মুখীন হবার সাহস পাচ্ছিলেন না। হঠাৎ অষ্টাবক্র গড়িয়ে গড়িয়ে সেই সিংহাসনে গিয়ে বসে পড়লেন। তাঁকে সিংহাসনে বসে থাকতে দেখে সবাই বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই রেগে গিয়ে অষ্টাবক্রকে নানা কথা বলতে লাগলেন।

তখন অষ্টাবক্র তাঁদের বললেন—আমাকে দেখে যারা বিদ্রূপ করে তারা চামার, কেউ বা কসাই। এই কথায় সবাই ক্ষেপে গেলেন এবং যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে বিচার চাইলেন। যাজ্ঞবল্ক্য অষ্টাবক্রকে বললেন—তুমি অন্যায় করেছ, ক্ষমা চাও। অষ্টাবক্র নির্দ্বিধায় বললেন—ক্ষমা চাইবার মতো কোনও দ্বিতীয় পুরুষ কোথায়? তাঁর এই কথায় সবাই আরও অপমানিত হয়ে তাঁকে সিংহাসন থেকে নেমে আসতে বললেন বারবার। অষ্টাবক্র অনড়, অচল। শুধু মহারাজের দিকে তাকিয়ে বললেন— মহারাজ, আমি তো কিছু ভুল বলিনি। এখানে সবাই তো ব্রহ্মজ্ঞ, তবু কেন তারা আমার দেহের প্রতি দৃষ্টি দিচ্ছে। আমার দেহে তো মাংস, মজ্জা, রক্ত, মেদ ইত্যাদি রয়েছে। এ সব নিয়ে যারা মেতে আছে তারা তো হয় কসাই নয়ত চামার।

অষ্টাবক্রের এই কথা শুনে তো সবার মাথা হেঁট। রাজা বললেন—আমি অষ্টাবক্রকেই গুরুবোধে গ্রহণ করব যদি তিনি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। অষ্টাবক্র তৎক্ষণাৎ বলে বসলেন—আগে তুমি আমার গুরুদক্ষিণা দাও। রাজা তো অবাক এই ভেবে যে, গুরু না-হয়েই তিনি গুরুদক্ষিণা চাইছেন! অষ্টাবক্র বললেন—গুরুকরণ করা হলে তো তোমার দেবার কিছু থাকবে না। তাই আগেই চাইছি! রাজা সম্মত হয়ে বললেন—বেশ, বলুন কী দক্ষিণা চাই। অষ্টাবক্র বললেন—আমি ধন, জন, রাজত্ব, অর্থ, সম্পদ কিছুই চাই না। তবে যা তোমার একান্ত নিজস্ব শুধু তা-ই আমাকে দাও।

রাজা ভাবতে বসলেন, কী দেবেন! অনেক বিচার করে তিনি এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, কোনও কিছুই তো তাঁর একান্ত আপন নয়। তবে একমাত্র আমার আমি—এই আত্মাই হল একান্ত আপন। কিন্তু আত্মাকে ভাগ করে দেবেন কী করে? আত্মাকে তো ভাগ করা যায় না।

অবশেষে রাজা নত হলেন অষ্টাবক্রের কাছে। তাঁর আর প্রশ্ন করার কিছুই রইল না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—হঠাৎ ধ্রুবাস্মৃতি জেগে ওঠায় তার একটু বর্ণনা তোমাদের দেওয়া হল। তখনও 'এ'-ই (নিজেকে নির্দেশ করে) বলেছিল, আজও 'এ'-ই বলছে। কারণ আমিতত্ত্ব এঁটো হয় না। আত্মা কখনও তুমি ছাড়া হয় না। মানুষ দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, অহংকার ও চিত্তের সঙ্গে জড়িয়ে আত্মাকে ভুলে অনাত্মাকে নিয়ে মেতে আছে অথচ এক-কে সে মানতে পারে না। এক-ই এক-কে জানে। এক-ই এক-কে দিয়ে জানে। It is Atman alone without which no Ajnana, Jnana, Vijnana and Prajnana exist. In Reality, Atmaa alone exists.

১৭। ৮। ৩১

৩৫৬

জ্ঞানী জানেন ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানা যায় তা স্বপ্ন, আবার মন দিয়ে যা জানা যায় তাও স্বপ্ন। একটি জাগ্রৎ, অপরটি স্বপ্ন। একটি ব্যবহারিক, অপরটি প্রাতিভাসিক। আর যা পারমার্থিক তা পাওয়া যাবে সমাধির গভীরে। অর্থাৎ যেখানে I in I, I of I, I from I, I for I, I by I, I with I, I to I, I on I and beyond beyond অর্থাৎ Consciousness in Consciousness, of Consciousness, from Consciousness, for Consciousness, by Consciousness, with Consciousness, to Consciousness, on Consciousness and beyond beyond।

এই formula আর কেউ চুরি করতে পারবে না। এই formula বুঝতে গেলে অহংকার ছাড়তে হবে, না-হলে এগুলি ভিতরে ঢুকে একেবারে জ্বালিয়ে মারবে, পাগল হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

এক শিষ্য গুরুর কাছে দীক্ষা নিয়েছে, শিক্ষা নিচ্ছে। শিষ্য গুরুর আশ্রমেই থাকে। সেই সময় গুরু একটি কঠিন শাস্ত্রের টীকা লিখতে ব্যস্ত ছিলেন। শিষ্যকে মাঝে মাঝে তিনি তা পড়ে শোনান। কিন্তু শিষ্যের মনে হত, এই রকম আমি যদি লিখতে পারতাম! ক্রমে গুরুর লেখাগুলির উপর শিষ্যের লোভ জন্মায়। এই লোভ ক্রমশ বাড়তে লাগল। কিছুদিন পরে সে সেই টীকাগুলি চুরি করল। গুরুদেব সব বুঝতে পারলেন, কিন্তু কিছু না-বলে স্থির হয়ে রইলেন। পরে শিষ্য একদিন গুরুকে জানায় যে, তার ভাল লাগছে না, সে তীর্থে যাবে। গুরুদেব বললেন—হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছায় তুমি এসেছ। এবার যখন যাবে বলছ তখন যাও।

শিষ্যটি তীর্থে তীর্থে ঘুরে ঘুরে এই টীকার খাতা থেকে কিছু লোককে পড়ে শুনিয়ে খুব বাহবা পেল। এই ভাবে তার দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। হঠাৎ একদিন একজন জ্ঞানী সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি তো সব বুঝতে পারলেন, কিন্তু তিনি একজন অতি সাধারণ পাঠকের মতো বসে লোকটির কথা শুনতে লাগলেন। তারপর একসময় তিনি বললেন—যেটুকু পাঠ করেছ সেখানেই থেমে যাও। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তুমি ভাবের ঘরে চুরি করছ। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি তোমার চিত্ত মলে ভরা, অহংকার, লোভ, মোহে আবৃত। তুমি গুরুধন হরণ করেছ। তোমাকে এমন দুর্ভোগ ভোগ করতে হবে যে, ধর্মজগতের কোনও গুরুই তোমাকে রক্ষা করতে পারবেন না।

শিষ্য অনন্যোপায় হয়ে গুরুর কাছে ফিরে এল। ইতিমধ্যে ঐ টীকার কিছু পাতাও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। গুরু শিষ্যকে বললেন যে, এ সব আর তিনি গ্রহণ করতে পারবেন না, কারণ এগুলি এঁটো হয়ে গিয়েছে। ....তার এই গুরুতর অপরাধের জন্য অশেষ কষ্ট পেতে হয়েছিল এবং সেই কষ্টই তার মৃত্যুর কারণ।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আমি অল্প কথায় ঘটনাটি বললাম, কারণ বর্তমান জগতে মানুষ ভাবের ঘরে চুরি করে বেশি। অনেকেই বলে, ওমুকে তো সারাজীবন ভাল কাজই করেছে, তবু কেন কষ্ট ভোগ করছে? আসলে তোমাদের তো দিব্যনয়ন খোলেনি, কী করে জানবে কষ্টের কারণ।

প্রত্যেকটি মানুষের দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, পারিবারিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিকারের কারণ হল তার মন। সে দায়ী করে অপরকে। বর্তমানে মানুষ সৎসঙ্গ করার সুযোগ পায় না। তাদের মধ্যে অসৎ-এর প্রভাব এত বেশি ঢুকে আছে যে, সৎসঙ্গ করেও কোনও উপকার পায় না। চল্লিশ/পয়তাল্লিশ বছর ধরে এই এক-এর বিজ্ঞানের কথা মানুষের কাছে এত বলা হয়েছে, কিন্তু আত্মজ্ঞান লাভ, মুক্তিশান্তি বা জীবন্মুক্তির জন্য কেউ আসেনি। সবাই আপন আপন স্বার্থসিদ্ধির ফিকির খুঁজে বেরিয়েছে। আসলে এবার 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) আগমন হয়েছে 'Missionless mission' নিয়ে। Mission নিয়ে আসিনি—it is a fact। কিন্তু যে সম্পদ 'এ' দিয়ে যাচ্ছে তা নেবার কোনও অধিকারী তো তৈরি হল না। এবার তো যাবার সময় হয়েছে। বহু আগেই দু'বার দেহ ছেড়ে চলে গিয়েও আবার ফিরে এসেছে। এবার আর তা হবে না। তবে বলতে পারি 'এর' এমন আবির্ভাব আর সহজে হবে না। কলি যুগে আর আসা হবে না। এই কলি যুগের প্রয়োজন মেটাবে অন্য অধিকারী পুরুষরা। কারণ খাদ না-মেশালে, অহংকার না-রাখলে তো কাজ করা যায় না। আবার কাজ না-করলে লোকসংগ্রহ হবে কী করে? কিন্তু 'এ' কাকে শিষ্য করবে? 'এ' তো বোধের মধ্যে 'এর' চেয়ে ছোট, হীন অথবা বড় এমন কারওকে পৃথক করে খুঁজে পায়নি। একটিমাত্র বোধ সর্বত্র বিরাজ করছে, তা আধার যেমনই হোক। সেই আধারের মধ্যে তার ব্যবহার হয় মন দিয়ে। মনের দোষেই মানুষ কষ্ট পায়। অঙ্কের প্রথম step-এই ভুল করেছ। সেই ভুল শুদ্ধ না-করলে তো অঙ্ক ঠিক হবে না। জীবনের ভুল তো জীবনের প্রথমেই করেছ। সেখানে 'আমার, আমার' ছাপ মেরেছ। 'আমারকে' যদি এতই ভালবাস তো সব কিছুর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নাও। মা হতে চাও তো জগৎমাতা হয়ে সবার মা হও, পিতা হতে চাও তো জগৎপিতা হয়ে সবার পিতা হও—দেখি কী সাধ্য তোমাদের! দু-একটি সন্তানের পিতামাতা হলে হবে না, be either one or none। আত্মবিদ্যা এই বিদ্যাই শিক্ষা দিয়েছে।

১২। ০৪। ০২

অষ্টম অধ্যায়

৩৫৭

বুদ্ধদেবকে সবাই কত রকম ভাবে প্রশ্ন করেছে, কত রকম ভাবে তাঁর কাছে সাহায্য পেতে এসেছে। এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটি গল্প বলছি শোন।

একদিন এক মহিলা এসে তথাগতর চরণে কেঁদে পড়ে বলল—আপনার মতো মহাপুরুষ বর্তমান থাকতে আমি কেন পুত্রহীন হব? আমি মায়ের পরিচয় কী করে দেব? বুদ্ধদেব স্থির হয়ে বললেন—আমাকে কী করতে হবে? মহিলাটি বলল—আমার পুত্রের প্রাণ ফিরিয়ে দিতে হবে।

বুদ্ধদেব বললেন—তোমার পুত্রের প্রাণ কেন গেল তা জান? মহিলা উত্তরে বলল—আমি তা জানি না। তুমি তথাগত, তোমাকে প্রাণ ফিরিয়ে দিতেই হবে।

বুদ্ধদেব তখন বললেন—ঠিক আছে, তুমি একটি পাত্র নিয়ে এমন বারোটি গৃহে গিয়ে মুষ্ঠিভিক্ষা সংগ্রহ করে নিয়ে এস যে গৃহে কোনও দিন মৃত্যু আসেনি। মহিলা তাঁর কথা শুনে ভাবল, এ আর এমনকী কঠিন কাজ! সে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু দিনশেষে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে তার শূন্য ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তথাগতর চরণে আবার ফিরে এল। এমন একটিও গৃহ সে খুঁজে পেল না যেখানে মৃত্যু আসেনি।

মহিলাকে দেখে তথাগত বললেন—দাও তোমার ভিক্ষাপাত্র। ভিক্ষাপাত্রটি দেখে তিনি বললেন—এ যে শূন্য! তাহলে তোমার পুত্রের প্রাণ আমি কী করে ফিরিয়ে দেব? কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন—আরেকটি উপায় আছে! তোমার প্রাণটা যদি দাও তাহলে পুত্রকে ফিরে পাবে।

এই কথা শুনে মহিলা সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল—আমার তো আরও সন্তান আছে, তাহলে তাদের দেখবে কে?

বুদ্ধদেব বললেন—তাহলে তোমার পুত্রকে বাঁচাতে অন্য কারওকে প্রাণ দিতে হবে, তাই নয় কি?

গল্পটি এখানে শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই রকম তো অনেকবার হয়েছে। অনেক দেনা হলে তা শোধ করতে না-পারলে তো আর ধার দেওয়া যায় না। এই রকম 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কাছেও অনেকবার হয়েছে। 'এ' জন্ম-মৃত্যুর খবর জানে না। যার জন্ম হয় তার মৃত্যুও হয়, কিন্তু তা আমি নয়। জন্ম-মৃত্যু হয় কার? আমি-র আভাসের গতাগতি হয়। তার আবির্ভাব-তিরোভাব, বৃদ্ধি-ক্ষয় এবং জন্ম-মৃত্যু আছে। আমি তো আভাস নই, আমি সর্বপ্রকাশক। আমি জন্ম-মৃত্যু উভয়কেই প্রকাশ করি। আমি-ই সব কিছুকে প্রকাশ করি, আমি-র কোনও প্রকাশক নেই।

১২। ০৪। ০২

৩৫৮

এখানকার (সোসাইটির সৎসঙ্গে) এই সব প্রসঙ্গ অনেকের কাছেই চিত্তাকর্ষক মনে হয় না। 'এ' যদি বিভূতি নিয়ে মাতামাতি করত, তুকতাক ফুকফাক করত তাহলে তোমরা ভাবতে 'এর' অনেক শক্তি আছে। তাও দেখা হয়েছে। তাদের বলা হয়েছে—তোমরা অজ্ঞান থেকে আরও অজ্ঞানের মধ্যে ডুবে যাচ্ছ। মানুষ তো অজ্ঞানেই ডুবে আছে। ভ্রান্তি দিয়ে ভ্রান্তিকে, অজ্ঞান দিয়ে অজ্ঞানকে, অভাব দিয়ে অভাবকে নাশ করা যায় না। তবুও মানুষ relief-এর জন্য ছোটে। Relief-এর জন্যই তারা belief করে। আবার relief পেলেই belief চলে যায়। এই রকম বিশ্বাস নিয়ে ধর্মপথে চলা যায় না। ধর্মপথে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা চাই। সেখানে কোনও compromise নেই। কার সাথে কে compromise করবে? You are eternally alone and alone–there is none within you. 'আপন ভিন্ন নাহি অন্য কোনও জন আপনার অন্তরে'—গানটিতে তা-ই বলা হয়েছে। তবে তোমার মন ভিন্ন চিন্তা করে। এটা তার ক্ষণিকের স্বপন। আবার সেই খেলার ফলও তাকে ভোগ করতে হয়; তোমার আপনস্বরূপ ব্রহ্ম-আত্মা। এর কোনও নড়চড় নেই। তুমি জান না, তাই তুমি মান না। কিন্তু শোনার পরও যদি তুমি না-মান তাহলে তা অপরাধ। সৎপ্রসঙ্গ শোনার পর যদি তা ব্যবহার না-করা হয় তবে তা অপরাধ।

এক রাজাকে মৃত্যুর পর যমালয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। যমরাজ চিত্রগুপ্তকে রাজার পাপ-পুণ্যের হিসাব দেখতে বললেন। চিত্রগুপ্ত সব দেখে বললেন—মহারাজ, এর পুণ্যের ভাগ বড় কম। যমরাজ তখন রাজাকে বললেন—কোনটা আগে ভোগ করবে, পাপ না পুণ্য? রাজা তখন যমরাজকে প্রশ্ন করলেন—মহারাজ, আমার পুণ্যের ভাগ কম হবে কেন? আমি তো জীবনভর ধর্মকর্ম করেছি। এই কথাতে যমরাজ একবার চিত্রগুপ্তর দিকে তাকালেন। চিত্রগুপ্ত বললেন—মহারাজ, এ জীবনভর ধর্মকর্ম করেছে ঠিকই, কিন্তু কী ভাবে করেছে তা একবার ওকে জিজ্ঞাসা করুন। রাজা চুপ করে রইলেন। রাজা ধর্মপালনের নাম করে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে কতজনের প্রাণ নিয়েছেন তার হিসাব কে রাখবে?

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আমরা আমাদের কৃত কর্মের ফল অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে রেহাই পেতে চাই। তাই মহাপুরুষরা বলেন (কৃতাকৃতম্ স্মর ক্রতুম্ স্মর) অর্থাৎ তুমি যা করেছ তা স্মরণ কর আবার যা করনি তাও স্মরণ কর। মন তোমার শত্রু ও মিত্র উভয় ভাবেই কাজ করছে। মনই বন্ধন-মুক্তির কারণ। আত্মা শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। আত্মা বন্ধন-মুক্তির ধার ধারে না। আত্মার বন্ধনই নেই, কাজেই মুক্ত হবার প্রশ্নই ওঠে না। আত্মা প্রভু বিভু সাক্ষী নিত্য মুক্ত চিৎ এক নিষ্ক্রিয় নিস্পৃহ শান্ত।

১২। ০৪। ০২

৩৫৯

অনেকে আছে নিমন্ত্রণবাড়িতে সবার আগে এসে খেয়ে চলে যায়। আবার আরেক দল আছে যারা সবার শেষে আসে। তারা খেতে আসে না, আসে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

জনক রাজার সভায় ব্রহ্মজ্ঞানীরা নানা বিষয়ে আলোচনায় বসতেন। আলোচনা করতে করতে এমন এক একটি point এসে যেত যাতে সবাই agree করতেন। সেই সভাতেই একজন স্বল্প পরিচিত ঋষি মাঝে মাঝে আসতেন। তবে তিনি প্রায়ই শেষের দিকে আসতেন। একদিন এক ঋষি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি রোজ এত দেরিতে আসেন কেন? প্রথম দিকে আসেন না কেন? তিনি বললেন—প্রথম দিকে তো হয় অভিমানাত্মক আলোচনা, কে কতটা জানে তা-ই অন্যদের জানায়। অন্যের জানাজানি দিয়ে আমার কী হবে? আমি তো এ সব জানতে আসিনি। সেই ঋষি তাঁকে আবার প্রশ্ন করলেন—তাহলে কেন আসেন? তিনি বললেন—এই জানাজানি ছাড়া আরও যে কিছু আছে তা জানেন কি? আপনারা তো সবাই ব্রহ্মজ্ঞানী। আপনারা ব্রহ্মবোধ নিয়ে আলোচনা করেন সবার শেষে, at the end of all understanding। এ-ই হল বেদান্ত, বেদের অন্তভাগ, the last part of the Vedas–the essence of Knowledge, the cream of Knowledge i.e. Self-Knowledge। সেখানে তো কোনও mixture নেই।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্থির হয়ে সব শুনছিলেন। রাজা জনকও সব দেখছেন, শুনছেন কিন্তু কিছু বলছেন না। কে আসে, কে যায়, কে কী বলে—কোনও দিকেই তাঁর দৃষ্টি নেই।

এই রকম সভা প্রায়ই হয়। একদিন এক ঋষি জনক রাজাকে বললেন—মহারাজ, আপনি তো এই সভায় যোগ দেন না, কোনও কথাও বলেন না। রাজা বললেন—হ্যাঁ, আপনারা বলছেন আমি শুনছি। আমার শুনতে খুব ভাল লাগে। ঋষি বললেন—শুনতে তো আমাদেরও ভাল লাগে। রাজা বললেন—শোনাও দুই রকমের হয়। একটি দল শোনা কথা ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে। অন্য দল শোনা কথার মধ্যে যে সাক্ষিরূপে আমিই আছে তা অনুভব করে।

সভা থেকে ফিরে গিয়ে রাজা রাতে আপনমনে ভাবলেন, এখানে এত ব্রহ্মজ্ঞানী, প্রত্যেকেই কত উন্নত পর্যায়ের আলোচনা করছেন, কত সূক্ষ্ম বিচার তাঁদের, বুদ্ধি দিয়ে যার হদিশ পাওয়া যায় না। অথচ তাঁদের মধ্যেও কত division! সব কিছুর সমাধান নিশ্চয়ই আছে।

ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেবও সেই সভায় উপস্থিত থাকতেন। তিনি অসাধারণ ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন। তিনি মাতৃজঠরেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। তাঁর জন্মও সাধারণ ভাবে হয়নি। কিংবদন্তী আছে, তিনি বারো বছর মাতৃজঠরে ছিলেন। তখন ব্যাসদেব মহাচিন্তায় পড়লেন। তিনি ভাবলেন, কে এই শিশু? রক্ষ, যক্ষ না বিশেষ কোনও দেবতা। এতদিন হয়ে গেল অথচ শিশু ভূমিষ্ঠ হচ্ছে না। ব্যাসদেব বারবার শিশুকে আহ্বান করে বললেন—তুমি কে? কেন তুমি ভূমিষ্ঠ হচ্ছ না? একদিন শিশু বলে উঠল—আমি যে-ই হই, এই মায়ার সংসারে আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারছি না। তুমি যদি এই অজ্ঞানমায়া স্বল্প কালের জন্য সরিয়ে দিতে পার তবেই আমি ভূমিষ্ঠ হতে পারি।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—'এ' কিন্তু কোনও তর্কের মধ্যে যাচ্ছে না, only statement of facts বর্ণনা করা হচ্ছে।

তখন ব্যাসদেব সেই শিশুকে বললেন—মায়াশূন্য জগৎ হতে পারে না। তা কী করে সম্ভব হবে? শিশুটি বলল—তাহলে এতকাল তুমি কী বেদচর্চা করলে যে, অজ্ঞানকে সরাতে পারছ না! ব্যাসদেব তপস্যাবলে যে শক্তি অর্জন করেছিলেন তা দিয়ে ক্ষণিকের জন্য মায়াকে অপসারণ করার পর তবে বালক ভূমিষ্ঠ হল। ভূমিষ্ঠ হয়েই সে চিমটা আর কমণ্ডলু নিয়ে তপস্যার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

এখানে মলিন চিত্ত অনেক কূট প্রশ্ন করতে পারে, যে প্রশ্ন যোগ্যতার মানের নয়, অযোগ্যতার মানের প্রশ্ন। বালক উলঙ্গ হয়ে ছুটছে এবং তার পিতা বস্ত্র পরিহিত হয়ে তার পিছনে ছুটছেন। পথে এক সরোবরে স্বর্গের দেবীরা বিবস্ত্র হয়ে স্নান করছিলেন। তাঁদের পাশ দিয়ে শুকদেব চলে গেল, কিন্তু তাঁরা তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপই করল না। কিন্তু যেই তাঁরা ব্যাসদেবকে দেখল অমনি লজ্জা এসে তাঁদের ঘিরে ধরল। ব্যাসদেব অবাক হয়ে ভাবলেন, কেন এমন হল!

তাহলে দেখ জ্ঞানীকে কী রকম আত্মপরীক্ষা দিতে হয়! ব্যাসদেব সরাসরি তাঁদের প্রশ্ন করলেন—আমি আপনাদের আচরণে বিস্মিত। বিবস্ত্র ঐ বারো/তেরো বছরের বালককে দেখে আপনাদের কোনও প্রতিক্রিয়া হল না, কিন্তু আমাকে দেখে এই প্রতিক্রিয়া কেন হল? দেবীরা হেসে বললেন—তুমি তো জ্ঞানী। তুমি জ্ঞানী না-হলে আমাদের এই বিকার হত না।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—খুব গভীরের প্রশ্ন! ঠিক এই প্রশ্নের সঙ্গে মিল আছে বৃন্দাবনের গোপীদের বস্ত্রহরণ প্রসঙ্গের। এই প্রসঙ্গে আজ আর কিছু বলব না। এই প্রসঙ্গ আলোচনার জন্য right place and right time এখন নয়। মন যখন পার্থিব চিন্তার ঊর্ধ্বে উঠে যায়, দেহাত্মবোধ থাকে না তখন শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রকাশ আপনা হতেই হয়। সেই মন শুধু বোধের ভাবনা ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। তা এত subtle হয়ে যায় যে, রূপ, নাম, ভাব—কারও সঙ্গেই যুক্ত থাকে না, শুধুমাত্র বোধ ছাড়া।

"দেহস্থাপি দেহাতীতম্ গৃহস্থাপি গৃহাতীতম্ দেশস্থাপি দেশাতীতম্ ভাবস্থাপি ভাবাতীতম্।" সমাধির গভীরে যখন ডুবে থাকে তখন বাইরে সে ভাবময়, কিন্তু ভিতরে ভাবাতীত। অর্ধবাহ্যদশা—এই অবস্থা সম্বন্ধে মানুষ বইয়ে পড়ে, কিন্তু এর সঙ্গে পরিচয় ক'জনের হয়।

মানুষের মন কতখানি মার্জিত হলে তবে সে এই বোধের অধিকারী হতে পারে! তাহলে মনকে শোধন করে এগিয়ে যেতে হবে। সে তখন রূপের ঘরে থাকবে, কিন্তু তার রূপটা হবে বোধের রূপ, রূপের বোধ নয়। রূপের মধ্যে যে বোধ আছে তা অতি সামান্য একটি অংশ আর বোধ দিয়ে যে রূপ গঠিত হয়েছে—দু'টি কী করে এক হবে? একটি form of knowledge, অপরটি knowledge of form।

এই সব সূক্ষ্ম ব্যাপার 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মধ্যে নিরন্তর খেলছে। দিনের পর দিন এগুলি 'এ' ব্যক্ত করে চলেছে, কিন্তু অধিকারী পুরুষ ছাড়া এগুলি বোঝা অসম্ভব। বুদ্ধির মাপকাঠি মানুষের এত ভোঁতা যে সেই বুদ্ধি দিয়ে এ সব বোঝা সম্ভব নয়।

১৯। ০৪। ০২

৩৬০

'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মুখ থেকে যা বেরিয়েছে তা হল বেদান্তের সারাৎসার। এই যুগে তা হল original, imitation নয়। তাই 'এ' বেদান্তের কোনও শ্লোক quote করেনি। সবই original formula। কারণ past-কে নিয়ে এসে কখনও present-এ set করা যায় না। এই প্রসঙ্গে ছোট উদাহরণ দেওয়া হয়েছে— ৪ নম্বরের bolt ৮ নম্বরের nut-এর সঙ্গে জোড় যায় না। Past and present cannot be unified in one, কারণ past একটি expression এবং present আরেকটি expression। Past-এর প্রয়োজন এক রকম, present-এর প্রয়োজন আরেক রকম। বর্তমানে যদি রামকে, কৃষ্ণকে তাঁদের past-এর বেশে ফিরিয়ে আনা হয় তবে তাঁরা limited হয়ে যাবেন, আর বর্তমানেব বেশে আসলে কেউ মানতেই পারবে না।

মানুষ বড় biased and prejudiced। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প 'এ' অনেকবার বলেছে, আবার বলছে শোন।

গোঁসাইবাবা তাঁর এক শিষ্যকে দীক্ষা দেবার পর নাম দিয়েছেন। সে তো তার ঠাকুরের আসনে কৃষ্ণকে সাজিয়ে নাম করে, ডাকে আর কান্নাকাটি করে। একদিন তার ইষ্ট কালীবেশে তার কাছে এলেন। মাকে দেখে তো সে ক্ষেপে গেল। মাকে উদ্দেশ করে সে বলল—আমি তো তোমাকে ডাকিনি, তুমি এসেছ কেন? তবু মা বারবার আসেন। একদিন সে মুড়ো ঝাঁটা দিয়ে মেরে মাকে তাড়িয়ে দিল। তারপর গুরুর কাছে গিয়ে সে সব বৃত্তান্ত জানাল। সব শুনে গুরু তো কেঁদে মাটিতে গড়াগড়ি দিলেন। গুরু তাঁর শিষ্যকে বললেন—হায় হায়, এ কী করলি! এই ঘটনার পর গুরু অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং পরে শিষ্যও অসুস্থ হয়ে পড়ে। তারপর গুরু প্রায়শ্চিত্ত করে প্রথমে সুস্থ হন, এবং তার পরে শিষ্য ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই তো আমাদের নমুনা! আসলে সবই আত্মবোধের বৃত্তি। আত্মবোধে যদি হয় চিত্তের নিবৃত্তি তাহলে কোনও রূপই আর অনাত্মা নয়। তখন সর্বরূপে, সর্বনামে, সর্বভাবে আত্মারাম স্বয়ং খেলেন। এর নাম Realization। কে কার মধ্যে কী রূপ দেখল বা কী রূপ দর্শন করল—তাঁকেই মাথায় তুলে সম্প্রদায় সৃষ্টি করছে এবং অপরকে আঘাত করছে—this is not the truth। অধিকারীর অভাবেই মানুষ এত degraded হয়ে গিয়েছে। এই degradation-এর জন্যই এত fanaticism তৈরি হয়েছে এবং ধর্মজগতে এত অরাজকতা ও অমিল।

৩। ০৫। ০২

৩৬১

প্রিয়বোধ সহজে জাগে না। যখন নিজের মধ্যে আপনবোধ জাগবে তখনই প্রিয়বোধ জাগবে। প্রিয়বোধ তো বুদ্ধির মধ্যে জাগবে না। আপনবোধের সঙ্গ করতে করতে যদি tuning হয় তবেই প্রিয়বোধ জাগবে।

এক পাগলের কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল। এক পাগলের সঙ্গে ভগবানের দেখা হল। ভগবান পাগলকে বলল—এবার চল তোকে নিয়ে যাই আমার কাছে। পাগল বলল—তোমার কাছে যাব কেন? তুমি কে?

তোমরা হয়ত ভাবছ জন্ম জন্ম তপস্যা করেও যাঁর দর্শন পাওয়া যায় না, পাগল তাঁকে বলছে—তোমার কাছে যাব কেন?

ভগবান বললেন—আমি তো জগতের প্রভু।

পাগল—তুমি জগতের প্রভু, জগৎ নিয়েই মেতে আছ। আমার সাথে তোমার কী সম্পর্ক? আমি আমি-ই। আমি যা আছি তা-ই থাকব। তুমি আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধিকে নষ্ট করতে পার, কিন্তু 'আমার আমিকে' নাশ করবে কী দিয়ে?

ভগবান—আমিই তো তোর আমি হয়ে বসে আছি।

পাগল—আমিও তো তোমার মধ্যে আমি হয়ে বসে আছি।

ভগবান—আমিই তো তোর মধ্যে থেকে কথা বলছি।

পাগল—আমিও তো তোমার মধ্যে থেকে কথা বলছি।

এ পাগল সহজ পাগল নয়। Real I has no rival. ভগবান যখন দেখলেন পাগলকে কোনও ভাবেই আর 'আমিবোধ' থেকে সরানো যাচ্ছে না তখন তিনি বললেন—আমি তোর কাছে তোর আমিটা ভিক্ষা চাইছি।

পাগল বলল—আমিকে তো ভাগ করা যায় না, 'আমারকে' ভাগ করা যায়। তুমি জগতের প্রভু, Lord। তুমি যদি পার তো আমিকে ভাগ কর। আমি ভাগ করতে পারব না! তুমি আমার দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি নিয়ে যাও। কিন্তু 'আমার আমিকে' নিতে এলে তুমি গলে যাবে।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার—এ সবই হল প্রকৃতির। তুমি এগুলি ব্যবহার করতে পারছ। তাঁর দেওয়া জিনিস তোমাকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছে। তোমার নিজস্ব কী আছে? কী দিয়ে পূজা করবে? পূজা করতে গেলে নানা প্রকার ingredients দরকার। সেই জন্য 'এ' (নিজেকে নির্দেশ ক'রে) সবার কাছে বলেছে—'এ' একটিমাত্র পূজা জানে, তা হল আমি-র পূজা। বোধ দিয়ে বোধের ব্যবহার। 'এ' তোমাদের conventional হিং টিং ছট-এর মধ্যে যাচ্ছে না। পূজা-পার্বণে উচ্চারিত সব মন্ত্রের essence-টা প্রকাশ করা দরকার। 'এর' পূজা হল বিজ্ঞানদর্শন, অন্তরদর্শন। তোমরা বহিঃপ্রকৃতিতে sunrise, sunset দেখ, 'এ' অন্তরে দেখে—এই হল তফাত। অনাদি অনন্ত কালের সব কিছুই 'এর' অন্তরে ভেসে ওঠে। তা তো আর কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। অনেক ভাবের ঘরে চুরির খেলা দেখা হয়েছে। কিন্তু এবার আর কিছু করতে পারবে না। এবার সব formula-তে বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

১৭। ০৫। ০২

৩৬২

'এর' কাছে ভক্তি আসে অদ্বৈতের পরে। দ্বৈততে শুধু কামনাবাসনা, আসক্তি ও নিজের পছন্দ মতো পাবার ইচ্ছা। এটা একেবারেই অভিনয়। সেই জন্য রাধাকৃষ্ণের প্রেম স্থূলদৃষ্টিতে অভিনয়। সূক্ষ্মদৃষ্টিতে ঝলক দর্শন হয়, আর আত্মদৃষ্টিতে আপনবোধে

স্বানুভূতির মাধ্যমে তা স্বয়ংপ্রকাশ হয়। এই আমি-র পরিচয় সৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণুর মধ্যে নিহিত রয়েছে। কিন্তু অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিত না-হলে এ জিনিস জানা যাবে না। অদ্বৈতবোধের লক্ষণ প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

এক গুরুগত প্রাণ শিষ্যকে গুরু ধুনির কাঠ আনতে জঙ্গলে পাঠিয়েছেন। সর্ববস্তুতে সে নিজের আমিকে বসিয়ে নিয়েছে, কারণ তার কাছে গুরু ধ্যান, গুরু জ্ঞান। আমি যেমন কখনও absent হয় না, তেমনই তার কাছে গুরুও কখনও absent হন না। সে গাছের ডাল কেটে জড়ো করছে ধুনি জ্বালাবার জন্য, যাতে শীতে গুরুর কষ্ট না-হয়। আবার জন্তুজানোয়ারেরও ভয় আছে। শিষ্য একমনে কাঠ সংগ্রহ করছিল। হঠাৎ সে দেখে সামনে একটি মস্ত বড় বাঘ। শিষ্য তো সব কিছুর মধ্যে গুরুকে দেখে। সে বাঘকে দেখে বলে উঠল—গুরু তুমি এসেছ, এস। বাঘ তো তার ঘাড়ে চেপে বসে মাংস খেতে আরম্ভ করল। তখন শিষ্য বাঘকে বলছে—গুরু তুমি সন্তুষ্ট হয়েছ তো? তৃপ্ত তো?

এদিকে গুরু তাঁর আরেকজন শিষ্যকে পাঠিয়েছেন প্রথম শিষ্য কী ভাবে কাঠ কেটে আনছে তা দেখবার জন্য। সে এক মস্ত বড় গাছে উঠে দেখতে পেল একটি বাঘ সেই প্রথম শিষ্যকে খাচ্ছে আর শিষ্যটি বাঘকে বলছে—গুরু, তুমি তৃপ্ত তো?

শিষ্যটি তখনই গাছ থেকে নেমে দৌড়ে এসে গুরুকে সব খবর জানাল। গুরু সব শুনে বললেন—সেকি, তুই কী করছিলি? শিষ্য বলল—আমি শুনলাম ও বলছে যে, গুরু তুমি আমার এই শরীরটা খেয়ে তৃপ্ত তো? সন্তুষ্ট তো? গুরু সব শুনে অবাক হলেন। তিনি শিষ্যকে বললেন—এক্ষুনি চল। গুরু শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন বাঘ সব সাবাড় করে চলে গিয়েছে। গুরু সেই জায়গায় সস্নেহে হাত বোলালেন। কিছুক্ষণ পরে সেই শিষ্যের দেহ ফিরে এল। তখন শিষ্য গুরুকে বলল—আমি তোমার জন্য কাঠ জোগাড় করে রেখেছি, চল নিয়ে যাই। গুরু বললেন—চল।

আশ্রমে ফিরে এসে গুরু শিষ্যকে বললেন—এবার আমার এই দেহটা ছাড়বার সময় হয়েছে। তুই এখন থেকে এখানে থাকবি। আমি তো একটাই।

গল্পটি শেষ করে গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—অখণ্ডের আমি যখন আরেকজনকে সেই আমিবোধে প্রতিষ্ঠিত করে তখন অখণ্ডের আমি শরীর ছেড়ে দেয়। এটা সম্পর্ক, স্পর্শ অথবা দৃষ্টি দ্বারা হতে পারে যা অধিকারী পুরুষ ছাড়া শুধু intellect দিয়ে কোনও দিনই জানতে পারবে না। হয়ত হিমালয়ের কোনও গুম্ফাতে রয়েছেন সেই অধিকারী পুরুষ। এই আমি তো সর্বব্যাপী।

"সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।।"

তাঁর সর্বত্র মুখ, নাক ও চোখ। আসলে বোধ তো সর্বত্রই আছে। Consciousness is present in every expression, everywhere, in everything 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) তো বোধ ছাড়া আর কিছুই বোঝে না।

এই যে চৈতন্য ভাগে ভাগে প্রকাশিত হয়ে চলেছে—এ-ই হল সংসার। আর চৈতন্য as a whole হল সমসার—অখণ্ড এক আমি। আমি বস্তু বা ব্যক্তি নয়, দুনিয়া নয়। তবে তা কী? বাক্য দিয়ে তাকে প্রকাশ করা যাবে না, একেবারে silent। Infinite-কে finite কখনও প্রকাশ করতে পারে না, শুধু indicate করতে পারে। আগেই গানের মধ্যে এ সব প্রকাশ করা হয়েছে—

এই যে আমি আমি সাজে
এই আমি যে সবার মাঝে
সবার আমি এই আমি যে
জানে শুধু আমি—আমির যে
অখণ্ড ভূমা আমিবোধের মাঝে সর্ব আমি বিরাজে
আমি-র ছায়ায় তারা চলে ফেরে ভ্রান্তিবশে।

মন ভুল করবেই। জগতে এমন একজনকেও খুঁজে পাবে না যে ভুল করে না, মিথ্যা কথা বলে না। অথচ জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলবে, আমি মিথ্যা বলি না। এটাও মিথ্যা কথা। কারণ সত্যকেও তো তুমি জান না।

১৭। ০৫। ০২

৩৬৩

অধ্যাত্মপথে আসতে গেলে নিজের মোহ, অভিমানকে ছেড়ে আসতে হয়, বিশেষ করে অভিমানকে। বর্তমানে অধ্যাত্মচর্চা করতে গিয়ে অভিমান বেড়ে যায়। অরবিন্দ আশ্রমে একজন অরবিন্দের কাছ থেকে dictation নিতেন। Dictation নিতে নিতে তিনি একদিন তাঁকে একটি প্রশ্ন করে বসেন। সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ তাকে বলেন—"Stop it"। তার পরদিন থেকে তাকে আর তিনি dictation দেননি।

ব্যাসদেব একদিন সিদ্ধিদাতা গণেশের কাছে উপস্থিত হলেন। গণেশ তাঁকে দেখে বললেন—মহামুনি, কী সংবাদ? ব্যাসদেব বললেন—আমি আপনার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি। গণেশ তো অবাক হয়ে বললেন—আপনি আমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছেন? আপনি তো মহামুনি, মহাজ্ঞানী। ব্যাসদেব তাঁকে বললেন—জগতের মহাকল্যাণার্থে আমি একটি সংকল্প করেছি, তার জন্য আপনার সাহায্য প্রয়োজন। গণেশ বললেন—মহামুনি, বলুন আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি। (বর্তমানের মানুষ কী বুঝবে ঋষি, মুনিরা কোন স্তরের! তাঁরা intellect-এর কত উপরে)। ব্যাসদেব বললেন—আমি মহাভারত প্রকাশ করব, কিন্তু উপযুক্ত লিপিকার পাচ্ছি না। আমি আপনাকে আমার লিপিকার হতে প্রার্থনা করছি।

গণেশ এই কথা শুনে তো খুব খুশি হলেন। তিনি বললেন—তবে একটি শর্ত আছে। আমি লেখা শুরু করলে যেখানে আমার কলম থেমে যাবে তারপর আর আমি এগোতে পারব না।

ব্যাসদেব স্থির হয়ে বিচারপূর্বক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে (জ্ঞাননয়ন যাঁর খুলে গিয়েছে) বিবেচনা করে বললেন—হ্যাঁ, আমি রাজি। তবে আমারও একটি বিশেষ শর্ত আছে।

আমি যে কথাগুলি বলব তা সম্যক্‌রূপে না-বুঝে আপনি একটি লাইনও লিখতে পারবেন না।

ব্যাসদেবের কথা শুনে গণেশ ভাবলেন, ব্যাসদেব জ্ঞানীপুরুষ, কী জানি কী শ্লোক বলবেন! এই সব ভেবে তিনি যেন একটু অসোয়াস্তি বোধ করছেন। যাই হোক, অবশেষে তিনি রাজি হলেন। আরম্ভ হল রচনা। অতি উচ্চমার্গের সাহিত্য—classic of all classics, সাধারণ মানুষের পক্ষে তা বোঝা অসাধ্য। বর্তমানে মানুষের তো পড়াশুনায় তেমন উৎসাহ নেই, জানবে কোথা থেকে? জানার তো দু'টি উপায়। একটি স্বাধ্যায়, অপরটি ধ্যান। মানুষ ধ্যান করে না, কিন্তু তার ধ্যানের কল্পনা আছে। কেন ধ্যান নেই? ধ্যান কোনও effortful practice নয়, ধ্যান হল spontaneous current of thought—a thoughtless easy state which cannot be grasped by intellect and mind। ধ্যানের গভীরে যে কী হয় তা জানা যায় না, মন সেখানে অ-মন হয়ে যায়। বুদ্ধি সেখানে পরমবোধিতে রূপায়িত হয়, যাকে নির্বিকল্প বলা হয়। সবিকল্প পর্যন্ত ধ্যান হল চেষ্টা বা exercise—এই প্রসঙ্গে অনেকেই প্রশ্ন করতে পারে, তর্ক করতে পারে। কিন্তু এ সব নিয়ে একমাত্র তাদের সঙ্গেই আলোচনা করা চলে যারা এ সব নিয়ে চর্চা বা গবেষণা করে। শুধু intellectual inquisitiveness-এর জন্য এই subject নয়। কারণ পরমবোধি ও বুদ্ধি এক স্তরের নয়। বুদ্ধি পরমবোধির খবর রাখে না। আর পরমবোধির স্তরে বুদ্ধির আর কোনও entity থাকে না। নদী সাগরে মিশলে যেমন তার আর separate existence থাকে না, তেমনই বুদ্ধি পরমবোধির স্তরে গিয়ে বোধির সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যায়।

গণেশের সঙ্গে ব্যাসদেবের কথা শেষ হতে কাজ শুরু হল। মহামুনি তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বর্ণনা করে যাচ্ছেন আর গণেশ সমানে লিখে যাচ্ছেন। যখন মুনিবর মনে করছেন, এবার গণেশকে একটু ভাবাতে হবে, তখন তিনি কয়েকটি নিগূঢ় তত্ত্বপূর্ণ কূট কঠিন শ্লোক বলছেন। এই সব শ্লোকের অর্থ বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা অসম্ভব, শুদ্ধ বুদ্ধি দিয়েও বিচার করা কঠিন হয়।

পরমতত্ত্ব যে কী বস্তু সে সম্বন্ধে কয়েকজনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল। পরমতত্ত্ব কোনও বুদ্ধিগ্রাহ্য বিষয় নয়। তা বুদ্ধির অতীত "বাক্যমনাতীতম্‌", "বাক্‌মনসোগোচরম্‌"। সেই সত্য যখন স্বতঃস্ফূর্ত হয় তখন বাক্য ও মন free channel হয়ে যায়।

এই পরমতত্ত্বের শ্লোক বুঝতে গণেশের যে সময় লাগত সেই ফাঁকে মহামুনি নূতন শ্লোক compose করে নিতেন।

যাই হোক, সমস্ত মহাভারত রচনা শেষ হল। এতবড় একটি মহাগ্রন্থ কল্পনায় আনা সত্যিই কঠিন। মহাভারত রচনার পর মহামুনি শান্তি পাননি। নারদের নির্দেশে তিনি তখন ঈশ্বরের লীলামাধুর্য প্রকাশের জন্য ভাগবত রচনা করলেন। ভাগবত রচনার পরে মহামুনি এক মস্ত ধাঁধায় পড়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন, এ আমি কী করলাম! যেখানে শ্রুতিবাক্য হল—"যতো বাচা নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ", অর্থাৎ যেখানে বাক্য-মন প্রবেশ করতে পারে না, যেখান থেকে ফিরে আসে—সেই তত্ত্বস্বরূপকে রূপে, নামে, ভাবে অলংকার দিয়ে বর্ণনা করেছি। ভাষার অধীনে এনে আমি তো অপরাধ করেছি। তখন তিনি আক্ষেপ করে Almighty-র কাছে প্রার্থনা জানিয়ে

বললেন—হে সর্বদেবদেব অভিনব অনুপম, অনুপম অভিনব সর্বদেবদেব—যাঁর স্বরূপ বাক্যমনাতীত, তাঁকে আমি বাক্য-মনের গোচরে এনে প্রকাশ করেছি; অরূপকে রূপের বর্ণনায় এনেছি; অনামীকে নামের মাঝে কীর্তন করেছি; ভাবাতীতকে ভাবযুক্ত করে ভাবময় করেছি, ভাবের সীমায় সীমিত করেছি, গুণাতীতকে গুণের মধ্যে এনে বদ্ধ করেছি। আমার এই চতুর্বিধ অপরাধের জন্য তুমি আমাকে ক্ষমা কর। তুমি দেশ-কাল, কার্য-কারণের অতীত, অনন্ত সৃষ্টি তোমার বক্ষে হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। দুর্বার স্রোতে কত জীব ভেসে চলে যাচ্ছে—কোথায় আদি, কোথায় অন্ত! আমার কল্পলোকে যা ফুটে উঠেছিল তা-ই প্রকাশ করেছি সত্য—এ তো স্বভাবের মনোবিলাস। এও তোমারই কাজ, কেন না তুমিই সেই পরমতত্ত্ব—সর্ব আমি-র আমি, সর্ববোধের বোধ, সর্বজ্ঞানের জ্ঞান, সর্বরহস্যের তুমিই মূল।

গল্পের তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এ সবই ধ্যানের গভীরের দর্শন। যে কথাগুলি তোমাদের কাছে বলা হয় তা কোনও পঠিত বা অধীত বিদ্যা নয়। তোমরা কোথাও গিয়ে হয়ত নানা জিনিস দেখে এসে লোকের কাছে তা বর্ণনা কর, কিন্তু এ সব তার চেয়েও অনেক গভীরের ব্যাপার। এ সব অন্তর্বোধে বোধিক্ষেত্রে প্রজ্ঞাজ্যোতিরূপে দর্শন করা অতি গভীরের ব্যাপার। বহুদিন সমাধির গভীরে তলিয়ে গিয়েছে মন—দুই দিন, তিন দিন, চার দিন কিছুই টের পাইনি—হয়ত বাইরে থেকে কেউ কিছু করেছে, কিন্তু তাও জানা যায়নি, কারণ জগৎ সেখানে vanish হয়ে যায়, সেখানের খবর তো কিছুই বলা যায় না। তবে বলতে পার এমন অবস্থা তো ঘুমের মধ্যেও হতে পারে। কিন্তু যারা সমাধির সঙ্গে পরিচিত তারা কিন্তু এ কথা বলবে না। সমাধি হয় মন-বুদ্ধি প্রশান্ত হয়ে গেলে। তা কিন্তু শ্রান্তক্লান্ত হয়ে শান্ত হওয়া নয়।

মানুষ সারাদিন পরিশ্রমের পরে দেহেন্দ্রিয়ের শ্রান্তিক্লান্তিজনিত কারণে ঘুমের মধ্যে তলিয়ে অব্যক্তে চলে যায়। এই অব্যক্ত হল cause state, যেখান থেকে নেমে এসে আমাদের মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয় সক্রিয় হয়ে আবার ঘুমের মধ্যে দিয়ে সেখানে ফিরে যায়। effect আবার cause-এ ফিরে যায়। Cause and effect একসঙ্গে হল অব্যক্তের স্তর। এই অব্যক্তের বা cause-এর ঊর্ধ্বে যেতে হলে সমাধির মাধ্যমে যেতে হবে। সমাধি হল supreme state of Super-Consciousness in which mind and intellect are absent।

"ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনো মনসঃ সত্ত্বমুত্তমম্।
সত্ত্বাদধি মহানাত্মা মহতোঽব্যক্তমুত্তমম্।।"

সূত্রাকারে বলতে গেলে বলা যায়—ইন্দ্রিয় থেকে শ্রেষ্ঠ মন, মন থেকে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিবিজ্ঞান, বুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ সমষ্টিবুদ্ধি (মহত্তত্ত্ব), সমষ্টিবুদ্ধি থেকে শ্রেষ্ঠ পরম অব্যক্ত। অব্যক্তের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরমপুরুষ পরমাত্মা পুরুষোত্তম। State of Absolute Consciousness—জীবের হৃদয়ে তা হল কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য। তার নিচে হল অন্তরচৈতন্য। এই অন্তরচৈতন্য বোধচৈতন্যের আভাস। তা real চৈতন্য নয়—reflection-এর সঙ্গে reflection-এর খেলা।

১৭। ০৫। ০২

৩৬৪

আত্মার বক্ষে আত্মার স্বভাব নানা ভঙ্গিমায় লীলায়িত হয় বটে, কিন্তু তাতে আত্মার কিছু এসে যায় না। এই যে অনন্ত মহাকাশের বক্ষে কত শহর তৈরি হচ্ছে, আবার ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে—তাতে আকাশের কি কিছু এসে যায়? মনকে তৈরি করতে গেলে সব সময় চৈতন্যের সাহায্য নিতে হয়। জড় বস্তুর সাহায্যে, আরামের মধ্যে গড্ডালিকা স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে মন চলে। মনকে সব সময় assert করতে হয়। Non-assertive mind কিন্তু অনেক lower nature-এর। অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে যত gradation আছে তার মধ্যে non-assertive mind অনেক নিচু স্তরে, assertive mind মধ্যম স্তরে এবং assertive-এর মধ্যে যারা শুধু পুঁথিগত বিদ্যার উপর নির্ভরশীল নয় অথচ বিচারপূর্বক assertive তারা অনেক উঁচু থাকের।

সাধনভজন হয় মানুষের রাজসিক মন দিয়ে। রাজসিক মন না-থাকলে সাধনভজনও হয় না। তামসিক মন সাধনভজন করে না। তার হল দিনগত পাপক্ষয়। সে ফাঁকিবাজ, অলস এবং উদাস। প্রাচীনকালে রাজারা ছিলেন রাজসিক গুণসম্পন্ন। আর যারা শুদ্ধসত্ত্বগুণী তাঁরা ছিলেন ঋষি, জীবন্মুক্তপুরুষ। কিন্তু আত্মজ্ঞানী বিলক্ষণ। তাঁকে অপর একজন আত্মজ্ঞানী ছাড়া আর কারও পক্ষে চেনা সম্ভব নয়। যতক্ষণ মানুষ লক্ষণ নিয়ে চলে ততক্ষণ সে প্রকৃতির বা গুণের ঘরে থাকে। তার মধ্যে মনের চিন্তা ও ব্যবহার গুণ অনুসারেই হয়ে থাকে।

একজন মহাত্মার কাছে তাঁর কথা শুনতে অনেকেই যেত। ধীরে ধীরে কিছু ছেলেমেয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ হয়। তারা মহাত্মার কথা মতো তাঁর নির্দেশাদি মেনে জীবনে চলতে চেষ্টা করত। এদের মধ্যে আবার কয়েকজন নিষ্ঠাবান, honest and sincere ছিল। তারা নিয়ম মতো অনেক কিছু অভ্যাস করত। কিন্তু একজন কিছুই করত না। তাকে সবাই অকারণ ভালবাসত।

একদিন আশ্রমের অনেকেই (যেন ছেলেটির উপকারের জন্য) ছেলেটির সম্বন্ধে মহাত্মার কাছে নালিশ করল—এত ভাল ছেলে অথচ কিছুই সাধনভজন করে না। আমাদের বড় কষ্ট হয়।

মহাত্মা বললেন—ওকে জিজ্ঞাসা করেছ ওর কষ্ট হয় কি না তোমাদের জন্য। তারা বলল—না।

মহাত্মা বললেন—তফাতটা বুঝেছ? অনেক উঁচু থাকের লোক ও। ওর ভিতর সমত্ব স্থিতি পেয়েছে। তোমাদের সমত্বে প্রতিষ্ঠিত হওনি।

তারা বলল—আমরা তো তা বুঝতে পারি না।

মহাত্মা বললেন—তোমরা বুঝতে পারবে না। তা বুঝতে হলে ওর স্তরের সঙ্গে তোমাদের পরিচিত হতে হবে, তার আগে নয়। তোমাদের চাহিদা, অহংকার ও কামনা আছে। কিন্তু ওর এ সব নেই। ও সাধনভজন করতে যাবে কেন?

তারা বলল—তাহলে ও এখানে আসে কেন?

মহাত্মা বললেন—এখানে আসতে তো ওর কোনও বাধা নেই। ও তো আমার কাছে আসে।

তারা বলল—আপনি তো ওকে কিছু বলেন না।

মহাত্মা বললেন—প্রয়োজন মনে করি না তাই কিছু বলি না।

তারা বলল—তাহলে আপনি তো পক্ষপাত করেন।

মহাত্মা বললেন—তোমাদের মনে পক্ষপাত আছে বলে পক্ষপাতের কথা তুলছ। তোমরা যার কথা বলছ সে তো তোমাদের নামে একবারও নালিশ করেনি, আবেদন-নিবেদনও করেনি। তোমরা কেন করলে?

মহাত্মার কথা শুনে সবাই চুপ করে গেল। কয়েকদিন পর মহাত্মা তাদের ডেকে এনে বললেন—কে কত বছর ধরে আমার সঙ্গ করছ? কেউ বলল আট বছর, কেউ বলল দশ বছর। তখন মহাত্মা বললেন—দশ বছর আগের তুমি ও দশ বছর পরের তুমিতে কতটা পার্থক্য হয়েছে?

তারা বলল—বুঝতে পারি না।

মহাত্মা—যদি কেউ বুঝতে পারে, তাহলে?

তখন সবাইকে ডাকা হল এই পার্থক্য কেউ বুঝতে পারে কি না তা দেখবার জন্য। সবাই প্রায় বলল—বুঝতে পারি না, তবে অভ্যাস করতে ভাল লাগে।

মহাত্মা—কোনও কিছু শিখতে গেলে মানুষের শিক্ষার একটি উদ্দেশ্য, বিশেষ পদ্ধতি, নিয়মশৃঙ্খলা এবং তার অভ্যাসের বা ব্যবহারের নির্দেশ থাকে। উদ্দেশ্য সাধন হলে, যোগ্যতা অর্জন হলে অভ্যাস করার প্রয়োজন আর থাকে না। আর যে যোগ্যতা নিয়ে জন্মায় তার অভ্যাস করার কী প্রয়োজন!

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—তাই দেখা যায় ব্রহ্মার পুত্রগণ—চতুর্সন বা সনকাদি—সনক, সনাতন, সনন্দাদি জন্ম লাভের সঙ্গে সঙ্গে বিবস্ত্র অবস্থায়ই ছুটলেন তপস্যা করতে। ব্রহ্মা এঁদের সংসারী করতে পারেননি। সৃষ্টির কাজে রত হয়ে ব্রহ্মাও তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান হারিয়েছিলেন। সেই জ্ঞান পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি সদা জপ করে থাকেন। অথচ সংসারী যারা তাদের সময় হয় না। আজেবাজে অজুহাতে সময় কাটায়। তারাও আত্মজ্ঞান হারিয়েছে। সেই জ্ঞান পুনরুদ্ধারের জন্য তাদেরও তো নিয়মনিষ্ঠা সহকারে অভ্যাস করতে হবে। নিজের খেয়ালখুশি মতো খাওয়া, ঘুম, চলাফেরা হল wild life-এর তুল্য। Wild life-কে সংযত করার জন্যই শিক্ষা। অতীতকালে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে এই সংযম অভ্যাস করা হত। কিন্তু বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থা হল collection of words from here and there। এই collection of words করেও সারাজীবনে তা apply করার scope পায় না।

২১। ০৬। ০২

৩৬৫

এই সৃষ্টিকে একটি দল বলছে লীলা এবং আরেক দল বলছে কর্মফলের গতি। কে কর্মফল সৃষ্টি করল? সন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর সৃষ্টি করেননি। কে সৃষ্টি করেছে তা তাঁরাও জানেন না।

এই প্রশ্ন তুলেছিলেন অষ্টাবক্র মুনি। তিনি তাঁর বিকলাঙ্গ হবার কারণ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি উত্তর না-দিয়ে তাঁকে পাঠালেন বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণুও উত্তর দিতে না-পেরে তাঁকে পাঠালেন শিবের কাছে। শিবও এর কোনও উত্তর দিতে পারলেন না। তিনি ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আনলে অষ্টাবক্র বললেন—কোথায় ঈশ্বর? শিব অনন্যোপায় হয়ে বললেন—এ তোমার কৃত কর্মের ফল। তোমার ভগ্ন শরীরের জন্য তুমিই দায়ী।

অষ্টাবক্র বললেন—আমিই যদি দায়ী হব তো তোমার কাছে এলাম কেন?

অষ্টাবক্র জন্মেছেন শুদ্ধ সংস্কার নিয়ে, তিনিই বা ছাড়বেন কেন? শিব দেখলেন সত্যিই জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। শিব বললেন—তোমার কৃত কর্মের ফল তোমাকেই ভোগ করতে হবে।

অষ্টাবক্র বললেন—ভোগ করে কে?

শিব—জীব।

অষ্টাবক্র—আত্মার সঙ্গে জীবেব কী সম্পর্ক?

শিব—না, আত্মার সঙ্গে জীবের এমনকী জগতেরও কোনও সম্পর্ক নেই। আত্মা নিষ্ক্রিয় নির্বিকার নির্বিকল্প নিরবলম্ব নির্দয়। আত্মার স্বরূপ হল সাক্ষী। এক পূর্ণ মুক্ত চৈতন্য—অসঙ্গ অনাসক্ত নিস্পৃহ শান্ত। শুদ্ধ আমি-র এই ধর্ম। সাধনভজন করে সিদ্ধিলাভ করলে এই সত্যের সঙ্গে মানুষের পরিচয় হয়। কাজেই একটি শুদ্ধ আমি এবং আরেকটি অশুদ্ধ আমি। অশুদ্ধ আমি দেহের সঙ্গে যুক্ত। দেহের নানাবিধ চাহিদা পূর্ণ করার কাজে সে ব্যস্ত। তারপর নিজস্ব চাহিদা তো আছেই। জীবনের প্রতিটি চিন্তা ও কর্মের মধ্যে চারটি স্তর আছে। এই চারটি স্তরের মধ্যে বোধের জ্যোতি প্রকাশ পায়। শুদ্ধবোধে এই চারটি স্তর হল মায়া। মায়া হল deluding, illusory, ভ্রান্তিকর—একটির পরিবর্তে আরেক রকম ভাবে প্রকাশ করে।

অষ্টাবক্র—আমি যদি আমার দেহের জন্য দায়ী হয়ে থাকি, তাহলে আমি ঈশ্বরকে বা দেবতাকে মানতে যাব কেন?

শিব—জগৎকল্যাণের জন্য মানতে হয়।

অষ্টাবক্র—ঈশ্বর তাঁর খেয়ালখুশি মতো জগৎ সৃষ্টি করলেন কেন?

দেখ এই কথাগুলি নিজের মতো করে ব্যবহার করতে গেলে কিন্তু আরও নিচে নেমে যাবে। 'এ' analytical part-এর কথা বলছে। অধিকার না-জন্মালে এ সব ব্যবহার করা যায় না। বিকারমুক্ত হবার একটি science তোমাদের বলা হচ্ছে। মন বিকার বাড়াতে পারে, কমাতে পারে না। এই যে রূপ, নাম, ভাব, বোধ—এই চারটি স্তরের কথা বলা হচ্ছে, এই চারটি স্তরের মধ্যে এক চৈতন্যই খেলছে। এই চৈতন্যের নামই হল মা। এই কথা বহুবার বলা হয়েছে, কিন্তু তোমাদের মন ধরে রাখতে পারে না।

অষ্টাবক্র শিবকে জিজ্ঞাসা করলেন—আত্মা যদি পরমসত্য হয় তাহলে জগৎ কী করে সত্য হয়? জগৎ বৈচিত্র্যময়। আত্মা তো বিশুদ্ধচৈতন্য, সাক্ষিচৈতন্য। তিনি বিভু,

all-pervading। তাহলে আবার জগৎকল্যাণের জন্য ঈশ্বরকে মানতে হবে কেন? (আত্মজ্ঞানীর এই হল বিশ্লেষণ!)

শিব—তাহলে তুমি আমাদের কাছে কেন এসেছ?

অষ্টাবক্র—সৃষ্টি সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা প্রত্যক্ষ করতে।

শিব—তোমার উপস্থিতবুদ্ধি, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং বিচার-বিশ্লেষণ শুনে আমি মুগ্ধ ও প্রীত। আমি যদি তোমাকে কিছু দিতে চাই তুমি নেবে তো?

অষ্টাবক্র—না।

শিব—আমি খুশি হয়ে দিতে চাই।

অষ্টাবক্র—আমি যখন আমার জন্য সর্বতোভাবে দায়ী তখন আমি কারও জিনিস চাই না। তোমার জিনিস তুমি রাখ। আমার যা আছে আমার থাক।

শিব দেখলেন অষ্টাবক্রকে আর মানানো যাবে না। এখানে প্রশ্ন জাগতে পারে, শিব সব জেনেও এ সব করলেন কেন? কেউ ভাবতে পারে শিব অত উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁরও ভুলভ্রান্তি থাকতে পারে। Self-realized person-এর analysis মন-বুদ্ধি দিয়ে এক বিন্দুও বোঝা যাবে না, কিন্তু ভুল বোঝবার right আছে পুরোপুরি।

অষ্টাবক্র—তোমরা প্রধান তিন দেবতা হলেও বদ্ধ। সৃষ্টিজালে জড়িয়ে আছেন ব্রহ্মা, দায়িত্বজালে জড়িয়ে আছেন বিষ্ণু এবং দায়িত্বের অন্য জালে জড়িয়ে আছেন মহেশ্বর। তাঁরা creation, preservation and destruction-এর জন্য responsible। Self is ever-free.

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আত্মবোধের জ্ঞান is quite distinct from all these। কাজেই তোমাদের মাথায় এ সব ঢোকে না। তা স্বয়ংপ্রকাশ বলে প্রকাশ হয়েই চলেছে। This is the true nature of Self. It is of revealing nature, ever-shining nature—স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। আত্মজ্ঞানী তাই জগৎ নিয়ে মাতামাতি করেন না। তাই এবার যখন বলা হয়েছিল 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) 'Missionless mission'-এর কথা, তখন কেউ তা বুঝতে পারেনি। অনেকেই বলেছে—এই কথা অর্থশূন্য। অথচ আপনি যা বলেন তার উত্তরও আমরা দিতে পারি না। তাদের বলা হয়েছে—তোমরা নিজের বশে নেই, তাই তোমরা অন্যের বশে আছ। তোমাদের আত্মা সম্বন্ধে কোনও ভাবনা নেই। তোমরা অনাত্মা নিয়েই মাতামাতি কর। আত্মজ্ঞানী নিজ ছাড়া অন্যকে জানেন না। 'এ' জগতের মধ্যে প্রথমেই দেখে বোধকে। তারপর ভাব, নাম এবং সব শেষে রূপকে দেখে। আর তোমরা আগে রূপকে দেখ। বোধ তোমাদের কাছে ধরাই পড়ে না। কারণ তোমরা মনের গোলামি কর। মনের দাস হয়ে তার সেবা করে চলেছ। তাই বলা হয়েছিল—

হরিনামের তরঙ্গে গা ভাসাও মন আমার
দেখছো তো জীবনভরে দুঃখময় এ সংসার।।

হরি হরি হরি বলে ভাসাও জীবনতরী এবার
ভাসতে ভাসতে লাগবে তরী স্বস্বরূপের ঘাটে আবার।।

যারা হরিকে আত্মা অতিরিক্ত ভাবে, তারা হরিকে পায় না। হরিকে নিজবোধে মানলে তাঁকে নিজবোধেই পাবে আপন করে। স্ববোধে অন্য বোধ খেলে না। তাই স্ববোধ দিয়েই হরির ভজনা করতে হয়।

২১। ০৬। ০২

৩৬৬

অখণ্ড আপন বোধসত্তা হল প্রেমসুধাসাগর প্রেমসত্তা বোধসত্তা। এই বোধসত্তাকে কী দিয়ে বোঝানো যাবে? একমাত্র বোধ দিয়েই তা সম্ভব। মনের সাধ্য নেই বোঝবার। এখানে তো অনেকেই তাদের evil mind-কে প্রশ্রয় দিয়ে বলছে—এটা নয়, ওটা নয় ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে অনেক গল্প তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে। অনেক দুর্বিনীত, অসংযত ও ধর্মবিরোধী রাজা, যারা সাধুসন্ত মহাত্মাদের অসম্মান ও পীড়ন করেছে, তাদের জীবনেই আবার এমন সময় এসেছে যে, তারা মানতে বাধ্য হয়েছে। যারা ঠেকে শেখে তারা খুব কষ্ট ভোগ করে। শুনে শেখার মতো অধিকারী পুরুষ বড় দুর্লভ। তারপর দেখে শেখা। একজনের ভাল হয়েছে দেখে অপর একজনও same determination নিয়ে চেষ্টা করে না।

উপরোক্ত প্রসঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর তিনটি গল্প বললেন।

(ক) একজন মহাপুরুষের কাছে অনেক লোক যাতায়াত করত। কিছু বৃদ্ধও সেখানে যেতেন। মহাত্মা তাদের আশীর্বাদ করতেন। একদিন এক বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি তো সবাইকে আশীর্বাদ করলেন, কিন্তু আমাকে কী আশীর্বাদ করলেন? মহাত্মা বললেন—তুমি যা চাও তা-ই। তিনি বললেন—আমি আপনার মতো হতে চাই। মহাত্মা বৃদ্ধের চোখের দিকে চেয়ে বললেন—তা-ই হবে। বেশ কিছুকাল পরে দেখা গেল বৃদ্ধ লোকটির আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে।

প্রথম গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—আসলে আমরা তো আশীর্বাদ কুড়াতে জানি না, শুধু অভিশাপ কুড়াই। নিজেদের ব্যবহারে অপরের বিরক্তির কারণ হয়ে অভিশাপ কুড়াই। ফার্ন রোডের সৎসঙ্গে একজন বলেছিল—আমি সারাজীবন অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছি আর যেন অভিশাপ কুড়াতে না-হয়। আশীর্বাদ যেন কুড়াতে পারি। সারাজীবন ঠ্যাটামি ও বাচালতা করে অনেক অভিশাপ কুড়িয়েছি। তাকে বলা হয়েছিল—তাহলে তোমার বাচালতা ও কথা কমাও, যাদের সঙ্গ কর তাদের সঙ্গ পরিহার কর। আশীর্বাদ গ্রহণের অধিকার থাকা চাই। ভেজাকাঠে যেমন আগুন জ্বলে না তেমনই কামাহত চিত্তে আশীর্বাদ কার্যকরী হয় না।

এবার তিনি দ্বিতীয় গল্পটি বললেন—(খ) একদল ডাকাত গ্রামে গ্রামে ডাকাতি করে বেড়াত। কাজ শেষ হলে সর্দারের সামনে ভাল জিনিসগুলি ভাগাভাগি হত। একদিন ডাকাতি করে ফিরে এসে সেই দলের কয়েকজন লোক কিছু জিনিসপত্র অন্যত্র সরিয়ে রাখল। তারপর সর্দার তাদের ডাকলে বাকি মালসমেত তারা সর্দারের কাছে গেল। সর্দার বলল—আমি এতদিন ধরে তোদের চালাচ্ছি, আমার কাছে মিথ্যে বললে তোদের কোথাও গতি হবে না। বাকি মাল কোথায় আছে নিয়ে আয়।

অন্য ডাকাতরা বলল—সর্দার, এ-ই সব মাল।

সর্দার—মিথ্যে বলছিস না তো?

ডাকাতরা—না সর্দার।

সর্দার—ঠিক বলছিস তো? এর পরে কান্নাকাটি করলে আর শুনব না। আর আজ থেকে আমি এই দল ভেঙে দিলাম। কাল থেকে আর ডাকাতি করব না। তোরা যে যেখানে পারিস চলে যা।

সর্দারের কথা শুনে অন্য ডাকাতরা তার পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল। তখন সর্দার তাদের বলল—আমিও ডাকাতি করতাম, কিন্তু তার মধ্যেও সততা ছিল। তোদের মধ্যে সততার একান্ত অভাব।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এখানেও শিখবার বিষয় আছে। এক কথায় ডাকাত দল ভেঙে দিল। কতখানি তার resolutive, determined will! তাই বলা হয়েছিল—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।" বল মানে এখানে bodily strength নয়। বল হল balanced nature—physical, vital, mental—সব জায়গায় control থাকবে। মন চাইলেই ছুটবে, এমন নয়। পেটরোগা মানুষের ভাল খাবার দেখলেই জিভে জল আসে, এমন নয়।

এবার তিনি তৃতীয় গল্পটি বললেন—(গ) একজন লোক তার বাবুর বাড়িতে কাজে লেগেছে। বাবু তার কাছারিতে বসে সবার মাইনে দিচ্ছেন। বাবু অনেক টাকা গুনছিলেন। টাকা দেখে লোকটির খুব লোভ হল। সে ভাবল—ইস, আমার যদি অত টাকা থাকত!

ইতিমধ্যে সবার টাকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে। বাবুও কার্যোপলক্ষ্যে অন্দরমহলে গেলেন। অন্যান্য লোকেদের বাইরে যেতে দেখে লোকটি সব টাকা চুরি করে পালাতে গিয়ে বাড়ির বৃদ্ধ দারোয়ানের হাতে ধরা পড়ে যায়। তখন দারোয়ান তাকে বাবুর কাছে নিয়ে গেল। লোকটি সরাসরি কিছু স্বীকার করল না। তার মিথ্যা বলার অভ্যাস, কাজেই অবান্তর মিথ্যা বলে যাচ্ছিল।

বাবু তখন দারোয়ানকে নির্দেশ দিয়ে বললেন—ওকে একটি ঘরে বন্দি করে রাখ আর এই টাকার চতুর্গুণ টাকা ওর ঘরে ছড়িয়ে রাখ। জল, খাবার কিছুই ওকে দেবে না। তিন দিন পরে লোকটি বাঁচবার জন্য চিৎকার করে উঠল। দারোয়ান এসে বাবুকে জানাল—বাবু, ও আধমরা হয়ে গিয়েছে। বাবু বললেন—ঠিক আছে, ওকে নিয়ে এস। লোকটি যে টাকা চুরি করেছিল সেই টাকা তাকে দিয়ে বাবু বললেন—এই টাকা নিয়ে এই তল্লাট ছেড়ে চলে যাও। আর কোনও দিনও যেন তোমাকে এখানে না-দেখতে পাই।

লোকটি বলল—বাবু, আমার টাকা চাই না। আমাকে আপনি প্রাণে বাঁচান। বাবু তখন তাকে বললেন—কী দিয়ে বাঁচবি টাকা ছাড়া? আবার তো চুরি করবি। এ ভাবে বাবু তাকে তিন দিন ধরে বোঝালেন। লোকটিকে তিনি জামাকাপড় কিনে দিলেন। তারপর লোকটি বাবুকে বলল—আমি আর বাড়ি ফিরব না। তবে আপনার কাছে

একটি প্রার্থনা আছে। যদি আমাকে রাখেন তো এখানেই বাকি জীবন কাটিয়ে দেব, অন্যথা যে দিকে দু'চোখ যায় সে দিকেই চলে যাব।

শেষ পর্যন্ত বাবু তাকে তার কাছে রেখে দিলেন। তাকে কী কাজ দিলেন জান? তাকে টাকা গুনে রাখার কাজ দিলেন।

উপসংহারে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—দেখ, মহৎ কাকে বলে! মহৎ অপরকে মহৎ বানায়। লোকটি যতদিন ছিল একটি পয়সাও সরায়নি। যে জানে, সে জানে—আত্মাকে আপন করে আপনবোধ। আত্মার কথা এত angle থেকে বলা হচ্ছে, কিন্তু তোমাদের মন deceive করছে, betray করছে। তোমরা মনকে deceive করতে পারছ না?

২১। ০৬। ০২

৩৬৭

আত্মা আত্মাকেই ভালবাসে। আত্মা অনাত্মাকে ভালবাসতে পারে না। আমাদের বস্তুপ্রীতির মূলেও আছে আত্মা, কেন না Self is all-pervading। It is the real existence on which all gross, subtle and subtler variations are rising, dancing, playing and functioning. কাজেই এই আত্মবিজ্ঞান হল সমস্ত বিজ্ঞানের essence। এই বিজ্ঞান যতদিন না মানুষ ঠিক মতো চর্চা করবে, ততদিন তার বর্ণপরিচয়ই হবে না—M.A. হোক আর doctorate হোক!

একদিন একটি ফলের বাগানে একজন ফল ব্যবসায়ী এসেছে। বাগান দেখে তো সে অবাক। এতবড় বাগান, তাতে এত রকম গাছ। ফল ব্যবসায়ী বাগানের মালিকে জিজ্ঞাসা করল—এতবড় বাগান তুমি manage করছ কী করে? মালি বলল—আপনি আগে বাগান দেখা শেষ করুন তারপর আমরা ঘরে বসে আলোচনা করব।

সেই ব্যবসায়ী সব ভাল করে দেখে মালির ঘরে এসে বসল। মালির ঘরে প্রচুর বই সাজানো ছিল। Botany, Life Science, Environmental Science-এর বই; প্রচুর ছবির collection এবং কিছু curio-র collection-ও ছিল। ব্যবসায়ী আশ্চর্য হয়ে মালিকে বলল—তুমি ফলের ব্যবসা করছ আবার এতবড় বাগান করে এত পড়াশুনা করছ, কী করে এই সব manage করছ?

মালি বলল—দেখুন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেছেন আবার জগৎকেও চালাচ্ছেন। এই সত্য আপনি মানতেও পারেন, আবার নাও মানতে পারেন। তবে আপনার সংসার চালাতে আপনাকে তো সংসারের কর্তা হতেই হবে। সেই রকম এই বিরাট সংসারকে maintain করবার জন্য তাঁর একজন কর্তার প্রয়োজন আছে যিনি এ সব দেখাশোনা করবেন।

ব্যবসায়ী—তাহলে তিনি এতদিন করেননি কেন?

মালি—আমাদের ভুলের দৃষ্টিতে আমরা তাঁকে দেখেছি, তিনি কিন্তু actually কোনও ভুল করেননি। কেন না ভুল হয় যার দ্বারা, তিনি সেই মনের দাস নন। কিন্তু আমরা সেই মনের দাস। আপনি আমার এই বাগান দেখে অবাক হয়েছেন কারণ আপনি পূর্বে এতবড় বাগান দেখেননি, অর্থাৎ আপনার সেই অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু

আমি যে বাগানকে অনুসরণ করে এই বাগান করেছি তার তুলনায় আমার বাগান একটি তিল পরিমাণ।

ব্যবসায়ী—কী বলছেন!

মালি—আমি জগৎ বাগান ঘুরেছি, পৃথিবীর নানা দেশ দেখে অবাক হয়েছি। তাঁকে বলেছি, হে master, creator! You are so great and perfect, ঠিক যেখানে যা দরকার তা-ই করেছেন। অথচ আমরা সংসারে দু-তিনজন member নিয়েও চালাতে পারি না। ফুটানি করি, গর্ব করি, রাগারাগি করি।

মালির এ সব কথা শুনে ব্যবসায়ীর খুব ভয় হল। ব্যবসায়ীকে মালি প্রশ্ন করলে সে কোনও উত্তর দিতে পারে না।

আমাদের আসলে কিছু নেই তবু আমরা pose করি knowing nothing at all।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর এবার গল্পের শেষাংশটি বললেন—মালি ব্যবসায়ীকে বলল—আপনার এই দেহকে, যাকে আপনি এত আপন ভাবেন তার মধ্যে কতগুলি department আছে জানেন? অর্থাৎ কতগুলি departmental function হয়ে চলেছে তা কি আপনি জানেন? আপনি তো অনেক কিছু জানেন—এমন ভাব করেন। জানবেন তো ঠিকই, কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এই জানা চলতে থাকবে ততদিন পর্যন্ত আপনি অপূর্ণ। অপূর্ণতার লক্ষণ হল আপনার অভিমান-অহংকার, স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত দুর্বলতা।

গল্প শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—প্রত্যেকেরই একটি ব্যক্তিগত দুর্বলতা আছে। অপরে যখন তা জানে তখন সে বলির পাঁঠার মতো হয়ে যায়। কিন্তু আত্মজ্ঞপুরুষের কাছে এ সব কোনও factor নয়। কারণ তিনি আপনবোধের জ্যোতিতে সব কিছুকে নিজের মধ্যে absorb করে মিলিয়ে নেন। তাই তিনি দ্বৈতকে বা বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেন না। এই একবোধ, আপনবোধের চর্চা মানুষ অজ্ঞাতসারে করে চলেছে। কিন্তু তা যখন সে জ্ঞাতসারে করবে তখন সে সাধক হবে—মহাসাধক হবে। অর্থাৎ সে তখন দেখে সমস্ত জগৎ এবং তার মধ্যে যা-কিছু আছে, সেগুলির একটিমাত্র উপাদান সত্তা—অর্থাৎ একবোধে গড়া জগৎসংসার। বোধ ছাড়া কোনও কিছুর পরিচয় নেই। সত্য মানেই বোধ, বোধ মানেই সত্য। এখানে কোনও মনের চিন্তার কথা বলা হয়নি। Dont forget and confuse My words with your imagination. বক্তব্য বিষয়ের প্রত্যেকটি word-কে follow করতে না-পারলে you cannot follow Me। তোমার মন তোমাকে সারাজীবন বঞ্চিত করেছে, তোমার অনন্ত জীবন বঞ্চিত করেছে। কয়েকটি petty pleasure দিয়ে তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে। ছোট শিশুকে যেমন নাড়ু ও খেলনা দিয়ে ভুলানো হয়, তেমনই মনও তোমাকে ভুলিয়ে রেখেছে—কিন্তু তুমি তা বোঝনি। দুই পাতা বই পড়ে তর্ক করে মানুষ। এটা তার imperfection-এর লক্ষণ। আবার তারা নিজেদের কথা justify করে, যুক্তি দেখায়—এটা আরও বেশি অজ্ঞানের লক্ষণ। All sorts of justification are to maintain ignorance. অজ্ঞানকে maintain করতেই justification আসে।

এক professor বলেছিলেন—বাবাঠাকুর আপনার কথা যত শুনি ততই অবাক হই। কথাগুলি যখন ভিতরে ঢোকে তখন যেন ধাক্কা খাই। এতদিন যা শিখেছি, পড়েছি সব futile মনে হয়—কিছুই শিখিনি, কিছুই জানতে পারিনি। We cannot apply our education in the right time for the right cause. তার কারণ তোমরা part নিয়ে চলছ সারাজীবন। ব্যক্তিগত পছন্দ বা part নিয়ে চলে সংসার। কিন্তু সমসারে একজ্ঞান নিয়েই সব চলে।

তোমাদের বুদ্ধি মার্জিত ও সংযত নয় বলে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) কথা সব সময় গ্রহণ করতে পার না। কিন্তু ফাঁকি দিলে তো তোমরা নিজেরাই ফাঁকে পড়বে। 'এ' যে কোথায় আছে তা তো তোমরা জান না। তোমরা তো 'একে' এখানে দেখছ—that is your fault। যখন আপনবোধ চর্চার দ্বারা তোমাদেব অন্তর expanded and elevated হবে তখন দেখবে তোমার অন্তর বিশ্ব ছাড়িয়ে চলে গিয়েছে। তখন সমগ্র বিশ্ব একটি dot-এর মতো তোমার মনের মধ্যে প্রকাশিত হবে। Can you imagine that at present? তোমার বর্তমান বুদ্ধি দিয়ে কি তুমি অনুমান করতে পারবে যে, সমগ্র বিশ্ব তোমার মনে মাত্র একটি বিন্দুর মতো জায়গা নিয়ে আছে? বাইরে তুমি দেখছ জগৎ, জগৎ আর তুমি জগতের অন্তর্ভুক্ত। This is optical illusion. আকাশের রঙ নেই তবু colourless sky appears as blue। সেই রকম formless Self appears as manifold। জগৎরূপে প্রতিভাত হচ্ছে যা, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে তা স্বপ্ন বা মায়া।

সংসারী মানুষ 'একে' লাঠিপেটা করবে। আবার বিপদে পড়ে একদিন এখানেই ছুটে আসবে। যখন সংসারে আপনজনের বা প্রিয়জনের কাছে ধাক্কা খাবে তখন সেই জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করতে না-পেরে support-এর আশায় 'এর' কাছেই আসবে। ইন্দ্রিয়ের ভাললাগা, অর্থাৎ বর্তমানে যা প্রিয় তা শ্রেয় নয়। যাকে তুমি বল আপন সে আর আপন থাকবে না। কারণ বাইরের কোনও বস্তু আপন হতে পারে না। Reflection cannot be one with the reflector. Light cannot be one with the shadow.

৫। ০৭। ০২

৩৬৮

যাঁরা আত্মজ্ঞানী তাঁদের কাছে আছে একজ্ঞান। আর যারা সংসারী তাদের কাছে আছে বহুজ্ঞান—নানাত্ব-বহুত্বের জ্ঞান। কাজেই সংসারীর কাছ থেকে জ্ঞান নিয়ে জ্ঞানী হওয়া যায় না। তাই জ্ঞানী আহ্বান করেন—জাগো। কত জন্ম তো অজ্ঞানের ঘরে ঘুমিয়ে কাটালে, এবার সেখান থেকে বেরিয়ে এস। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।" জ্ঞানীর কাছে যাও, কারণ তোমার অজ্ঞান কারণকে আর কেউ সরাতে পারবে না। অজ্ঞানের একমাত্র ওষুধ হল জ্ঞান। অদ্বৈতজ্ঞান দিয়েই অজ্ঞানকে/ দ্বৈতজ্ঞানকে খণ্ডন করতে হবে। তাই বলছে—"ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুধা চিন্ত্যমানঃ।" আত্মজ্ঞানী ছাড়া অন্য কারও দ্বারা অনুশাসিত হলে তোমার অজ্ঞান

কারণ অপসারিত হবে না। "এতৎ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মর্ত্যঃ প্রবৃহ্য ধর্ম্যমণুমেতমাপ্য।"—এটা সুবিদিত হবে না। কারণ যার নিজেরই অজ্ঞান যায়নি তার কথায় তোমার অজ্ঞান যাবে কী করে? অন্তরে যার অজ্ঞান বিরাজমান সে অপরের অজ্ঞান কী করে নাশ করবে? সংসারীর কাছ থেকে জ্ঞান নেওয়া বিপদ। একটি দোঁহাতে আছে—

'গৃহী হোকে কহে জ্ঞান
ভোগী হোকে লাগায়ে ধ্যান
যোগী হোকে ঠোকে ভগ
এ তিন আদমি পুরা ঠগ।'

জন্ম যখন নিয়েছ মানুষের ঘরে তখন এই সত্য অনুভব করার চেষ্টা কর। জ্ঞান হল এক-এর জ্ঞান। গৃহী, যে নানাত্ব-বহুত্বের মধ্যে থাকে, তার কাছে এক-এর জ্ঞান কী করে পাবে? ভোগী যে, সে যখন ধ্যান করে তার মধ্যে ভোগের চিন্তাই আসে--সেই ধ্যান কখনওই আত্মধ্যান হয় না। আবার যে যোগী সে যদি স্ত্রীসঙ্গ করে তাহলে সে যোগীই নয়। সাধুসমাজে এই তিনজনই ঠগ অর্থাৎ cheat। এদের কাছে কোনও উপকার পাবে না। কাজেই দেখ কতখানি সচেতন হয়ে চলতে হবে। আমরা তো খাইদাই আর ঘুমিয়ে পড়ি। এই ঘুমকেও overcome কবতে হবে।

বেশির ভাগ মানুষই তো অসুস্থ। কেউ না-ঘুমিয়ে পারে না, কেউ একবেলা না-খেলে অসুস্থ বোধ করে—এই নিয়েই চলছে জীবন। প্রিয়জনদের নিয়ে সংসার করছে। কিন্তু এই প্রিয়জনেরাও তো থাকে না। যার যখন সময় হয় চলে যায়। তখন দিনকয়েক কান্নাকাটি তারপর আবার যে-কে-সেই। এই জীবনটাই প্রহসন, নাটক। এরই মধ্যে মানুষ দিব্যি বেঁচে আছে।

হরিভক্ত নারদের ত্রিলোকে অবাধ গতি। তিনি হরি নাম গুণগান করে সর্বত্র ঘুরে বেড়ান। হরিও নারদকে পেলেই তাঁকে দিয়ে কিছু কাজ করিয়ে নেন।

একদিন নারদ বলছেন—প্রভু, তুমি তো আমাকে দেখলেই তোমার কোনও কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও। তুমি আমার কী গতি করলে?

ভগবান—তোমার গতি তো হয়েই আছে।

নারদ—কী গতি?

ভগবান—কাজটা সেরে এস তারপর বলব।

নারদ কাজটা সেরে এলেন। ভগবান তখন ভাবলেন, নারদকে আবার কিছু শিক্ষা দিতে হবে। নারদকে সঙ্গে নিয়ে হরি চললেন এক ভক্তের বাড়ি। নারদ বিরক্ত হলেন। তিনি ভগবানকে বললেন—আপনি যে এত সৃষ্টি করে ঝামেলা তৈরি করেছেন, তার ঝক্কি তো আমাকেই পোহাতে হবে। আমার আর ভাল লাগে না। শিব তো সব সময়ই আত্মবোধে মগ্ন থাকেন।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই নারদও দু-একবার আত্মবোধ লাভের চেষ্টা করেছিলেন। ভগবানই ইন্দ্রকে দিয়ে তা ব্যর্থ করিয়েছিলেন। নারদ তাই ইন্দ্রের প্রতি তুষ্ট নন। এ সব হল Divine plane-এর politics।

নারদ প্রভুর সঙ্গে ভক্তবাড়ি গিয়েছেন। ভক্তও ভগবানের সেবায় নানা উপচারে ভোগ নিবেদন করেছে। নারদ ভাবলেন, যাক, বহুদিন পরে আজ একটু ভাল-মন্দ খাওয়া যাবে! প্রভু তো আহারে বসেছেন। তিনি তো নিজেই খেয়ে চলেছেন। ভগবান নারদকে তো কিছুই দিচ্ছেন না। অনেকক্ষণ পর নারদকে একটি পদ দিলেন, আর কিছু দিলেন না। নারদ তাতে বিরক্ত হলেন। নারদ ভাবলেন, ভগবান কি রাক্ষস! নিজে একাই খাচ্ছেন, আমাকে তো কিছুই দিচ্ছেন না।

এদিকে ভগবান খাওয়াদাওয়া শেষ করে বললেন—চল নারদ। নারদ তো অবাক। তিনি ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনি আমাকে নিয়ে এলেন এখানে আর সব খাবার একাই খেলেন! ভগবান বললেন—কেন তুমি যে একটু আগে বললে, আমি বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছি কেন? ভাবলাম তোমার বৈচিত্র্য ভাল লাগে না তাই তোমায় একটি পদ খেতে দিলাম।

এবার তাঁরা আবার রওয়ানা হলেন। বনের প্রান্ত দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ প্রভু বললেন—নারদ, আমার খুব জল পিপাসা পেয়েছে, তুমি আমায় একটু জল খাওয়াতে পার? নারদ প্রভুর জন্য জল আনতে ছুটলেন। ছুটছেন তো ছুটছেনই, জল আর খুঁজে পান না। জল খুঁজতে খুঁজতে নারদেরও ক্ষুধা-তৃষ্ণা পেয়ে গেল। অনেক সময় পেরিয়ে গিয়েছে। প্রভুও জলের আশায় বসে আছেন। এ ভাবে কয়েকবছর পেরিয়ে গেল। আসলে time-এর calculation different plane-এ different। এই difference হয় according to the distance of the sun।

নারদ দেখলেন একটি মেয়ে শুয়োর চরাচ্ছে। মেয়েটি ডোমের মেয়ে। নারদ তার কাছে জল চাইলেন। সে নারদকে বলল যে, জল দিতে পারে, কিন্তু তাঁকে তার বাড়ি যেতে হবে। মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দরী ছিল। গরিবের ঘরে মাঝে মাঝে এমন সুন্দরী মেয়ে দেখা যায়। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নারদ সেই মেয়েটির সাথে তাদের বাড়ি এলেন। নারদেরও তখন খুব জল পিপাসা পেয়েছে। মেয়েটি তাঁকে বলল—ঠাকুর, তুমি এত দূর থেকে আমাদের বাড়িতে এলে, একটু বিশ্রাম কর, কিছু আহার গ্রহণ কর, তারপর না-হয় যাবে। নারদ তার কথাতে রাজি হয়ে গেলেন। তারপর তার বাড়িতে নারদ আহার গ্রহণ করে একটু বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম যখন ভাঙল তখন সন্ধে হয়ে গিয়েছে। এদিকে প্রভুর জন্য জল নিয়ে যাবার কথা নারদ একেবারে ভুলেই গিয়েছেন। বাড়িতে মেয়েটির বাবা-মাও তাঁর খুব আদরযত্ন করল। নারদের খুব ভাল লাগছিল। তাঁর মনে হল, এরা খুব ভক্ত লোক।

ধীরে ধীরে নারদ মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন! শেষ পর্যন্ত তিনি মেয়েটিকে বিয়েই করে বসলেন। দেখতে দেখতে অনেকদিন কেটে গেল। নারদ অনেকগুলি সন্তান নিয়ে ঘোর সংসারী হলেন। প্রভুর কথা তাঁর আর মনেই নেই।

এদিকে প্রভু ভাবছেন, সেই যে নারদ জল আনতে গেল আর তো ফিরছে না! সে কি হারিয়ে গেল? প্রভু যোগবলে জানতে পারলেন নারদের সংসারের কথা। নারদের খবর নিতে তিনি একজনকে পাঠালেন। নারদ কিন্তু কোনও মতেই তাকে

প্রশ্রয় দিলেন না, এমনকী প্রভুর কথাও তাঁর মনে এল না। তিনি তখন সংসার নিয়ে এতই মশগুল। এখন নারদ শুয়োর চরান (সঙ্গদোষে কী হয় দেখ!)। প্রভু কয়েকবার লোক পাঠিয়ে নারদের মন ফেরাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হল না। তাই প্রভু নারদকে ফেরাবার জন্য অন্য পথ অনুসরণ করলেন।

প্রভু প্রথমে নারদের শ্বশুর-শ্বাশুড়িকে মেরে ফেলসেন। তারপর অনেকগুলি শুয়োর মেরে ফেললেন। নারদের খুব মন খারাপ হল। কিন্তু তবুও তাঁর মন ফিরল না। আস্তে আস্তে নারদের কয়েকটি ছেলেমেয়েকেও মেরে ফেললেন। তাতেও নারদের মন ফিরল না। এরপর শুরু করলেন বৃষ্টি। এত বৃষ্টি হওয়ার ফলে বন্যা হয়ে গেল। ডাঙার সন্ধানে নারদ ও তাঁর স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কোলে পিঠে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। যেতে যেতে জলের current-এ একে একে তাঁর সব ক'টি ছেলেমেয়ে ভেসে গেল। নারদ মনের দুঃখে চিৎকার করে উঠলেন। নারদ চোখ খুলে দেখেন তাঁর প্রভু সামনে দাঁড়িয়ে হাসছেন আর বলছেন—কী নারদ, তুমি তো অনেক জল খেলে, আমার জন্য কি জল পেলে? নারদ তখন প্রভুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাইলেন। তিনি প্রভুকে বললেন—প্রভু, অনেক শিক্ষা দিয়েছ, আর নয়। নারদ আবার প্রভুর সঙ্গে চলতে শুরু করলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এ রকম গল্প পুরাণে অনেক আছে, দেবতাদের প্রসঙ্গেও আছে। কারণ সবই তো মনের রাজ্য। আত্মবোধে তো মন নেই, কাজেই সৃষ্টিও নেই। এই কথাগুলি মনে রাখার জন্যই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এত কথা বলা হচ্ছে। Mind is so mysterious, that is why creation of mind is also mysterious. সৃষ্টি হল বৈচিত্র্যে ভরা। বৈচিত্র্য হল contradiction। Contradiction থেকে আসে ভেদদৃষ্টি। তাই *শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা*-তে ছোট্ট কথাতে বলা হয়েছে—কর্ম ও মন অভিন্ন। কর্ম থাকলে কর্মফলও আছে। পুরো ব্যাপারটিই mysterious। জ্ঞানীর ভাষায় তা ইন্দ্রজালবৎ। Magician যখন magic দেখায় সেটা বেশ enjoyable but that is not real। That is why it is called figment।

মনের সৃষ্টিকে অতিক্রম করার জন্যই আত্মবিজ্ঞান—যার দ্বারা সমস্ত জ্ঞানাভাস, অজ্ঞান, অজ্ঞানাভাস, স্থূল, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বিলাসকে অতিক্রম করা যায়। তাই তো গানে বলা হয়েছে—

নাই নাই রে নাই নাই রে
নাই সুখ নাই শান্তি মনের অধিকারে।।
ভুলে মুক্তস্বরূপ আপন কামাহত মন
অভিমানে চলে সদা স্বভাব বিকারে।
বদ্ধ হয়ে অহংকারে দেহকারাগারে
ভোগ-আশে আছে প'ড়ে মায়ার সংসারে।।

আছে সুখ ও শান্তি মনের 'পরে
স্ববোধ ঘরে ঘিরে আপনারে পূর্ণ ক'রে চিরতরে।
থাক সেথা সুখে নির্বিকারে
এসো না এসো না এসো না ওরে
মেতে উল্লাসে মানস বিলাসে
ভুল ক'রে মনের অধিকারে।।

ছোট গান, তার মধ্যে depth কতখানি! মন তোমাকে সেই depth-এ যেতে সাহায্য করবে না। Until and unless the song is explained, you will never

be able to understand the implied meaning of the song. গানের অন্তর্নিহিত মর্মকে, এ সব revealed song, বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না। বুদ্ধি দিয়ে সাধারণ গানের বিচার হতে পারে, কিন্তু after realization যে-সব ভজন আসে তা হল দিব্যসংগীত—revealed song। তা কখনওই intellectual composition নয়।

অনেকেই বলে গানমাত্রেই revelation। তাদের বলা হয়েছে, what is the meaning of realization, mental understanding and intellectual understanding? What is the difference between realization, perception and conception? Realization Real-কে base করেই হয়। That is Knowledge of Oneness/Oneness of Knowledge, that is Knowledge of Knowledge, but not the knowledge of person, thing, action, result, space, time, causation and phenomenal creation—এগুলির জ্ঞান নয়। এগুলি objective knowledge। তার উপরে আছে subjective knowledge। তারও উপরে super subjective knowledge এবং তার পরে transcendental knowledge–that is Knowledge Itself।

১৯। ০৭। ০২

৩৬৯

নিজের সম্বন্ধে আমরা অজ্ঞ অথচ বাইরে থেকে বিষয় সংগ্রহ করে আমরা বিজ্ঞ সাজছি। এটাই antithesis, আত্মবিরোধী। জানতে হলে worth knowing হল to know one's own Self। নিজেকে জানাই হল সবচেয়ে বড় জানা। নিজেকে কী ভাবে জানবে? I am the background, I am the essence of all, I am the reality, I am the Absolute, infinite, immortal. আমাতে দুই নেই, তাই দ্বন্দ্বও নেই। আমি দ্বন্দ্বাতীত ভাবাতীত ভেদাতীত সর্বসম অনুপম (matchless) অনাদি (আদি নেই)--অনন্ত (অন্ত নেই), তাই জন্ম-মৃত্যুর কোনও প্রশ্ন নেই। এগুলি সামান্য একটু যদি কেউ ভাবে তাহলে মন আপনা থেকেই সতেজ হয়ে উঠবে। তাকে নূতন জীবনীশক্তি দেবে। প্রতিদিন যদি কেউ অল্পকিছু সময় এগুলি নিয়ে চিন্তা করে তবে তার ভুলভ্রান্তি আপনা থেকেই কমে যাবে। আসলে গৃহস্থ সজাগ থাকলে চোর আসে না। Self-awareness যখন জেগে ওঠে তখন ইন্দ্রিয়ের প্রাধান্য থাকে না। ইন্দ্রিয়ই অখণ্ড এক-এর জ্ঞান চুরি করে সেখানে নানাত্ব-বহুত্বের জ্ঞান বসায়। Self-awareness জেগে উঠলে আর মন-রূপ দস্যু, পিশাচ মায়ার প্রাধান্যও থাকবে না। মন কী ভাবে ভুলিয়ে, শাস্ত্র ও ধর্মের দোহাই দিয়ে তোমাকে বৈচিত্র্যের কারাগারে বন্দি করে রাখছে। সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে তো পারছ না। সংসারে রাজা হলেও তো তুমি ভিখারি, কারণ তোমার আত্মজ্ঞান নেই। আবার আত্মজ্ঞানী তো রাজা হতে চান না। আত্মজ্ঞানী বাইরের রূপ-নাম-ভাবের রাজত্ব চান না। তাঁর আছে স্বরাজ। তিনি যে আপনাতে আপনি স্বয়ংপূর্ণ অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দ স্বয়ং। কাজেই নিজের পরিচয় শোনার নাম শিক্ষা, তা মেনে চলার নাম ধর্ম এবং তা অনুভব করার নাম মুক্তি।

'এ' নূতন সংজ্ঞা দিয়ে যাচ্ছে, যা তোতাপাখির মতো একই বুলি নয়। তবে এ সব বুঝতে গেলে মনকে হৃদয়ের গভীরে নিয়ে যেতে হবে। সেখান থেকে মন আর ফিরে আসতে পারবে না। মন তখন অ-মন হয়ে যায়। নদী যেমন সাগরে গেলে আর ফিরে আসতে পারে না, সে সাগর হয়ে যায়, তেমনই এই মনকে সচ্চিদানন্দসাগরে ডুবিয়ে দাও স্বরূপের কথা স্মরণ করে। তোমার বীজমন্ত্রকে লক্ষবার জপ করে তুমি যে ফল পাবে তার কোটিগুণ ফল পাবে আত্মস্বরূপকে স্মরণ করে। কেন না সব দেবতাই আত্মদেবতার projection। অবশ্য দেবতাদের তুষ্ট করে কী হবে? তাঁর দেওয়া জিনিস যখন ফুরিয়ে যাবে তখন তো যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে।

নচিকেতা তার নিজের পিতার যজ্ঞকর্ম দেখে অবাক হয়েছিল। তার পিতা মুনি ছিলেন। তিনি যজ্ঞান্তে গোদান করছিলেন। সেটাই ছিল তখনকার রীতি। গোদান হল শ্রেষ্ঠ দান। এই দানের জন্য গরু সংগ্রহ করা হয়েছিল। সেই সব গরুদের মধ্যে কিছু রুগ্ণ ও ক্লিষ্ট গরুও ছিল। নচিকেতা বারবার তাঁর পিতাকে অনুরোধ করে বলল—পিতা, তুমি এত ভাল ভাল জিনিস দিচ্ছ, কিন্তু তার মধ্যে এই রুগ্ণ ও ক্লিষ্ট গরু কেন দিচ্ছ? এদের সরিয়ে দাও। পিতার কানে সে কথা পৌঁছাল না। নচিকেতা বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও পিতা তার কোনও কথা শুনলেন না। তারপর নচিকেতা যখন দেখল যে, তার পিতা সবই দান করেছেন তখন সে তার পিতাকে বলল—তুমি তো সবই দিয়ে দিচ্ছ, কিন্তু আমাকে তুমি কাকে দিচ্ছ? বেশ কয়েকবার একই কথা বলার পর পিতা বিরক্ত হয়ে বললেন—তোকে যমকে দিয়ে দিলাম।

দেখ, তখনকার মুনিরাও বিরক্ত হতেন! কারণ তাঁরা তো আত্মজ্ঞানী ছিলেন না। তখনকার যাগযজ্ঞ, ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি ছিল পুণ্য অর্জনের জন্য। এই পুণ্য অর্জন অনেকটা bank-এ টাকা রাখার মতো বা বেশ কিছু টাকা জমিয়ে দিনকয়েকের জন্য কোনও star hotel-এ গিয়ে থাকার মতো। টাকা ফুরিয়ে গেল, manager bill ধরিয়ে দিল—আবার কর্মক্ষেত্রে ফিরে আসা। তেমনই সঞ্চিত পুণ্য নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে অর্জিত পুণ্য শেষ হয়ে গেলে আবার মর্তে ফিরে আসতে হয়। আবার কর্ম করে ভোগের জন্য বিভিন্ন লোকে যাওয়া। এই তো চলছে। এই দু'টিতে যাঁর বিতৃষ্ণা জেগেছে, অর্থাৎ এগুলি যে অনিত্য—এই জ্ঞান যাঁর হয়েছে, তিনিই সেই পরমজ্ঞান লাভ করেছেন। দান—কাকে কে দান করবে? এ সব দ্বৈতবোধে সম্ভব, অদ্বৈতবোধে তা সম্ভব নয়।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আবার গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন—*পিতা মুনি, তাঁর কথা সত্য হবে ভেবে নচিকেতা যমের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হল। যমের বাড়ি গিয়ে দেখতে পেল যে, যম বাড়িতে নেই। নচিকেতা অপেক্ষা করতে লাগল। মুনিপুত্র ব্রাহ্মণ বালক, পিতার নির্দেশে ও অনুশাসনের ফলস্বরূপ তার কিছু অর্জিত কর্ম/জ্ঞান তো ছিল। যমের বাড়িতে গিয়ে তাঁর অনুপস্থিতিতে সেখানে জলগ্রহণ পর্যন্ত না-করে সে তিন দিন* অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে দিল। তিন দিন পরে যম ফিরে এসে এই অবস্থা দেখে ভাবলেন, আমি দেবতাদের মধ্যে বিশেষ দেবতা, আমার তো এটা অধর্ম হয়ে

গেল! এমন একজন বালক অভুক্ত অবস্থায় এখানে রয়েছে। তিনি বালকের কাছে ক্ষমা চাইলেন। অথচ বালকটির সরল মতি, তার মধ্যে তো কোনও complex নেই, ক্ষমা চাওয়ার কারণও সে বুঝতে পারছে না। বর্তমানে ছোটদের মধ্যেও 'আমার আমার ভাব' ঢুকে যায়। আবার যম দেবতা বলেই ক্ষমা চাইছেন, মানুষ হলে তো এ সব পরোয়াই করত না।

যম নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে চাইলেন। নচিকেতা বুদ্ধিমান বালক, সে বলল—সশরীরে এসে যমরাজের দর্শন পাওয়া তো ভাগ্যের কথা। আর একবার যখন আপনার সাক্ষাৎ পেয়েছি তখন আমার একটি প্রশ্নের উত্তর আপনাকে দিতেই হবে। প্রশ্নটি হল, মৃত্যুর পরে কী আছে?

যমরাজ তখন ভাবলেন, এ কী রকম বালক! এমন প্রশ্ন করছে, যে প্রশ্ন কোনও বৃদ্ধও করে না, এমনকী সাধুসন্তরাও করেন না। নচিকেতাকে ভুলিয়ে দেবাব জন্য যম বললেন—আমি তোমায় আরেকটি বর দেব, তুমি এই প্রশ্ন ছাড়া অন্য কোনও প্রশ্ন কর। আমি তোমাকে এমন আয়ু দিচ্ছি যা মানুষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। স্বর্গের আরাম, আনন্দ সব দিচ্ছি যা তুমি মর্তলোকে পাবে না। স্বর্গের সব অপ্সরীরা তোমার সেবা করবে। যম ধন-দৌলত, ঐশ্বর্য দিয়ে তাঁকে ভরিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু একটি বারো বছরের বালক হেলায় সব সরিয়ে দিয়ে শুধু সেই একটি প্রশ্নের উত্তর চাইল। ভোগী মন সংসারে যত পায় তত চায়।

নচিকেতা যমকে বলল—অবশ্য আপনি আমাকে একটি বর দিতে পারেন, আমি সংসারে ফিরে গেলে পিতা যেন আমায় দেখে ভয় না-পান।

সাধারণত মৃত্যুর পর আবার বেঁচে উঠলে মানুষ ভয় পায়। এমন ঘটনা জানি যে, মরে যাবার পর দেহ শ্মশানে নিয়ে গিয়েছে, হঠাৎ সেখানে মরদেহ জীবন্ত হয়ে ওঠে। তখন সেই শবদেহ বহনকারীরা শবকে পিটিয়ে মেরে তারপর পুড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে। এখনকারদিনে এ সব হলে পুলিশ খবর পেয়ে ধরে নিয়ে যাবে। এমনকী রামচন্দ্রও committing suicide-এর দায়ে পড়তেন। তিনিও তো সরযূ নদীতে স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। আগেকারদিনে যজ্ঞ করে যে দেহাহুতি দেওয়া হত তাও বর্তমানে criminal offence। মহাভারতে কর্ণ নিজের পুত্রকে বলি দিয়ে অতিথি আপ্যায়ন করেছিলেন। এটাও তো criminal offence। 'এ' এই সব কথা তোমাদের সামনে রাখছে তোমাদের alert করার জন্য। তোমরা হয়ত এ সবই জান। তবে *তোমাদের এই জানা কিন্তু জ্ঞান নয়, জ্ঞানাভাস। আমরা যত জ্ঞানাভাস সংগ্রহ করি, তা আমাদের কোনও কাজে লাগে না, আবার ভুলেও যাই।*

যাই হোক, নচিকেতা যমের কাছে প্রার্থনা করল, ঘরে ফিরে গেলে যেন পিতা আমাকে দেখে ভয় না-পান। বালকের সরলতা, দৃঢ়তা ও বুদ্ধির গভীরতায় যম তো অভিভূত। বালক বলল—এই দেহ তো একদিন না একদিন শেষ হবেই, আমি তো কালাধীনই রয়ে গেলাম। তাহলে আপনাকে পেয়ে আমার কী লাভ হল? আর একমাত্র আপনিই আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন। আপনিই বলেছেন দেবতারাও এই প্রশ্নের

উত্তর জানেন না। তাহলে এমন দুর্লভ বস্তু তো আপনি ছাড়া আর কারও কাছে পাওয়া যাবে না। যম যত প্রলোভন দেখিয়ে নচিকেতাকে তার প্রশ্ন থেকে সরে আসতে বলেন, নচিকেতাও তত দৃঢ় হতে থাকে। অবশেষে যম হার মানলেন। যম নচিকেতাকে বললেন—জ্ঞানের জন্য তোমার এই স্পৃহা নাচিকেতাগ্নি/জ্ঞানাগ্নি নামে পরিচিত হবে। এটাও একটি বর দিলেন।

বর্তমানে এমন একটি প্রাণও খুঁজে পাওয়া যাবে না যে নিজের প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য এত প্রলোভন ত্যাগ করে অবিচল থাকতে পারে। নচিকেতা শেষে যমকে বলল—আপনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন বর দেবেন। আপনি আপনার কথা রাখলে রাখুন, না-রাখলে আমার কিছু বলার নেই। যম যখন দেখলেন এমন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ বালককে কিছুতেই রোধ করা যাচ্ছে না, তখন তিনি বাধ্য হয়ে তার কাছে অমৃতত্বের কথা, অমর আত্মার কথা প্রকাশ করলেন।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর গল্পের অন্তর্নিহিত তত্ত্বপ্রসঙ্গে বললেন—এটা অতীতের একটি ঘটনা, কঠোপনিষদের একটি বিরাট অংশ। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) বই পড়েওনি, শোনেওনি। তবে ছিন্নমস্তারূপে সব কিছুকে গ্রহণ করা হয়েছে। এই বেদ, বেদান্ত, শাস্ত্রের বহু অংশ চোখের সামনে দেখা হয়েছে—সেই হিসাবে বলা। এগুলি কি জ্ঞান নয়? হয়ত আত্মজ্ঞান reveal হওয়ার আগে এগুলি প্রকাশ পায়। এর বিশেষ কোনও গুরুত্ব নেই। বাইরের জগতে আমরা যা দেখি তা যেমন দৃশ্য, ইন্দ্রিয়ের দৃশ্য, এগুলিও তেমন মনের দৃশ্য। দৃশ্য সব সময়ই আত্মা অতিরিক্ত, আত্মা নয়। অদ্বয়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হলে কী হয় জান—এক-এর জ্ঞানের বাইরে যাওয়া যায় না। লক্ষ লোক মিলে যদি তাঁকে প্রশ্ন করে, তখন তিনি এক-এরই কথা বলবেন।

এই নচিকেতা একটি বালক, এমন একটি example রেখে দিয়ে গিয়েছে যা পৃথিবীর সব দেশে খুঁজে দ্বিতীয় আরেকটি পাওয়া যাবে না। আশি/নব্বই বছরের বৃদ্ধ নয়, তপস্বী তো তার পিতাও নন, তবে এই বালকের মধ্যে এই জিনিস কোথা থেকে এল? বালকের মধ্যে আত্মবিচার জেগেছিল—পিতা তুমি আমাকে কাকে দেবে? নিজেকে সে দিতে উদ্‌গ্রীব। অর্থাৎ তার যে জীবত্ব তা দিতে সে উদ্‌গ্রীব। আত্মাকে তো দেওয়া যায় না—এই ব্যাপারে সে কতখানি sincere, কতটা honest। ধর্মজগতে সাধনায় honesty and sincerity একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যাঁরা যম, নিয়ম অভ্যাস করেন তাঁদের কাছে এর গুরুত্ব আরও বেশি।

এখন বেঁচে থাকতে হলে যদি আমাকে দুঃখকষ্ট নিয়ে থাকতে হয়, তা মৃত্যুর থেকে কম নয়। যে জীবনে আনন্দ বস্তুসাপেক্ষ, ব্যক্তিসাপেক্ষ, দেশ-কাল, কার্য-কারণ সাপেক্ষ, সেখানে তো আনন্দ পূর্ণমাত্রায় নেই—আছে শুধু আনন্দের আভাস। তার জন্য মানুষকে এত পরিশ্রম করতে হয় যে, সে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়ে। আসল আনন্দকে না-পেয়ে আনন্দের আভাসে সে কী করে তুষ্ট হবে? জ্ঞানাভাস নিয়ে কী ভাবে তুষ্ট হবে আসল জ্ঞানস্বরূপকে না-পেলে? আকাশের সূর্যকে না-দেখে জলে প্রতিবিম্বিত সূর্যকে দেখে কি তৃপ্ত হবে? আকাশের পূর্ণ চন্দ্রিমাকে না-দেখে অমুক চন্দ্র অমুকের

landscape-এ চন্দ্র দেখে কি মানুষ তৃপ্ত হবে? আর কেউ হয় কি না জানি না, 'এ' দৃশ্য দেখে তৃপ্ত হয়নি। কর্তা-ভোক্তা সেজে তৃপ্ত হতে রাজি নই। যেখানে কর্তা, ভোক্তা, দ্রষ্টা, দৃশ্য নেই সেখানে নিত্যসত্য অখণ্ডরূপে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। নিজের স্বরূপ ছেড়ে দৃশ্যের পিছনে যাব কেন? ব্রহ্ম যদি আমার থেকে আলাদা হয় তাহলে ব্রহ্ম is not the Absolute, Brahman ceases to be Absolute। তাহলে আমার মধ্যে ব্রহ্ম আছে। আমি সেই ব্রহ্মকে বাদ দিয়ে অব্রহ্মের পিছনে কেন যাব? পরমদেবতাকে ছেড়ে ক্ষুদ্র দেবতার পিছনে কেন ছুটব?

আমার প্রশ্ন আমার কাছে। তাই 'এ' আপনার খোঁজ করেছে আপনবোধে। তাই বুঝেছে— "স্বস্বরূপানুসন্ধানম্ ভক্তিরুচ্চতে"। ভক্তি সর্ববস্তুর মধ্যে পরিবেষিত। এই ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে 'এ' কোনও ভেদ খুঁজে পায়নি। তাই 'এর' কাছে যা ভক্তি তা-ই জ্ঞান, যা জ্ঞান তা-ই ভক্তি। তবে এটা লৌকিকদৃষ্টির জ্ঞান বা ভক্তি নয়। যা নিত্য এক-কে প্রকাশ করে, এক-কে এক দিয়ে ব্যবহার করে, একবোধে নিত্যযুক্ত থাকে, একবোধকে ভালবাসে—এখানে 'আমি'-র জ্ঞান-ভক্তি-যোগ অভিন্ন অবস্থায় বিরাজ করে। একবোধ দিয়ে এক-কে প্রকাশ করা, একবোধ দিয়ে একবোধকে, আপনবোধ দিয়ে আপনবোধকে ভালবাসা এবং একবোধে যুক্ত থাকা। তাই 'এ' ছিন্নমস্তার কথা বলেছে, সেখানে আর দ্বৈতবোধ নেই। ছিন্নমস্তা মা (আত্মা) নিজেকেই নিজে প্রকাশ করছেন নিজবোধ দিয়ে। নিজ মুণ্ড কাটছেন এবং নিজের রক্ত নিজেই পান করছেন। তিনি মরছেনও না, মারছেনও না। This is the Science of Oneness, Oneness of Knowledge/Knowledge of Oneness.

৩০। ০৮। ০২

৩৭০

এই যে সংসারে আমরা এত দুঃখকষ্ট ভোগ করি তবু সত্যি সত্যি এই দুঃখকে লাঘব করতে চাই কি আমরা? তোমরা ভাব—জন্মের পর থেকে প্রতিটি মানুষ দৈহিক, প্রাণিক, মানসিক, আর্থিক, বৌদ্ধিক, পারিপার্শ্বিক ইত্যাদি নানা দিক থেকে কষ্ট ভোগ করছে, আঘাত পাচ্ছে আবার নিজ কৃত কর্মের ফলও ভোগ করছে। তবুও কি একবারও ভাবছে এই চক্র থেকে কী করে রেহাই পাবে? কেউ কারও সঙ্গে যখন পরম শত্রুতা করছে তখন তার প্রতি জাগছে প্রতিশোধস্পৃহা—ছাড়ব না। কিন্তু এই ভাবে তো রেহাই পাবে না, আবার জড়িয়ে পড়বে আরও গভীরে। কিন্তু আসল বস্তু যে কত দূরে সরে যাচ্ছে তা বোঝে না। বুঝিয়ে দিতে চাইলেও বোঝে না। তর্ক করে, নিজের জ্ঞানের গরিমা করে, কেউ বা দেয় বয়সের অভিজ্ঞতার দোহাই। বয়স কোনও criterion-ই নয়। একটি শিশুর মধ্যেও বোধ জাগতে পারে। একজন বৃদ্ধ অজ্ঞানীর মতো আচরণ করতে পারে। বড় আশ্চর্য এই মিথ্যা মায়ার জগৎ! এত দুঃখের মধ্যেও মানুষ আশায় বুক বাঁধে—সুদিন আসবে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কোনও একজন গৃহস্থের একটি সুন্দরী স্ত্রী ছিল। বেশ কিছুদিন সংসার করার পর হঠাৎ একদিন তার স্ত্রী গত হল। সে তার স্ত্রীকে খুব ভালবাসত। সে কিছুতেই এই

বিচ্ছেদকে মেনে নিতে পারল না। সে হন্যে হয়ে খুঁজতে লাগল, কোথায় গেলে সে তার স্ত্রীকে খুঁজে পাবে। সে পাগলের মতো ঘুরছে—যাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছে। কেউই তার সমস্যার সমাধান করতে পারছে না। সে ছুটল ধর্মজগতের লোকেদের কাছে, সাধুসন্তদের পিছনে। সবার কাছে তার এক অনুরোধ—আমার স্ত্রী কোথায় গিয়েছে? তার সঙ্গে কি আমায় দেখা করিয়ে দিতে পারেন? এই ভাবে পাহাড়ে তার সঙ্গে এক মহাত্মার দেখা হল। মহাত্মা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কী কর? সে যা কাজ করত তা মহাত্মাকে জানাল। মহাত্মা বললেন—তাহলে তো তুমি আরেকটি বিয়ে করে নিতে পাব। সে বলল—না, আমি অন্য কারওকে স্ত্রীরূপে চাই না, আমার স্ত্রীকেই চাই। মহাত্মা বলল—তা তো হবার নয়। তার দেহ তো পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। সে বলল—সে সব আমি জানি না, আমি আমার স্ত্রীকেই চাই। মহাত্মা তাকে আরও বুঝিয়ে বললেন—দেখ, তোমার অবস্থাটা কী রকম জান? তুমি বহু দূরে এক গন্তব্যস্থলে যাবে। বেশ খানিকটা পথ চলে আসবার পর মনে হল—আরে, আমি তো বাড়িতে একটি জিনিস ফেলে এসেছি! তা ছাড়া তো আমার চলবে না। তখন সে ঐ জিনিসটি আনতে ফিরে যাবেই। কেন না সেই অবস্থায় ওটাই তার মনের কাছে খুব জরুরি। আবার গন্তব্যস্থলটাও জরুরি—সেখানেও যেতে হবে। তার সাথে অন্য যা'দের দেখা হল তারাও বলছে—কী ব্যাপার, আবার ফিরে যাচ্ছ? ওটা ছাড়াও তো চলতে পারে। গেলে আর তো ফিরে আসতে পারবে না। আর একবার গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলে ওটার আর কোনও প্রয়োজনই থাকবে না। লোকটি তো নাছোড়বান্দা। সে বলল—না, ওটাই আমার চাই। সে রেগে গিয়ে তর্ক করতে লাগল।

মহাত্মা তাকে আরও বললেন—তুমি যদি এখন তাকে দেখ সে তোমাকে নিতে পারবে না আর তুমিও তাকে নিতে পারবে না। সে বলল—না, তা হতেই পারে না। মহাত্মা—যদি হয় তাহলে তুমি কী করবে? সে তখন আর কোনও উত্তর দিতে পারল না। মহাত্মা তখন তাকে বললেন—তুমি যাকে চাইছ, কেন তাকে পেয়েছিলে তার কারণটা তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এই বলে তিনি তাকে সব দেখালেন। লোকটি অবাক হয়ে ভাবল, এমন করে পেতে হয়েছে! মহাত্মা বললেন—হ্যাঁ, আবার যদি তাকে পেতে হয় এই ভাবেই পেতে হবে, আবার সে চলে যাবে। আর সে না-গিয়ে যদি তুমি যাও তার অবস্থাও ঠিক এই রকম হবে।

লোকটি ভাবল, মহাত্মা আমাকে যা বললেন, যা দেখালেন তার সাথে তো আমার কোনও পরিচয়ই নেই। মহাত্মা তখন বললেন—দেখ, তোমাকে আমি এর চেয়ে অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারি, সেখানে এ সব কিছুই নেই। তিনি লোকটিকে বসতে বলে তাকে স্পর্শ করে বললেন—relax কর। ধীরে ধীরে সে নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। তিন দিন সে একই ভাবে সেখানে বসে রইল। চতুর্থ দিনে মহাত্মা আবার তাকে স্পর্শ করে ফিরিয়ে আনলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—কী হল? লোকটি বলল—আঃ! কী দারুণ আনন্দ, কী শান্তি! আপনি আমাকে আবার সেখানে পাঠিয়ে দিন। মহাত্মা বললেন—না, এবার যাকে আগে চেয়েছিলে তার সাথে তোমাকে নরকযন্ত্রণা ভোগ করাব। লোকটি বলল—না দেব, আমি আর কারওকে চাই না। তবুও তাকে মহাত্মা

কতগুলি দৃশ্য দেখালেন। দেখালেন তার স্ত্রীর চেয়েও সুন্দরী এক মহিলার দেহ কী ভাবে আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে পচে গলে যাচ্ছে। সুন্দর কী ভাবে কুৎসিতে রূপান্তরিত হয় তা-ই দেখালেন। এই দৃশ্য দেখে লোকটি চিৎকার করে বলল—আপনি বন্ধ করুন, আমি আর সহ্য করতে পারছি না।

মহাত্মা বললেন—তোমার ভাললাগা, liking, প্রিয়বোধের কী অবস্থা দেখ! লোকটি বলল—না, আপনি আমাকে সেই শান্তির স্থানে নিয়ে যান। মহাত্মা বললেন—আর সহজে তুমি সেখানে যেতে পারবে না। এই দুর্ভোগ ভোগ করার এখনও অনেক বাকি আছে। আগে সে সব নাশ কর, তারপর। লোকটি বলল—কী করে নাশ করব? মহাত্মা বললেন—নিজের অন্তরের জ্ঞানাগ্নি দ্বারা তা দগ্ধ কর। জ্ঞান-অসি দিয়ে তা খণ্ডন কর। এই বলে তিনি লোকটিকে ধ্যানে বসিয়ে দিলেন।

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এই লোকটি কে জান? স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনির্বাণ, সত্যানন্দ, শিবানন্দ ইত্যাদি অনেকেই ছিলেন। শুধু এক গুরুর কাছে নয়, যে রসাস্বাদন তিনি করেছিলেন তাতে established হবার জন্য চারজন গুরুকে বরণ করেছিলেন। সেই যোগী ছাড়া, তান্ত্রিক গুরু বামাক্ষেপার কাছে শ্মশানে ছিলেন। তারপর জ্ঞানী গুরুর কাছে 'জগৎ অনিত্য' এই ভাব দৃঢ় করার জন্য তাঁর অনুশাসন গ্রহণ করেন। অবশেষে এক প্রেমিক গুরুর কাছে যান। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা শোনা যায়। সাধনোত্তর জীবনে নিগমানন্দের চেহারা হয়েছিল অনিন্দ্যসুন্দর দেবদুর্লভ। তিনি গেলেন এক মহাসাধিকার কাছে। তাঁর ঐ চেহারা দেখে তাঁর গুরুই তাঁর প্রেমে পড়ে যান। সেই অবস্থা থেকে তাঁর যোগী গুরু তাঁকে উদ্ধার করেন। তিনি দেখা দিয়ে বললেন—কি রে! তুই আবার ঐ সর্বনাশা পথে চলেছিস। তখন তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—কে বুঝবে এর মহিমা! সংসারী তো বোঝেই না, সাধুসন্তরাও বোঝেন না। এতবড় একজন যোগী তিনিও ভুলে গিয়েছিলেন। আত্মবোধে প্রতিষ্ঠার আগে মানুষকে বহু পরীক্ষা দিয়ে তবে পার হতে হবে—তা সে যোগের মাধ্যমেই কর আর জ্ঞানের মাধ্যমেই কর। জ্ঞানের সাধনা অতি দুর্লভ। জ্ঞানী কোথায়! অদ্বয়বোধে প্রতিষ্ঠিত জ্ঞানীর কোনও problem থাকতেই পারে না। তাঁর কাছে আবার কিসের সমাধান! সাধনাই তো কল্পনা। আত্মা তো নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত। এই আত্মা কোনও দিন বদ্ধই হয়নি। তাহলে পরমসত্য কী? যার উৎপত্তি ও বিনাশ নেই, সাধক কেউ নেই, বন্ধন ও মুক্তি নেই—তা-ই হল পরমার্থসত্য পরমতত্ত্ব নিত্যাদ্বৈত।

যারা জ্ঞানতত্ত্বে পূর্ণ অধিষ্ঠিত তাঁরা গুরু-শিষ্য মানেন না। আত্মা নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত—তাঁ কখনও জীব হতেই পারে না। তাঁ জীব হলে তো শিব হবে। তাঁর বিকার হলে তো বিকারমুক্তির প্রশ্ন আসবে। তাঁর জন্ম হলে তো জরা, ব্যাধি, কর্ম, কর্মফল ও মৃত্যু হবে—all these are relative, but not real। বুদ্ধি নেই, মন নেই—বুদ্ধিই তো মন, বুদ্ধিই তো জ্ঞানচর্চা করে। কোথায় বুদ্ধি এবং কার বুদ্ধি? 'অখণ্ড ভূমা সচ্চিদানন্দস্বরূপ কেবলোঽহম্'-এ কোথায় বুদ্ধি? দ্বৈতবাদ সেখানে নেই—সেখানে না পুরুষ, না প্রকৃতি, না সাধ্য, না সাধক, না সাধন, না সিদ্ধি। তা-ই হল পরমতত্ত্ব অদ্বয়তত্ত্ব ব্রহ্ম-আত্মার পরিচয়।

কী পরিমাণে নিজেকে নিজেরা degrade করেছ, এখন সাফাই গাইছ, নিজের দোষ ঢাকবার চেষ্টা করছ। সংসারে যদি এমন কোনও লোক থাকেন যিনি সব কিছুর জন্য শুধু নিজেকেই দায়ী করেন তিনিই একমাত্র জ্ঞানচর্চা করার উপযুক্ত, আর কেউ নয়। I am the cause—আমি সর্বপ্রকার কার্যের জন্য দায়ী। জগতে যা-কিছু ঘটে যাচ্ছে তার জন্য আমিই দায়ী। এ কথা যিনি বলতে পারেন অন্তত তাঁর কোনও দ্বন্দ্ব থাকবে না। He will be free from all contradictions, all pairs of opposites.

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি।।"

জ্ঞানীরা বলেন—জ্ঞানীর পথ বড় rigid, ক্ষুরের ধারের মতো sharp। সে পথ অতি দুর্গম। এই সংসাররূপ দুর্গম পথে চলতে চলতে একটু পদস্খলন হলে দুর্ভোগ ভোগ করতেই হবে। নিজেকে অজ্ঞানের গভীরে নিয়ে যাবে। তাঁকে একা চলতে হবে—one by himself/herself। সেখানে দ্বিতীয় কেউ নেই। আমি আমার ত্রাতা, আমি আমার মালিক, দ্বিতীয় কোনও মালিক নেই, কোনও compromise নেই। প্রকৃতি যতই প্রলোভন নিয়ে আসুক all are futile, all are insignificant। আমি অতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছু নেই। একটি গানে বলা হয়েছিল—'আমি অতিরিক্ত সব মিথ্যা/আমাতে আমি স্বয়ংপূর্ণ।' "ময়া এব সর্ব্বং পরিব্যাপ্তম্ ময়ি এব সর্ব্বং পরিপূরিতং অভিব্যক্তং ময়ি এব সর্ব্বং লয়ং জাতি তস্মাৎ সচ্চিদানন্দ অখণ্ড ভূমা স্বরূপ কেবলম্।"

১৩। ০৯। ০২

৩৭১

জগৎ জুড়ে আছে বিষাদ। বিষাদে ভরা জগৎ। তাই 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) জগৎকে বলে dustbin। জগতে যে দিকে তাকাবে দেখবে শুধু অজ্ঞানের খেলা। এই অজ্ঞান তোমাদের জীবনে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে, তা-ই তোমাদের সর্বদুঃখের কারণ। Patch work করে তা কী করে এড়াবে? তোমার ভাললাগা এবং প্রত্যেকের ভাললাগা দিয়েই সবাই চেষ্টা করছ। সবার ভাললাগাই তো পরস্পরের থেকে পৃথক। তুমি তোমার ভাললাগাটা গ্রহণ করে অপরের না-ভাললাগাটা বাদ দিলে আবার অপরে তোমার সেই ভাললাগাকে পছন্দই করবে না—কী করবে! তাই তো সংসারে প্রতি ঘরে ঘরে অশান্তি। স্বামী-স্ত্রীয়ে, ভাই-বোনে, ভাই-ভাইয়ে, বোন-বোনে মিল নেই। সবাই patch work করে চলেছে। সংসারে তাই শান্তি নেই। সংসারে শান্তি থাকলে তো কেউ আর শান্তির সন্ধান করত না। যে জিনিসের অস্তিত্বই নেই, তাকে আমরা সত্য বা বাস্তব মনে করে সেবা করছি। তাহলে এই world appearance is unsubstantial, illusory, unreal—তা কী করে জানবে? নিজেকে জানলে আর জগৎ থাকে না। আবার যতদিন জগৎ আছে ততদিন কেউই নিজেকে জানতে পারবে না—অসম্ভব, absolutely impossible। সেই জন্য ঋষিরা সমাধির কথা উল্লেখ করে গিয়েছেন। সমাধির মধ্যে জগৎ একেবারেই লয় হয়ে যায়, থাকেই না। যার অস্তিত্বই নেই তাকে আর negate করার প্রশ্নই ওঠে না। যার অস্তিত্ব নেই, তাকে বিদ্যমান বলে মনে

হয়—তার নামই মিথ্যা। আর অসৎ মানে যাকে মনেও করতে পারি না। কাজেই মনের বিষয় সবটাই মিথ্যা। এটাই solution। মিথ্যাকে পোষণ করে শান্তির আশা করা অবান্তর, absurd।

কাজেই এখনও অনেক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে চলতে হবে, অনেক দুঃখকষ্টের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। প্রিয় বস্তুর বিয়োগে ব্যথা, অপ্রিয় বস্তুর বিয়োগে আনন্দ। যেখানে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি নেই, সেখানে এগুলি কল্পনা করছে মন। কিন্তু গাঢ় ঘুমে, সুষুপ্তিতে কোথায় জগৎ, কোথায় প্রিয়জন!

আগেকারদিনে রাজারা ঋষিদের কাছে পরামর্শ নিতে যেতেন। আবার রাজারাও ঋষিদের আশ্রম পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। পরস্পরের সঙ্গে এই সম্পর্ক আজ আর নেই, চুরমার হয়ে গিয়েছে। সেই ব্যবস্থাপনাও আজ আর নেই। বিশেষ এক ঋষির কাছে রাজা গিয়েছেন। রাজার খুব মন খারাপ। তার তিন রানি তাকে মানসিক চাপে ক্লিষ্ট করে রেখেছে। মনের দুঃখে তিনি ঋষির পরামর্শের আশায় এসেছেন।

যেমন সুরথ রাজার সব কিছু তার পরিবার দখল করে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। বৈশ্যকেও তা-ই করেছিল। এগুলি ঘটনা। অবশ্য কল্পনাতেই ঘটনা ঘটে। এর মধ্যে সুরথ রাজা তার কষ্টের কারণের সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাইলেন। কিন্তু বৈশ্য সব ছেড়ে পরমতমের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। তাই বৈশ্য আর ঘরে ফিরলেন না, কিন্তু সুরথ নিজের রাজ্যে ফিরে এসে তার রানিদের শাস্তি দিয়ে আবার রাজত্ব করতে লাগলেন। সুরথের রাজত্ব আজও চলছে দেহ দেহান্তর। কিন্তু বৈশ্য সমাধি লাভ করে সকল দুঃখের পরপারে শান্তির রাজ্যে চলে গেলেন।

ঋষি রাজাকে পরামর্শ দিতে গেলে রাজা বিরক্ত হয়ে ঋষিকে কিছু কড়া কথা বলে ফেললেন। ঋষি তখন রাজাকে বললেন—রাজা তুমি কী ভাবে রাজা হয়েছ তা তুমি জান না, আবার এই রাজত্ব তুমি কী করে হারাবে সে সম্বন্ধেও তোমার বিশেষ কোনও জ্ঞান নেই। তোমার রাজত্ব হারাবার ভয় থাকলেও আমার ঋষিত্ব হারাবার কিন্তু কোনও ভয় নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ঋষিত্ব একবার অর্জিত হলে অর্থাৎ এক-এর বোধ একবার জাগ্রত হলে তা আর বিনষ্ট হয় না। এক-এর বোধ জাগার আগে দ্বৈতের কারণ সম্পূর্ণ ভাবে নির্মূল হওয়া চাই। Knowledge of Oneness cannot reveal so long as there is sense of duality which characterizes ego, desire and cause of enjoyment. ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা হল enjoyment, subject যখন object-এর ব্যবহার করছে that is enjoyment। There is no sense of subject-object duality. This is called knowledge. Subject-object-এর knowledge হল reflection of knowledge—জ্ঞানাভাস।

জ্ঞানাভাস না-থাকলে বিষয় প্রতিভাত হয় না। বিষয়কে প্রতিভাত করে জ্ঞানাভাস, আর তাকে জ্ঞাত করায় কূটস্থচৈতন্য। জ্ঞানাভাস যার থেকে প্রকাশ হয় সে-ই হল কূটস্থচৈতন্য existing in our heart অর্থাৎ আত্মচৈতন্য—the inmost Conscious-

ness. Inmost pure Consciousness হল কূটস্থ, দেহের বাইরে তা-ই ব্রহ্ম। Pure Consciousness existing outside the body is Brahman and inside the body is Kutastha. তার প্রকাশ দ্বারা বুদ্ধি প্রকাশিত, বুদ্ধি এক part-এ বস্তুকে প্রকাশ করছে এবং আরেক part-এ বস্তুকে অনুভব করছে। আত্মাতে বুদ্ধি না-থাকায় সেখানে enjoyer এবং object of enjoyment নেই।

১৩। ০৯। ০২

৩৭২

'এ' perfect realization-এর science-কে step by step সবার সামনে রেখেছে। গ্রহণ করার মতো যোগ্য ব্যক্তি যদি কেউ থাকে তবে সে-ই এগিয়ে আসতে পারবে, আর কেউ নয়। সংসার network-এর জালে জড়িয়ে মন-বুদ্ধি লক্ষ অজুহাত দেখায়। দায়িত্ব, কর্তব্যের অজুহাত দিয়ে সে নিজেকে বেঁধে রেখেছে। যদি সত্যি দায়িত্ব কর্তব্যের কথা ওঠে তবে first chance should be for the Self. My first duty is to realize my own Self, Which I have forgotten–if there is any utility of duty, all else are secondary. প্রত্যেকের জীবনে আত্মাকে জানাই হল একমাত্র লক্ষ্য। The only purpose of life is to know the Self, all else are secondary. Secondary জিনিস নিতে গেলে তোমাকে pay করতে হবে, penalty দিতে হবে, কেন না জন্ম জন্মান্তর ধরে তুমি যা ভোগ করেছ তা ফিরিয়ে দিতে হলে তুমি হিমশিম খেয়ে যাবে। তোমার কোনও যোগ্যতাই নেই to return all these things। তার জন্যই বলা হয়েছে একমাত্র পথ হল unconditional surrender।

কিন্তু কথাটি যত সহজে বলা যায়, কাজে তত সহজে করা যায় না। How can you surrender until and unless you are exhausted and tired enough? ভোগের ইচ্ছা, প্রাধান্য পাবার ইচ্ছা, মোহ, কর্তৃত্ব ইত্যাদি থেকে বেরিয়ে আসতে না-পারলে তুমি surrender করবে কী করে? এই যে কথাগুলি শুনছ এগুলি যদি তোমার মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করে তবেই কিছুটা এগোতে পারবে নতুবা নয়। আর যাদের মাথায় কিছুই ঢুকছে না, যারা আসছে-যাচ্ছে, তাদের কী লাভ হচ্ছে? অনন্ত কাল চলতে হবে এই জগৎচক্রে। তাই বলা হয়েছিল—

'ভবচক্রের যাতাকলে কতকাল আর রাখবে মোরে
রক্ষা কর রক্ষা কর রক্ষা কর আমারে।।'

এত সহজেই ছাড়বে? কত কান্নাই কাঁদছে ভক্তের দল মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে। তীর্থস্থানে গিয়ে বুকে হেঁটে পরিক্রমা করছে। তাতে কি আর দোষ খণ্ডন হবে? মোটেই না।

কোনও একজন মহাপুরুষ এক বারবনিতাকে কৃপা করেছিলেন। সে মহাপুরুষের কৃপা পেয়ে চলে গেল বৃন্দাবনে। সেখানে সে কৃচ্ছ্রসাধন করতে লাগল। নিজের দেহ, টাকাপয়সা সবই তার তুচ্ছ মনে হল। সব টাকা বিলিয়ে দিয়ে সে ভাবল, এই দেহই হল সর্বনাশের কারণ। তাই সে তিল তিল করে দেহকে নষ্ট করবে বলে ঠিক করল;

সে এত কৃচ্ছ্রসাধন শুরু করল যে তা বলার নয়, কারও বারণও সে শুনছে না। মহাপুরুষের কৃপা এমনভাবে তার মধ্যে খেলতে লাগল। আস্তে আস্তে দেহ শীর্ণ হল. চামড়া শিথিল হল ও রোগভোগের বিকারে দেহ আরও ক্ষীণ হল। গুরুর নির্দেশে দিনান্তে সে একবার আহার করত। তাও দুই দিন অন্তর, তিন দিন অন্তর, চার দিন অন্তর, পাঁচ দিন অন্তর করে অবশেষে মাসে একদিন আহার গ্রহণ করতে লাগল। তার কৃচ্ছ্রসাধন দেখে আশেপাশের সাধকরা অবাক হয়ে গেল। এই ভাবে সাধনার ফলে তার দেহবুদ্ধি চলে গেল। সে গুরুকৃপায় ইষ্টের দর্শন পেল এবং তাঁর সঙ্গে একীভূত হয়ে গেল।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—ঠিক এমনই সাধনা করেছিলেন উমা শিবের জন্য। রাজকুমারী উমা গাছের পাতা খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। দেবতারাও অবাক হয়ে ভাবলেন, এ কী কৃচ্ছ্রসাধন! শিবের মন আপনিই টলে গেল। তিনি ছদ্মবেশে এসে উমাকে দর্শন দিলেন। উমা বললেন—তোমাকে তো আমি ডাকিনি, তুমি এসেছ কেন? শিব সহজে ভোলেন না, তিনি তো ভোলানাথ। সব শেষে দর্শন দিলেন ঠিকই।

এগুলি eventual ঘটনা ঠিকই। এর চেয়ে অনেক উর্ধ্বের কথা তোমাদের সামনে রাখা হচ্ছে, সেখানে তপস্যাও লীন হয়ে যায়। তপস্যাতে শক্তি জাগে, বল বাড়ে, কিন্তু তাও তো কালাধীন। কিন্তু কাল যাকে ছুঁতে পারে না আমি তাঁর কথাই তোমাদের বলছি—that which is untouched by space, time, causation is the Absolute Reality। সমগ্র প্রকৃতি, আপনারে সে আহুতি দেয় পরমপুরুষের পায়ে। ভক্ত তাই কেঁদে বলে—এমন দিন কী হবে মা তারা যবে তারা তারা তারা বলে দু'নয়নে বইবে ধারা।

কী concept! দু'নয়নে ধারা বইলেও তো আমি তোমাকে পাচ্ছি না। আমার মনের কালিমা কিছুটা যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু তোমার আমার মাঝে এই অন্তরায়, এই ভেদ. কবে যাবে? যখন তুমি-আমি আর আলাদা রব না, তখন এক হয়ে যাব।

একসময় এই রকম feeling কত এসেছিল, যারা দেখেছিল তারা জানে। সংসারটা এমন একটি জায়গায়—যার, এই হল একটি দিক। আর অন্য দিকে সংসার নেই। আমি আমাকেই নানা রূপে, নামে, ভাবে দেখছি। রূপ, নাম হল মুখোশ। আমাকে বাদ দিয়ে রূপ, নাম মূল্যহীন। প্রত্যেকটি জিনিসের যেটুকু মূল্য তা due to the presence of the ever-present background! 'এ' কোনও মতবাদের কথা তোমাদের সামনে রাখেনি। এটা হল the science of the Absolute। আমার কাছে তা-ই হল ছিন্নমস্তা। এই পরমতত্ত্বস্বরূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মা পুরুষোত্তম ভগবান—One without a second, eternal Self-realized entity ever revealing Itself in Itself, for Itself, by Itself। 'আপনার মাঝে আপনিই স্বয়ং আপনার দ্বারা পরিপূর্ণ, আপন ছাড়া আপনার মাঝে নাহি অন্য।' এখানে sense of otherness is ignorance and that is the cause of phenomenal creation and also the cause of our birth, old age and death।

'মত্তঃ পরতর নান্যৎ কিঞ্চিৎ অত্র অস্তি বিশ্বং সত্যং বাহ্যং বস্তুং মায়া উপক্লৃপ্তং
আদর্শ অন্তর্ভাস মানসতুল্যং ময়ৈদ্বৈতে বিভাতি সর্বমিদম্।'

আয়নার মধ্যে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব দেখছ তেমনই নিজের মধ্যে জগৎরূপে তুমি নিজেকেই দেখছ। It is the reflection of your real nature. নিজেকে সরিয়ে নিলে আর জগৎ থাকে না। ঘুমের মধ্যে জগৎ নেই, মন তখন নিষ্ক্রিয়। ঘুম ভাঙলেই আবার জগৎ। জ্ঞানীর মন থাকে না বলে জগৎ নেই। প্রতিভাত হলেও ছায়াসম ভাসে বিশ্বচরাচরে, সে রূপ হেরি অন্তরে-বাহিরে। নিজেরই ছায়ারূপ বিশ্বকে দেখছ, নিজেকে সরিয়ে নিলে বিশ্ব আর নেই। ছায়া কায়াকে কী করে touch করবে? এই রকম আলোছায়ার খেলা যখন অন্তরে চলছিল তখন এসেছিল একটি গান—

কী খেলা খেলছ মাগো হৃদি অন্তঃপুরে বসি
তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি তোমার ইচ্ছা সর্বগ্রাসী।।

কখনও তুমি পুরুষ, কখনও নারী, কখনও তুমি সর্বশূন্য। কখনও নিরাকার, কখনও সাকার, কখনও তুমি আকারবিহীন। এই ছিন্নমস্তাকে অনুভব করার পরেই 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) ভিতরের সব contradiction নির্মূল হয়ে যায়। তবে হ্যাঁ, বাহ্য ব্যাপারে তোমাদেরই মতো 'একে' দেখছ, কিন্তু ভিতরে কী খেলছে তা অনুমান করার বা বোঝবার সাধ্য তোমাদের কারও নেই।

১৩। ০৯। ০২

৩৭৩

একটি আমি-র কী ভাবে ব্যবহার হচ্ছে দেখ! এক আমিকেই দুই দিকে মানুষ simultaneously চালাচ্ছে, I বলে চালাচ্ছে। কিন্তু আত্মজ্ঞপুরুষ আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে unchanged, unaffected হয়ে সব কিছু observe করেন। এই বোধেই বলা হয়েছিল—আমিবোধে নিত্য অবস্থান করলে জগৎ ধ্বংসের কোনও পাপ স্পর্শ করে না। আপনবোধে প্রতিষ্ঠিত থেকে আমি অতিরিক্ত যা-কিছু অর্থাৎ অনাত্মাকে ধ্বংস করলে কোনও পাপ স্পর্শ করে না। অর্থাৎ জগৎ হল আত্মা অতিরিক্ত কল্পনা। সেই কল্পনাকে নাশ করলে আত্মার কি ক্ষতি হবে? কাজেই আপন আত্মাকে ভুলে যারা দেহবুদ্ধি নিয়ে চলে তারা বিষয় নিয়েই মেতে থাকে। বিষয়প্রীতির ফলেই আত্মপ্রীতি নাশ হয়, আত্মবিস্মৃত হয়। আত্মবোধে কোথায় অহংকার, কামনাবাসনা, দায়িত্ব, কর্তব্য? যেমন গাঢ় ঘুমে অজ্ঞানীর সংসার থাকে না, তেমন জ্ঞানীর জাগ্রৎ অবস্থা হল সুষুপ্তিবৎ।

ছাত্র যদি steady না-হয় তাহলে পরস্পর সাথির কথায় তার পদস্খলন হয় অর্থাৎ সে শুদ্ধ অঙ্ককেও ভুল করে আসে। সংসারে যদি সংসারীর কাছ থেকে বুদ্ধি নাও তাহলে সংসারের বিকারের মধ্যেই থাকতে হবে, বেরিয়ে আসতে পারবে না। সংসারে মানুষ নিজের দুঃখকষ্টের জন্য ঈশ্বরকেই দায়ী করে। কিন্তু নিজের কর্ম ও চিন্তার record তো সে রাখে না। কল্পিত ঈশ্বরের কাছে মাথা ঠুকে কী হবে? এমন কোনও

দেবতা কি আছেন যিনি ঈশ্বরের উপরে? সর্বদেবতাই হলেন আত্মবোধে আত্মারই প্রতিফলন। আত্মার উর্ধ্বে কেউ নন। এটা বোঝে ক'জন? সংসারী মনে করে তার ইষ্টই সবার উপরে। আবার তাঁকেই চাল, কলা, দুধ, বাতাসা দিয়ে পূজা করে আর তাঁর কাছে কামনাবাসনার কথা জানায়। এ সব থেকে বেরিয়ে আসা কষ্টকর। তাই দেখা যায় যাঁরা চরমতমের জন্য jump দিয়েছেন তাঁদের কাছেও অজ্ঞান-কল্পনা মায়ের রূপে এসে ভোলাবার চেষ্টা করে। মহাপুরুষদের জীবনে এমন অভিজ্ঞতা হয়। এই কল্পনা আমাদের ছাড়তে চায় না। তারাও প্রশ্ন করে, এতদিন সঙ্গে রেখে আজ কোন দোষে তুমি আমাদের ছাড়তে চাইছ? তখন আত্মজ্ঞানী বিচার দ্বারা বলেন—তোমাদের কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে। তোমরা পালাও না-হলে নাশ হবে। তোমাদের আমার আর প্রয়োজন নেই। তখন তারা জ্ঞানীকে ভোলাবার জন্য কত রকম মানসিক উৎপীড়ন করে ও প্রলোভন দেখায়। জ্ঞানী তখন আত্মবিচাব দ্বারা সব কিছুকে খণ্ডন করেন অনায়াসে। আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পূর্ণ। অপূর্ণতার ভাবনা তাঁর নেই। তাই অভাবও নেই এবং সাধনভজনেরও দরকাব নেই। সেই অনাত্মা কল্পনা যখন কিছুতেই সুবিধে করতে পারে না তখন দেহকে একটি parting kick দিয়ে চলে যায়। তাই দেখা যায় মহাপুরুষদের অনেকেরই দেহ সুস্থ থাকে না।

'এ' to the point কিছু কথা বলে যাচ্ছে। One can accept it or not, that is up to them. Individual বা জীব জানে না তার জীবত্বের কারণ। তার ভিতরে নানাবিধ মল—দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধির মল ও সর্বোপরি সমষ্টি অজ্ঞানমল একমাত্র অখণ্ড ভূমা অদ্বয় আত্মবোধ দ্বারাই নাশ হয়। দেহের মল নাশ হয় কতগুলি নিয়ম যথাযথ ভাবে পালন করে। প্রাণ, মনের মল নাশ হয় উপাসনার মাধ্যমে। বুদ্ধির মল নাশ হয় আত্মবিচারের মাধ্যমে। এত কথা শুনেও শয়তান মন মানে না, কারণ তার ভোগের বস্তুর কথা তো এখানে বলা হয় না। আসলে এখানে পাবার কোনও বস্তু নেই, শুধু হবার কথাই বলা হয়েছে। কী হবার? তুমি যা ছিলে তা-ই হবে। আর বর্তমানে তুমি যা নও তা-ই তুমি ভাবছ নিজেকে। You will be re-established in your true nature which you have forgotten. তোমার জীবত্ব কবে শুরু হয়েছে তা তুমি জান না। কাজেই তোমার পুঁথিগত বিদ্যা হল futile, তার কোনও মূল্য নেই।

একসময় কয়েকজন 'একে' বলেছিল—আপনি শাস্ত্র পড়েননি তাই আপনার কথার কোনও মূল্য নেই। তাদের বলা হল—আমি তো বলছি না আমার কথার মূল্য দিতে। তুমি তো এত শাস্ত্র পড়েছ তবে তোমার এত tension কেন? শাস্ত্র পড়ে কি tension বাড়ে? এ কথা শুনে তারা আর কোনও কথা বলল না। 'এই সংসার হল dustbin, তাতে অহংকাররূপ মাছি ভ্যানভ্যান করে রাতদিন।' রাতদিন চলছে competition আর 'আমার, আমার' চিৎকার।

দেখ, আমরা যে ঘরে বাস করি সেখানে আলো-হাওয়া না-ঢুকলে আমরা বলি unhygienic, আর এই দেহঘরের মধ্যে কত unhygienic ব্যাপার ঘটছে সেদিকে

তো আমরা খেয়ালই করি না। কত দুর্গন্ধময় মল, মূত্র, কফ নিয়ে বাস করছি, বিচার করে দেখ নরক কাকে বলে। এই দেহটাই নরক। বিচার করে যদি নিজেকে দেহের থেকে আলাদা করতে পার তাহলে দেখবে দেহই মন্দির। Detach your body, dissociate yourself from your body–then you will see your body as a scene and look at your Self Which is absolutely free. তুমি দেহ, মন, প্রাণ, বুদ্ধির অধীন নও, অবার জগতের অধীনও নও। 'এ' আত্মবোধের দৃষ্টিতে কথাগুলি বলছে। এখানে একটিও ধার করা কথা নেই। কিন্তু অভিমানী মন মানবে না। কতজনের কত ভাবনা! ছেলের কথা, মেয়ের কথা, নাতির কথা—এই হল সংসার। কিন্তু মুক্তির মতো একাকীত্বের আনন্দ তো তোমরা কেউ চাও না। রবীন্দ্রনাথের মতো মানুষ তিনিও বললেন—"বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।" অনেকেই বলেছিল, দারুণ কথা! অথচ সারাজীবন তিনি কত দুঃখ, ব্যথা, বেদনা নিয়ে চলে গেলেন।

বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে এক-এর মহিমা অনুভব করা যায় না। অথচ একবোধে থাকলে মৃত্যুর মধ্যেও অমৃতের আস্বাদন হতে পারে। কে বলবে তোমাদের কাছে এ সব কথা। ধর্মক্ষেত্রে, আশ্রমে আশ্রমে যাও, কিন্তু কেউ এ সব বলবে না। ধর্মের কথা ধর্মের পুস্তকেই লেখা থাকে, জীবনে ফলানো যায় না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলছি শোন।

এক আত্মবিশ্লেষক/আত্মানুসন্ধানকারী বহুদিন ধরে গুপ্ত ভাবে সাধনা করতেন। হঠাৎ একদিন একজন দেবতা তাঁর কাছে এসে বললেন— তুমি এত কঠোর তপস্যা করছ কেন?

জ্ঞানী—তুমি কী করে জানলে আমি কী করছি?

দেবতা—আমি তোমার সব জানি।

জ্ঞানী—তুমি যদি আমার সব জান তো তুমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করছ না কেন? আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন?

দেবতা দেখলেন জ্ঞানীর কাছ থেকে কিছুই উদ্ধার করা সম্ভব নয়। তিনি তখন তাঁর উপরের দেবতাকে জানালেন। সেই দেবতা এসে এবার জ্ঞানীকে বললেন—তুমি তো অনেক কিছু অর্জন করেছ, আমাকে কিছু দাও।

জ্ঞানী—আমার তো দেবার কিছু নেই। আর তোমাকেই বা দেব কেন? তুমি আমার কে?

দ্বিতীয় দেবতা জ্ঞানীকে কিছুতেই convinced করতে না-পেরে সরে গেলেন। এবার তৃতীয় এক দেবতা এলেন, তিনি আরও উচ্চ পদের। তিনি এসে জ্ঞানীকে বললেন—আমি তোমাকে কিছু দিতে চাই।

জ্ঞানী—তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না। আর আমি তো তোমাদের কাছে কিছুই চাইনি।

তৃতীয় দেবতা এসেও কিছু সুবিধা করতে পারলেন না। তিনিও ফিরে গেলেন। তারপর চতুর্থ দেবতা এলেন। তিনিও কিছু সুবিধা করতে পারলেন না। তখন

দেবতাদের মধ্যে এই বিষয়ে আলোচনা হল। কারণ দেবতাদের উপরেই সৃষ্টিতে সংসারীদের দেখাশোনা করার ভার আছে। এরপর পঞ্চম দেবতা জ্ঞানীর কাছে এসে বললেন—তোমার কী প্রয়োজন বল?

জ্ঞানী—আমার তো কোনও প্রয়োজন নেই।

পঞ্চম দেবতা—তাহলে তুমি তপস্যা করছ কিসের জন্য?

জ্ঞানী—তা আমি তোমাকে বলতে যাব কেন?

একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—আসলে সব দেবতাদের ভয়, মানুষ যদি তপস্যা করে দেবলোক অতিক্রম করে যায়! তা তাঁরা কখনওই চান না। মানুষের দেহের মধ্যে, মাথা থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দেবতাদের স্থান আছে। যে দেবতাদের আমরা বাইরে ভাবি আসলে তাঁরা রয়েছেন আমাদের দেহের মধ্যেই। Perfection বড় সাংঘাতিক জিনিস। দেহের প্রত্যেকটি বিষয়ের সঙ্গে direct experience হওয়া চাই।

দেবতারা তখন ব্রহ্মার দ্বারস্থ হলেন। ব্রহ্মা এলেন সেই জ্ঞানীর কাছে। ব্রহ্মা জ্ঞানীকে বললেন—তুমি তো সৃষ্টির বাইরে যেতে পার না।

জ্ঞানী—তুমি কে? আমি তো তোমাকে চিনি না, আর কেনই বা তুমি সৃষ্টি করছ?

ব্রহ্মা—তুমি আমাকে না-চিনলেও তুমি তো আমার সৃষ্টির মধ্যেই আছ।

জ্ঞানী—আমি তো আমার মধ্যে আছি। আমিকে তো তুমি সৃষ্টি করতে পার না। ব্রহ্মা তখন অপারগ হয়ে বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন। এবার বিষ্ণু এলেন জ্ঞানীর কাছে।

বিষ্ণু জ্ঞানীকে বললেন—আমি তোমাকে কিছু বর দিতে চাই।

জ্ঞানী—আমার তো কোনও বরের দরকার নেই।

বিষ্ণু—আমি সৃষ্টির পালক, আমার ইচ্ছা হল তাই।

জ্ঞানী—তুমি বর দেবার কে?

(কথাগুলি শুনে এ সবের অন্য অর্থ যেন কেউ গ্রহণ না-করে। Right use করা কিন্তু কঠিন)। বিষ্ণুও জ্ঞানীকে convinced করতে না-পেরে শিবের দ্বারস্থ হলেন। এরপর শিব জ্ঞানীর কাছে এলেন।

শিব বললেন—আমি তোমার কাছে প্রার্থী হয়ে এসেছি। তোমার তপস্যার ফল আমাকে দাও।

জ্ঞানী—তুমি কে? আর আমি তোমাকে দেবই বা কেন?

শিব—আমি দেবাদিদেব মহেশ্বর।

জ্ঞানী—তুমি মহেশ্বর হয়েও প্রার্থী হয়ে এসেছ? আমি তো তোমাকে ডাকিনি। তোমরা তোমাদের স্বার্থে সম্পর্ক তৈরি কর। But I dont care for anybody, কারণ আমি তো আমাকে নিয়ে আছি। শেষ পর্যন্ত শিবও হতাশ হলেন। আসলে যাঁর মধ্যে কোনও desire নেই, কোনও দেবতাই তাঁকে কব্জা করতে পারবেন না। বিন্দুমাত্র কামনা, least of desire যদি কারও থাকে তবে দেবতারা তার উপর আধিপত্য করবেনই। মহেশ্বর তখন তাকে আবার বললেন—আমি তোমাকে কিছু জ্ঞান দিতে চাই।

জ্ঞানী—আমার তো জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। যাদের প্রয়োজন আছে তাদের কাছে গিয়ে জ্ঞান দাও।

কিছুতেই জ্ঞানীকে কাবু করতে না-পেরে দেবতারা জ্ঞানীকে বললেন—তোমার মধ্যে আমাদের যা যা অংশ আছে, আমাদের তা ফিরিয়ে দাও।

জ্ঞানী—আমি তো তোমাদের কাছে কিছু চাইনি। তোমরা নিয়ে যাও। ব্রহ্মা তাঁর সৃষ্টির উপকরণ, বিষ্ণু জীবনধারণের উপকরণ, শিব তাঁর উপকরণ নিয়ে যেতে পারে। নিয়ে যাও তোমাদের জিনিস। আমার কোনও প্রয়োজন নেই। তোমরা সব নিতে পার, কিন্তু আমার আমিকে তো নিতে পারবে না।

তখন দেবতারা ভাবলেন, এমন অধিকারী যদি জগতে আসেন তবে তিনিই একমাত্র অমৃতত্বের অধিকারী হতে পারবেন—কত রকম পরীক্ষার পরও যিনি আমিবোধ থেকে একচুলও নড়েন না!

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—Consciousness never deviates from Its true nature. So also the real Self Which is Pure Consciousness, Which never goes out of existence. Self-কে বিচলিত করবে কে? আমিশূন্য আমি তো কখনও হয় না। আমি অতিরিক্ত যা-কিছু সবই কল্পনা। 'এ' ছোট ছোট কথা দিয়ে সব তত্ত্ব রেখে যাচ্ছে। A time will come when the living beings will find their perfection/realization at ease in these words। এখন নিতে পারছে না। এখন নানা অজুহাত দেখাবে। তাই avoid করছে। জীব avoid করে তার শিবত্বকে। শিব সর্বদাই অবজ্ঞা করেন অশিবত্বকে। কথাগুলি লক্ষ্য কর। Individual does not want his absolute perfection or realization and the Absolute never goes out of existence and hence never deviates from Its true nature.

আপনবোধের ঘরে বাস করেও জীবকে জীবত্ববরণের জন্যই দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়। Contradictions-কে real মনে করাই জীবত্ব। অর্থাৎ নিজেকে ভুলে নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থা বা phenomenal creation-কে real মনে করা—যেমন নিজের দেহ-মন-বুদ্ধিকে অধিক গুরুত্ব দেওয়া। আর যখন সব কিছুর মধ্যে শুধু আপনকেই দেখবে, অর্থাৎ all verily I am, all verily Consciousness Itself—এই হল আত্মজ্ঞান! যত design-pattern হোক same One Consciousness is the substratum, the background, the underlying essence of all—ever revealed Self! আকাশে যত বাড়িঘর তৈরি কর না কেন, আকাশ আকাশই থাকবে—it never deviates from its true nature. So is your Self, of the nature of Pure Consciousness or the Absolute.

এত করে বলার পরেও মন কিন্তু মানতে পারে না। সে আস্বাদন করতে চায়। আস্বাদন করতে করতে এমন একটা সময় আসবে যখন সে আপনিই নিজের ঘরে ফিরতে চাইবে। তোমার অফিসের কাজ যতই প্রিয় হোক, একটা সময় আসে যখন

তোমাকে বাড়ি ফিরতেই হবে। আমরা প্রতিদিনই তো স্থূল দেহ ছেড়ে কারণ দেহে চলে যাই। তখন আর জাগতিক দুঃখকষ্ট থাকে না। কিন্তু কারণ দেহেরও দুঃখ আছে। সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহেরও দুঃখ আছে। দুঃখ নেই শুধু আত্মাতে। আত্মা সুখস্বরূপ। Objective সুখ নয়, তিনি জ্ঞানস্বরূপ। কেবল "বোধোঽহম্ আনন্দোঽহম্ নিরন্তরম্" হল আসল আমি-র পরিচয়। সেই আমিতে আমি অতিরিক্ত কিছু নেই। সেখানে কোনও কল্পনা নেই। গাঢ় ঘুমে মন কাজ করে না। স্বপ্ন হয় অবচেতন মনে। অবচেতন মন হল চিদাভাস, তাতে অনেক কিছুই ভাসে। চৈতন্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত।

আমি-ই সেই সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্ম। দ্বিতীয় কোনও ব্রহ্ম নেই। এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে মানুষের অন্তরের মল আপনা থেকেই সরে যাবে। In fact he is Brahman. সে কারও স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, মা, বাবা, ভাই, বোন নয়—all these are imaginary relations, মন দিয়ে ঠিক করা হয়। মন সরে গেলে আর কোনও relation থাকে না। যেমন গাঢ় ঘুমে মন থাকে না। কাজেই জগৎ থাকে না। যখন জাগ্রৎ অবস্থাতে এই জগৎ বিস্মৃতি ঘটবে, অর্থাৎ জগৎ নেই, একমাত্র আমিই আছি—এই বোধ যাঁর মধ্যে জাগ্রত হবে, তিনিই আত্মজ্ঞপুরুষ।

২০। ৯। ০২

৩৭৪

'পথের ডাকে যে ঘর ছেড়ে যায় পথকে করে ঘর
আপন বলে কেউ থাকে না, আপন হয় তার পর।
পথে পথে ঘুরে বেড়ায়, পথের মাঝে জীবন কাটায়
পথের মাঝে পায় যে খুঁজে আপনারে পূর্ণ করে
ঘর ছাড়ে সে তাঁর তরে।।'

এই পথ কোন পথ? এই ঘরটাই বা কোন ঘর? পথের ডাক ক'জনের কানে আসে, ক'জনই বা ঘর ছাড়ে? কিন্তু কেন পথের ডাক আসে, কেনই বা পথের ডাকে ঘর ছাড়ে—এই ছোট্ট কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া কিন্তু সহজসাধ্য নয়। পথের ডাকে ঘর ছেড়ে পথকে ঘর করে কে?

এই পথ হল এক-এর পথ, যেখানে দুই নেই। এক-এর পথে এক-ই থাকে। এক-এর ঘরে এক-ই বাস করে। ভারতের ঋষিদের মধ্যে যাঁদের পথের ডাক এসেছিল তাঁরা ঘর ছেড়েছিলেন। তাই যাজ্ঞবল্ক্যের মতো অতবড় ঋষি, তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হয়েও ঘর ছাড়লেন কেন? তিনি তো সংসারে থেকেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। জনক রাজার দরবারে ব্রহ্মজ্ঞানীরা মিলে ব্রহ্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন। ব্রহ্ম আলোচনাতে মনের অস্তিত্ব থাকে না, কারণ তখন আর জাগতিক রূপ-নাম থাকে না। জগৎ সেখানে থাকে না। তাই যখন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা জাগে তখন জগৎ ছেড়ে আসতে হয়। অনাত্মাকে না-ছাড়লে আত্মজিজ্ঞাসা জাগে না। ঘরে বসে অনাত্মার মধ্যে, ভোগের মধ্যে থেকে কেউ আত্মজ্ঞানী হয়েছে এমন দেখা যায় না। তাকে সংসারকে সরিয়ে রাখতে হয়। মন

একসঙ্গে দু'টি বিষয়ে চিন্তা করতে পারে না। মন তৈরি হয়েছে সংসারের জন্য। সংসারকে যতক্ষণ সে ভালবাসে ততক্ষণ তার পক্ষে আত্মচিন্তা করা সম্ভব হয় না।

বিচারবান পুরুষ যাজ্ঞবল্ক্য সংসারে থেকেও আত্মচিন্তা করেছেন, আত্মা/ব্রহ্ম সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন এবং ব্রহ্মের সন্ধান পেয়েছেন। তিনি বুঝলেন যে, তাঁর পক্ষে আর সংসারে থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি তার জীবনের সমস্ত অর্জিত সম্পদ, অর্থাৎ সংসারে যা যা দরকার—অর্থ, বিত্ত, জমি, গোসম্পদ, স্বর্ণ যা রোজগার করেছেন, সব দুই পত্নীকে ভাগ করে দিয়ে সংসার ছাড়বেন বলে মনস্থ করলেন। এক পত্নী তো বিষয়-আশয় পেয়ে খুব খুশি হল। কারণ তার সখ-আহ্লাদ আছে, সংসারে বেঁচে থাকবার ইচ্ছা আছে—তাই এই সব তার একান্ত দরকার। সে এ সব পেয়ে তুষ্ট হল। সে তার স্বামীকে ছেড়ে দিতে রাজি হয়ে গেল। বেঁচে থাকবার জন্য যা যা দরকার তা পেয়ে গেলে আর ঘাটাঘাটি করে কী হবে!

'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) যে পথের কথা বলেছিল, সেই পথের সন্ধান দেওয়া হচ্ছে। একটা পথে থাকলে এ সবের দরকার। তাই মানুষ চাকরি করে, ব্যবসা-বাণিজ্য করে, বাড়ি-গাড়ি করে। এটা একটি দিক। এর মাধ্যমে ইন্দ্রিয় তুষ্ট ও পুষ্ট হয়। মন তার জোগান দেয়। কাজেই এখানে 'কিছু নেই' এ কথা তারা মানে না। তারা বলে—এই যে সুখ, আরাম, এ সব ছেড়ে আমরা কোথায় যাব? এই যুক্তিতে আজ জগৎ মাতোয়াবা, তার ফলে শান্তি নেই। জগতের মধ্যে যার যত ঐশ্বর্য-সম্পদ, তার শান্তি তত কম। এ প্রসঙ্গ পরে আসছে।

যাজ্ঞবল্ক্যের আরেক পত্নী জিজ্ঞাসা করল—তুমি কোথায় যাবে? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন—আমি অমৃতের মধ্যে ডুবে যাব।

পত্নী বলল—তাহলে আমি কেন মৃত্যুলোকে বাস করব? আমিও অমৃতলোকে ডুবে যাব।

যাজ্ঞবল্ক্য—সে পথ তোমার জন্য নয়, এ সখের পথ নয়।

পত্নী—তা আমি জানি না। যে পথে অমৃত নেই সে পথে আমি যাব না। একটু থেমে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—শোন, একজন গৃহবধূ কী বলল! আর আজকালকার গৃহবধূরা কী বলে? আর কী করে? তা ভাববার বিষয়।

যাজ্ঞবল্ক্য—সেকি, আমি তো তোমাকে সব দিচ্ছি, বাড়ি, গাড়ি (তখনকারদিনে অবশ্য গাড়ি ছিল না), টাকাপয়সা, তপোবন (যেখানে প্রকৃতি ছড়িয়ে দিয়েছে তার সম্ভার), প্রচুর ধেনু (তখনকারদিনে গোধন ছিল প্রথম সম্পদ), স্বর্ণালংকার (স্ত্রীদের কাছে অলংকার ইত্যাদি অত্যন্ত প্রিয় বস্তু), কিন্তু তবু তুমি কেন তুষ্ট হচ্ছ না?

পত্নী—যার দ্বারা আমি অমৃতত্ব পাব না, আমাকে মৃত্যুলোকে বাস করতে হবে, তা আমার দরকার নেই। তুমি যে অমৃতলোকের সন্ধান পেয়েছ সেখানে আমিও তোমার সাথে যাব, কারণ আমি তো তোমার অর্ধাঙ্গিনী। সেই অমৃতত্বের প্রতি আমার পরিপূর্ণ ইচ্ছা, সংকল্প ও সাধনা আমি তোমাকে জানাচ্ছি।

যাজ্ঞবল্ক্য—যদি তুমি একান্তই তা শুনতে চাও তবে তোমার মনকে একাগ্র কর। আমি যা বলব এক মন দিয়ে শুনে পরিপূর্ণ ভাবে তার মধ্যে প্রবেশ কর। তখন তিনি

পত্নীকে এই সংসারের যা-কিছু আমরা ইন্দ্রিয়-মন দিয়ে ধরি ও নাগাল পাই সে সমস্ত কিছুর পরিচয় দিলেন। তারপর তিনি পত্নীকে বললেন—এবার সেই পথের বিপরীত পথে যাব, ভাল করে মন দিয়ে শোন।

তোমাদের অস্থির, চঞ্চল মন নিয়ে 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) একটি কথাও নিতে পারবে না। মনের মধ্যে তোমাদের ঘুরছে অন্য চাকা।

যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর পত্নীকে বললেন—ইন্দ্রিয় যা চায় ও পায় তাতে সে তৃপ্ত হয় না। সে আরও চায়। সবটা গ্রহণ করার মতো ক্ষমতাও তার নেই, তথাপি সে চায়। (যেমন সংসারী মানুষ, কোটি কোটি টাকা আছে, তবু আরও চায়। একটি বাড়ি আছে, আরও একটি বাড়ি চাই। একটি গাড়ি আছে, আরও একটি চাই। মনের সাধ আর মেটে না। আর এক-এর পথে মন শুদ্ধ হয়ে সব সাধকে পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে। মনকে তখন সে বলে—আমার সাথে চলতে গেলে গোলাম হয়ে থাকতে হবে, চাইতে পারবে না)। সেই পথে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণের সমস্ত সম্ভারকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। এই হল "চরৈবেতি"। চল, এগিয়ে চল, থেমে থেক না। (যেখানে rest নেবে সেখানে rust পড়বে।)

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বললেন—তোমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

পত্নী—তার মানে? তুমি অমৃতলোকে অমর হবে আর আমি মৃত্যুলোকে পচে মরব! তা হবে না।

যাজ্ঞবল্ক্য—কেন? আরেকজন তো দিব্যি রাজি হয়েছে। তুমি কেন রাজি হচ্ছ না?

পত্নী—যা মৃত্যুরূপে এসে সব কেড়ে নিয়ে যায় আমি সেখানে থাকতে রাজি নই। আমি তোমার সাথে অমৃতলোকেই যাব।

যাজ্ঞবল্ক্য—তবে মন দিয়ে শোন, শুনে মনকে পরিপূর্ণরূপে উৎসর্গ কর। অর্থাৎ মনকে বিসর্জন দিয়ে দাও। যদবধি মন তদবধি সংসার। যেখানে মন নেই সেখানে সংসার নেই।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—পথের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম—যে পথকে করেছে ঘর, পথের ডাকে সব ছেড়েছে। কিসের পথ? যে পথে সংসার নেই, আছে সমসার। তাই যাজ্ঞবল্ক্যকে তাঁর পত্নীকে সুন্দর করে বোঝাতে হয়েছে। পরে তো কথা উঠতে পারে। অমৃতলোকে কী আছে—যেখানে আকার, বিকার, ক্রিয়া, কর্তা, কর্ম ও কর্মফল নেই? এই বিদ্যা শ্রবণসাপেক্ষ। শুনতে শুনতে মন লয় হয়ে যাবে। যতক্ষণ মন support নিয়ে আছে ততক্ষণ সংসার। The very moment mind loses the support, mind cannot continue. মনের খোরাক চাই। মনের খোরাক হল কল্পনা, কামনাবাসনা, সাধ-আহ্লাদ, স্বপ্ন। এ সব ছাড়া মন বাঁচতে পারে না। মনের সৃষ্টি হল এই জগৎ। মন যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন আর জগৎ থাকে না। যেই ঘুম ভাঙল সঙ্গে সঙ্গে জগতের উদয় হল। এই বিচার যাজ্ঞবল্ক্যের মধ্যে এমনভাবে এসেছিল যে, তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মন থাকলেই দুই থাকে। দুই থাকলে subject/object থাকে। Subject/object থাকলেই বিকার ও দ্বন্দ্ব থাকবে। দ্বন্দ্ব থাকলে সেখানে মৃত্যু এসে বাসা বাঁধবে।

এই যে "চরৈবেতি", ঋষিদের আবিষ্কার—চলতে থাক, তুমি থেমে যেও না। এই পথচলা যেখানে শেষ হবে সেখান থেকেই শুরু হবে অমৃতলোকের সীমা। রবীন্দ্রনাথ গানের ভাষায় বলেছিলেন—"মঙ্গলালোকে"। তিনি ঋষিদের উপনিষদ পাঠ করেছিলেন, ঋষিদের ভাষা বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন, নিজে চিন্তা করেছেন, তাঁর কবি মন দিয়ে তা তিনি উপলব্ধি করতে চেষ্টা করেছেন, তাই তাঁর মধ্যে খুলে গিয়েছিল এক কবির জগৎ। তাঁর কাছে জ্ঞানের জগৎ খুলে গিয়েছিল। সেই জ্ঞানের জগতে অজ্ঞানের প্রবেশাধিকার নেই। অখণ্ড ভূমা আমিতত্ত্বে অহংকারের প্রবেশাধিকার নেই। সেখানে কল্পনা করবে কে? কী দিয়ে কল্পনা করবে? কেন কল্পনা করবে? কোথায় জগৎ? যতক্ষণ ইন্দ্রিয়-মন আছে ততক্ষণ জগৎ। জগৎ হল যত রকমের বিকারের সমাহার। গুণ বা উপাধি চৈতন্যের সঙ্গে মিশে যে কত রকমের permutation and combination তৈবি করছে তার ইয়ত্তা নেই। যেখানে শেষ করছে সেখানে নূতন একটা আরম্ভ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আবম্ভ নেই কোথায়? কামনা নেই যেথায়। কল্পনা, স্বপ্ন, সৃষ্টি সেখানে কী করে আসবে? কেন না কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব নিয়েই হয় সংসার। যেখানে কাম-কর্ম-কর্তৃত্ব নেই, সেখানে সংসার নেই। That is the highest discovery of the Rishis. ঋষিদের চরম আবিষ্কার হল সেই সত্যস্বরূপ, তত্ত্বস্বরূপ—যার মধ্যে মিথ্যার প্রবেশাধিকার নেই—যার আকাব, বিকার, ক্রিয়া, দ্বন্দ্ব, ছন্দ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। ছন্দ থাকলে দ্বন্দ্ব থাকবেই।

কাজেই এই যে পথ, যেখানে এই সবের একান্ত অভাব সেখানেই তুমি খুঁজে পাবে পূর্ণতা চিরতরে। সেই পূর্ণতা তুমি আর হাবাবে না। কিন্তু মন তো সেই পূর্ণতাকে চায় না। না-হলে ঋষিবাণী তো বহুবার ধ্বনিত হয়েছে—হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা অমৃতকে ভুলে মৃত্যুর জগতে হানাহানি করছ, দ্বন্দ্ব-বিরোধে লিপ্ত হচ্ছ। এই সব থেকে বের হবার রাস্তা আছে। আমি তোমাদের রাস্তা দেখাচ্ছি, কেন তোমরা সে পথে আসবে না, মুক্তির পথে এগোবে না? দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকে বাঁচবার জন্য আকুল চিৎকার করছ কেন? বশিষ্ঠদেবের কথায় বলা হয়েছে, তিনি যেখানেই যাচ্ছেন কেউ নিজেকেই নিজে মারছে আর বলছে—মরলাম রে, মরলাম রে! গেলাম রে, গেলাম রে! যেই তাকে সচেতন করলেন অমনি সে বলে উঠল—তুমি কে হে আমায় শাসন কবছ? আমি তো তোমায় ডাকিনি। বশিষ্ঠদেব তাকে ছেড়ে কিছু দূর গিয়ে দেখেন আরেকজন নিজের শরীর চুলকে চুলকে ঘা করে নিজেই চেঁচাচ্ছে—মারল রে, মারল রে! মরলাম রে, গেলাম রে! বশিষ্ঠদেব তাকে সচেতন করতেই সে ক্ষেপে গেল। সবারই এক অবস্থা। অর্থাৎ আমরা সবাই নিজের mental network-এ জড়িয়ে গিয়ে, 'হায়, হায়' করছি। রাস্তা কিন্তু খোলা আছে, তবু কেউ বেরিয়ে আসতে চায় না। 'যাতায়াতের পথ আছে খোলা তবু কেহ নাহি আসে সে পথে, দোহাই দেয় সংসারের।'

সংসারে কেউ যে আপন নয়, এটা কেউ বুঝতে চায় না। আপন ভেবে শুধু কল্পনা করে। আপন তো ছেড়ে চলে যায়। আর যারা থাকে তারা কান্নাকাটি করে। তবু হুঁশ হয় না। এই অমৃতত্বের প্রতি যে নিষ্ঠা তা হল পৃথিবীর মানুষের কাছে একটি beacon-light। গার্গী একটি beacon-light। মানুষ যুক্তি দেখায় অনেক, কিন্তু কিসের জন্য?

নকল আমি-র প্রতিষ্ঠার জন্য। নকল আমি প্রতিদ্বন্দ্বী সেজে প্রতিষ্ঠা পেতে চায় অপরের মতো বা অপরের চেয়ে নিজেকে বড় ভেবে। সেখানে শান্তি পাবে কী করে? তুমি কষ্ট করে অর্থ উপার্জন করে জমা করলে অথচ দস্যু, তস্কর এসে তা কেড়ে নেবে। তুমি বিদ্যা অর্জন করলে, অন্য একজন পণ্ডিত তোমাদের মাঝেই প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করবে।

একই ভাবে ভয়ের কয়েকটি কারণের কথা বলা হয়েছিল। ভয় কাকে পায় মানুষ? জাগতিক ব্যাপারে ব্যবসায়ী অন্য ব্যবসায়ীকে, এক পণ্ডিত অন্য পণ্ডিতকে, এক পালোয়ান আরেক পালোয়ানকে ভয় পায়। এই রকম ভয়ে ভরা জগৎসংসার। এই ভয়কে অতিক্রম করবে কী করে? ভয়কে যে আহ্বান করে, আর ভয় পেয়ে যে পালিয়ে যায়—দু'জন লোক এক নয়। ভয়কে জয় করতে পারে ক'জন? মৃত্যুর মতো বড় ভয় তো আর কিছু নেই। মৃত্যুকে ভয় পায় না এমন ক'জন আছেন? যাঁর অহংকার নেই মৃত্যু তাঁর উপর আধিপত্য করতে পারে না। অহংকারহীনকে মৃত্যু স্পর্শ করতে পারে না। আত্মজ্ঞানী জানেন—দেহ আমার নয়, আমি দেহের নই। দেহের আকার আছে, তাই তার বিকারও আছে। দেহকে কেউ নিতে এলে তিনি বলেন—দেহ চাস নিয়ে যা, দেহ তো পচাগলা, বিকারী, দুর্গন্ধে ভরা, মল-মূত্রে ভরা। তাকে নিয়ে যাবার permission-ও কেউ দেয় না। দেহ পচেগলে যাচ্ছে তবু মানুষের বাঁচার সাধ যায় না! এই বাঁচা কি বাঁচা?

কেন এই কথাগুলি তোমাদের বলা হচ্ছে একটু ভাববার চেষ্টা কর। কত দুর্বল তোমাদের মন। সেই মনকে শক্ত করার জন্য তোমাদের কী দরকার? কাঙালপনা করবে কেন? যে সংসারে তুমি নিজে প্রবেশ করেছ সেখান থেকে বেরিয়ে আসবার পথ থাকা সত্ত্বেও কেন বেরিয়ে আসবে না? যেখানে জন্ম জন্ম ধরে জরা-ব্যাধি-জন্ম মৃত্যুর দুঃখ ভোগ করছ, কেন মুক্তির আনন্দ, পূর্ণতার আনন্দ, অমৃতত্বের আনন্দ আস্বাদন করতে চাও না? এই মনের আবার গর্ব কিসের? কী নিয়ে মন ফুটানি করে? সবই তো প্রকৃতির। প্রকৃতির জিনিসকে 'আমার, আমার' করছে আর মার খাচ্ছে।

কিন্তু যে পথের কথা বলা হল সেখানে 'আমার, আমার' করার উপায় নেই, তিন গুণের এবং পঞ্চভূতের সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। আর এই তিন গুণ ও পঞ্চভূত নিয়েই সংসার। মন সেখানে কারবারি। আর যখনই fail করছে তখনই 'হায়, হায়' করছে। প্রিয়জন বিয়োগ হচ্ছে আর 'হায়, হায়' করছে। কোথায় ছিল এই প্রিয়জন? কোথায়ই বা গেল? কিন্তু তোমার অমৃতস্বরূপের তো গতাগতি নেই। তুমি লক্ষবার রাজা হতে পার, কিন্তু তবুও তুমি মৃত্যুর অধীন। তুমি শান্তি ও আনন্দ সেখানে পাবে না। তবে হ্যাঁ আরাম পেতে পার। আরাম আর আনন্দ এক বস্তু নয়। আরাম ভোগ করে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন। কিন্তু আনন্দ ভোগ করে আত্মা। তার জন্য দেহেন্দ্রিয়ের দরকার হয় না। Here lies the difference between bliss and comfort।

'এ' এক একদিন এক একটি chamber খুলে দিচ্ছে। তবু মন মানে না, কুকুরের লেজের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে যায় ঘরে গেলেই। কে তোমার আপন? কাকে তুমি পেয়েছ বা পাবে আপন করে? প্রত্যেকের সাথে প্রত্যেকের সম্বন্ধই তো স্বার্থের সম্বন্ধ। স্বার্থপূরণ না-হলে প্রত্যেকেই তো রুখে দাঁড়ায়। নিজেদের জীবনে কি এ সব প্রত্যক্ষ করনি?

সাধু কে? সাধু তিনি-ই যিনি অসৎ-কে ছেড়ে সৎ-এর মধ্যে বাস করেন। অসৎ কী? যার আকার, বিকার ও পরিণাম আছে তা-ই অসৎ। আর সৎ কী? যার আকার নেই। আনন্দ, মুক্তি, চৈতন্যের আকার নেই, তাই বিকারও নেই। কিন্তু মৃত্যুর বিকার আছে। মৃত্যুতে মানুষ ভীত হয়, কারণ সংসার ছেড়ে যেতে হয়। সংসারে থাকতে কত সাধ ছিল, কিন্তু তা তো পূরণ হল না—এ সব চিন্তা করতে করতে চোখ বন্ধ করে আবার আরেকটি দেহ নিয়ে এসে সেই সাধ পূরণ করে। এরই নাম সংস্কার—সবই কল্পনা। আত্মার স্তরে জন্ম, জরা, ব্যাধি, ভোগ ও প্রারব্ধ নেই। যে অমৃতস্বরূপ,অখণ্ডস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ পূর্ণস্বরূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ, সে-ই সাক্ষিস্বরূপ—সে কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা নয়। সে-ই আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দস্বরূপকে ছেড়ে নিরানন্দের রাজ্যে এসে রাজাই হই আর মন্ত্রীই হই—সকলেই মৃত্যুর অধীন, কালাধীন ও বিকারের অধীন। আমাকে সেখানে দুঃখকষ্ট ভোগ করতেই হবে।

দেখ, অনেক মহাযোগী আছেন, যাঁদের সঙ্গ করলে অদ্ভুত আনন্দ পাওয়া যায়। সংসারী মানুষের আছে অভাববোধ। কল্পিত অভাববোধ সৃষ্টি করে সে বাঁচতে চায়। সংসার দাঁড়িয়ে আছে তার কল্পনার উপর। যত অবতারপুরুষ, মহাপুরুষ এসেছেন তাঁরা মানুষকে এই সংবাদটি দিয়ে গিয়েছেন। কেন? কারণ সংসারে মানুষের দুঃখকষ্টের অন্ত নেই। মানুষ সুখের কল্পনায় ডুবে আছে, কল্পিত সুখপূরণের আশায় দুঃখের বোঝা সে বয়েই চলেছে। দুঃখের অতীত যিনি তাঁর স্বরূপ তো স্বতঃসিদ্ধ, তাঁকে পাবার জন্য তো পরিশ্রম করতে হয় না। স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ—everything is pervaded by Him, He is not subordinate but the background of all, substratum of all, the essence of all।

আমাদের প্রত্যেকের জিভের রুচি বা স্বাদ আলাদা। কেউ মিষ্টি ভালবাসে, কেউ ঝাল ভালবাসে, কেউ বা টক ভালবাসে। তার অর্থ মনও এর সাথে বসে কারবার করছে। সেই সব জিনিস সংগ্রহ করে আস্বাদন করছে। কিন্তু যেখানে শুধু Oneness সেখানে কে কাকে আস্বাদন করবে? যে মুহূর্তে তুমি আবিষ্কার করলে তুমিই নিজে সেই সচ্চিদানন্দ আত্মা তখন তুমি আর কার আশায়, কিসের আশায় দেহকে প্রকৃতির রাজ্যে engaged রাখবে? এই প্রশ্ন 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) মধ্যেও এসেছিল। 'এ' কারও কাছে কোনও শিক্ষাদীক্ষা পায়নি। সেটা অবশ্য 'এর' কাছে মস্ত বড় আশীর্বাদ। সেই রকম শিক্ষা পেলে 'এও' কল্পনার রাজ্যে বিরাজ করত। কল্পনার ঈশ্বরকে নিয়ে থাকত। নিজের স্বরূপকে খুঁজত না। আর কল্পনা ভেঙে গেলে কী নিয়ে থাকত—নিজেকেই নিজের বোঝা বইতে হত। এটা 'এর' ভিতরে ভাল ভাবেই অনুভূত হয়েছিল। তাই ঠিক করেছিল এই বোঝা এবার নামিয়ে দিতে হবে। এই অহংকারের বোঝা 'এ' আর বইতে পারছে না। কল্পনা, কামনার বোঝা বইতে 'এ' আর রাজি নয়। তাহলে 'একে' ছোঁবে কে?

মায়াপ্রকৃতি ছলনা করে কাকে? কামনা আছে যার তাকে। কিন্তু যার কামনা নেই তাকে সে স্পর্শ করতে পারে না। কাজেই এটা করব, এই কামনা যখনই মাথায় এল

অমনি অহংকার সেটা করার জন্য তৈরি হল। Assert করল, পেল, ভোগও করল, তারপর আস্তে আস্তে সব শেষ হয়ে গেল। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথ অত পরিশ্রম করে কাব্যরাজ্য তৈরি করে ভাবলেন, এ কী হল! "আমার যে সব দিতে হবে", অর্থাৎ আমি তো কোনও কিছুর অধিকারী নই। ঈশ্বর আমাকে দিয়েছেন তাই। হায় রে হায়! আবার সেই কাঙাল, সর্বহারা। সেই জন্য বৈরাগ্যের পথে না-গিয়ে অসংখ্য বন্ধনের মাঝেই মুক্তির স্বাদ নেবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি দেখলেন অসংখ্য বন্ধন অক্টোপাসের মতো তাঁকে চেপে ধরেছে, একে একে আপনজনেরা সরে যাচ্ছে—তখন আর সামাল দিতে পারছেন না। তিনি প্রিয়জনের কাছে লিখেছেন—"এ ভাবে তো ভাবিনি, যা ভেবেছিলাম তা তো হল না।" তাঁর বাণীর মধ্যে এমন অনেক কথা আছে যা অনেকেই গ্রহণ করতে পারে না, আবার এমন অনেক কথা আছে যা অনেকেরই প্রিয়। তাই কথায় কথায় অনেকেই রবীন্দ্রনাথের উক্তি quote করে, তাঁর গান গায়। কিন্তু তা দিয়ে সে তার বিকারের ঊর্ধ্বে উঠতে পারে না।

প্রত্যেককেই তাদের ইন্দ্রিয়কে ব্যবহার করতে হচ্ছে মন দিয়ে। মনকে ঠিক রাখতে হচ্ছে বুদ্ধি দিয়ে। আর বুদ্ধিকে ঠিক রাখতে যা দরকার তা সে পাচ্ছে না, কেন না তা তার হাতের মুঠোয় নেই। আমরা ইন্দ্রিয়-প্রাণকে control করতে কিছুটা অভ্যাস করতে পারি। কিন্তু মৃত্যু যখন আসে তখন তো আর প্রাণকে control করতে পারি না। যোগীর সারা জীবনের যোগ বিয়োগ হয়ে যায়। আত্মজ্ঞানী জানেন—দেহ আমার নয়। যে দেহটা আছে তা আমি নই, তা আমার নয়। অর্থাৎ তিনি সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত যে বোধ নড়ে না, হারায় না, পালায় না। জগতে একটিমাত্র বস্তু আছে, তা হল চৈতন্য, প্রজ্ঞান—তার কোনও প্রতিপক্ষ ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। সুতরাং তাকে স্পর্শ করবে কে? প্রজ্ঞানের বক্ষে কত ছায়াবাজি চলছে, তাতে প্রজ্ঞানের কিছু এসে যায় না। সাগরবক্ষে কত তরঙ্গ, লহরী, বুদ্‌বুদ্ ওঠে, ভাসে, ডোবে, কিন্তু সাগর কি তার হিসাব রাখে? আর আমরা আছি সারাজীবন হিসাবনিকাশ নিয়ে। এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে একজন বলেছিল—বাবাঠাকুর আপনার কথায় সবাই যদি সন্ন্যাসী হয়ে যায় তাহলে কী হবে? তাকে বলা হল—সবার কথা ছেড়ে দাও, তুমি হয়ে দেখাও তো। নিজের কথা ভাব। জন্মের সময় সবাইকে নিয়ে আসনি, যাবার সময়ও কারওকে নিয়ে যাবে না। You are eternally One. এই সংসারে কেউ তো আপন নয়। দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, বুদ্ধি কেউই আপন নয়। নিজের বাবা-মাও আপন হন না। কিন্তু যে পথের কথা দিয়ে আজকের প্রসঙ্গ শুরু করা হয়েছিল সে পথে এগুলি নেই। যদিও এই প্রসঙ্গ কারও কাছে প্রিয় হবে না। যে প্রিয়তাবোধ তাকে ঘিরে রেখেছে তা হল নকল প্রিয়তাবোধ। তা হল এই রূপ-নাম-ভাবের সংসার।

মানুষ কর্তব্য, দায়িত্বের কথা বলে। কিন্তু লক্ষ লক্ষ জনম কেটে গেলেও শুধু কর্তব্যের বোঝা বাড়ে। দায়িত্ব বলতে যে অনাত্মার বোঝা সে বয়ে চলেছে—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ, ঘরসংসার, কলকারখানা। কর্তব্য পালন করতে করতে কর্তব্যের বোঝা বেড়েই চলে, তার থেকে আসে দুঃখ। এই দায়িত্ব, কর্তব্যের ভারে জন্মের সময়

মাথায় যত চুল ছিল সব পড়ে গিয়ে টাক হয়ে যাচ্ছে। দুশ্চিন্তা থাকলে টাক পড়বেই। 'এর'-ও (নিজেকে নির্দেশ করে) ছিল। তবে 'এ' এমন আগুন দিয়ে তা জ্বালিয়ে দিয়েছে যে, সেগুলি আর 'একে' জ্বালাতে পারবে না। জ্বালাবার আগুন, সেই কল্পনার আগুনকে 'এ' জ্ঞানাগ্নি দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছে। জ্ঞানাগ্নি হল আত্মজ্ঞান।

'এ' কখনওই চিন্তা করেনি যে, সব মানুষ আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হবে। কারণ সব ক'টি মানুষ 'এর' কাছে কল্পনা। The sense of individuality is imagination, then why should I think of that? 'এ' আত্মাকে দেখছে তোমাদের মধ্যে, কিন্তু তোমাদের form-গুলি দেখছে না। এই বাড়ি তৈরি হবার আগে এখানে আকাশ ছিল। তারপর বাড়ি হয়েছে। আবার অনেক জায়গায় বাড়ি ছিল, তা ভেঙে গিয়েছে বা পুড়ে গিয়েছে। তাতে তো আকাশের কিছু হয়নি। তেমনই তোমাদের মধ্যে যে আত্মা তাঁর কোনও বিনাশ বা বিকার নেই। যার বিকার হয় তা আত্মা নয়। এই বোধটি নিশ্চয়ই দুর্বোধ্য নয়। যার বিকার হয়, আবির্ভাব-তিরোভাব হয় তা আত্মা নয়। আত্মার আবির্ভাব-তিরোভাব হয় না, আত্মা সর্বব্যাপী। এমন কোনও জায়গা নেই যেখানে আত্মার অভাব আছে। কারণ Self is all-pervading, everything is pervaded by the Self. That Self verily you are. আত্মার কাছে তোমার form-টা insignificant, এ রকম কত appearance আসছে-যাচ্ছে। এগুলি আগন্তুক, তা কখনও নিত্য সত্য পূর্ণ হতে পারে না।

আত্মা সম্বন্ধে আগে যা বলা হয়েছে তা-ই বলা হচ্ছে। মন-বুদ্ধি দিয়ে আমরা যা ভাবনাচিন্তা করি তা আত্মার পর্যায়ে পড়ে না। Mind/intellect is absolutely inefficient. তবে যারা সদ্‌গুরুর সন্ধান পেয়েছে, তারা তাঁর কাছে এমন একটি মন-বুদ্ধির সন্ধান পেয়েছে যাকে বলা হয়েছে সংস্কৃত মন-বুদ্ধি, অর্থাৎ controlled mind। সেই মন দিয়ে গুরু তাকে এক-এর পথে চলার নির্দেশ দেন। এই আলো কখনও নিভবে না। এই আলোই হল আমি। আমি-র আদি নেই। যার আদি-অন্ত নেই, তার নাশও নেই। I am beginningless, so I am endless, কিন্তু সাধারণ মানুষ তো এ কথা মানবে না। তারা cinema দেখতে ভালবাসে। বহু বছর আগে একটি গান খুব popular হয়েছিল—"স্বপন যদি মধুর এমন হোক না মিছে কল্পনা—আমায় জাগিও না, আমায় জাগিও না।" কল্পনা জেনেও মানুষ স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। "স্বপ্ন দেখি প্রবালদ্বীপে তুলব আমি বাড়ি....।"

জনক রাজার সভাতে সব ব্রহ্মজ্ঞানীরা বসে আলোচনা ও বিচার করেন। তাঁরা যোগ্য অধিকারী হয়েও পূর্ণ সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না। তার কারণ জানতেই যাজ্ঞবল্ক্য সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। সন্ন্যাস দুই রকমের—বিদ্বৎ সন্ন্যাস ও বিবিদিষা সন্ন্যাস (এটা সবার কাছে পরিচিত নয়)। একটি হল সংসারে বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকে বিচারের মাধ্যমে বৈচিত্র্যের মূলে পৌঁছানো, যেখানে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ Oneness-এ পৌঁছানো। আরেকটি হল Oneness-এর কথা শ্রবণ করে Oneness-এ বাস করা। তার জন্য অবশ্য একটি পরিবেশ চাই, নির্জনতা চাই। আর অন্যান্য সন্ন্যাস হল এদেরই gradation।

১৯৭০ সালে যখন প্রথম এই দু'টি সন্ন্যাসের কথা বলা হয়েছিল তখন অনেকেই বলেছিল—যে সন্ন্যাসের কথা আমরা জানি তার সাথে আপনার বর্ণিত সন্ন্যাসের তো মিল হচ্ছে না। তখন তাদের বলা হয়েছিল—হ্যাঁ, মিললে তুমি খুশি হতে, কিন্তু তাতে তোমার লাভ হত না। কেন মেলেনি তা অনুসন্ধান কর। একমাত্র যথার্থ অনুসন্ধানীই যোগ্য অধিকারী হতে পারে, ভোগীরা হতে পারে না। ভোগী অর্থে যারা অনুসন্ধান করে না। যাদের মধ্যে জিজ্ঞাসা জাগেনি, আত্মবোধে/ব্রহ্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য যাদের জিজ্ঞাসা জাগেনি, তারা এক-এর পথে যেতে পারে না। এক-এর পথ হল বিচারের পথ, বিচারের পথ হল বিচরণের পথ। "চরৈবেতি"—চল আপনার মধ্যে, আপনার অন্তরে আপনবোধে। থেমে যাওয়া মানেই death।

এই প্রসঙ্গে একজন অবাঙালি প্রশ্ন করেছিল—আপনি যে স্তরের কথা বলেছেন সেখানে তো ক্রিয়া ও গুণ নেই। তাকে বলা হয়েছিল—কে বলেছে ক্রিয়া ও গুণ নেই? নির্বিশেষে ক্রিয়া নেই, বিশেষে ক্রিয়া আছে। আসলে তোমরা যা জান তা দিয়েই সব মাপতে চাও। কিন্তু unfathomable যা, অপরিমেয়কে মাপবে কী দিয়ে? তোমাদের মাপকাঠি হল মন-বুদ্ধি। মন-বুদ্ধির সেখানে প্রবেশাধিকার নেই। তবে হ্যাঁ, যে মন-বুদ্ধি দিয়ে সেখানে যাওয়া যায় তা একমাত্র অনুভবসিদ্ধের কাছেই পাওয়া যায়, আমাদের school, college বা কোনও institution-এ পাওয়া যায় না। সেখানে বেদ, বেদান্ত পড়ানো হলে তা মুখেই থেকে যায়, আর বেশি দূর এগোয় না, হজম হয় না।

সংগ্রহ করা জিনিস দিয়ে তুমি সর্বাতীতকে ধরতে পারবে না। সেখানে প্রবেশ করার বিজ্ঞান আলাদা। সেই বিজ্ঞান যাঁদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁদের লোকে নিতে পারে না। 'একে' (নিজেকে নির্দেশ করে) প্রশ্ন করেছে—তুমি সেই বিজ্ঞান কী করে পেলে? তাদের বলা হয়েছে—এই বিজ্ঞান কোনও প্রাপ্তব্য বস্তু নয়। তা attain করার বস্তু নয়, achievement-এর বস্তু নয়। তা ছিল, আছে ও থাকবে। অন্য সব কিছু থেকে 'এ' মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই 'এ' তা দেখতে পাচ্ছে। তখন পাঁচটা অস্ত্রের কথা বলা হল—প্রত্যেক জীবেরই একটি চাওয়া আছে। মুক্তিও চাওয়া, শান্তিও চাওয়া। কিন্তু আত্মা কার কাছে কী চাইবে, যেখানে আত্মা অতিরিক্ত কোনও বস্তু নেই? তাহলে মিথ্যা চাওয়ার কী মূল্য আছে! তাই এই প্রসঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়েছে—

'কিছু না-চাওয়া হল সর্বোত্তম চাওয়া।
কিছু না-পাওয়া হল সর্বোত্তম পাওয়া।
কিছু না-জানা হল সর্বোত্তম জানা।
কিছু না-করা হল সর্বোত্তম করা।
কিছু না-হওয়া হল সর্বোত্তম হওয়া।'

That is the true nature of the Self. Self কিছু চায় না, তাঁর কোনও অভাব নেই, তাই অভাবপূরণের তাগিদও নেই। সেই জন্য Self কিছু করে না। তাঁর কিছু

হওয়ারও প্রয়োজন নেই, কারণ Self কিছু হারায়নি। আত্মগুরুই হলেন সর্বোত্তম গুরু। আত্মজ্ঞান যাঁদের হয়েছে তাঁরাই আত্মগুরুর ভূমিকায় অপরকে সেই বোধে প্রতিষ্ঠিত করতে আত্মজ্যোতি প্রকাশ করেন। শ্রবণের মাধ্যমেই কাজ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়েছিল—লোহা একটি ধাতু, লোহা জ্বলে না। কিন্তু আগুনের সংস্পর্শে থাকার ফলে লোহা আগুনের ধর্ম প্রাপ্ত হয়। কাজেই লোহা তখন আগুনের মতো লাল হয়, তার মধ্যে তাপ সৃষ্টি হয় ও জ্যোতি তৈরি হয়। আবার লোহাকে আগুন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে লোহা আবার স্বধর্ম প্রাপ্ত হয়। লোহার মধ্যে অগ্নির অস্তিত্ব ক্ষণস্থায়ী।

আবার দেখ, একটি মশালকে গোল করে ঘোরাতে থাকলে একটি circle তৈরি হয়। আত্মার জ্যোতি অনাত্মার মধ্যে প্রতিফলিত হলে ঘূর্ণায়মান তা আত্মার মতোই দৃষ্ট হয়। কিন্তু তা আত্মা নয়। লোহার আগুন real আগুন নয়, তা সাময়িক ভাবে প্রতিফলিত হয়। এই যে সাময়িক ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে তাতে মানুষ deluded হয়ে যাচ্ছে। সাময়িকের মাধ্যমে মন আকৃষ্ট হয়ে বদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাই আমরা অন্ধকারে দড়িকে বা লতাকে সাপ বলে ভুল করি। ভ্রমও অনুভূতি। কেউ হয়ত দড়িকে সাপ মনে করে চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে গেল। লোকে আলো, লাঠি ইত্যাদি নিয়ে ছুটে এল। এসে দেখল সাপ নয়, দড়ি পড়ে আছে। আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, B.A./M.A. পাশ করা লোকটি দড়িকে সাপ মনে করে অজ্ঞান হয়ে গেল! শেষ পর্যন্ত ডাক্তার ডেকে ওষুধ দিয়ে জ্ঞান ফেরাতে হল। এই যে সাপ দেখল এটা একটি অনুভূতি, এই যে ভয় পেল এটাও একটি অনুভূতি। কিন্তু এগুলি real জ্ঞান নয়। এগুলি হল জ্ঞানাভাস। কেন না a rope cannot be a snake। আবার ঝিনুককে মুক্ত বলে, মরুভূমির বালুকে জল বলে, গাছের গুঁড়িকে লোক বলে অনেকে ভ্রম করে। এই হল মনের কাজ—এক বস্তুতে অপর বস্তুর গুণ আরোপ করে। Mind superimposes one thing on the other and accept that thing to be something different from its true nature. একেই বলা হয় ভ্রান্তিবিলাস। আত্মার জায়গায় আমরা অনাত্মাকে দেখছি—এই হল ভ্রান্তিবিলাস। আত্মাকে না-দেখে অনাত্মাকে দেখছি। অথচ আত্মাকে দেখার কথা। Self cannot be non-self and non-self cannot be Self. কী আশ্চর্য! ব্রহ্ম কখনও জগৎ হতে পারে না, জগৎ কখনও ব্রহ্ম হতে পারে না। ব্রহ্মবক্ষে জগৎ ভাসে, কিন্তু কখন? অজ্ঞান বিলাসে। তুমি বিচার করতে থাক—ঐ পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে তুমি আর পেঁয়াজকে খুঁজে পাবে না, জগৎকে খুঁজে পাবে না। দেখবে তুমি একাই আছ, without any subjective and objective part you alone exist. You are neither a subject nor an object. কিন্তু সংসারে প্রতিটি মানুষ তার অহংকার দিয়ে subject সেজে বসে আছে—object তার কাছে প্রিয়। Subject-এর জন্য object চাই।

'এ' তোমাদের সামনে তোমাদের সত্য পরিচয়টুকু রাখছে। তুমি নিজের চোখে নিজে দেখ, নিজের কানে নিজে শোন, মন দিয়ে চিন্তা কর, নিজের পা দিয়ে হাঁট, নিজের হাত দিয়েই তুমি কাজ কর। সুতরাং নিজবোধ দিয়েই তুমি নিজেকে অনুভব কর। Dont depend on others, dont hire anybody. 'এ' তোমাদের কথাই

তোমাদের সামনে রাখছে, try to reflect on that and you will find that you are verily Self. একচুলও এদিক-ওদিক হবে না। কিন্তু মন তোমাদের ভুলিয়ে রেখেছে। আমরা সেই মনকেই তোয়াজ করছি, সেই মনের কথাই শুনছি, আবার সেই মন দিয়েই আমরা সবার সঙ্গে relation স্থাপন করছি। একমাত্র ঘুমের মধ্যে মনটি ঘুমিয়ে থাকে বলে দ্বন্দ্ব বিলাস বন্ধ থাকে কিছুক্ষণের জন্য। সেখানে সাধু-অসাধু, মূর্খ-শিক্ষিত, জ্ঞানী-অজ্ঞানী, সুস্থ-অসুস্থ সব এক জায়গায় পৌঁছে যায়, কোনও difference থাকে না। কিন্তু বীজ বা সংস্কার থেকে যায়। আত্মজ্ঞানী যখন তোমাকে সমাধির স্তরে পৌঁছে দেবেন তখন দেখবে তোমার ঘুমের ঘুম হয়ে গিয়েছে, মৃত্যুর মৃত্যু হয়ে গিয়েছে—তুমি নিত্য এক-এ বিচরণ করছ।

তাই বলা হয়েছে এক-এর পথে চল—that is the royal avenue, the path of the infinite Divine-Self, unalloyed, unmixed, free from all merits and demerits made of ignorance—অজ্ঞান, জ্ঞান, বিজ্ঞান কিছুরই প্রয়োজন হয় না। কারণ কিছু সেখানে entry পায় না। জগৎটা হল কিছু নিয়ে। এই কিছু কিন্তু impermanent, unreal। তাই মায়া প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—এটা আছে কী নেই সে কথায় তুমি যাবে কেন? It is insignificant. তুমি আত্মা হয়ে আত্মচিন্তা ছেড়ে অন্য চিন্তায় যাবে কেন? আত্মা ছাড়া আর কিছু আছে কি নেই, থাকলে কী রকম হবে ইত্যাদি অবান্তর চিন্তায় যাবে কেন? In the light of Oneness, in the Knowledge of Oneness all these are insignificant, here duality cannot find any entry. সেখানে দ্বৈতের কোনও entry নেই। জ্ঞানাভাসও সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। জ্ঞানাভাস মানে মন-বুদ্ধি। তার মধ্যে কূটস্থচৈতন্য, অর্থাৎ অন্তরের গভীরতম প্রদেশে স্থিত চৈতন্যের প্রতিফলন হচ্ছে তোমার অন্তরে। সে-ই অন্তর থেকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বাইরে আসছে। এরই নাম হল subject-object complex। মনের একটি অংশ কল্পিত কল্পনার রূপ ধরছে এবং আরেকটি অংশ দিয়ে তা enjoy করছে। Mind is the creator and enjoyer. When it is the creator, it is Brahmaa. When it sustains, it is Vishnu. When it dissolves all, it is Shiva. কাজেই তিনটি Godhead যখন একত্র হল, অর্থাৎ Consciousness presiding over the field of action is Brahmaa, when the Consciousness acts as preservation, sustenance, it is called Vishnu and when it dissolves all, it is called Shiva। এই তিন দেবতা যখন এক হয়ে one unit হল তখন আর সৃষ্টি-স্থিতি-লয় নেই। তখন absence of creation, preservation and dissolution। আরও ঊর্ধ্বে যেখানে কাল তোমাকে স্পর্শ করে না, বিকার তোমাকে স্পর্শ করে না, কার্য তোমাকে স্পর্শ করে না, কর্মফল তোমাকে স্পর্শ করে না—কর্মফল আসবে কী করে? সেখানে কার্য, কারণ, কর্তা নেই। একেই বলা হয়েছে পরম অমৃততত্ত্ব।

২৭। ০৯। ০২

৩৭৫

যার মনে জিজ্ঞাসা জাগেনি তার বিচার আসেনি। আর যার বিচার আসেনি তার বৈরাগ্য জাগেনি। যার মধ্যে বৈরাগ্য জাগেনি সে মুক্তিশান্তি লাভ করতে পারে না। মুক্তিশান্তি অন্তরে থাকা সত্ত্বেও তার সন্ধান সে পায় না। কেন না এই জগতে ব্রহ্মার সকল সৃষ্টিকে অর্থাৎ আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সব কিছুকে যিনি তৃণবৎ মনে করতে পারেন তিনি একমাত্র মুক্তিশান্তি লাভের যোগ্য অধিকারী। পরলোক অর্থাৎ যাকে আমরা স্বর্গ বলি, সেখানে গিয়ে সুখভোগ করা যায়, পুণ্য কর্মের ফল ভোগ করা যায় এবং ভোগান্তে আবার নেমে আসতে হয়। এই দুই জগৎ সম্বন্ধেও যার বৈরাগ্য এসেছে, detachment এসেছে, indifference এসেছে, এই দুই জগৎকে যিনি মিথ্যাবৎ জানতে পেরেছেন, তিনিই হলেন যথার্থ জ্ঞানী। এই জ্ঞানীর পতন হয় না।

ভয় পেয়ো না। তুমি এই জ্ঞানের অধিকারী হতে পারছ না বলে ভয় পেয়ো না। কারণ তোমার মন-বুদ্ধি এই জ্ঞানের অধিকারী কোনও দিনই হতে পারবে না। এই প্রসঙ্গ শুনতে শুনতে যখন তোমার মন ও বুদ্ধির প্রতি বিতৃষ্ণা আসবে then you will attain that stage. You shall not entertain your mind and intellect, but you will have to avoid and neglect it knowing fully that they are insign:ficant, inefficient. মন-বুদ্ধি দিয়ে আমি কী করব?

সৎপ্রসঙ্গ আলোচনাকালে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর নারদ সম্পর্কে একটি গল্প বললেন।

নারদ দেবলোকে ও স্বর্গলোকে যান। সৃষ্টির প্রথম থেকেই নারদ এই nomination পেয়ে গিয়েছিলেন। ত্রিভুবনে তাঁর অবাধ বিচরণের অধিকার ছিল। নারদ সব জায়গাতেই যান কিন্তু গোলকে নারায়ণই হল তাঁর লক্ষ্য। কৈলাসে মহাদেব তাঁর পরিবাব নিয়ে বেশ সুখেই আছেন, আমি কেন বাদ যাই—এই ভেবে নারদ নানা রাজ্যে ঘুরতে লাগলেন। তিনি ঘুরতে ঘুরতে বনে এক রাজকন্যাকে তার সহচরীদের সাথে ভ্রমণরত অবস্থায় দেখতে পেলেন। রাজকন্যাকে তিনি propose করলেন। রাজকন্যা নারদকে জানাল যে, তার তো স্বয়ম্বরসভা হবে, সেখানেই সব ঠিক হবে।

স্বয়ম্বরসভার আয়োজন হয়েছে। দেশ-বিদেশেব সব রাজারা সেজেগুজে বসে আছেন। রাজকন্যা মালা হাতে এক এক করে সবার সামনে আসছে আর সরে যাচ্ছে। নারদের কাছে আসবার আগেই একজন বসেছিলেন—তিনি বিষ্ণু স্বয়ং, ছদ্মবেশে এসেছেন। তাঁর কাছে আসতেই বিষ্ণু ঝলকে নিজ রূপ প্রদর্শন করাতে রাজকন্যা তাঁর গলায় মালা দিয়ে দিল। তাই দেখে নারদ খুব রেগে গেলেন। তিনি মনের দুঃখে বিষ্ণুলোকে যাওয়াই ছেড়ে দিলেন। (কামনার বস্তু না-পেয়ে মানুষ যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে! ঈশ্বরের গুণগান করে যে ঋষি দিন কাটাতেন, বিষ্ণুর ছলনা তাঁকে তাঁর প্রতি প্রতিশোধপরায়ণ করে তুলল। হায় রে জীবধর্ম!)

অনেকদিন হয়ে গিয়েছে, নারদ আসছেন না। বিষ্ণু নারদের খোঁজখবর নিতে লাগলেন। তারপর একদিন নিজেই নারদের কাছে চলে এলেন। তিনি নারদের কাছে এসে দেখলেন নারদ উদাস মনে একটি গাছতলায় বসে আছেন। নারদ বিষ্ণুকে

প্রণামও করলেন না। সব বুঝতে পেরে বিষ্ণু মনে মনে হাসলেন। তিনি নারদকে বললেন—নারদ, তুমি কষ্ট পাচ্ছ তাই আমি তোমার কাছে এসেছি। তুমি যে বিয়ে করে সংসার করতে চাও—এ কথা আমায় আগে বলনি কেন? আমি তোমাকে জগতের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে জোগাড় করে দিতাম। নারদ কোনও কথাই বললেন না। অবশেষে বহু তোয়াজ তোষামোদ করে বিষ্ণু নারদকে ঠান্ডা করলেন। তারপর তিনি নারদকে বললেন—তুমি যাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে আমি তার চেয়েও অনেক বেশি সুন্দরী মেয়ে জোগাড় করে দিচ্ছি যাকে দেখে স্বর্গের দেবীরাও ঈর্ষা করবেন। শেষ পর্যন্ত বিষ্ণুর দেওয়া পাত্রীর সঙ্গে নারদের বিয়ে হয়ে গেল।

দীর্ঘকাল নারদ তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে সুখে সংসার করছেন। ত্রিভুবনের সঙ্গে তাঁর আর কোনও সম্পর্কই নেই। তিনি কৈলাসে ও গোলকেও যাচ্ছেন না। নারদের স্ত্রীর নাম ইতি। একদিন যমরাজ তাঁর চরদের পাঠালেন নারদের গৃহে। তাঁর স্ত্রীর সময় হয়েছে, তাকে নিয়ে যেতে এসেছে যমরাজের চররা। নারদও বুঝতে পারলেন যে, এবার তাঁর স্ত্রীর যাবার সময় হয়েছে। তাঁর ভিতরটা হুহু করে উঠল। যমদূতরা এল। তারা নারদকে প্রণাম করে বলল—প্রভু, আপনি বিয়ে করে কেমন হয়ে গেলেন! আর স্বর্গরাজ্যেও যান না, নামগানও করেন না। নারদ কোনও কথাই বলতে পারলেন না। তাঁর আদরের সোহাগের স্ত্রীকে যে তারা নিতে এসেছে! তারা স্ত্রীকে নিয়ে চলে গেল। প্রচণ্ড দুঃখে নারদের তখন প্রভুর কথা মনে পড়ল। প্রভু যদি এই বিয়ে না-দিতেন তাহলে তো তাঁকে এত দুঃখ সহ্য করতে হত না। কেন তিনি এই কাজ করলেন! নারদ বিষ্ণুর কাছে জবাবদিহি চাইলেন। বিষ্ণু কিছুই বললেন না। নারদ তখন তাঁকে বললেন—আমি যদি নামগান করে কোনও পুণ্য অর্জন করে থাকি, সেই পুণ্যের জোরেই বলছি, আমি যে দুঃখ ব্যথা ভোগ করছি এই ব্যথা তোমাকেও একদিন ভোগ করতে হবে প্রভু।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—যাক সে কাহিনি, আমরা পূর্বের প্রসঙ্গে ফিরে যাই। এক ভক্ত মাকে বলছে—তুমি কখন কোথায় থাক আমাকে যদি বলে দাও তাহলে আমি আমার খুশি মতো তোমার কাছে চলে যেতে পারি। মা বললেন—আমি তো কোথাও যাই না, তুই আমায় দেখছিস কী দিয়ে? আমি তো তোর অনুভূতির মধ্যেই বাস করি। কিন্তু কোন অনুভূতি? বহুর মধ্যে থাকলে তো তুই আমাকে চিনতে পারবি না। আমাকে চিনতে হলে এক-এর মধ্যে আসতেই হবে। The Knowledge of Oneness is the only base in and through which one can realize his own Self and the Self of all as infinite and absolute.

অন্তর্বোধের গতির পথে অন্তরাত্মা নিত্যবিদ্যমান। কাজেই যিনি সর্বব্যাপ্ত হয়ে আছেন একবোধে, তৃতীয়নেত্র বা প্রজ্ঞানেত্র (through the eye of wisdom) দিয়েই তাঁকে একমাত্র দেখা যায়। সেই জন্য মনকে এই প্রজ্ঞানেত্রে নিবদ্ধ করতে হবে। সেখানে আছে একটা light। সেই light-এ যে চলে বেড়ায় সে-ই মহাকুণ্ডলিনীর সন্ধান পায়। মহাকুণ্ডলিনী কী? The supreme power of Oneness, the power of the Absolute. তিনি সব কিছুর মধ্যেই মিশে আছেন। তাঁর দর্শন একমাত্র

আপনবোধেই হয়। এই আপনবোধের কোনও সীমা নেই। That is verily your Self, that is verily your true nature by which everything is pervaded. তোমার দ্বারাই পরিব্যাপ্ত সব। তুমি ভুলে গিয়েছ, মনে করছ—আমি নিকৃষ্ট জীব, আমার সাধ্য নেই, আমি হাত-পা বাঁধা হয়ে পড়ে আছি। তা সত্য, কিন্তু কে তোমাকে এ ভাবে থাকতে বলেছে? কে বলেছে তোমাকে এই কারাগারে বাস করতে? নারদকে যখন প্রভু বোঝাতে চেয়েছিলেন, নারদ তখন বোঝেননি। যখন নারদ বুঝলেন তখন দেখলেন তাঁর ইষ্টকেই তিনি হারিয়ে বসে আছেন। ইষ্টকে ছেড়ে এতকাল স্ত্রীকে নিয়ে সংসার করলাম আর সে-ই চলে গেল এবং তার শোকে মুহ্যমান হলাম!

কেন কাঁদ কেন কাঁদ কেন কাঁদ মন
সর্বসমতত্ত্ব স্বয়ং তুমি নিত্য যখন।

তুমি পূর্ণ হয়েও অপূর্ণের অভিনয় করছ। আর অপূর্ণতার মধ্যে থেকে তুমি যাত্রাদলের মতো কখনও রাজা সাজছ, কখনও ভিখারি সাজছ। সংসারে কারও ভাই, কারও পিতা, কারও পুত্র—কত সাজে সেজে তুমি অভিনয় করছ। কিন্তু ঘুমিয়ে যখন পড়ছ তখন কে কার পুত্র, কে কার ভাই, কে কার স্বামী! Fantastic!

যোগীরা উজান পথে চলেন, বৈচিত্র্য ছেড়ে এক-এর পথে চলেন। বাউলরাও তাই অন্তরের পথে চলে, অন্তরের মানুষ বা মনের মানুষকে নিয়ে। তাঁকে কখনও পাখি বলছে, কখনও বন্ধু, কখনও বা সখা বলছে। আত্মাকে তারা অদ্ভুত ভাবে ভজনা করে। তারা ঘর বাঁধে না, কিন্তু ঘরেই বাস করে। কাজেই পথকে করেছে ঘর কে? সাধনায় ডুবে গিয়েছে যে। সাধনরূপ পথে চলতে হবে। জীবনের ভুলে থাকা অংশটি হল negative part। সাধনা হল এই negative-কে positive বানানো। সাধনা হল না-কে সাধা। সাধ-না অর্থাৎ না-কে সাধ, desire-কে বর্জন কর, সা-ধনা অর্থাৎ তোমার অন্তরের শক্তি হল তোমার সম্পদ। এই সম্পদশূন্য তুমি কোনও দিনই হবে না।

প্রতিদিন মানুষ জাগ্রত অবস্থায় এক রকম ভাবে ভোগ করে এবং স্বপ্ন অবস্থায় মন দিয়ে সৃষ্টি করে তা আবার অন্য ভাবে ভোগ করে। সেখানে দেহ-ইন্দ্রিয় জাগ্রত অবস্থার মতো থাকে না। আবার গাঢ় ঘুমে দেহ-মন-ইন্দ্রিয় কিছুই থাকে না। এই তিনটি স্তরে তিন রকম জীবের লক্ষণ—বাইরে সে ব্যবহারিক জীব, স্বপ্নে সে প্রাতিভাসিক জীব আর গাঢ় ঘুমে সে প্রাজ্ঞ জীব, তার ঊর্ধ্বে সে পারমার্থিক জীব—সদাশিব। সেখানে বৈচিত্র্য না-থাকায় সে এক-কে অনুভব করে।

বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেও সে এক-কে অনুভব করে বলে সে ঈশ্বর। আর আমরা এক-এর মধ্যে থেকে বৈচিত্র্যকে অনুভব করি বলে জীব। 'এ' কথাগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তোমাদের সামনে রাখছি ভিতরের রাস্তাটা তৈরি করার জন্য। এত গভীর জঙ্গল কামনাবাসনার—এক দিক দিয়ে পরিষ্কার হচ্ছে, আবার অন্য দিক দিয়ে গজিয়ে যাচ্ছে। কাজেই প্রত্যেকদিন একটু একটু করে তোমাদের সামনে রাখা হচ্ছে। একদিন নিজেই অনুভব করবে এই আলোটা তোমার নিজস্ব, তোমারই অনুভবের কথা। এখানে আর কোনও উদ্দেশ্য নেই। A realizer has no purpose at all. He is purposeless.

He is missionless, but He has a mission. তাই 'missionless mission'-এর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু intellectual-রা তা গ্রহণ করতে পারেনি। All-pervading Reality personified as God or Self cannot have any mission because He is all-perfect. He is omnipotent, omnipresent and omniscient. তাঁর অভাব কিসের? তিনি নিজের সাথে নিজেই খেলছেন। নিজের খেলার সাথি তিনি নিজেই। Self is the only companion, there cannot be any second Self in the infinite One Self. মন-বুদ্ধি দিয়ে যা রচনা করবে তা দিয়ে কোনও কাজ হবে না। ছবির আগুন দিয়ে রান্না করা যায় না, স্বপ্নে দেখা রৌপ্য দিয়ে গয়না তৈরি করা যায় না। কাজেই imagination দিয়ে realization হয় না।

২৭। ০৯। ০২

৩৭৬

আমরা যোগের বিজ্ঞানে শম, দম, তিতিক্ষা, উপরতি ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছু পড়ি। এই শব্দগুলির অর্থ ঠিক মতো উপলব্ধি করতে না-পারলে শুধু বই পড়ে কী হবে? দম হল দমন, ইন্দ্রিয় সংযম। ইন্দ্রিয়কে তার বিষয় থেকে সরিয়ে আনতে হবে। মেয়েদেব নাচ দেখতে ভাল লাগে সবার। T.V.-তে তো সব সময়ই এমন উলঙ্গ নাচ হচ্ছে। তাই তো T.V. এত popular, দেখতে তো সবাই ভালবাসে, কিন্তু ক'জন পারে চোখ সরিয়ে আনতে। এ সব কথা শুনতে কারওরই ভাল লাগবে না। কিন্তু 'এ' তো ছেড়ে কথা বলবে না। টেনে আনো মনকে তার বিষয় থেকে। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয় থেকে তার বিষয়কে যে দমন করতে পারেনি, সে যখন ধর্মের বা সত্যের কথা বলে, তার মতো hypocrite আর কেউ নেই। আজকাল সংসার এই সব hypocrite-এ ভরা।

কাজেই দমন করতে হবে কী? ইন্দ্রিয়কে ইন্দ্রিয়ের বিষয় থেকে সরিয়ে আনতে হবে। আর শম হল—মনকে ইন্দ্রিয় থেকে সরিয়ে আনা। কেন না মন ছাড়া কেউ কোনও কিছু করতে পারে না। দেখি কার কত সামর্থ্য! ধর্মকথা চর্চা করতে ভাল লাগে, আসল ধর্মে আসতে গেলে জান (প্রাণ) বেরিয়ে যাবে।

কথাপ্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর একটি গল্প বললেন।

এক সাধক তপস্যা করতে গিয়ে দারুণ কষ্ট ভোগ করে। একদিন অস্থির হয়ে সে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করল—ঠাকুর! হয় আমায় মেরে ফেল, না-হয় বাকিটুকু তুমিই শেষ করে দাও! গুরু বললেন---পাঁচ বছর আগে কী তোর এই বোধটুকু হয়েছিল যে, তুই পারছিস না। কাজেই লেগে থাক। আমি তো আছি। আমি তোর থেকে আলাদা হতেই পারিনি। তুই যে আমার থেকে আলাদা হয়ে আছিস, এটা বুঝবার চেষ্টা কর।

কী দারুণ শিক্ষা! প্রত্যেকেই আমরা individual আমিকে ধরে 'আমি, আমি' করছি। এই আমি তো সেই আমি নয়। এই আমি সেই আমি-র ছায়া।

শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর আবার গল্পটি বলতে আরম্ভ করলেন---সাধক আবার তপস্যায় রত হল। বারবার হতাশ হয়ে আবার নূতন উদ্যমে সাধনা করতে শুরু করে। এমনি

করে সাধক একদিন আবিষ্কার করল, তার অনুভূতির মধ্যে শুধু গুরুই বসে আছেন আর কিছুই নেই। গুরু তাকে বললেন—আমি তো নিত্যকালই তোর মধ্যে বসে আছি। অহংকারের আবরণে এতদিন তা তুই দেখতে পাসনি। এখন সেই আবরণ সরে গিয়েছে, তাই আমি দৃশ্য হয়েছি।

গল্পটি শেষ করে তিনি বললেন—কী করবে মানুষ! তাই বলা হয়—Science of Oneness cannot be negated, supplemented and predicated। আর যা-কিছু আছে সব shadow। জীবনভর তুমি চর্চা করতে পার, লাভ হবে না। 'এ' এমন অনেক দৃশ্য দেখেছে তপস্যার—গাছের উপর থেকে ঝুলছে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে, কোনও বিশেষ আসনের ভঙ্গিতে দীর্ঘকাল আছে, কেউ বা হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে—সেই হাত stiff হয়ে গিয়েছে, সেই হাত দিয়ে আর কোনও দিন সে কিছু করতে পারবে না। কিন্তু তাতে কী হয়েছে? হয়ত তার মনের জোর কিছুটা বেড়েছে। এই যে তামসিক কৃচ্ছ্রসাধনা, তাতে তার লাভ কী হল? আসল জায়গায় তার কিছুই হল না। সে তো উল্টোপথে চলছে। বেশির ভাগ মানুষই perverted understanding নিয়ে চলে। ধর্মজগতে এই অভ্যাস maximum মানুষের আছে। তন্ত্রের misuse করছে লাখ লাখ লোক। যোগের misuse করছে লাখ লাখ লোক।

দেখ যে জিনিসটা সত্য, তাকে mixture করা যায় না। আর যা mixture হয় তা কখনওই সত্য নয়। সত্যের কথা বলতে পারে ক'জন? তেমন সত্যবান পুরুষ কোথায়? ভোগের মধ্যে থেকে সত্যের কথা বলা যায় না। ভোগের গতি রহিত হলে তবে আসবে ভক্তি। অর্থাৎ ভোগ বন্ধ করলে আসবে ভক্তি। ভোগকে বন্ধ করতে হলে ভোগের মধ্যে সেই পরমকে বসাতে হবে। নিজেকে নিজে ভোগ করা যায় না। ভোগ করতে হলে নিজের থেকে আলাদা কোনও কিছুর দরকার হয়। সেখানেই নিজেকে বসাও। দেখ, 'এ' original কথা বলে যাচ্ছে only to remove your ignorance। তোমাদের জন্ম জন্মান্তরের যে অজ্ঞান সেই অজ্ঞানকে দূর করার জন্য this light is enough. This is the beacon-light. এই light দিয়েই অজ্ঞানকে তাড়াতে পারবে, নইলে পারবে না। তুমি জ্ঞানের বহু collection করতে পার, but this very knowledge is direct। এটা ধার করা, হাওলাতি করা জিনিস নয়। দীর্ঘকাল 'এই জীবন'-এর মধ্যে দিয়ে এই একই জিনিস প্রকাশ হয়েছে। তবু মানুষের মধ্যে জিজ্ঞাসা জাগেনি। 'এর' (নিজেকে নির্দেশ করে) শরীরের মেয়াদ ফুরাবার সময় হয়ে গিয়েছে। হয়ত 'এর' অবর্তমানে সব posthumous follower সাজবে, বড় বড় কথা দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে—আমি শ্রীশ্রীবাবাঠাকুরের সঙ্গ করেছি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

You are to enter within yourself, discover yourself by yourself and be ever established in that. সেখানে যে আমিকে খুঁজে পাবে সেই আমি-ই চিরকালের আমি। বাইরে থেকে তাকে দেখা যায় না। সেই আমি-র কোনও limitation নেই, সে কোনও condition নিয়ে চলে না। সেই আমি একেবারে direct।

১৩। ১২। ০২

৩৭৭

একজন 'এাকে' প্রশ্ন করেছিল যে, সে যদি কিছুদিন নিয়মনিষ্ঠা সহকারে সাধনভজন শাস্ত্রপাঠ করে তাহলে কী হবে? তাকে বলা হল—তাহলে তার সংস্কারের কিছুটা পরিবর্তন হবে ঠিকই, কিন্তু সেই ভাবে তাকে আরও কতগুলি জন্ম কাটাতে হবে। সত্যের কোনও প্রতিপক্ষ নেই। মিথ্যার প্রতিপক্ষ হল সত্যের আভাস। এই কথাগুলি কিন্তু শাস্ত্রে ঠিক এই ভাবে নেই। 'এ' শাস্ত্র পড়েনি। কিন্তু যারা শাস্ত্র পড়ে 'একে' challenge করতে এসেছিল তারা, কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। তাদের বলা হয়েছিল—তোমরা তো নিজেকেই পাঠ করনি, শাস্ত্র পড়ে কী লাভ হল? কোন যুগে কে কী বলে গিয়েছেন তা এই যুগে, এই পরিস্থিতিতে তোমার ক্ষেত্রে applicable কি না তা একবারও ভেবে দেখেছ? তোমার দেহ ও যোগ্যতা দিয়ে পারবে সত্য যুগের, ত্রেতা যুগের বা দ্বাপর যুগের সাধনাকে বর্তমানে এনে set করতে? চেষ্টা অনেকেই করেছে, কিন্তু দিনকয়েক পরে তুবড়িবাজির মতো শেষ হয়ে গিয়েছে। বেশ কিছু লোক তাদের পিছনে ছুটেছে, তারপর কোথায় সব চলে গিয়েছে, কিছুই হয়নি।

কেন না realization cannot be compromised with anything secondary. It must be more than original. কোনও যুগেই সমাজ original-কে নিতে পারেনি। Original-এর মধ্যে খাদ মিশিয়ে গ্রহণ করেছে। এই হল আমাদের intellectual সমাজের বিশেষত্ব। They cannot accept Reality as it is without any mixture. তাদের যে দোষ, তাদের যে misconception তা দিয়ে Reality-কে একটু অতিরঞ্জিত করে নেয়। তাদের misunderstanding দিয়ে জারিত করে তবে তারা ব্যবহার করে, otherwise not। Real quotation-গুলিকে বিকৃত করে তাদের সুবিধা মতো করে নেয়। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে এল।

১৯৩৩/৩৪ সাল হবে। তখন Calcutta University-তে B.Com পরীক্ষা চলছিল—সেই বাব একটি অঙ্ক এসেছিল। অঙ্কটি একটি প্রচলিত নিয়মে college-এর professor-রা করান। একজন student তার এক পরিচিত আত্মীয়ের বাড়িতে একজনের সঙ্গে meet করে। তিনি সেই student-টির সঙ্গে আলাপ করে তাকে একটি formula বলে দিলেন। তিনি ছাত্রটিকে আরও বললেন—এই formula কিন্তু কোনও text book-এ নেই। এবার সেই student পরীক্ষার hall-এ সেই formula প্রয়োগ করে তিনটি অঙ্কের answer করল।

Result বের হলে দেখা গেল examiner ছেলেটির অঙ্কগুলি কেটে দিয়েছেন, ফলে তার result ভাল হয়নি। ছেলেটি মনের দুঃখে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই খবর ছেলেটির আত্মীয়ের মাধ্যমে সেই learned person-এর কাছে পৌঁছায়। সব শুনে তিনি বললেন—মানুষ কারও উপকার করতে চাইলে তার একটি যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, অযোগ্যতা দিয়ে কারও উপকার করা যায় না।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি যথেষ্টই ব্যক্তিকেন্দ্রিক। তিনি তখন বলেছিলেন—শিক্ষিত সমাজ যা জানে তার বাইরেও যে জ্ঞান আছে তা তারা মানেন না। কিন্তু ব্যক্তিগত

ভাবে তাদের সঙ্গে meet করলে জানতে পারেন 'জ্ঞান' আছে। জ্ঞানের light আসে individual-এর কাছ থেকে। A learned man can make others learned.

পুরো ঘটনাটি বলতে অনেক সময় লাগবে বলে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে—যে examiner-এর কাছে এই খাতা পড়েছিল তিনি ঘটনাচক্রে South India-তে বেড়াতে যান। সেখানে তার সঙ্গে এই learned person-এর যোগাযোগ হয়। তার কাছে তিনি অঙ্কের কয়েকটি নূতন formula জানলেন। কথাপ্রসঙ্গে জ্ঞানী ব্যক্তিটি সেই professor-কে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি যা জান তার বাইরে যদি তোমার student-রা জানে, তুমি কী করবে? Professor কোনও জবাব দিতে পারলেন না। জ্ঞানী ব্যক্তিটি আরও বললেন—তোমার জীবনে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে কি? Professor চুপ করে রইলেন। তিনি তাকে ছেলেটির কথা মনে করিয়ে দিয়ে বললেন—তুমি তার correct তিনটি অঙ্ককে ভুল বলে কেটে দিয়েছ। এখন দেখলে এই formula দিয়ে অঙ্কটা হয় কি না!

সেই examiner কলকাতায় ফিরে এসে resignation দিয়ে মনের দুঃখে কাশী চলে গেলেন। সেখানে এক বেদান্তবাদী সাধুর সঙ্গে তিনি meet করেন। পরে তাঁর কাছেই দীক্ষা নিয়ে তিনি সাধু হয়ে যান। পরবর্তীকালে তিনি জানতে পারেন যে, এই বেদান্তবাদী সাধু triple M.A. এবং maths-এ master। তখন তিনি ভাবলেন, কী বিদ্যা শিখে প্রফেসারি করেছি! আমি তো কিছুই জানি না। কিছুই জানি না—এই বোধটা যখন তার মধ্যে confirmed হল তখন তার বেদান্ত study করার যোগ্যতা এল, তার আগে নয়।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—বেদান্ত পড়ে বেদান্তবাদী হওয়া যায় না। বেদান্ত ভিতর থেকে reveal করবে with the help of another Realizer। একজনকে মানুষ বানাতে মানুষেরই দরকার, বাঁদরের দরকার হয় না। পশু মানুষকে মানুষ বানাতে পারে না। কিন্তু সমাজে আমরা সব মানুষবেশধারী পশু। We are devoid of human nature. We have got sub-human nature in human form. কী শিক্ষা পেলে আমরা sub-human nature থেকে human nature-এ, সেখান থেকে super-human nature, তারপর divine nature-এ পৌঁছাব—আছে কি শিক্ষাবিভাগে এমন কোনও বিধান? একজন Realizer-এর কাছে from the lowest unit of Consciousness and Knowledge to the highest unit of Consciousness and Knowledge—সবটাই crystal clear। কারণ He is verily the personification of that Reality Itself. বাইরের থেকে তাঁর চেহারা তো মানুষেরই মতো। আবার যার ভিতরে পশুভাব খেলছে সেও তো বাইরে থেকে মানুষেরই মতো। সেও তো হীনতম কাজ করে pose করছে মানুষের বেশ ধরে। এই রকম অদ্ভুত জীবে ভরে আছে আমাদের সমাজ। এর মধ্যেই জাগবে মানবীয় চেতনা, তারপর অতিমানবীয় চেতনা, তারপর ঈশ্বরীয় ভাব। এগুলি কে কাকে শেখাবে? কতগুলি শ্লোক মুখস্থ করছে তত্ত্ব না-বুঝে, শাস্ত্র থেকে quote করছে তার তত্ত্ব না-

বুঝেই। সেই তত্ত্ব যে প্রত্যেক যুগে different shape নিয়ে appear করতে পারে সেটা তারা বোঝে না। প্রতি যুগে divine personage যখন আসেন, তিনি তাঁর স্বকীয়ভাব নিয়েই আসেন, কিন্তু গতানুগতিক সমাজ তো তাঁকে accept করতে পারে না। তাঁর দেহরক্ষা নিয়ে মাতামাতি করে—তারা নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করতে চায়। In order to establish himself in the name of great noble soul!

চার দিকে দেখা যায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের নামে কত রকম organization আছে। কিন্তু একটি organization থেকেও সেই calibre-এর ব্যক্তিত্ব বের হয় না। জাগতিক progress দিয়ে spiritual progress-কে মাপা যায় না কেন? জাগতিক ব্যাপারে সবটাই হল apparent nature, material/objective। এই objective knowledge থেকে কী করে subjective knowledge acquire করতে হয় সে ব্যাপারে ক'জন সচেতন? তারপর তো super-subjective, তারপর spiritual/divine, তার পরে transcendental। একজন transcendental knowledge-এর পুরুষকে below the standard থেকে মানুষ judge করে বসে। তাই দেখা যায় Divine Personage-দের জীবনে অদ্ভুত রকমের খেলা। তাঁদের জীবদ্দশায় তৎকালীন সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁদের accept করতে পারে না, তাঁদের defects খুঁজে বার করে। কী করে? তাদের conventional conception দিয়ে। কেউ বাদ যাননি। সেই সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, যিশু—কেউ বাদ যাননি। বুদ্ধদেবকেও অনেক পরীক্ষা দিতে হয়েছে। শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মাধবাচার্য, নিম্বার্ক আচার্যকেও পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। কবির অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে তবে সবার কাছে পরিচিত হয়েছেন। নানক, শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ কেউ বাদ যাননি। পরবর্তীকালে তাঁদের posthumous followers-রা বড় বড় কথা বলে prove করতে চেষ্টা করে যে, as if they are the authority।

প্রশান্ত মহাসাগর দু'টি হবে না। বিরাট এক মহানদী এই সাগরে গিয়ে মিশলে নদী তার পূর্ব পরিচিতি হারিয়ে সাগরের সঙ্গে মিলেমিশে এক হয়ে যাবে। A man when perfectly established in the Absolute Reality, He becomes fully unified and identified with the Reality, and then He is no more an individual, though He appears to be so. বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দৃষ্টিতে সবাই individual, কিন্তু এই বাহ্য ইন্দ্রিয়দৃষ্টির পশ্চাতে কী আছে তা যিনি জানেন তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রিয়বোধের ঊর্ধ্বে উঠেছেন। ইন্দ্রিয়দৃষ্টি দিয়ে বড়জোর একজন skilled man হতে পারে, তার চেয়ে উন্নত হলেন scholar, scholar-এর থেকে superior হলেন philosopher, philosopher-এর থেকে superior হলেন seer/sage, তার চেয়েও superior হলেন প্রজ্ঞানপুরুষ। তিনি seer নন, প্রজ্ঞানঘন। Seer হলেন witness and beyond the witness is the transcendental Being।

যখন becoming Being-এর সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল, তখন how can one, who is living in becoming can judge that blessed Realizer। কিন্তু

মানুষ প্রমাণ খোঁজে কী করে তাঁকে জানবে! বুদ্ধি নিজেকে বাদ দিয়ে কল্পিত অন্য কিছুর থেকে প্রমাণ খোঁজে, কিন্তু যিনি স্বয়ংপ্রমাণ, তাঁর প্রমাণ বুদ্ধি পাবে কোথায়? সত্য দ্বিতীয় কোনও সত্য দিয়ে তার প্রমাণ দেয় না। Self সব সময়ই স্বয়ংপ্রমাণ। আত্মাই হল সেই সত্তা যাঁর সত্তায় সবাই সত্তাবান—সবাইকে প্রকাশ করছে তাঁর প্রকাশধারা দিয়ে। তাঁর বাইরে কেউ নেই। কাজেই আত্মার বক্ষে আত্মা অতিরিক্ত দ্বিতীয় যা-কিছু সবই কল্পিত। তাই অনাত্মা হল কল্পিত।

'এ' 'জ্ঞান'-এর analysis করে পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে। জ্ঞানের দু'টি অংশ—জ্ঞ + অন্। জ্ঞ হল সত্তা, অন্ হল শক্তি, তার জ্যোতি। কাজেই সত্তা-শক্তি অভিন্ন তত্ত্ব। কিন্তু বর্তমান ধর্মজগতে সব পৃথক পৃথক রূপে গৃহীত হয়। তা না-হলে তো রাজত্ব করা যায় না, কর্তালি করা যায় না এবং বহু লোককে দীক্ষা দিয়ে গুরুগিরি করা যায় না। সত্যিকারের যিনি গুরু তিনি বলেন—তুমিই তোমার গুরু। Self is the only Guru of all. Self is Saccidananda, so each and every individual is none but that Saccidananda Itself. এরই নাম Science of Oneness, Knowledge of Oneness/Knowledge of Knowledge।

২০। ১২। ০২

৩৭৮

আজ সৎপ্রসঙ্গের মাঝে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—

আজ তোমাদের একটা মজার গল্প শোনাব। এই গল্পটির বিষয়বস্তু খুব রহস্যপূর্ণ, বুদ্ধি দিয়ে তার নাগাল পাবে না।

রাজরাজড়াদের দরবারে অনেক জ্ঞানীগুণী পণ্ডিত লোকের সমাবেশ হয়ে থাকে। রাজতন্ত্রের যুগে এ দেশে অনেক ছোট-বড় রাজ্য ও রাজা ছিলেন। পাঞ্জাবে অনেকগুলি ছোট-বড় রাজ্য (state) ছিল। সেগুলির মধ্যে একটি বিশেষ state-এ এক রাজা ছিলেন। তিনি ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজাবৎসল। রাজার অনেক গুণ থাকা সত্ত্বেও তার একটি দোষ ছিল। তা হল, রাজা দীর্ঘসূত্রী ও মিতব্যয়ী ছিলেন। রাজার চার রানি ছিল। এই চার রানির মধ্যে দু'জন রানির সন্তান ছিল না, আর দুই রানির মধ্যে এক রানির এক পুত্র ছিল ও আরেক রানির এক কন্যাসন্তান ছিল। এ ছাড়া রাজার বুদ্ধিদাতা এক সুমন্ত্রী ছিল। রাজার রাজদরবার কিছু জ্ঞানীগুণী আলোকিত করে রাখতেন। ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে বহু জ্ঞানীগুণী রাজার কাছে আসতেন। তাঁরা বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণের পরিচয় দিয়ে রাজার মনোরঞ্জন করার চেষ্টা করতেন এবং পরিশেষে উপযুক্ত পারিতোষিক নিয়ে বিদায় হতেন। এভাবে অনেক জ্ঞানীগুণী মাঝেমধ্যে রাজদরবারে এসে তাঁদের কলাকৌশল ক্রীড়া চাতুরি প্রদর্শন করতে আসতেন। রাজা তাঁদের গুণপনার প্রশংসা করতেন, যথার্থ মর্যাদা দিতেন এবং অর্থ সামগ্রী দান করে তাঁদের তুষ্ট করতেন। যথাকালে রাজপুত্র ও রাজকন্যা বড় হওয়াতে রাজা রাজপুত্রকে যুবরাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দেন এবং রাজকন্যাকে ভিন্ন রাজ্যের রাজপুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে দেন। ন্যায়পরায়ণ রাজার শাসনে প্রজারা সুখে ও

আনন্দেই দিন অতিবাহিত করছিল। কিন্তু হঠাৎ একদিন রাজা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত হন। এরপর যুবরাজ সিংহাসনে বসেন ও রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সুবুদ্ধি মন্ত্রী যুবরাজকে রাজ্য পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। মন্ত্রীর এখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। মন্ত্রী অতি বিচক্ষণ ও প্রজারঞ্জক বলে যুবরাজ তাকে কিছুতেই অবসর দিতে রাজি ছিলেন না। নূতন রাজার অভিজ্ঞতা কম ছিল, তার বুদ্ধিও তীক্ষ্ণ ও বিচক্ষণ ছিল না। যুবরাজের সৎ সাহসের অভাব ছিল এবং তিনি একটু স্বার্থপর ও কৃপণ স্বভাবেরও ছিলেন। অযথা অর্থব্যয় করতে তিনি দ্বিধা বোধ করতেন। তিনি জ্ঞানীগুণীদের শ্রদ্ধা করলেও তাঁদের জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করতে সংকোচ করতেন।

যুবরাজের পিতা অর্থাৎ রাজার অনেক সুনাম ছিল বলে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে বহু জ্ঞানীগুণীর প্রায়ই রাজ্যে আগমন হত। বৃদ্ধ রাজা তাঁদের সংবর্ধনা দিতেন, তাঁদের জ্ঞান ও গুণের মর্যাদা দিতেন এবং যোগ্যতা অনুসারে পারিতোষিক দ্বারা প্রীত রাখতেন। যুবরাজের রাজত্বকালেও ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য থেকে জ্ঞানীগুণীরা আসতেন, কিন্তু আগের মতো উপযুক্ত মর্যাদা ও অর্থ সামগ্রী লাভ করতেন না। মন্ত্রী যদিও যুবরাজকে এই বিষয়ে সুবুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু তাতেও যুবরাজের আচরণের কোনও পরিবর্তন হত না। এই ভাবেই দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল। একদিন হঠাৎ একজন গুণী ব্যক্তির আবির্ভাব হয় রাজ্যে। তিনি যুবরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মন্ত্রী যুবরাজের সঙ্গে গুণী ব্যক্তির সাক্ষাৎ করার ব্যবস্থা করেন। মন্ত্রী তাঁকে রাজার কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁর পরিচয় দিয়ে বলেন—মহারাজ, এই ব্যক্তি মহাগুণী। ইনি ভিন্ন রাজ্য থেকে এসেছেন আপনার দরবারে তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি ও গুণের প্রদর্শন করবেন বলে। প্রথমে রাজা মন্ত্রীর কাছে গুণী ব্যক্তির পরিচয় পেয়েও প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে ভেবে তাঁকে চলে যেতে বলেন। কিন্তু গুণী ব্যক্তি রাজাকে নানা ভাবে প্রশমিত করতে চেষ্টা করেন এবং তাঁর সমর্থন পাওয়ার জন্যও চেষ্টা করেন। রাজার অমত শুনে মন্ত্রী রাজাকে সচেতন করে বলেন—এই আগন্তুক গুণী বহু রাজ্যে তাঁর গুণ ও বিদ্যার পরিচয় দিয়ে প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছেন। সেই সমস্ত রাজ্যের প্রজারা তাঁর গুণপনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর সুখ্যাতি করেছে। আপনি যদি তাঁকে ফিরিয়ে দেন তবে আপনার রাজ্যের সুনাম নষ্ট হবে। আপনি আপনার স্বর্গীয় পিতার কথা স্মরণ করে এই গুণী ব্যক্তিকে তাঁর গুণ বা বিদ্যা প্রকাশের সুযোগ দিন। মন্ত্রীর বিশেষ অনুরোধে রাজা গুণী ব্যক্তিকে তাঁর গুণ বা বিদ্যা প্রদর্শন করার সুযোগ দেন।

গুণী প্রথমে চিত্তাকর্ষক কিছু বিদ্যার পরিচয় দিয়ে সবাইকে বিস্মিত করেন, নানা প্রকার অদ্ভুত যাদুখেলা দেখিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করে দেন। সর্বশেষে যে খেলাটি তিনি পরিবেষণ করেন তা তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ও অন্যতম খেলা ছিল। প্রথমে তিনি তাঁর ঝুলি থেকে একটি বিরাট মাপের দাবা খেলার board বার করেন। এই বিরাট আকারের board-টি দেখে রাজদরবারে উপস্থিত অনেকেই অবাক হয়ে যায়। তিনি board-টির ভাজ খুলে রাজসভার মেঝেতে পেতে দেন। রাজসভায় board-টি এমন

ভাবে তিনি পেতে দিলেন যাতে সর্বদিক থেকে সকলেই খেলা দেখতে পায়। Board-টির মধ্যে চৌষট্টিটা ঘর ছিল। খেলা শুরু করবার আগে গুণী যাদুকর রাজার কাছে নিবেদন করে বললেন—মহারাজ, আমি কোনও দক্ষিণা নেব না, কিন্তু যে খেলা আমি দেখাব তাতে কিন্তু আপনাকে চৌষট্টিটা ঘর গম দিয়ে ভর্তি করে দিতে হবে। নিয়মটা হল এক নম্বর ঘরে একটি গম, দুই নম্বর ঘরে তার দ্বিগুণ গম, তিন নম্বর ঘরে তার দ্বিগুণ গম, চার নম্বর ঘরে তার দ্বিগুণ গম—এই ভাবে প্রতি ঘরে পূর্ব ঘরে রাখা গমের দ্বিগুণ পরিমাণ গম দিয়ে পরবর্তী ঘরগুলি পূরণ করতে হবে। সমস্ত ঘর ভর্তি হয়ে গেলে সেই গমগুলি আমি নিয়ে যাব এবং এতে কিন্তু আপনি কোনও আপত্তি করতে পারবেন না।

যাদুকরের কথা শুনে রাজা, মন্ত্রী ও অন্যান্য রাজকর্মচারীরা ভাবলেন, এতে আর কত গম লাগবে! তাঁরা বিনা দ্বিধায় যাদুকরকে খেলা দেখাবার অনুমতি দিয়ে দিলেন। তাঁরা সকলেই ভাবলেন, এই খেলার মধ্যে এমন কী বিশেষত্ব বা চমৎকারিতা আছে যে এই খেলা যাদুকরের শ্রেষ্ঠ ও অন্যতম খেলা! কিছুক্ষণ পরে খেলা শুরু হয়ে গেল। রাজ্যে প্রচুর গমের চাষ হয় এবং প্রজারা সকলেই সচ্ছল জীবনযাপন করত। এই প্রসঙ্গে বিশেষ বক্তব্য হল যে, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যের রাজাদের শাসনব্যবস্থা ভিন্ন প্রকারের এবং প্রত্যেকেই স্বাধীন স্বতন্ত্র বলে তাঁদের প্রত্যেকেরই বংশমর্যাদা ও রাজ্যের গৌরব রক্ষার জন্য সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু কোনও কোনও বছর প্রাকৃতিক বিপর্যয় অর্থাৎ অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কারণে রাজ্যে ফসল সমান ভাবে হত না। কোনও কোনও রাজ্যে এই খাদ্যশস্যের অভাব তীব্র ভাবে পরিলক্ষিত হত। তখন প্রজাদের খুবই কষ্ট হত। তাদের মধ্যে অনেকেই খাদ্যের অভাবে মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে বাধ্য হত। এরকম একটি রাজ্যের বাসিন্দা ছিলেন সেই গুণী যাদুকর। সেই বছর ফসল খুব খারাপ হওয়াতে তাঁর প্রতিবেশিদের অনেককেই অন্ন সংগ্রহের জন্য ভিন্ন রাজ্যে গিয়ে আহার সংগ্রহ করে আনতে হয়। অবশ্য সব বছর এরকম হত না। সেই বছর ভিন্ন রাজ্যের থেকে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য এই গুণী যাদুকরকেও ভিন্ন রাজ্যে যেতে হয়। সেই গুণী যাদুকর খুব বুদ্ধিমান ও চালাক ছিলেন বলে বুদ্ধির কৌশলে কী করে ভিন্ন রাজ্য থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে এনেছিলেন তারই পরিচয় এই খেলাটির মধ্যে নিহিত আছে।

খেলার নিয়মানুযায়ী রাজসভায় রাজার আদেশে প্রচুর পরিমাণ গম রাখা হয়। যাদুকরের কথা অনুযায়ী রাজার কর্মচারীরা board-এর প্রতি ঘরে পূর্ব ঘরে রাখা গমের দ্বিগুণ পরিমাণ গম দিয়ে ঘরগুলি পূরণ করতে শুরু করে। প্রথম প্রথম খুব অল্প পরিমাণ গম দিয়ে ঘরগুলি অর্থাৎ প্রথম ঘরে ১টি গম, দ্বিতীয় ঘরে প্রথম ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২টি গম; তৃতীয় ঘরে পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪টি গম; চতুর্থ ঘরে তার পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮টি গম; পঞ্চম ঘরে তার পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৬টি গম; ছয় নম্বর ঘরে তার পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩২টি গম; সাত নম্বর ঘরে পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬৪টি গম; আট নম্বর ঘরে তার পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১২৮টি গম; নয় নম্বর ঘরে তার পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৫৬টি

গম; দশ নম্বর ঘরে তার পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫১২টি গম; এগারো নম্বর ঘরে তার পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০২৪টি গম; বারো নম্বর ঘরে তাঁর পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০৪৮টি গম; তেরো নম্বর ঘরে তার পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০৯৬টি গম; চৌদ্দ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮১৯২টি গম; পনেরো নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৬৩৮৪টি গম; ষোলো নম্বর ঘরে তার পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩২৭৬৮টি গম; সতেরো নম্বর ঘরে তার পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬৫৫৩৬টি গম; আঠারো নম্বর ঘবে আগের ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৩১০৭২টি গম; উনিশ নম্বর ঘরে তার আগের ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৬২১৪৪টি গম; কুড়ি নম্বর ঘরে তার পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫২৪২৮৮টি গম; একুশ নম্বর ঘরে তার পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০৪৮৫৭৬টি গম; বাইশ নম্বর ঘরে একুশ নম্বর ঘরে রাখা গমের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২০৯৭,১৫২টি গম রাখা হয়; তেইশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪১৯৪৩০৪টি গম রাখা হয়; চব্বিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮৩৮৮৬০৮টি গম রাখা হয়; পঁচিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৬৭৭৭২১৬ সংখ্যক গম রাখা হয়; ছাব্বিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৩৫৫৪৪৩২ সংখ্যক গম রাখা হয়, সাতাশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬৭১০৮৮৬৪টি গম রাখা হয়, আঠাশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৩৪২১৭৭২৮ সংখ্যক গম রাখা হয়, উনত্রিশ নম্বর ঘরে আগের ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৬৮৪৩৫৪৫৬ সংখ্যক গম রাখা হয়, তিরিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫৩৬৮৭০৯১২ পরিমাণ গম রাখা হয়, একত্রিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০৭৩৭৪১৮২৪ গম রাখা হয়, বত্রিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২১৪৭৪৮৩৬৪৮ সংখ্যক গম রাখা হয়।

এই ভাবে প্রতি ঘরে পূর্ব ঘরে রাখা গমের দ্বিগুণ গম যেভাবে বাড়তে থাকে তা দেখে রাজসভায় অনেকেরই ভাবনা বেড়ে যায়। কারণ যে পরিমাণ গম রাজসভাতে আনা হয়েছিল তা নিঃশেষ হয়ে যায়। বস্তা বস্তা আরও গম আনার জন্য রাজা আদেশ করেন। রাজকর্মচারীরা সেই পরিমাণ গম রাজসভাতে নিয়ে আসে। রাজসভায় কিছু বিদ্বান বুদ্ধিমান কর্মচারী ও পরিষদ ছিলেন। তাঁরা একটু চিন্তিত হয়ে পড়েন। খেলার প্রথমে তাঁরা যা অনুমান করতে পারেননি খেলার মধ্য পর্বে এসে তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। কিন্তু খেলার মধ্যে এমন একটা মাদকতা ছিল, এমন একটা ঔৎসুক্য ছিল যা উত্তরোত্তর সবার মধ্যে বাড়তেই থাকে। কোথায় গিয়ে খেলাটি শেষ হবে তা অনুমান করতে না-পারলেও তারা কিছুটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন। এই পর্যন্ত যে পরিমাণ গম বত্রিশটি ঘরে জমা হয়েছিল তা একত্র করে বস্তায় পুরে যাদুকর তাঁর লোকেদের নিয়ে যেতে বলেন। এগুলো তাঁর প্রাপ্য, তাঁর অর্জিত সম্পদ।

এর পর আবার নূতন উদ্যমে খেলা শুরু হয়। রাজসভায় প্রচুর লোকের সমাবেশ হয়েছে এই অদ্ভুত খেলা দেখার জন্য। এবার তেত্রিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪২৯৪৯৬৭২৯৬ সংখ্যক গম রাখা হয়; চৌত্রিশ নম্বর ঘরে তার আগের ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮৫৮৯৯৩৪৫৯২ সংখ্যক গম রাখা হয়; পঁয়ত্রিশ নম্বর ঘরে তার

পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৭১৭৯৮৬৯১৮৪ পরিমাণ গম রাখা হয়; ছত্রিশ নম্বর ঘরে তার আগের ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৪৩৫৯৭৩৮৩৬৮ সংখ্যক গম রাখা হয়; সাঁইত্রিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৬৮৭১৯৪৭৬৭৩৬ সংখ্যক গম রাখা হয়; আটত্রিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৩৭৪৩৮৯৫৩৪৭২ পরিমাণ গম রাখা হয়। উনচল্লিশ নম্বর ঘরে তার পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৭৪৮৭৭৯০৬৯৪৪ সংখ্যক গম রাখা হয়; চল্লিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫৪৯৭৫৫৮১৩৮৮৮ গম রাখা হয়, একচল্লিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১০৯৯৫১১৬২৭৭৭৬ সংখ্যক গম রাখা হয়, বিয়াল্লিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২১৯৯০২৩২৫৫৫৫২ সংখ্যক গম রাখা হয়; তেতাল্লিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৩৯৮০৪৬৫১১১০৪ পরিমাণ গম রাখা হয়; চুয়াল্লিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৮৭৯৬০৯৩০২২২০৮ সংখ্যক গম রাখা হয়। এই পর্যন্ত খেলা দেখে অনেকেই ভীত হয়ে ভাবল, এখনও তো কুড়ি ঘর বাকি! প্রতি পরবর্তী ঘরে যে পরিমাণ গম বেড়ে যাচ্ছে তাতে সভাপরিষদ শুধু নন, রাজা ও মন্ত্রীও চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা ভাবলেন, গমের বদলে যদি যাদুকর টাকা চেয়ে বসতেন তবে তো রাজকোষ শূন্য হয়ে যেত এতক্ষণে! এ পর্যন্ত গমের পরিমাণ ১৩টি সংখ্যার আকারে পৌঁছায়। দর্শকদের মধ্যে অনেকের মনেই খেলাটি বন্ধ করে দেওয়ার ইচ্ছা জাগলেও তা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করতে পারল না, আবার অনেকের মধ্যে উদ্যম উৎসাহ বেড়েই চলল এই অদ্ভুত খেলার পরিণাম দেখবার জন্য।

পঁয়তাল্লিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ গম বিশেষ ভাবে গুনে রাখা হয়। তার সংখ্যা হল ১৭৫৯২১৮৬০৪৪৪১৬। গমের মাত্রা বাড়তে দেখে যারা গম জোগান দিচ্ছিল তারা হিসাব করে বিশেষ ভাবে গুনে প্রতি ঘরে গম রাখতে লাগল। ছেচল্লিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ গম অর্থাৎ ৩৫১৮৪৩৭২০৮৮৮৩২ সংখ্যক গম রাখা হয়; সাতচল্লিশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৭০৩৬৮৭৪৪০৭৭৬৬৪ সংখ্যক গম রাখা হয়; আটচল্লিশ নম্বর ঘরে আগের ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৪০৭৩৭৪৮৮১৫৫৩২৮ সংখ্যক গম রাখা হয়; উনপঞ্চাশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৮১৪৭৪৯৭৬৩১০৬৫৬ সংখ্যক গম রাখা হয়; পঞ্চাশ নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫৬২৯৪৯৯৫২৬২১৩১২ সংখ্যক গম রাখা হয়। এই পর্যন্ত যত গম আনা হয়েছিল সব শেষ হয়ে গেল, আর মাত্র সামান্য পরিমাণ গম রাজসভায় ছিল। রাজভাণ্ডারের গম নিঃশেষ হওয়ার ফলে রাজা তার পার্শ্ববর্তী মিত্র রাজ্যের থেকে গম চেয়ে পাঠালেন। এই পর্যন্ত খেলা দেখে কয়েকজন দর্শক ভয়ে রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যায়। তাদের মনে ভয় ঢোকে যে, যাদুকর রাজ্যের সমস্ত গম নিয়ে চলে যাবেন।

এবার নূতন করে বেশ কিছু গম পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে আনা হয়। রাজকর্মচারীরা গমের বস্তা খুলে একান্ন নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ গম গুনে অর্থাৎ ১১২৫৮৯৯৯০৫২৪২৬২৪ সংখ্যক গম রাখা হয়; বাহান্ন নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২২৫১৭৯৯৮১০৪৮৫২৪৮ গম রাখা হয়, তিপ্পান্ন নম্বর ঘরে পূর্ব

ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৫০৩৫৯৫৬২০৯৭০৪৯৬ গম গুনে রাখা হয়। যারা গম গুনে রাখছিল তারা পূর্বাপেক্ষা অধিক সচেতন ও মনোযোগ সহকারে গম গুনে পরবর্তী ঘরগুলি পূরণ করছিল। তাদের গম গোনার কাজে সাহায্য করার জন্য আরও কয়েকজন যোগ্য কর্মচারী এল। চুয়ান্ন নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৯০০৭১৯৯২৫৪৭৪০৯৯২ সংখ্যক গম রাখা হয়। এবার মন্ত্রীর মনেও ভয় ঢুকে গেল। তিনি বুঝতে পারলেন যে, রাজ্যের গম তো গেলই, কিন্তু ধার করা গম শেষ হয়ে গেলে কী করা যাবে! এই দুশ্চিন্তা মন্ত্রীকে ভাবিয়ে তুলল।

পঞ্চান্ন নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৮০১৪৩৮২৪৮৩৮৮১৯৮৪ সংখ্যক গম রাখা হয়; ছাপ্পান্ন নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৩৬০২৮৭৯৬৭৬৭৬৩৯৬৮ সংখ্যক গম গুনে রাখা হয়। এ পর্যন্ত ঘরে জমা গম বস্তা ভর্তি করে যাদুকরের লোকেরা নিয়ে গেল। দর্শকরা অবাক হয়ে শুধু খেলার পরিণাম দেখার অপেক্ষায় বসে রইল। সাতান্ন নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৭২০৫৭৫২৯৯৩৫৫২৭৯৩৬ সংখ্যক গম রাখা হয়; আটান্ন নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১৪৪১১৫০৫৯৮৭১০৫৫৮৭২ গম রাখা হয়; উনষাট নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৮৮২৩০১১৯৭৪২১১১৭৪৪ গম রাখা হয়; ষাট নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৫৭৬৪৬০২৩৯৪৮৪২২৩৪৮৮ পরিমাণ গম রাখা হয়; একষট্টি নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ১১৫২৯২০৪৭৮৯৬৮৪৪৬৯৭৬ সংখ্যক গম রাখা হয়; বাষট্টি নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ২৩০৫৮৪০৯৫৭৯৩৬৮৯৩৯৫২ গম রাখা হয়; তেষট্টি নম্বর ঘরে পূর্ব ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪৬১১৬৮১৯১৫৮৭৩৭৮৭৯০৪ সংখ্যক গম রাখা হয়; চৌষট্টি নম্বর ঘরে পূর্ববর্তী ঘরের দ্বিগুণ অর্থাৎ ৯২২৩৩৬৩৮৩১৭৪৭৫৭৫৮০৮ পরিমাণ গম রাখা হয়।

এই ভাবে সমস্ত গম যাদুকর বস্তা ভর্তি করে নিয়ে গেলেন। এদিকে রাজভাণ্ডার শূন্য, পার্শ্ববর্তী রাজ্য হতে যে গম আনা হয়েছিল সেই গমও সব শেষ। এখন রাজ্যের মান রক্ষার্থে রাজা ও মন্ত্রী ভাবনায় পড়ে গেলেন। তিনি পার্ষদদের জিজ্ঞাসা করলেন—এমত অবস্থায় কী করা উচিৎ? চতুর যাদুকর এমন সুকৌশলে এই রাজ্যের সমস্ত গম সবার সামনে খেলার ছলে সংগ্রহ করে নিয়ে চলে গেল রাজ্যকে ফতুর করে! দেহের বলের থেকে বুদ্ধির বল যে শ্রেষ্ঠ তা এই খেলাতে সর্বসমক্ষে প্রমাণিত হল। রাজা ও মন্ত্রী পরামর্শ করে যাদুকরকে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে কিছু গম রেখে দিয়ে যেতে বললেন। গুণী যাদুকর রাজ্যের অবস্থা এবং রাজা ও মন্ত্রীর কথা ভেবে উপযুক্ত অর্থের বিনিময়ে কিছু গম রেখে সসম্মানে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন। এভাবে এই যাত্রায় তিনি তাঁর রাজ্যবাসীর খাদ্যের অভাব মোটামুটি পূরণ করলেন কেবলমাত্র বুদ্ধির কৌশলে, পররাজ্য আক্রমণ না-করে। তাঁর বুদ্ধি সত্ত্বগুণী বুদ্ধি ছিল বলে তিনি এই ভাবে শক্তিশালী অপর পক্ষকে পরাজিত করে সগৌরবে সসম্মানে নিজ পরিবার ও নিজ রাজ্যের খাদ্য সংকটের সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিলেন। গল্পটির বিষয়বস্তু শিক্ষিত সমাজকে বিশেষ ভাবে প্রবুদ্ধ করবে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—তোমরা গল্পটির বিষয়বস্তু নিয়ে ভেবে দেখ। সবাই অবশ্য ভাববে না, যারা উৎসুক তারাই একমাত্র ভাববে। গল্পের মধ্যে বুদ্ধিবিজ্ঞানের উৎকর্ষ-অপকর্ষের প্রসঙ্গকে অতীব বিজ্ঞানসম্মত ও যুক্তিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। গল্পটির মধ্যে কেবল বাস্তবতার কথাই নেই, আধ্যাত্মিকতার নিগূঢ় রহস্য প্রচ্ছন্নভাবে আছে। সূক্ষ্ম সংযত মার্জিত বোধের দৃষ্টিতে তা ধরা পড়বে, সাধারণ বুদ্ধির কাছে তা দুর্বোধ্য।

গল্পটি বলতে গিয়ে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর প্রতি ঘরে যে পরিমাণ গম রাখা হয়েছে তার উল্লেখ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য প্রতি ঘরের গমের সংখ্যাকে বিশেষ ভাবে হিসাব করে রাখতে বলেছেন। তাতে বক্তব্যের ভাষায় কিছু পুনরাবৃত্তি মনে হতে পারে কিন্তু খেলাটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও গুরুত্বকে যথার্থ ভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রতি ঘরের পূর্বাপর গম সংখ্যাকে যথার্থ ভাবে উল্লেখ করা একান্ত প্রয়োজন মনে করে সেই ভাবেই তা বলা হয়েছে। সুকৌশলে কর্ম সম্পন্ন করাই হল যোগযুক্তের লক্ষণ। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অস্থির, চঞ্চল ও বহুমুখী বলে তার দ্বারা কৃত কর্মের ফল সুন্দর ও পূর্ণ হয় না। তামসিক ও রাজসিক বুদ্ধির কোনও কর্মই সিদ্ধপ্রদ নয়, তা বিকারী ও পরিণামী। কিন্তু সাত্ত্বিক বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তা যে কাজই করে তা পূর্ণাঙ্গ ও সিদ্ধপ্রদ হয়। আলোচ্য গল্পটি নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরই দৃষ্টান্ত ও পরিচয়। এইরূপ বুদ্ধির অধিকারী নিষ্ঠা, ভক্তি, শ্রদ্ধার মাধ্যমে আপন কার্য সম্পন্ন করে কৃতকার্য ও সফল হয়। তা লক্ষণীয় ও বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য।

২৩। ১২। ০২

৩৭৯

গল্প হল জীবনের আলেখ্য। গল্পের বিষয়বস্তু জীবনের সঙ্গে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো যুক্ত থাকে। গল্পের অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুর গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর অন্তর্বোধের সত্য পরিচয় যে ভাবে অনুভূত হয় সেই প্রসঙ্গে একটি তত্ত্বভিত্তিক গল্প/কাহিনি বলছি শোন। গল্পটির গুরুত্ব আত্মবোধের প্রতিপাদ্য বিষয়।

আমরা অনেকেই ছুটি কাটাতে ভাল ভাল জায়গায় বেড়াতে যাই। বন্ধুবান্ধব মিলে টাকাপয়সা সাথে নিয়ে অনেকেই এরকম বেড়াতে যায়। এরকম একটি team বেশ ভাল টাকাপয়সা সংগ্রহ করে বেড়াতে গিয়েছিল। প্রত্যেকেই young man, ভাল চাকরি করে। Juvenile spirit তো অদ্ভুত, তারা কারওকেই পরোয়া করে না। সারা জগতে সব জায়গাতেই তাই। তারা সকলে মিলে কাশ্মীরে গেল। কাশ্মীর খুব সুন্দর জায়গা, enjoyable। সেখানে গিয়ে তারা প্রাকৃতিক শোভা enjoy করছে। রাতে হোটেলে ভাল-মন্দ খাওয়ার পর তারা drink করে শুয়ে পড়ে। তাদের মধ্যে একজন (suppose 'X' তার নাম, অন্য কোনও নাম উল্লেখ করা হল না কারণ তাতে অনেকেরই আপত্তি থাকতে পারে) ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নের মধ্যে দেখল যে, রাস্তায় চলতে চলতে তার পকেটমার হয়ে গিয়েছে। বাড়িতে ফিরে এসে সে দেখল দরজায় তালা দেওয়া, তার স্ত্রী বাড়িতে নেই, বাচ্চারাও অন্য কোথাও বেড়াতে

গিয়েছে। বাড়ির অন্যান্য লোকজনকে তাদের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে তারা কেউ কিছু বলতে পারল না। লোকটি মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। সে পথে পথে উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে লাগল। তার পকেটে একটি পয়সাও ছিল না। পথ চলতে চলতে লোকটি রাস্তাই হারিয়ে ফেলল। এভাবে দু'/তিন দিন অভুক্ত অবস্থায় থেকে লোকটি শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়ল। ঘুরতে ঘুরতে সে বহুদূরে এক শহরতলীতে এসে পৌঁছালো। রাস্তায় হঠাৎ তার সঙ্গে এক college friend-এর দেখা হয়। বহুদিন পর দুই বন্ধুর দেখা হওয়াতে পরস্পর পরস্পরের খোঁজখবর নিল। বন্ধুটি তার অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করল—আরে এ কী চেহারা করেছিস! তোর কী হয়েছে? লোকটি বলল—আর বলিস না! অনেক ঘটনা ঘটে গিয়েছে, সে অনেক ব্যাপার! তার কথা শুনে বন্ধুটি বলল—আচ্ছা সে সব না-হয় পরে বলবি, এখন তুই আমার সঙ্গে চল! পথে চলতে চলতে বন্ধুকে আরও বলল যে, সে চার/পাঁচ দিন কিছুই খায়নি। এই কথা শুনে বন্ধু বলল—সে কী রে! লোকটি সুখী প্রকৃতির ছিল এবং ভাল-মন্দ খেতে ভালবাসত। বাড়ি পৌঁছে বন্ধুটি তার স্ত্রীয়ের কাছে লোকটির পরিচয় দিয়ে বলল—এ আমার পুরোনো বন্ধু। আমরা একসঙ্গে পড়াশুনা করেছি। ষোলো বছর পর ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। তারপর সে তার বন্ধুকে বলল—তুই আগে বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে জামাকাপড় বদলে আয়। তারপর স্ত্রীকে বলল—তাড়াতাড়ি ওকে খাবার দাও। খাওয়াদাওয়া শেষ হতে বন্ধুটি তাকে বলল—তুই শ্রান্তক্লান্ত, আগে একটু বিশ্রাম করে নে, পরে না-হয় তোর সঙ্গে কথা হবে। তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমের মধ্যে লোকটি আরেকটি স্বপ্ন দেখল। সে স্বপ্নের মধ্যে দেখল যে, সে পরীক্ষার হলে বসে পরীক্ষা দিচ্ছে। সব প্রশ্নের উত্তর সে ঠিক মতো দিতে পারছে না, কিছু পারছে, কিছু পারছে না। তখন সে নিরুপায় হয়ে পাশের ছেলেদের প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করে বলছে—ভাই এটা একটু বলে দে না! এই ভাবে পাশের ছেলেদের বিরক্ত করার জন্য invigilator তাকে তিন বার ধমক দেন। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে পাশের কয়েকটি ছেলের থেকে চোথা (note) কোনও রকমে জোগাড় করে লিখতে শুরু করে। এদিকে পরীক্ষার সময় শেষ হয়ে যাওয়াতে invigilator তার থেকে উত্তরপত্র কেড়ে নিতে আসেন। সে তো কিছুতেই খাতা দিতে রাজি ছিল না, কারণ তখনও তার লেখা শেষ হয়নি। দু'পক্ষের মধ্যে খাতা টানাটানি হওয়াতে খাতা ছিঁড়ে যায়। খাতা ছিঁড়ে যাওয়াতে সে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ে, কারণ ছেঁড়া খাতা তো invigilator জমা নেবেন না। এর মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র খাতা জমা দিয়ে চলে গিয়েছে। একটি ছেলে তখনও পরীক্ষার হলে উপস্থিত ছিল। সে এই ছেলেটির কাছে এসে তাকে বলল—ভাই কী হয়েছে তোর? আমিও খুব খারাপ পরীক্ষা দিয়েছি। বাড়িতে গিয়ে আজ আর কারওকে মুখ দেখাতে পারব না। চল তুই আর আমি অন্য কোথাও চলে যাই। আমার কাছে কিছু টাকাপয়সা আছে, তাতে বেশ ক'দিন চলে যাবে। তারা দু'জনে পরামর্শ করে বেরিয়ে পড়ল। তারপর তারা একটি হোটেলে ওঠে। সেখানে তারা খাওয়াদাওয়া সেরে মনের দুঃখে ঘুমিয়ে পড়ে।

ঘুমের মধ্যে লোকটি আরেকটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে সে দেখল যে, চাকরির জন্য সে এক জায়গায় interview দিতে গিয়েছে। Interview হয়ে যাওয়ার পরে সে চাকরিটা পেয়ে গেল। Interview দিতে অনেক ভাল ভাল candidate এসেছিল। সে ভেবে অবাক হয়ে গেল যে, এত যোগ্য candidate-দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সে কী করে চাকরিটা পেয়ে গেল! চাকরির সুবাদে সে থাকবার জন্য একটা flat-ও পেল। সেই office-এর officer-এর এই নূতন ছেলেটির উপর নজর পড়ল। এই ছেলেটির সঙ্গে তিনি আলাপ করেন এবং কিছুদিন পরে ছেলেটিকে তার বাড়িতে dinner-এর জন্য invite করেন। ছেলেটি প্রথমে কিছুতেই রাজি ছিল না, কিন্তু officer-এর অনুরোধে তার বাড়িতে যেতে বাধ্য হয়। Officer তাকে আরও বলল যে, আমি young man-দের বড় ভালবাসি, কাজেই তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে। লোকটি তার boss-এর বাড়িতে গেলে তার একমাত্র কন্যার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। ক্রমে তাদের মধ্যে ভাব হয় এবং দু'জনের বিয়েও হয়ে যায়। একদিন তারা দু'জনে cinema দেখতে যায় এবং ফেরার সময় হোটেলে খাওয়াদাওয়া সেরে বাড়িতে ফিরে আসে।

তারা বাড়িতে ফিরে এসে শুয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়তে লোকটি আরেকটি স্বপ্ন দেখে। লোকটি স্বপ্নের মধ্যে দেখতে পেল যে, কতগুলি লোক এসে তাদের বাড়ির সামনে হামলা করছে। এই বাদবিতণ্ডার মধ্যে পড়ে লোকগুলি তাকে বেদম প্রহার করে এবং তার ফলে সে অজ্ঞান হয়ে যায়।

এই অজ্ঞান অবস্থায় লোকটি আরেকটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখে যে, তাকে hospitalize করা হয়েছে। সে গুরুতরভাবে আহত হবার ফলে সেখানে ডাক্তাররা তার একটি পা ও একটি হাত কেটে বাদ দেয়। এই ভাবে তার চিকিৎসা চলতে লাগল। হাত-পা হারানোর ফলে লোকটি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে। Hospital থেকে discharge হবার পড়ে সে উদ্ভ্রান্তের মতো পথ চলতে লাগল। এমন সময় এক ধর্মপরায়ণ সহৃদয় ব্যক্তির তার উপর নজর পড়ে। লোকটির করুণ অবস্থা দেখে সহানুভূতি জানিয়ে তাকে সে বলে যে, তোমার তো সত্যিই খুব কষ্ট! একটা হাত ও পা নেই! কয়েক বছর আগে আমার একমাত্র পড়ুয়া ছেলে অল্প বয়সে kidnapped হয়ে যায়। আমি এখন নিঃসন্তান। আমার প্রচুর টাকাপয়সা আছে। তুমি চল আমার বাড়িতে গিয়ে থাকবে। সেখানে তোমার কোনওরকম অসুবিধা হবে না।

সেই ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে লোকটি আনন্দেই আছে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই তার খুব যত্ন নেয় যাতে তাব কোনওরকম অসুবিধা না-হয়। একদিন খাওয়াদাওয়া সেরে সে ঘুমিয়ে পড়ে। ঘুমের মধ্যে সে আরেকটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে দেখে যে, সে খুব গরিব হয়ে গিয়েছে। এমনই দুরবস্থা যে অন্নই জোটে না। একদিন সে দেখতে পেল কোনও এক বাড়িতে উৎসব হচ্ছে। খুব ধুমধাম করে উৎসব হচ্ছে, চারদিকে আলোর রোশনাই, বাজনা বাজছে, বহু লোকজনের সমাগম হচ্ছে। এত কিছু দেখে লোকটির মনের মধ্যে নেমন্তন্ন খাওয়ার সাধ জাগে। মনে মনে সে ভাবল, বহুদিন ভালমন্দ খাবার কিছুই তো খাই না, একবার এখানে গিয়েই দেখি! উৎসববাড়িতে লোকটি যেতে সেখানকার লোকেরা তাকে অপরিচিত মনে করে তার

পরিচয় জানতে চায়। তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগল যে, এই লোকটি কে? এ কোথা থেকে এসেছে? তাকে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে সে একজনের নাম উল্লেখ করে নিজের পরিচয় দেয়। তারা পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে বলল—আচ্ছা, ঠিক আছে! তারপর লোকটি নেমন্তন্ন খেয়ে সেই উৎসববাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে।

রাস্তায় চলতে চলতে লোকটির খুব ঘুম পেয়ে যায় এবং শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় উপায়ান্তর না-পেয়ে সামনের একটি গাছতলায় বসে ঘুমিয়ে পড়ে। সেই সময় সে ঘুমের মধ্যে আরেকটি স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নের মধ্যে সে দেখে যে, সে এক রাস্তা দিয়ে চলেছে। রাস্তায় কিছু লোক যেন কারওকে খুঁজছে। এই লোকগুলি যখন তাকে সামনে দেখতে পায় তখন তারা চিৎকার করে বলে ওঠে—আরে, এই লোকটিকে দিয়েই কাজ হবে! ওকে ধর! লোকটি প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি, সে তাদের আচরণে অবাক হয়ে যায়। লোকগুলি এই লোকটিকে দেখে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে থাকে—এ সুলক্ষণ! একেই আমরা রাজা করব। এই বলতে বলতে তারা লোকটিকে তাদের রাজ্যে ধরে নিয়ে যায়। এই লোকগুলি আসলে এক বন্য জাতি। এদের leader বা রাজা গত হয়েছে। তাদের একজন সুলক্ষণ ব্যক্তির প্রয়োজন যে তাদের রাজা হতে পারে। লোকটি বাধ্য হয়ে তাদের রাজা হয় এবং বেশ কিছুদিন নিশ্চিন্তে সেখানে কাটিয়ে দেয়।

লোকটি অর্থাৎ রাজা একদিন ঘুমের মধ্যে আরেকটি স্বপ্ন দেখে। রাজাদের সাধারণত মৃগয়া করার অভ্যাস থাকে। লোকটি স্বপ্নের মধ্যে দেখল যে, সে মৃগয়া করতে গিয়েছে। বনের মধ্যে মৃগয়া করতে গিয়ে সে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। পাঁচ/ছয় দিন অভুক্ত অবস্থায় কাটিয়ে সে শ্রান্তক্লান্ত হয়ে পড়ে। তার নড়াচড়া করার শক্তি পর্যন্ত ছিল না। এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে কথা বলার শক্তিও ছিল না। গাছের তলায় লোকটি আশ্রয় নেয়। এমন সময় এক সাধু তাকে দেখতে পেয়ে মনে মনে ভাবলেন, একে দিয়ে কাজ হবে! অর্থাৎ লোকটিকে তাঁর শিষ্য বানাবার কথা ভাবলেন। সাধু লোকটির কাছে এসে বললেন—তুই তো অনেক কষ্ট পেয়েছিস! তোর খিদে পেয়েছে? তারপর তাঁর ঝোলা থেকে ফল মিষ্টি বার করে লোকটিকে দিয়ে বললেন—এগুলি তুই খেয়ে নে। খাওয়াদাওয়া সেরে স্নান করে আয়। তিনি লোকটিকে কাছেই একটি ঝরনার জলে স্নান করতে আদেশ দিলেন। লোকটি স্নান সেরে আসতে তাকে তিনি বললেন—আজ আমি তোকে মন্ত্র দীক্ষা দেব। এই মন্ত্র নিয়ে তুই এখানে বসে সাধন কর, যথাসময়ে আমি তোর কাছে এসে উপস্থিত হব। লোকটি নিবিষ্ট চিত্তে জপ করতে থাকে, কিন্তু সেই সাধু আর আসেন না। একদিন লোকটি মনে মনে ভাবল, আমি সাধনভজন করি! অনেকেই তো আমাকে ফল মিষ্টি দিয়ে যায়! রোজগারটা তাহলে মন্দ নয়, ভালই হয় দেখছি! তাহলে আমি নিশ্চয়ই সাধু হয়ে গিয়েছি! এখন থেকে তাহলে আমি দীক্ষা দেব। কিছুদিন পরে লোকটি দীক্ষা দিতে আরম্ভ করে এবং প্রচুর ভক্তশিষ্য হয় তার।

একদিন দীক্ষা দেবার আগে লোকটি ঘুমিয়ে পড়ে। সে স্বপ্নের মধ্যে দেখে যে, বহু লোক সমাগম হয়েছে। আর গুরু সেজে সে ভগবৎ প্রসঙ্গ করছে। এমন সময় সেখানে

এক পাগল এসে উপস্থিত হয়। পাগল লোকটিকে উদ্দেশ করে বলল—তুমি নিজেই ভগবানকে দেখনি আর অন্যকে ভগবানকে দেখাবার কথা বলছ! লোকটির শিষ্যরা পাগলের উক্তিতে বিরক্ত হয়। তারা পাগলকে চলে যেতে বলে। পাগল যাবার আগে লোকটিকে আরও বলল—গুরু সেজে বসেছ! কিছুই তো শিখলে না, জানলে না! পরে তুমি ঠেলা বুঝবে! গুরু সেজেছ, গুরু সাজা পাবে! এই কথা বলে পাগল চলে যায়। পাগলের কথা শুনে লোকটি মনে মনে ভাবল, পাগল তো সত্যি কথাই বলেছে! আমি তো এখনও ভগবানকে পাইনি, কিন্তু এই লোকগুলিকে যে মিথ্যা কথা বলছি তার শাস্তি তো আমায় একদিন পেতে হবে, তখন আমি কী করব!

নানা কথা চিন্তা করতে করতে সাধুবেশী লোকটি একটি গাছের নিচে আশ্রয় নেয়। লোকটি ঘুমিয়ে পড়তে আরেকটি স্বপ্ন দেখে। সে স্বপ্নের মধ্যে দেখে যে, এক জ্যোতির্ময় পুরুষ আকাশপথে চলেছেন। তাঁকে দেখে লোকটি ভাবল, এঁর পিছনে পিছনে গেলে জানতে পারব তিনি কোথায় থাকেন! তারপর সুযোগ বুঝে তাঁর কাছে দীক্ষাও নিয়ে নেব। এই সব ভাবছে আর জ্যোতির্ময় পুরুষকে সে অনুসরণ করে চলেছে। চলতে চলতে লোকটি একটি খাদের মধ্যে পড়ে যায়। তখন সে মনে মনে ভাবল, এ কী আমি তো খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছি, এখন কী করে উঠব! কোনওরকমে লোকটি একটি লতা ধরে উঠতে চেষ্টা করে। যখন সে কিছুটা ওঠে তখন তার খেয়াল হয় যে তা লতা নয়, একটি সাপ। তখন সে সাপকে ছেড়ে আরেক পাশে যাবার চেষ্টা করতে দেখে যে কিছু দূরে একটি বাঘ তাকে খাবার জন্য অপেক্ষা করছে। তখন লোকটি মনে মনে ভাবল যে, যদি ওপাড়ে চলে যাওয়া যায় তাহলে প্রাণটা বাঁচতে পারে! একটি গাছের ডাল ধরে ঝুলে ওপাড়ে যাবার চেষ্টা করছে লোকটি, কিন্তু সাহস পাচ্ছে না। যে গাছের ডাল ধরে লোকটি ঝুলছিল সেই গাছের গুঁড়িতে দু'টি ইঁদুর মাটি খুঁড়ছিল এমন ভাবে যে, যে-কোনও সময়ে গাছটি মাটিতে পড়ে যাবে। সেই সময় লোকটি দেখে যে গাছটিতে থোকা থোকা আঙুর ঝুলছে। তখন লোকটি ভাবল, জীবনটা তো এমনিতেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু এখন তো খিদে পেয়েছে! তখন লোকটি আঙুরগুলি খেতে আরম্ভ করে। আঙুরগুলি খুব টক ছিল। এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে লোকটির হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতে সে দেখল যে, একটা খাটের উপর সে শুয়ে আছে।

গল্পটি শেষ করে শ্রীশ্রীবাবাঠাকুর বললেন—এর মধ্যে কোন স্বপ্নটি সত্য? দশটি স্বপ্ন সে দেখেছে। আমাদের প্রত্যেকের জীবনও ঠিক তাই। আমরা সবাই এখানে স্বপ্ন দেখছি। 'এ' (নিজেকে নির্দেশ করে) যে তোমাদের দেখছে, কথা বলছে তাও কিন্তু 'এর' কাছে স্বপ্ন—I know it is also a dream। তোমরা একটু পরে সবাই চলে যাবে, but I will remain as it is, তখন আর তোমরা এতজন থাকবে না। এক সময়ে ছিলে না, এক সময়ে এসে পড়েছ, আবার এক সময় চলে যাবে। এতগুলো অবস্থার মধ্যে which one is real? যখন কেউ ছিল না তখন hall-টা vacant ছিল without a single one। পরে একে-একে সবাই এসে এখানে উপস্থিত হল। পূর্ব অবস্থার সঙ্গে বর্তমান অবস্থার তুলনা করলে present-টাই সবার কাছে real মনে

হবে। আবার যখন hall vacant হয়ে যাবে তখন the absence of people in the room will be revealed by the same light which is the witness of all—first absence, second presence and lastly again absence। সৃষ্টির রহস্য হল—আদিতে সৃষ্টি ছিল না, মধ্যে সৃষ্টি হল এবং অন্তে সৃষ্টি থাকবে না।

কী খেলা খেলতে এসে ভবে
কী খেলা খেলিছ সবে
জান না তার আদি-অন্ত
মধ্য নিয়ে সবে আছ মেতে।
কী খেলা খেলিছ সবে....।।

এই আমারবোধ নিয়ে আমি যে সংসারে খেলে বেড়াচ্ছে তা কতক্ষণ থাকছে? কেন চিরকালের জন্য থাকছে না? না-থাকার কারণ কী? কে ভাবছে। যারা ভাবছে তারা কী দিয়ে ভাবতে পারছে? 'এও' তোমাদের মতো মানুষ, সুখে-দুঃখে গড়া জীবন। কিন্তু 'এর' কাছে একটি রহস্য উদঘাটিত হয়েছে। এই সত্য cent percent original এবং প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। সেই জন্য 'এ' আমি-র বিজ্ঞান তোমাদের সামনে পরিবেষণ করছে। আমার বিজ্ঞান সম্বন্ধে সবাই সচেতন to some extent, অর্থাৎ mind সম্বন্ধে অনেক information পাবে, কিন্তু আমি-র অর্থাৎ I, the witness of all, তার খবর অনেকেই জানে না। I or the witness is not the enjoyer, experiencer and the doer but the eternal witness, the underlying essence or substratum. প্রত্যেকের মধ্যে witness-এর একটা part আছে যা unattached, unalloyed, unmixed, the eternal substratum, the background of all, the underlying essence of all which lies behind all the panorama of creation—gross, subtle, causal and remains unaffected by all creations in the foreground। Background remains always the same, it is unaffected. 'এ' সেই আমি-র কথা বলছে যা প্রত্যেকের মধ্যে আছে, কিন্তু তোমাদের মন তা ঢেকে রেখেছে। মন-পর্দা দিয়ে তা ঢাকা আছে। সেই পর্দা না-সরালে তার সন্ধান পাবে না।

জীবাত্মা ক্ষণিকের স্বপ্নমাত্র। এই স্বপ্নের প্রসঙ্গ নিয়ে নিশ্চয়ই তোমরা ভেবে দেখবে। অবশ্য অনেকেই এই বিষয় নিয়ে ভাববে না। তারা 'eat, drink and be merry' দলের লোক, শুধু মজা লুটতে ব্যস্ত। কিন্তু যখন opposite nature অর্থাৎ কর্মের ফল তাকে এসে গ্রাস করবে, তখন আর কোনও উপায় খুঁজে পাবে না। মানুষ কারণ সম্বন্ধে জানে না বলে কার্য দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং কার্যের চক্রের মধ্যেই ঘুরে বেড়ায়। Action without cause is not possible, but when you reach the cause state no action can touch you. কার্য কখনও কারণকে অতিক্রম করতে পারে না। আসল scientist সে-ই who is possessed by the sense of universal causation। 'এ' material scientist-দের কথা বলছে না, কারণ এরা

limited কতগুলো জিনিস নিয়ে মাতামাতি করে এবং ধ্বংসের কারণ সৃষ্টি করে নিজেরাই হায় হায় করছে। যে বিজ্ঞানের দ্বারা সমস্ত অজ্ঞান, দ্বৈত, বৈচিত্র্য, মনের সকল স্তর অতিক্রম করে নিত্য অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠা লাভ করা যায় সেই বিজ্ঞানের কথাই তোমাদের কাছে প্রসঙ্গক্রমে পরিবেষণ করা হচ্ছে।

Each and every individual will have to suffer like this person who experienced ten dreams. 'এ' দশটি স্বপ্নের কথা উল্লেখ করেছে, কিন্তু জীবনভর মানুষকে কত স্বপ্ন দেখতে হবে! একেকটি জীবন একেকটি স্বপ্ন। মানুষ চুরাশি লক্ষ জনম অতিক্রম করে তার শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। প্রতি জন্মে মানুষ যে কত স্বপ্ন দেখে তার হিসাব নেই। সেই হিসাবে চুরাশি লক্ষ জন্মের স্বপ্নের সংখ্যা অসংখ্য। সেই সকল স্বপ্ন জীবনের সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ সব কিছু অবলম্বন করে আমি-র বক্ষে আমারবোধের স্বকল্পিত কল্পনাবিলাসের স্বপ্নের সমষ্টি। সেই স্বপ্নগুলি হল জীবনের সম্পদ। তার ভিত্তিতে মানুষের সাংসারিক জীবনের অভিজ্ঞতার মান ও পরিচয় নির্ণিত হয়। স্বপ্ন হল মনের কল্পিত সৃষ্টি বা বিলাসরচনা। মন তার কারণ জানে না। সেই জন্য স্বপ্নকেই সত্য মনে করে তার মধ্যেই জীবন কাটায়। মনের পশ্চাতে যে বিশুদ্ধবোধস্বরূপ আত্মা সে-ই হল পাকাআমি অহংদেব। তাঁ মনাতীত বলে স্বপ্নাতীত। মনের অন্তর্ভুক্ত হল গুণ-ভাব অবস্থাদি। তার সঙ্গে যুক্ত যে চৈতন্যের অংশ তা হল জীবচৈতন্য, অহংকার তার নাম। এই অহংকারই কর্তা-ভোক্তা-জ্ঞাতা সেজে জীবননাট্যে অভিনয় করে চলেছে। এই অহংকারের পশ্চাতে রয়েছে কূটস্থ সাক্ষিচৈতন্য আত্মারাম পাকাআমি। কাঁচাআমি পাকাআমি-র অংশ হলেও এবং পাকাআমি-র বুকে খেলে বেড়ালেও পাকা আমি-র পরিচয় জানে না। তাই কাঁচাআমিকে জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধির চক্রে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করতে হয় স্বভাবদোষে। তাই হল তার আত্মবিস্মৃতির ফল—জীবনবন্ধন। পাকাআমি-র শরণ নিলে এবং তাঁর আশ্রয়ে বাস করলে তাঁর কৃপায় কাঁচাআমি পাকাআমি-র ধর্ম অর্থাৎ সাক্ষিবোধে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তখন তার আর দ্বৈতবোধ বা জীবভাব থাকে না, অন্তঃকরণ মন-বুদ্ধির কার্যও থাকে না। সুতরাং মনোকল্পিত স্বপ্নেরও আর কোনও কারণ ও সম্ভাবনা থাকে না। শুদ্ধ আপনবোধই হল পাকাআমি-র স্বভাব ও ব্যবহার। এই আপনবোধে শুধু আত্মবোধই খেলে, আমারবোধ বা অনাত্মবোধ খেলে না।

'এ' তোমাদের ভয় দেখাচ্ছে না, শুধু তোমাদের আত্মার (পাকাআমি) আমিকে point out করছে যাতে তোমরা সচেতন হও। Don't forget that you are the same I which is the witness of all duality, relativity, manyness (plurality) because it is the eternal substratum of all, the background of all and the underlying essence of all. একটি ছবি আঁকতে গেলে একটা background-এর প্রয়োজন—canvas, paper বা wall যাই হোক। মনে কর তুমি একজন শিল্পী। Oil painting-এর মধ্যে তুমি কত কিছু আঁকতে পার—নদী, ঝরনা, পাহাড়, সাগর, মানুষ, পশু, পাখি, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি। কিন্তু একটা background না-থাকলে এগুলো আঁকা কি সম্ভব? 'এ' তোমাদের মধ্যে অবস্থিত সেই background অর্থাৎ

আমি-র কথাই বলছে। এই background-এর দোহাই দিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে কিন্তু তার ফল ভোগ করতে হবে! তুমি কারও বাবা, মা, পত্নী, পুত্র, কন্যা, ভাই, বোন রূপে অভিনয় করলেও তুমি সত্য কেউ বা কারও নও। You are the Real I, the substratum, Pure Consciousness without which no designation is possible, no categorical function is possible and no life function is possible. এই হল তোমাদের সামনে 'এর' বক্তব্য। এই প্রসঙ্গ বারবার তোমাদের সামনে রাখার কারণ হল, যদি কখনও কথাগুলি মনে ধরে! আর যদি না-ধরে তবে যেমন ভাবে চলছ সেই ভাবেই চল। যে ভগবান ছাড়া কারও কোনও অস্তিত্ব নেই, যিনি কারও কাছে ধরা দেন না, তিনি যে তোমার মধ্যে বসেই খেলছেন can you acknowledge it? Without acknowledgement how can you recongnize it? Without recognition how can you realize it? That essence (Real I) can be realized but cannot be explained. কী দিয়ে comprehend করবে? তুমিই সেই essence। আজ সবার মাঝে একটা magical game হয়ে গেল। কোনটা সত্যি তা নির্ণয় করতে হবে। এই যে সকলে এখানে বসে আছ এটাও কিন্তু স্বপ্ন। I never consider all these as real. They are relative existence which are reflections of the same I which exists in you as infinite One. All finite expressions are dream. We are infinite in infinite, of infinite, from infinite, for infinite, by infinite, with infinite, to infinite, on infinite and beyond, beyond. That is the Real I, without which none of you can exist, not to speak of your characteristic feature of dream life.

তোমাদের কাছে পরিমাণ করবার কোনও যন্ত্র আছে কি? পরস্পরের মধ্যে ভেদ দেখা ছাড়া আর কিছু দেখবার যন্ত্র আছে কি তোমাদের? মানুষ অন্যের দোষ দেখতেই অভ্যস্ত এবং নিজের দোষ না-দেখে পরের দোষ দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। তার পরে রাতে ঘুমিয়ে পড়ার পর স্বপ্ন দেখে। কাজেই হৃদয়পুরে বসে কে সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি নাড়ছে? এই সোনার কাঠি ও রূপোর কাঠি যে তোমাদের নিজেরই কল্পনা তা ভুলে যেও না। কল্পনা দিয়ে গড়া এই সংসার। যা সৃষ্টি হয়েছে তা ধ্বংস হবেই। আর যা সৃষ্টিই হয়নি তার নাশ নেই। Real I সৃষ্টি হয়নি, অহংকার সৃষ্টি হয়েছে ফলে তার নাশ হবে, তার বিকার আছে। অহংকার দেহ নিয়ে বাস করে, কাজেই দেহের সুখ-দুঃখ-জরা-ব্যাধি face করতেই হবে। একদিন সকলেই শিশুরূপে জগতে এসেছিল, ক্রমে বয়স হল এবং বৃদ্ধ হল। অনেকেই তখন আর একা একা চলতে পারে না। কিন্তু এই ভাবে তো কেউ আসেনি, সকলেই ছোট শিশু হয়ে জগতে এসেছিল। প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য। This is one aspect of our life, but this is not real, it is just like a dream experience. আমি-র যখন জন্মই হয়নি তখন কী করে বার্ধক্য আসবে? এই দশটি স্বপ্নের মধ্যে 'এর' বক্তব্যের সার কথা সুন্দর ভাবে দেওয়া হয়েছে। দেখ তোমরা নিজেকে খুঁজে পাও কী না!

স্বপ্ন হল মনোময় কোষের এক অভিনব খেলা, কল্পনাবিলাস। সমগ্র সৃষ্ট জগৎই মানসরচনা, মনেরই সৃষ্টি, মনের মধ্যেই তার উৎপত্তি, স্থিতি, বিকার, বিকৃতি অর্থাৎ বিস্তার পরিণাম এবং লয় বা নাশ। তাই গানের ভাষায় বলা হয়েছে 'মনোদয়ে জগতের উদয় আবার মনোলয়ে জগতের লয়'। অখণ্ড ভূমা পূর্ণ অদ্বয় বিশুদ্ধ চিৎসত্তা পরমাত্মা অহংদেব আত্মারাম পাকাআমির বক্ষে এই চিত্ত বা মানসসত্তার অভিব্যক্তি হয়। অর্থাৎ Absolute 'Self I'-এর বক্ষে তার অন্তর্নিহিত স্বভাবশক্তি মানসরূপে/ universal Mind রূপে অভিব্যক্ত হয়। এই স্বভাবরূপী universal mindই হল চিৎসত্তার বক্ষে তার প্রথম অভিব্যক্তি বা আদি স্পন্দন তারই নাম হচ্ছে নাদব্রহ্ম। এই universal mind অর্থাৎ সমষ্টি মন হল সমগ্র বৈচিত্রময় সৃষ্টির মূল কেন্দ্র ও উৎস। এই সমষ্টিমন বা চিত্তের বুকে মনের অভিনব কল্পনাবিলাস ইন্দ্রজালবৎ অর্থাৎ যাদুকরের যাদুখেলা—magic-এর মতো নিরন্তর সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাব নাম রূপে এক অনন্যসাধারণ কল্পনাবিলাস রচনা করে স্বভাবমহিমাকে সত্তার বক্ষে প্রদর্শন করছে। তাই গানের ভাষায় বলা হয়েছে 'ইন্দ্রজালবৎ বিশ্বজগৎ অনন্ত অনন্ত কল্পনার বিলাসক্ষেত্র। কল্পনার বুকে কল্পনা জাত হয়। স্বপ্নবৎ হয় তা প্রতিভাত। তাদের পরস্পরের মহিমা কোথাও স্থূল কোথাও সূক্ষ্ম কোথাও সূক্ষ্মতর কোথাও সূক্ষ্মতম, আদি মধ্য অন্তে তারা কত যে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব মিলেই এই স্বপ্নের জগৎ'। সংক্ষেপে বলা হয়েছে চিৎসত্তায় স্বপ্রকাশ চিৎ-এর বুকে চিত্ত ভাসে। চিত্তের বুকে ভাসে অনন্ত বিশ্ব—জীবজগৎ। চিত্ত মূলে চিৎতত্ত্ব, চিৎসত্তা নিত্যানন্দে সদা স্বয়ং প্রকাশে।

এই স্বপ্নবৎ পার্থিব জগৎ হল মনেব অভিনব সৃষ্টি রচনা ও বিলাস। তার অভিনবত্ব কল্পনার দ্বারাই সৃষ্ট কল্পনার দ্বারাই বিধৃত আবার কল্পনার দ্বারাই হয় নিবৃত্ত। এই স্বপ্নের জগৎ জীবনের মাধ্যমেই সর্বতোভাবে অভিব্যক্ত বিস্তৃত অনুভূত এবং তাই সত্য বলে জীবরূপী মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ও অপরিহার্য। জীবরূপী মানুষেব জন্ম, সাময়িক স্থিতি, ক্রমবৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষয় ও লয় বা নাশ এই ছয়টা বৃত্তির মাধ্যমে এই মনোমায়ার লীলাভিনয় জীবজগৎ রূপে অনুমিত কল্পিত ও অনুভূত হয়। জীবের যে স্বরূপ তা মানসদৃষ্টিতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-মনের দৃষ্টিতে সত্য বলেই গন্য হয়। জীবনের মধ্যে মনের সর্ববিধ ক্রিয়াকলাপ বিলাসাদি দ্বৈতবোধে অর্থাৎ দ্রষ্টা ও দৃশ্য বোধে, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় বোধে, স্রষ্টা ও সৃষ্টি বোধে সর্বত্র অনুভূত হয়। এই অনুভূতির একটি কেন্দ্র হল অন্তরে আরেকটি কেন্দ্র হল বাইরে। অন্তরে দ্রষ্টা জ্ঞাতা কর্তা ভোক্তা, স্রষ্টা রূপে হল অহংকার এবং বাইরে দৃশ্য, জ্ঞেয়, কর্ম, ভোগ ও সৃষ্টি রূপে হল অহংকারের বিষয়—আমারবোধ। এই আমারবোধের মধ্যে স্থূল সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর সূক্ষ্মতম অসংখ্য ক্রম আছে। দৃশ্যের মধ্যেও এইরূপ ক্রমের পরিচয় পাওয়া যায়। এই বাইরে যা পরিদৃশ্যমান জগৎ তা হল অন্তরের অভিব্যক্তি বা স্ফূর্তিরূপ। অন্তর হল আবার জীবনের কেন্দ্রসত্তার অভিব্যক্তি বা স্ফূর্তিরূপ। তারও কেন্দ্রে আছে অনাদি অনন্ত স্বতঃসিদ্ধ স্বতঃস্ফূর্ত স্বয়ংপ্রকাশ চিৎতত্ত্ব চিৎসত্তা, ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্ম তার নাম।

অন্তর্বোধের ব্যবহার বলতে মন বুদ্ধির ব্যবহারকেই নির্দেশ করা হয় সর্বতোভাবে। জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়মনে যে বোধের বৃত্তি খেলে তার একটা সূক্ষ্ম সংস্কার চিত্তে

রক্ষিত (recorded) হয়ে থাকে সূক্ষ্মভাবে। জাগ্রৎ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্তী হল স্বপ্নাবস্থা। এই স্বপ্নাবস্থার মধ্য দিয়ে মন জাগ্রৎ অবস্থা হতে সুষুপ্তি অবস্থায় যায় প্রতিদিন নিদ্রাকালে। সাথে থাকে তার জাগৎকালীন স্থূল সূক্ষ্মাদি অনুভূতির পূর্ণ সংস্কার। সেই সংস্কারাদি পরস্পর মিলে স্বপ্নাবস্থায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ জ্ঞাতব্য হল যে জাগ্রৎ অবস্থায় মনের সাধ আহ্লাদ কল্পনা, ভোগবৃত্তি যা পূর্ণাঙ্গ ভাবে হয় না নানাকারণে, যোগ্যতা সময় পরিবেশ অবস্থা প্রভৃতি তার অন্তরায় হওয়ার জন্য সেই সব অসমাপ্ত সাধ আহ্লাদ ভোগবৃত্তি আদি স্বপ্নকালে চরিতার্থ হওয়ার প্রয়াস/সুযোগ পায়। তার মধ্যে পূর্ব ভুক্ত অনুভূত সংস্কারাদি তো থাকেই তার সাথে থাকে কিছু কল্পিত মিশ্র ভাববোধের সংস্কার আবার কিছু থাকে নতুন কল্পিত ভবিষ্যতের কিছু কল্পনা। সেইজন্য স্বপ্নের অভিজ্ঞতা কিছু বাস্তবের সঙ্গে মিল থাকে আবার কিছু তার সঙ্গে মিশ্রিত হয় আবার কিছু সম্পূর্ণ নতুন ভবিষ্যতের ঘটনাবলীর অভিনব দৃশ্যাবলী স্বপ্নরূপে ফুটে ওঠে। সমগ্র স্বপ্নই হল বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাববোধের এক অভিনব সংস্করণ। এই হল রাত্রিতে নিদ্রাকালে আমরা যে স্বপ্ন দেখি তার বিজ্ঞানভিত্তিক বৃত্তান্ত।

জ্ঞানীদের দৃষ্টিতে জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা যা ভাবি চিন্তা করি, পরিকল্পনা করি এবং কার্যে পরিণত করি সে সবের সংস্কারাদিও মানসব্যাপার—মনের সৃষ্টি। বোধস্বরূপ চিদাত্মা স্বয়ংপূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ। এই চৈতন্যসত্তার স্বয়ংপ্রকাশতাকে তত্ত্বজ্ঞানী তত্ত্ববিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন যেভাবে তা হল ঃ (1) Ordinary conscious mind (চৈতন্যের জাগ্রত অবস্থা) (2) Sub conscious mind (চৈতন্যের স্বপ্নাবস্থা) (3) Unconscious mind (চৈতন্যের নিদ্রা বা সুষুপ্তি অবস্থা) এবং (4) Super Conscious or All Conscious mind—Transcendental mind (বোধের তুরীয় অবস্থা)

আত্মজ্ঞানী/ব্রহ্মজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অখণ্ড ভূমা পূর্ণ চৈতন্যই একমাত্র সত্যবস্তু বা পরমতত্ত্ব, তা নিত্যাদ্বৈত এবং স্বতঃসিদ্ধ, স্বতঃস্ফূর্ত প্রজ্ঞানঘন সচ্চিদানন্দ। তদতিরিক্ত দ্বৈত যা কিছু প্রতিভাত হয় তা ভ্রান্তিপূর্ণ কল্পিত কল্পনার সম্যকরূপ এই নাম রূপের দ্বৈতজগৎ। অজ্ঞানকারণ আত্মার দৃষ্টিতে অর্থাৎ সমবোধ বা অদ্বয়বোধের দৃষ্টিতে যেমন রজ্জুসর্পবৎ শুক্তিরজতবৎ মরুভূমিতে মরীচিকাবৎ ভ্রম হয় সেইরূপ অদ্বয় ব্রহ্ম আত্মাতে দ্বৈত জগৎ ভ্রম হয়। সেইজন্য জ্ঞানী জগৎ দেখে না ব্রহ্ম আত্মাকেই নিরন্তর অনুভব করে এবং সত্য বলে তাকেই মানে। কল্পিত কল্পনার বিলাসরূপে জগৎ তাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে স্বপ্নবৎ। সোজা কথায় দ্বৈতবোধই কাঁচাআমি অহংকার অজ্ঞানী স্বপ্ন দেখে কিন্তু পাকাআমি সত্যবোধে আত্মাকেই আপনবোধে নিরন্তর অনুভব করে। অদ্বয়বোধই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম আত্মার পরিচয়, পাকাআমি হল তার প্রমাণ। স্বানুভূতি হল তার স্বরূপ আপনবোধ হল তার ব্যবহার। এক কথায় আমি-র বুকে বা আমিতে আমি-র প্রকাশ আমি হতে আমি-র জন্য আমি-র দ্বারা আমার সাথে আমাতে/আমিতে আমি-র নিত্য স্ববোধে বা আপনবোধে লীলাবিলাস।

এক আমি যে সবার আমি এবং সবার আমি যে এক আমি—এই তত্ত্বপূর্ণ পরম সত্যটি প্রকাশ করার জন্যই স্বপ্নের বিজ্ঞানরহস্যের মাধ্যমে তোমাদের আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত হবার রহস্য ব্যক্ত করা হয়েছে। এই আমিই হল অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের স্বরূপ। আবার অখণ্ড পূর্ণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের স্বরূপও আমি। জ্ঞানসত্তাই হল জ্ঞানসাগর চিদাকাশ। তার স্বয়ংপ্রকাশতাই হল তার বিজ্ঞান। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানস্বরূপই হল তত্ত্বের পরিচয়। তা সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণ সনাতন। তার বক্ষে তার প্রকাশাদি তার স্বভাবশক্তির মাধ্যমে নিরন্তর লীলায়িত হয়ে চলেছে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাব কত ভাব ভঙ্গিমায়ই না অভিব্যক্ত হয় জীবনের রূপ ধরে! তার স্বভাবশক্তি তার বিজ্ঞানশক্তি। তার সত্তাতে পরাচিৎ গুণ-ভাবের অতীত অবিমিশ্র পূর্ণ আমি হল পাকাআমি আত্মারাম (ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্ম)। জীবনের কেন্দ্রে তা হল স্ববোধস্বরূপ। তার প্রকৃতি হল চিৎশক্তি বা বিদ্যাশক্তি। অন্তরে তা হল চিৎ-অচিৎ (বিদ্যা-অবিদ্যা অথবা জ্ঞান-অজ্ঞান) মিশ্রণ জীবশক্তি। বাইরে তা হল অচিৎ অবিদ্যা অজ্ঞানপ্রকৃতি। জীবন প্রথমে অবিদ্যা অজ্ঞানপ্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং তার প্রভাবে চলে বহু জনম। পরে ক্রমশ সংস্কৃত ও শুদ্ধ হয়ে অবিদ্যা অচিৎ অজ্ঞানের প্রভাবমুক্ত হবার জন্য চেষ্টা করে বিদ্যাশক্তির সাহায্যে। বিদ্যার প্রভাবে অবিদ্যার মিশ্রণ হতে মুক্ত হয়ে কেন্দ্রসত্তা স্ববোধের সঙ্গে মিশে জীবের অজ্ঞান অনাত্মা যুক্ত কাঁচাআমি কেন্দ্রের স্ববোধ-আত্মা পাকাআমি-র ধর্মপ্রাপ্ত হয়। পাকাআমি-র কৃপাতে তা সম্ভব হয় বলে পাকাআমি-র প্রসঙ্গ কাঁচাআমি-র পক্ষে সর্বতোভাবে গ্রহণ করা ও তাঁর আশ্রয় নেওয়া একান্ত আবশ্যক। সেই জন্য আমি-র তত্ত্ব, সত্য ও ধর্মকে সম্যক্‌রূপে তোমাদের সামনে ব্যক্ত করা হল স্বানুভূতির (প্রত্যক্ষ অনুভূতির) দৃষ্টিতে। আত্মার আমি পাকাআমি। পাকাআমি কেবল নিত্য অদ্বয় সত্য, দ্বিতীয় সেথায় অবান্তর ও অসিদ্ধ। আমি-র জ্ঞান ও বিজ্ঞানকে তোমাদের কাছে পরিবেষণ করা হল তোমাদের আত্মবোধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। এই পাকাআমি হল আত্মার আমি, তোমাদের সকলের আপন পরিচয়। তাঁ মনাতীত, সুতরাং তোমাদের কল্পনা, কার্য, বাক্য, মন ও সর্ব উপাধি রহিত, নাম-রূপ বর্জিত কেবল সচ্চিদানন্দস্বরূপ নিত্য এক এই পাকাআমি। এই হল পরমতত্ত্ব নিত্যাদ্বৈত ঈশ্বর-আত্মা-ব্রহ্মের বিজ্ঞান।

গল্পে আত্মবিদ্যা গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডে যত গল্প আছে তার মধ্যে আত্মবিজ্ঞানকে—আপনবোধের রহস্যকে অতীব সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে স্বানুভূতির বিজ্ঞানজ্যোতিতে। সহৃদয় পাঠকবর্গ অতি মনোযোগ সহকারে গল্পগুলি পাঠ করলে এবং তার অন্তর্নিহিত বিষয়বস্তুকে ভাবনা করলে গল্পগুলির অন্তর্নিহিত তাত্ত্বিক রহস্য অবশ্যই হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। গ্রন্থের প্রবক্তার এই উক্তির যথার্থতা পাঠকবর্গই প্রমাণ করবে, তাদের স্বানুভূতির মাধ্যমে। *

২৭। ১২। ০২
